প্রেমচাঁদের উর্দু ছোটগল্পে সমাজ চিত্র

পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ

গবেষক

আ. ন. ম এহছানুল মালিকী
পিএইচ. ডি. গবেষক
উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ

সেপ্টেম্বর ২০১৯

ঘোষণা পত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **প্রেমচাঁদের উর্দু ছোটগল্পে সমাজ চিত্র** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণাকর্ম। এটি কোনো যুগ্মকর্ম নয়; বরং আমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে এই শিরোনামে ইতোপূর্বে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। এই অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য প্রণীত হয়েছে। আমি আমার এই গবেষণাকর্ম পূর্ণ বা এর অংশবিশেষ কোথাও কোনো ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি।

(আ. ন. ম এহছানুল মালিকী)
পিএইচ. ডি. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং : ০৯
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫
উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

Professor
Dr. Md Israfil
Department of Urdu
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone : Office 9661920-59/6154
Residence 01718-191747

অধ্যাপক
ড. মো: ইস্রাফীল
উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : অফিস ৯৬৬১৯২০-৫৯/৬১৫৪
বাসা ০১৭১৮-১৯১৭৪৭

Ref.............................. Date.......................

প্রত্যয়ন পত্র

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের পিএইচ. ডি. গবেষক **আ. ন. ম এহছানুল মালিকী** কর্তৃক পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত **প্রেমচাঁদের উর্দু ছোটগল্পে সমাজ চিত্র** অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় লেখা হয়েছে। এই গবেষণাকর্ম গবেষকের একক গবেষণার ফল। অন্য কেউ এর কোনো প্রকার অংশীদার নয়। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি এবং এই গবেষণাকর্মের সামগ্রিক বা আংশিক অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

আমি অভিসন্দর্ভটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অধ্যয়ন করেছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন করেছি। এর মৌলিকত্ব বিচার করে গবেষককে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনের অনুমতি প্রদান করছি।

(ড. মো: ইস্রাফীল)
অধ্যাপক ও গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রেমচাঁদের উর্দু ছোটগল্পে সমাজ চিত্র শীর্ষক মৌলিক অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজ সম্পন্ন করতে পেরে মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ ইস্রাফীল। তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের নির্দেশনা ও আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এ কঠিন কাজটি সম্পন্ন করা সহজ হতো না। তাই আমি তার কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের অধ্যাপক ড. জাফর আহমদ ভূঁইয়া, ড. মোঃ মাহমুদুল ইসলাম, ড. মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী, সহকারী অধ্যাপক জনাব হুসাইনুল বান্না এ বিষয়ে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও উপাত্ত প্রদান করেছেন। এছাড়া আমার নিজস্ব বিভাগ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগ) এর প্রাক্তন ছাত্র বন্ধুবর জনাব ইনায়াতুল্লাহ সিদ্দিকী, শরিফুল ইসলাম ও স্নেহাস্পদ ছোট ভাই ও বোন যথাক্রমে আব্দুস সালাম, শফীকুল হাসান শিহাব, মোঃ নুরুন্নবী, খাদিজা আক্তার বেনজীর, মৌসুমী খাতুনসহ আরো অনেকের কাছ থেকে পেয়েছি প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগীতা!

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধাস্পদ প্রিয় ব্যক্তিত্ব কলকাতা গার্লস কলেজের শিক্ষক ড. নাঈম আনিসের, যার তথ্য দেয়া, পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা আমার গবেষণাটিকে করেছে আরো সমৃদ্ধ। আমি তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

এ গবেষণাকর্মের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি,উর্দু বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, ঢাকা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, এছাড়াও ভারতের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি, মুসলিম ইনিস্টিটিউট লাইব্রেরি ইত্যাদি ব্যবহার করেছি। এ সকল লাইব্রেরির কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ আমাকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নানা ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। বিশেষভাবে স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা রীনা রানী সরকারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের ও নাদিয়া এন্টারপ্রাইজের শাহজালালকে তাদের সহযোগিতা না পেলে হয়তো অভিসন্দর্ভটি হতো গবেষণার ক্ষেত্রে অপ্রতুল! তাদের সহযোগতিার ফলে বর্তমানে গবেষণাটি পূর্ণতা পেয়েছে বলে আমি মনে করি। আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা, ছোট দুই বোন, আমার সহধর্মীনি, একমাত্র সন্তান আবরার এহছান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী ড. রশিদ আহমদ, ড. মোঃ রেজাউল করিম, জনাব মোঃ গোলাম মাওলা, হাফসা আক্তারের প্রতি,

যাদের দু'আ ও আন্তরিকতা, উৎসাহ-উদ্দীপনা আমার এ কাজকে করেছে আরো বেগবান আরো শাণিত। মহান আল্লাহ পাকের কাছে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা করি। আমীন!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় **গবেষক**

সেপ্টেম্বর, ২০১৯

সূচিপত্র

ক্র. নং	অধ্যায়		বিষয়	পৃষ্ঠা
১.			ভূমিকা	১-৪
২.	**প্রথম অধ্যায়**	ঃ	প্রেমচাঁদের জীবন কথা	৫-৪৯
৩.	**দ্বিতীয় অধ্যায়**	ঃ	প্রেমচাঁদের উর্দু ছোটগল্পে সমাজ চিত্র	৫০-১৫১
৪.	**তৃতীয় অধ্যায়**	ঃ	প্রেমচাঁদের উর্দু ছোটগল্পে সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য	১৫২-২১৮
৫.	**চতুর্থ অধ্যায়**	ঃ	প্রেমচাঁদের সমকালীন কয়েকজন উর্দু গদ্য সাহিত্যিক	২১৯-৩০৩
৬.		ঃ	উপসংহার	৩০৪-৩০৬
৭.		ঃ	মুন্সি প্রেমচাঁদের জীবনপঞ্জি	৩০৮-৩১০
৮.		ঃ	মুন্সি প্রেমচাঁদের উর্দু ও অন্যান্য ভাষার রচনাবলীর তালিকা	৩১১-৩১৭
৯.		ঃ	সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার নাম	৩১৮-৩২২
১০.		ঃ	চিত্রাবলী ও প্রতিচিত্র	৩২৩-৩৪৩

ভূমিকা

মুন্সী প্রেমচাঁদ উর্দু সাহিত্যের এক কিংবদন্তী সব্যসাচী ছোটগল্পকার। যিনি ছোটগল্প লিখে উর্দু সাহিত্যকে তুলে নিয়ে গেছেন স্বর্ণচূড়ায়। প্রেমচাঁদের কলম চলেছে হিন্দী, উর্দু উভয় ভাষাতেই। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় নির্যাতিত মানুষের আর্তনাদ, জমিদার ও মহাজনীর শোষনের চিত্র ফুটে উঠেছে তার ছোটগল্পের পরতে পরতে। প্রেমচাঁদ তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থাকে খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করে সমাজের দুষ্ট চক্রগুলোকে চিহ্নিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। উর্দু হিন্দী ভাষায় ছোটগল্প কারের সংখ্যা অধিক হলেও প্রেমচাঁদ তার ছোটগল্পের মাধ্যমে উর্দু, হিন্দী পাঠকের কাছে স্বতন্ত বৈশিষ্ট অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। প্রেমচাঁদের ছোটগল্পে সমাজ চিত্র যেন সমাজ বাস্তবতার একটি সফল প্রতিচ্ছবি।

প্রেমচাঁদ ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ৩১ জুলাই বারাণসী নামক এলাকা থেকে চার মাইল অদূরে লমহী নামক এক অজপাড়া গাঁয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রেমচাঁদের আসল নাম হল ‘ধনপত রায় শ্রীবাস্তব’। বাড়ীতে আদর করে তাকে নবাব রায় বলে ডাকা হত। কথিত আছে এই নামটি তার কাকার দেয়া। প্রেমচাঁদের বাবা অজেয়ব রায় ছিলেন একজন পোস্ট মাস্টার। মাসিক পচিঁশ টাকা বেতনে পুরো পরিবার চলা ছিল খুব কঠিনসাধ্য ব্যাপার। ছেলে বেলায় প্রেমচাঁদের ঘুড়ি উড়ানোর সখ থাকলেও ঘুড়ি কেনার মত পয়সা তার জুটত না। বেনারসে জন্ম হলেও প্রেমচাঁদ তার পরিবারের সাথে পাঞ্জাবের একটি নিন্ম এলাকায় বসবাস করতেন। পাঞ্জাবের অধিকাংশ অধিবাসীর ভাষা যেহেতু উর্দু ছিল তাই প্রেমচাঁদের প্রাথমিক শিক্ষা উর্দু ভাষার উপর ভিত রচনার জন্য শুরু হয়।

প্রেমচাঁদ ছিলেন একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য। এই একান্নবর্তী পরিবারই ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। আর একে কেন্দ্র করেই ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনায় একটি আদর্শ রূপ দাঁড় করিয়েছিলেন প্রেমচাঁদ।

মাত্র সাত বছর বয়সে মাকে হারান এবং কয়েক বছরের মাথায় বাবাকেও হারিয়ে সংসারের বোঝা যুবক প্রেমচাঁদের মাথায় নেন। এ বোঝা প্রেমচাঁদকে চূড়ান্ত অসহায়ত্বের দিকে ঠেলে দেয়। এই কঠিন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রেমচাঁদ পরিণত বয়সে দ্বিতীয় বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন।

১৮৯৯ সালে তার জীবনে কিছুটা আর্থিক স্বস্তি আসে। তিনি চুনারের এক মিশনারি স্কুলে মাসিক আঠারো টাকা বেতনে চাকরি নেন। এইভাবে বিভিন্ন স্কুলের চাকরি করার একপর্যায়ে প্রধান শিক্ষক হয়ে এলাহাবাদ মডেল স্কুলে আসেন, সেখান থেকে আসেন কানপুর গভর্ণমেন্ট স্কুলে।

মূলতঃ কানপুর গভর্ণমেন্ট স্কুলে থাকা কালীন প্রেমচাঁদের সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত ঘটে। উর্দু পত্রিকা ‘জমানা’র সম্পাদক দয়ানারায়ণ নিগমের সঙ্গে এখানে তার পরিচয় হয় এবং এই পরিচয় ক্রমশ পরিনত হল অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে। প্রেমচাঁদের পক্ষে এই যোগাযোগ যথেষ্ট শুভদায়ক হয়েছিল। এরপর থেকেই ‘জামানা’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রেমচাঁদের গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে।

নবাব রায় ছদ্মনামেই প্রেমচাঁদ সাহিত্য চর্চায় প্রথম দিকে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি প্রায় চার-পাঁচ বছরের মতো কানপুরে ছিলেন। তারপর প্রেমচাঁদ তার ছত্রিশ এবং উনচল্লিশ বছর বয়সে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে এফ.এ. ও বি.এ.পাস করেন এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অধ্যাবসায়ের জন্য তিনি স্কুলের একজন সাধারণ শিক্ষকের পদ থেকে স্কুলের ডেপুটি ইন্সপেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন।

১৯০৩ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত উর্দু *‘আওয়াজ-এ-খালক’* নামক উর্দু সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রেমচাঁদের বিখ্যাত উপন্যাস *‘আসরারে মাআবিদ’* বা *‘মন্দির রহস্য’* প্রকাশিত হলে প্রেমচাঁদ জগৎ বিখ্যাত হয়ে উঠেন। অবশ্য প্রেমচাঁদ প্রথম দিকে উর্দু ভাষার সাহিত্য চর্চা শুরু করলেও পরবর্তীতে তিনি হিন্দীতে বেশ কিছু কাজ করেছেন। তার হিন্দী উপন্যাসগুলোর মধ্যে *‘কৃষ্ণা’* অন্যতম। উনবিংশ শতকের প্রথম দশকে প্রেমচাঁদের লেখায় *‘স্বদেশ প্রেম’* উজ্জ্বল ভাবে ফুটে উঠে। ১৯০৭ সালে তার লেখা *‘দুনিয়া কা সবসে আনমূল রতন’* (পৃথিবীর সবচেয়ে অমূল্য রত্ন) প্রকাশিত হয়। এটি স্বদেশ ভক্তির একটি উঁচু স্তরের কাহিনী। এতে বলা হয়েছিল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু হল সেই রক্তের ফোঁটা যা মাতৃভূমি রক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়। তিনি এই জাতীয় আরো অনেক গল্প লিখেন। এই সব গল্প ‘জমানা’ নামক উর্দু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। স্বদেশ মূলক লিখার জন্য ইংরেজ সরকার প্রেমচাঁদের সাথে বিরূপ আচরন শুরু করে। কালেক্টার অফিসে ডেকে তার হাত পা কেটে ফেলার হুমকি দেয়া হয়। তার লিখিত সমস্ত গল্পগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়।

প্রেমচাঁদ তার স্বরচিত গল্পগুলোকে ১৯১৪ সালের পরে সাধারণত নিজেই হিন্দীতে অনুবাদ করেন। প্রেমচাঁদ নিজেই বলেন, “আমার প্রথম লেখা ১৯০১ ও প্রথম বই ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই লেখার ফলে আমার অহংবোধের তৃপ্তি ছাড়া অন্য কোন রকমের লাভ হয়নি। প্রথম প্রথম আমি সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে লিখতাম তারপর বর্তমান ও অতীতের বীরদের রেখাচিত্র পাঠক মহলের সামনে উপস্থাপন করি। ১৯০৭ সালে আমি উর্দুতে গল্প লিখতে শুরু করি। তারপর হিন্দীতে লিখতে আরম্ভ করি এবং ‘সরস্বতী’ নামক পত্রিকায় পাঠাতে থাকি। এই সময়ে আমার হিন্দি উপন্যাস ‘সেবাসদন’ প্রকাশিত হয়”।

বিশ শতকের পূর্বে উর্দু সাহিত্যে ছোট গল্পের উপস্থিতি ছিল বিরল। বলা যায় প্রেমচাঁদের হাত ধরেই উর্দু সাহিত্যে ছোটগল্পের বিকাশ ঘটে। প্রেমচাঁদের ছোটগল্প *'দুনিয়া কা সাব সে আনমূল রতন'* যখন প্রকাশিত হয়, তখন তার বয়স ছিল সাতাশ। এর দু'বছর পর 'সোজ এ ওয়াতন' নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে সরকার কর্তৃক তা বাজেয়াপ্ত হয়। তাই অনেকে মনে করেন, প্রেমচাঁদ প্রায় অর্ধেক আয়ুস্কাল অতিক্রম করে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। আর জীবনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ অতিক্রম করার পর ১৯১০ সালে *'সোজ এ ওয়াতন'* বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর 'জমানা' পত্রিকায় ছদ্মনাম ব্যবহার করে গল্প লিখতে শুরু করেন। *'বড়ে ঘর কি বেটি'* প্রেমচাঁদের এই সময়ের অনবদ্য রচনা। এরও প্রায় পাঁচ বছর পর প্রেমচাঁদ *'সৌত'* নামে হিন্দী ছোটগল্প লিখেন। ১৯৩৬ সালের ৮ই অক্টোবর উর্দু ও হিন্দী ছোটগল্প রচনার স্বর্ণপুরুষ প্রেমচাঁদ বেনারসিতে মৃত্যু বরণ করেন।

প্রেমচাঁদই প্রথম কবি যিনি সমাজের বঞ্চিত মানুষের না বলা কথাগুলো তার কলম তুলিতে লিপিবদ্ধ করেন। তার অধিকাংশ গল্পগুলো পড়লেই পাঠকের চোখে ভেসে উঠবে জমিদার কর্তৃক কৃষকের শেষ রক্তটুকু শোষণ, মহাজন বা সুদী ব্যবসায়ী কর্তৃক দরিদ্র জনবলকে উচ্চহারে সুদ দিয়ে তাকে সর্বশান্ত করে দেওয়া। প্রেমচাঁদ সুদী ব্যবসায়ীর নির্মমতা পাঠক সমাজে আরো গভীরভাবে তুলে ধরে দেখান যে, বাবা মাহজনের থেকে সুদ গ্রহণ করে যা সুদে আসলে ছেলে পর্যন্ত গড়ায়। তবুও তা শেষ করতে পারে না। যা পরবর্তী বংশধর পর্যন্ত বর্তায়। নারীবাদী গল্পগুলো লিখেতে গিয়ে দেখান, নারীর অধিকার খর্বের চিত্র। যে সমাজে নারীর কোন মূল্যই ছিল না। প্রাক ঐতিহাসিক যুগে নারীদের যেমন কোন মূল্য ছিল না তেমনিআঠারো শতকে হিন্দু সমাজে নারীরা ছিল সমাজ পরিত্যক্তা। না ছিল বাবা-মার কাছে সম্মান, না ভাই-বোনেরকাছে, না শ্বশুর শ্বাশুড়ী, না স্বামীর কাছে, না সন্তানের কাছে, আর না সমাজে বসবাসরত আধুনিক মানব সমাজে। পণ্য সামগ্রী যেমন বেচাঁকেনা হতো তারা ছিল সেই সমাগ্রীর সরঞ্জাম। মুখ থাকতেও তারা ছিল বোবা প্রাণী। কে শুনবে তাদের মুখের কথা, চোখের কোনে জমে থাকা জলের ভাষা। একটু জীবিকা আহরণের জন্য নারী তার শেষ সম্বলটুকু বিলিয়ে দিতে যেখানে দ্বিধাবোধ করে না সেখানে সমাজের উচ্চবিত্ত নর সমাজ তাকে সহযোগীতার পরিবর্তে তার রক্তা শুষে নিতে একটুও কার্পন্যতা করতে দেখা যায় না। নারীর উজার করা প্রেম ভালবাসা পুরুষকে প্রদান করলেও সেই সমাজে পুরুষের কাছে ছিল সেটা খামখেয়ালী ব্যাপার, তাদের চোখে মুখে ছিল বহু নারী লালসা। অচ্ছুৎবর্গের প্রতি রুঢ় আচরনের ছবি প্রেমচাঁদের লিপিতে পাঠক সমাজে নির্মম দাগ কাটে। সমাজের মানুষ হয়েও তার ছিল সমাজ পরিত্যক্তা। যেখানে সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষ তাদের দ্বারা সকল সুবিধা ভোগ করতে পারে সেখানে এই মানুষগুলো সমাজের সকল কিছু থেকে বৈষম্যের স্বীকার। কারণ তারা হল অচ্ছুৎবর্গ বা মেথর। যদিও তার একই রক্তে মাংসের গড়া মানুষ। উচ্চবিত্ত সমাজ তা মানতে নারাজ, তারা মেথরের সদ্য ভূমিষ্ট হওয়া বাচ্চাদের দেখা বা ছোয়া পাপ মনে করতো। প্রেমচাঁদ তার

ছোটগল্পে হিন্দু, মুসলিম ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িক দাংগার কথা তুলে ধরতে ভুল করেননি। হিন্দুরা দাড়ি টুপি পরা মুসলমানদের দেখা মাত্রই আঘাত করা বা মসজিদ ধ্বংস করা আবার মুসলিম কর্তৃক হিন্দুদের মন্দির ভেঙ্গে ফেলার নজিরও দেখিয়েছেন। প্রেমচাঁদ তার ছোটগল্পের মধ্যে যেমন সমাজের বিভিন্ন চরিত্রের চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন তেমনি সেই সমাজের সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যের ছবিও অংকন করেছেন। প্রেমচাঁদের ছোটগল্পের এই সামাজিক চিত্র ও শ্রেণী বৈষম্যগুলো চির যৌবনা। কারণ তার এই গল্পগুলো আজও জীবন্ত, যা সমাজ জীবনের অনুভূতি আজকের জীবনেও বর্তমান।

প্রেমচাঁদের উর্দু ছোটগল্পে সমাজ চিত্র শীর্ষক অভিসন্দবটি ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়াও নিম্মোক্ত চারটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়	ঃ	প্রেমচাঁদের জীবনকথা। এখানে প্রেমচাঁদের জন্মস্থানের পরিবেশ পরিচিতি, জন্ম ও বংশপরিচিতি, শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন, বৈবাহিক জীবন, সাহিত্য জীবন ও মৃত্যুকাল আলোচিত হয়েছে।
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	প্রেমচাঁদের উর্দু ছোটগল্পে সামাজ চিত্র। এ অধ্যায়ে তৎকালীন ভারত বর্ষের সমাজ চিত্রের ছবি যেমন গরিব চাষীর প্রতি জমিদারের দৃষ্টিকোন, সুদী ব্যবসায়ী দিনমজুরকে সর্বসান্ত করে দেওয়া, ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রাধান্যতা, নারীরের তৎকালীন সামাজিক অবস্থায় পুরুষ দ্বারা হেয় প্রতিপন্ন, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পতিতা, হরিজন গোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থা, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	প্রেমচাঁদের উর্দু ছোটগল্পে সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য। এখানে নিম্ন শ্রেণী ও উচ্চ শ্রেণী, নারী-পুরুষ মহাজন, জোতদার, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত প্রভৃতি শ্রেণীর শোষণ ও বৈষম্য আলোচিত হয়েছে।
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	প্রেমচাঁদের সমকালীন কয়েকজন উর্দু গদ্য সাহিত্যিক। এটি অভিসন্দর্ভের শেষ অধ্যায়। এ অধ্যায়ে প্রেমচাঁদের সমসাময়িক কয়েকজন লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

অভিসন্দর্ভটির পরিশিষ্টে রয়েছে প্রেমচাঁদের জীবনপঞ্জি, সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি, প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকা ও দুর্লভ কিছু চিত্রাবলী ।

গবেষক

প্রথম অধ্যায়

প্রেমচাঁদের জীবন কথা

পরিবেশ পরিচিতি -

প্রেমচাঁদের জন্মভূমি ভারতের উত্তরপ্রদেশের বারাণসী জেলার লমহী গ্রামে। তাঁর জীবনকথা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে তার জন্মভূমি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। উত্তর ভারতের একটি রাজ্য হল উত্তরপ্রদেশ। ১ এপ্রিল ১৯৩৭ সালে 'যুক্তপ্রদেশ' নামে এই রাজ্য গঠিত হয়েছিল। যা পরবর্তীতে নাম বদলে ১৯৫০ সালে 'উত্তরপ্রদেশ' রাখা হয়। এ রাজ্যের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর হলো লখনৌ। গাজিয়াবাদ, কানপুর, মোরাদাবাদ, বরেইলি, আলিগড় ও বারাণসী প্রভৃতি স্থানগুলো রাজ্যের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র। ২০০০ সালের ৯ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের হিমালয়-সংলগ্ন অঞ্চলটিকে বিচ্ছিন্ন করে 'উত্তরাঞ্চল' (অধুনা উত্তরাখণ্ড) রাজ্য গঠিত হয়।[১] উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে অনেক ঐতিহাসিক, প্রাকৃতিক ও ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র আছে। আগ্রা, বারাণসী, পিপরাওয়াল, কানপুর, বালিয়া, শ্রাবস্তী, কুশী নগর, লখনৌ, কাঁসি, এলাহাবাদ, বুদাউন, মিরাট, মথুরা ও জৌনপুর উল্লেখযোগ্য। উত্তরপ্রদেশ রাজ্যটি ১৮টি বিভাগের অন্তর্গত ৭৫টি জেলায় বিভক্ত। উত্তরপ্রদেশের প্রশাসনিক বিভাগগুলোর মধ্যে বারাণসীও একটি।[২]

বারাণসী বা বেনারস বা কাশী হল ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের একটি শহর। এর আয়তন ১৫৩৫ কিলোমিটার (৫৯৩ বর্গমাইল), উচ্চতা ৮০.৭১ মিটার (২৬৪.৮০ ফুট)। জনসংখ্যা ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ১,৪৩৫,১১৩ জন। ভাষার দিক থেকে সরকারি ভাষা হল হিন্দি, অন্যান্য প্রচলিত ভাষা হল ইংরেজি ও উর্দু। এই শহর বেনারস বা কাশী নামেও পরিচিত। শহরটি গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনৌ থেকে এই শহরের দূরত্ব ৩২০ কিলোমিটার (২০০ মাইল)।[৩] হিন্দু ধর্ম ও জৈন ধর্মের সাতটি পবিত্রতম শহরের (সপ্তপুরী) একটি হল বারাণসী। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশেও বারাণসী শহরের বিশেষ ভূমিকা ছিল। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, বারাণসীতে মৃত্যু হলে মৃত ব্যক্তি মোক্ষ লাভ করেন। বারাণসী ভারত তথা বিশ্বের প্রচীনতম শহরগুলির অন্যতম।[৪]

কাশীর মহারাজা (ইনি 'কাশী নরেশ' নামে পরিচিত) হলেন বারাণসীর প্রধান সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষক। বারাণসীর সব ধর্মীয় উৎসবের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ তিনি। গঙ্গা নদীর সঙ্গে বারাণসীর সংস্কৃতির বিশেষ যোগ আছে। বিগত কয়েক হাজার বছর ধরে বারাণসী উত্তর ভারতের এক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। বারাণসীর ইতিহাস বিশ্বের অনেক প্রধান ধর্ম সম্প্রদায়ের ইতিহাসের চেয়েও প্রাচীন। হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীতের বারাণসী ঘরানার উৎপত্তি এই

[১] *Statistics* of Uttar pradesh, Censur of India 2011, Up Government, ১ মার্চ ২০১১ ও ২৬ এপ্রিল ২০১২ তারিখে আর্কাইভে করা। সংগ্রহের তারিখ ২৫-০১-২০১৯।

[২] *State division of Uttar Pradesh*, সংগ্রহের তারিখ ২২ জানুয়ারী, ২০১৯।

[৩] Irfan Habib, *An Atlas of the Mughal Empire: Political and Economic Maps with etailed Notes, Bibligraphy and Index,* Oxford University press, Oxford New york – 1982, P- 30.

[৪] Joseph E. Schwactzberg, *A Historical Atlas of South Asia,* The University of Chicago Press ltd. London, P- 2017.

শহরে। এই শহরে অনেক বিশিষ্ট ভারতীয় দার্শনিক, কবি, লেখক ও সংগীতজ্ঞ বসবাস করেছেন। বারাণসীর কাছে সারনাথের গৌতম বুদ্ধ প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

বারাণসী শহরে চারুকলা ও সাহিত্যের একটি নিজস্ব ধারা আছে। কবীর, রবিদাস, তুলসীদাস (রামচরিত মানস গ্রন্থের রচয়িতা), কুল্লুকা ভট্ট (পঞ্চদশ শতাব্দীতে মনু স্মৃতির টীকাকার) ও ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র এই শহরে বাস করতেন। জয়শঙ্কর প্রসাদ, আচার্য শুক্ল, মুন্সি প্রেমচাঁদ, জগন্নাথ প্রসাদ রত্নাকর, দেবকীনন্দন কাতরি, হাজারি প্রসাদ দ্বিবেদী, তেগ আলি, ক্ষেত্রেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাগীশ শাস্ত্রী, বলদেব উপাধ্যায় সুদাম পাণ্ডে (ধুমি) ও বিদ্যা নিবাস মিশ্র প্রমুখ আধুনিক লেখকেরাও এই শহরে বাস করতেন। রায় কৃষ্ণদাস, তাঁর পুত্র আনন্দ কৃষ্ণ, সংগীতজ্ঞ ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, রবি শংকর, বিসমিল্লাহ খান, গিরিজা দেবী, সিদ্ধেশ্বরী দেবী, লালমণি মিশ্র ও তাঁর পুত্র গোপাল শঙ্কর মিশ্র, এন. রাজাম, আনোখেলাল মিশ্র, সমতা প্রসাদ, কান্থে মহারাজ, সিতাঁরা দেবী, গোপী কৃষ্ণ, কিশন মহারাজ, রাজন ও সাজন মিশ্র, ছন্নুলাল মিশ্র প্রমুখ এই শহরে বাস করতেন।[৫]

লম্মি বা লামহি (লমহী) ভারতের উত্তর প্রদেশের বারাণসী শহর হতে মাইল পাঁচেক দূরে অবস্থিত ছোট একটি গ্রাম 'লহমী'। ২০০৯ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গ্রামের মোট ভৌগলিক এলাকা হচ্ছে ৫১,৪৩ হেক্টর, মোট জনসংখ্যা রয়েছে ১,৮৪১ জন। তাঁর মধ্যে পুরুষ হল ৯৪৬, মহিলা হল ৮৯৫ জন। গ্রামের ঘর বাড়ির সংখ্যা ৩০৮টি, গ্রামটি পঞ্চায়েত দ্বারা পরিচলিত হয়।[৬] প্রখ্যাত হিন্দু ও উর্দু লেখক মুন্সি প্রেমচাঁদ এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন। তাই এই গ্রামে 'মুন্সী প্রেমচঁন্দ্র স্মারক গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং স্টাডি সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও এখানে মুন্সী প্রেমচাঁদ স্মৃতি পার্ক, মুন্সী প্রেমচাঁদ স্মৃতি দিওয়ার, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরোয়ার, লামহী রাম-লিলা, হারের মহাদেব মন্দির, লামাহী ডাকঘর ইত্যাদি রয়েছে। এই গ্রামটি ভারতীয় লেখক ও ঔপন্যাসিকের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। ভারতীয় মৌলিক সংস্কৃতিগুলো এই গ্রামে চলমান হওয়ার কারনে অনেক বিদেশী পর্যটক লমহী গ্রামে পরিদর্শনে আসেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেনঃ ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ, জয়পাল রেড্ডি, মুলায়ম সিং যাদব, মনোজ টিয়ারী ও হিরালাল যাদব।[৭]

জন্ম ও পরিবার পরিচিতি -

প্রেমচাঁদের পিতার নাম ছিল শ্রী অজায়ব লাল শ্রীবাস্তব। তিনি ছিলেন তার পিতা মুন্সী গুর ছোহায়ীর চার সন্তানের মধ্যে তৃতীয় নম্বর সন্তান। প্রেমচাঁদের পিতা মুন্সী অজায়ব লাল একজন সাদাসিধে ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি কাউকে সাহায্য করতে না পারলেও কাওকে ক্ষতি করতেন না। সামাজের মধ্যে তিনি একজন ভালো মানুষ হিসেবে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ছিল। কিন্তু তাঁর চলাফেরার জন্য আর্থিক আবস্থা খুবই নাজুক ছিল। প্রেমচাঁদ এর ভাষায়,

---

[৫] Swami Medhasananda, *Varanasi at the crossroads: a panoramic view of early modern Varanasi and the story of its transition*, Ramakrishna Mission, Institute of Cultur, India, 2002. P- 96.

[৬] Indian Village Directory, ওয়েব সাইডঃ banwaripur Lamhi

[৭] http://hindi.firstpost.com/culture/special-story-on-munshi-premchand-village-lamahi-on-his-birthday-pr-44233.html সংগ্রহের তারিখ ২৯-০৯-২০১৮

"دس روپیے پر نوکر ہوئے تھے، چالیس تک پہنچتے پہنچتے رٹائر ہو گئے" [৮]

("দশ রুপি থেকে চাকরি শুরু আর চল্লিশ রুপি পর্যন্ত পৌছাতে তাঁর জীবন সার হয়ে যায়। ")

অজায়ব লাল কাশী দেশওয়ারী দেয়ালী এর পাশের গ্রামের মেয়ে আনন্দী দেবী'কে বিয়ে করেন। আনন্দী রুপে গুনে অনন্য ছিলেন। সে কারো সাথে ঝগড়া এবং অন্য মহিলাদের মতো একজনের কথা অপর জনের কাছে লাগাতো না। তাঁর স্বামীর মত সেও অপর কে সাহায্য করার জন্য সব সময় আগে এগিয়ে যেত। তাঁর কীর্তিকলাপ সম্পর্কে নিজের আপন ভাতিজীর স্ত্রী বলেন,

"گھر کے کام کاج میں وہ یکتا تھیں۔ کھانا بہت اچّھا پکاتی تھیں اور سینے پرونے میں بھی بے مثال تھیں۔ان کے ہاتھ کی

بخیا میں جو صفائی تھی، وہ تو پھر دیکھی ہی نہیں گئی۔" [৯]

("তিনি (আনন্দী) ঘরের কাজ কর্মে সব সময় মনোযোগী ছিল, খাবার খুব ভাল রান্না করত, পুথি পড়তে তাঁর কোন জুড়ি ছিল না। তিনি যে ভাবে সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতেন, তা অন্য কার মাঝে দেখা যেত না।")

সেই গ্রামে বসবাসকারী ডাকঘরের মাসিক পঁচিশ টাকা মাইনের একেবারে অতি সাধারণ পোস্ট-মাস্টার ছিলেন শ্রী অজায়ব লাল শ্রীবাস্তব। পৈতৃর্ক সম্পত্তি বলতে ছিল দু-চার বিঘে জমি আর ভিটে বাড়ীটা। জমির আয় বলতে বিশেষ কিছু ছিল না, তাই অভাব পূরণের জন্যই চাকরী করতেন। তাতে যা গোটা কুড়ি টাকা পেতেন তাতেই টেনেটুনে চলে যেত সংসারটা। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মত অভাব অনটন লেগেই থাকতো। স্ত্রী আনন্দী দেবী ছিলেন চির রুগ্না, সব সময় ডাক্তার দেখানো ও ঔষধের বাড়তি একটা খরচ তাকে চালিয়ে যেতেই হত।

সব চাইতে দুঃখের বিষয় হল, আনন্দীর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। প্রথমে দুটি কন্যা শিশুর পর লমহীতে তার তৃতীয় কন্যা সন্তানও মেয়ে হয়। এর চার বছর পর এমন একটা অভাবগ্রস্ত পরিবারে ১৮৮০ সালে ৩১ জুলাই রোজ শনিবার বেনারস শহর (কাশী নগর) থেকে চার মাইল দূরে লমহী (উত্তর প্রদেশ, বৃটিশ ভারত) নামে এক অজপাড়া গাঁয়ে প্রেমচাঁদ জন্ম গ্রহণ করেন। [১০] প্রেমচাঁদ তাঁর পিতা-মাতার খুব আদরের সন্তান ছিলেন, কারণ তিনটি মেয়ে সন্তানের পর প্রেমচাঁদের জন্ম হয়। তাই নির্ধন মা-বাবা আদর করে নাম দিলেন ধনপত রায়। আর চাচা তাকে আদর করে 'নবাব' নাম রাখেন। কি আশা করে তাঁর বাবা-মা তাঁর নাম ধনপত রেখেছেন, তা জানা নাই, তবে ছেলে ধন-সম্পদে ধনী না হলেও যশ ও খ্যাতির ধনে ধনী হয়ে তাঁর মা-বাবার আকাংঙ্খা পূরণ করেছিল তা বলার অবকাশ রাখে না। তবে চিরন্তন সত্যটা হলো তাঁর এই যশ-খ্যাতি তাঁর বাবা-মা কেউই

---

[৮] অমরিত রায়, *প্রেমচাঁন্দ ঃ কলম কা ছিপাহি*, সাহিত্য একাডেমি, নয়া দিল্লী, ১৯৯২, পৃ. ২১।

[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

[১০] মানিক টালা, *প্রেমচান্দ: হায়াতে নূর*, মর্ডন পাবলিসিং হাউজ, ১৯৯৩, পৃ: ১৭

দেখে যেতে পারেননি। কারণ প্রেমচাঁদের যখন সাত বছর বয়স তখন তাঁর মা আনন্দী দেবী আন্ত্রিক রোগে ছয় মাস ভুগে মৃত্যু বরণ করেন ও তাঁর কয়েক বছর পরই পিতাও দেহ ত্যাগ করেন।

ছদ্মনাম -

প্রেমচাঁদের আসল নাম 'ধনপত রায় শ্রীবাস্তব'। বাড়িতে তাঁর আদরের নাম ছিল 'নবাব রায়'। 'প্রেমচাঁদ' তো লেখকের ছদ্মনাম। ১৯১০ সালের অক্টোবর কি নভেম্বর মাস থেকে তিনি এই নামটি ব্যবহার করতে শুরু করেন। এই নতুন নামে প্রথম *'বড়ে ঘর কি বেটি'* গল্পটি ছাপা হয়।[১১] হামীরপুর জেলায় শিক্ষা বিভাগের সাব-ডেপুটি ইন্সপেক্টর হিসেবে সরকারি চাকরি করার সময় 'নবাব রায়' ছদ্মনামে উর্দু ভাষায় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় *'সোজ-এ-ওয়াতন'* (দেশ মাতার বিষাদ সংগীত) নামে। তাঁর প্রকাশিত বইটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ফলে 'নবাব রায়' নামটিও তিনি বর্জন করেন। কানপুরের *জামানা* পত্রিকার সম্পাদক দয়া নারায়ণ নিগামকে প্রেমচাঁদ এক পত্রে লিখেন,

پریم چنداچّھانام ہے۔مجھے بھی پسند ہے۔افسوس صرف یہ ہے کہ پانچ چھ سال میں نواب رائے کوفروغ دینے کی جو

محبّت کی گئی وہ سب بیکار ہوگئی یہ حضرت قسمت کے ہمیشہ لیڈ یرے رہے اور شاید رہیں گے۔[১২]

("প্রেমচাঁদ এটা ভাল নাম। আমারও পছন্দ হয়েছে। দুঃখ শুধু এই কারনে যে, পাঁচ ছয় বছর নবাব রায় হিসেবে পরিচয় দিয়ে যে ভালবাসা পেয়েছি ঐ সব কিছু মাটির সাথে ধুয়ে গেছে।")

প্রেমচাঁদের আকৃতি -

প্রেমচাঁদ পোশাকে এবং চালচলনে অত্যন্ত সাদামাটা ছিলেন। তিনি সব সময় ক্যানভাসের জুতো পরতেন। যার সামনের আঙ্গুলটা ফাকা থাকত। মুখটা একটু মঙ্গোলীয় ধরনের, তাতে বাদামি রঙ্গের লম্বা মোটা গোঁফ ছিল। পরবর্তী জীবনে গোঁফটি একটু ছোট হয়ে এসেছিলে। তাঁর পরিহিত ধুতি-পাঞ্জাবি কোনোদিনই খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতো না। বেশভূষার পারিপাট্য-সম্পর্কে তিনি বরাবরই নিস্পৃহ ছিলেন। ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ ছিলেন ছোটগল্পকার এই শ্রেষ্ঠ কথাকার। প্রেমচাঁদের জীবনচর্যা ছিল সাদামাটা। তিনি সদাসর্বদা মানুষের মধ্যে 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' এর অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর ঢিলে-ঢালা পোশাক, মোটা গোঁফ, মাথার উপরে শুকনো এলোমেলো ছড়ানো চুল, ফিতে ছাড়া অমসৃণ জুতো, সব ব্যাপারেই শিশু সুলভ কৌতূহল, নির্মল শুভ্র অট্টহাস্য, সর্বোপরি সরল, সুন্দর আন্তরিকতা ভরা ব্যবহার সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করত।[১৩] অন্তরের মধ্যে তিনি সর্বদাই লালন করতেন মানুষের প্রতি নিবিড় ও গভীর সহানুভূতি যা মানুষের পীড়া দেখলেই

[১১] অমরিত রায়, *প্রেমচান্দ ঃ কলম কা ছিপাহি*, সাহিত্য একাডেমি, নয়া দিল্লী, ১৯৯২, পৃ. ২৩।
[১২] প্রেম গোপাল মিত্রা, *প্রেমচাঁদ শাহনাছ : মদন গোপাল*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ১৫৫।
[১৩] নিতাই বসু, *মুনশি প্রেমচন্দ*, গ্রন্থতীর্থ ৬৫/৩এ ,কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা, ১ম প্রকাশনা, ২০০৬, পৃ. ১২।

বিচলিত হয়ে বেরিয়ে আসত। মানুষের সেই পীড়া দূর করার জন্য, জনগণের মধ্যে সামাজিক চেতনা সঞ্চারের নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন প্রেমচাঁদ।

মাতৃ বিয়োগ -

অতি শৈশবেই প্রেমচাঁদ মা আনন্দী দেবীর পাশে শুয়ে গল্প শুনতেন আর গল্পের নায়ক রূপে নিজেকে কল্পনা করে কল্পলোকের আকাশে ভেসে বেড়াতেন। সেই ভূত-প্রেত্নী, রাক্ষস- খোক্ষস, রাজার দেশে বন্দী সুন্দরী রাজকুমারীকে উদ্ধার করবার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু খুব বেশী দিন তাঁর মায়ের মুখ থেকে তাঁর স্বপ্নের গল্প শুনার সৌভাগ্য স্থায়ী হয়নি। স্নেহময়ী মা ছ'মাস আন্ত্রীক রোগে ভোগার পর ১৮৮৮ সালে মাত্র আট বছর বয়সে ছেলেকে অকূলে ভাসিয়ে এ দুনিয়া ছেড়ে পরপারে চলে যান। মাতৃ-বিয়োগের এ ধাক্কা তাঁর মনে কতটা আঘাত করেছিল, তা আমরা তাঁর গল্প, উপন্যাসের মধ্যে দেখতে পাই। *'প্রেরণা'* গল্পে মাত্র সাত বসন্তের শিশু মাতৃহারা হয়। শিশু মনের ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি যা বলছেন, তার ভাষান্তর হল এই,

"শিশু মনে স্নেহের যে ক্ষুধা থাকে - যা দুধ মিঠাই মন্ডা এবং খেলনা অপেক্ষাও অধিক নেশা ধরায় তা মাতৃক্রোড়ের সামনে বিশ্ব সংসারের কোন তোয়াক্কা করে না। মোহনের সে ক্ষুধা কখনও কোন অবস্থাতেই তৃপ্ত হতো না।"

কাহিনীর এই মাতৃহারা শিশু মোহনের মাধ্যমে তিনি নিজের মনেরই ছবি একেছেন এতে সন্দেহ নেই। মাতৃহারা শিশুর জীবন সম্পর্কে তিনি *'ঘর জামাই'* গল্পে যা বলেছেন, তার ভাষান্তর হল,

"যদি সে (মা) না থাকে তবে বালকের জীবন স্রোত শুকিয়ে যায়, সে তখন শিবের নন্দি যার উপর ফুল বা জল ঢালা আবশ্যক নয়।"

অকালে মা হারা প্রেমচাঁদ তার অন্তরের কষ্ট প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন,

"بچپن وہ عمر ہے جب انسان کو محبّت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔اس وقت پودے کو نمی مل جائے تو

زندگی بھر کے لئے اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔میری ماں کا اسی زمانہ میں انتقال ہوا اور تب سے میری دوح کو

خوراک نہیں ملی وہ بھوک میری زندگی ہے"۔ [১৪]

("শৈশব ঐ বয়স যখন মানুষের সবচেয়ে বেশি ভালবাসার প্রয়োজন হয়। ঐ সময়কালে যদি তা পুরোপুরি পাওয়া যায় তাহলে তার মূল খুটি আরো মজবুত হয়ে যায়। আমার মা ঐ সময়কালে মারা যায়, তখন থেকে আমার অন্তরের ক্ষুধার চাওয়া পূরণ হয়নি, ঐ ক্ষুধা আমার চিরকালই ছিল")

---

[১৪] আলিমুল্লাহ সিদ্দিকী, *মাগরিবে বাঙ্গাঁল মে উর্দু কে নাম*, কহিনূর আর্ট প্রেস লিমিটেড, কলকাতাহ, পৃ. ১৩৩।

বিমাতার সংসারে প্রেমচাঁদ -

প্রেমচাঁদের মার মৃত্যুর কিছুদিন পর তার পিতা মুন্সি অজায়ব রায় শ্রীবাস্তব বদলী হয়ে জমীনপুর যান। তখন প্রেমচাঁদের বয়স ছিল বারো। সে সময় বাবা আবার ঘর সামলাবার জন্যে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। প্রেমচাঁদের তখন মাত্র পনের বছর বয়স। প্রেমচাঁদ তাঁর দ্বিতীয় মা'কে চাচী বলে ডাকতেন।[১৫] ড. গুয়েনকার ভাষায়,

"پتا کا تبادلہ گورکھپور ہو چکا تھا۔ ماں کی موت کے بعد پتا نے دوسرا بیاہ کرلیا"۔[১৬]

("পিতাঁর চাকরি গোরখপুরে হয়েছিল। মা মারা যাবার পর পিতা দ্বিতীয় বিয়ে করেন।")

প্রেমচাঁদের দ্বিতীয় মা ছিলেন শোরানী দেবী। দ্বিতীয় মার করানে তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা তিনি '*কর্মভূমি*' উপন্যাসের অমরকান্তের চরিত্রের মাধ্যমে এভাবে ব্যক্ত করেছেন,

"سمرکانت نے دوستوں کے کہنے سے دوسری شادی کرلی تھی۔ سات سال کے اُس بچّے نے نئی ماں کا بڑی محبّت سے اِستقبال کیا، لیکن اسے جلد معلوم ہو گیا کہ اس کی نئی ماں اُس کی ضد اور شرارتوں کو اس عفو کی نظر سے نہیں دیکھتی جیسے اُس کی ماں دیکھتی تھی۔ وہ اپنی مان کا اکیلا لاڈلا تھا۔ بڑا ضدّی، بڑا نٹ کھٹ۔ جو بات منہ کے نلی جاتی، اُسے پورا کر کے ہی چھوڑتا۔ نئی ماں بات بات پر ڈانٹی تھی، یہاں تک کہ اُسے ماں سے دشمنی ہو گئی۔ جِس بات کو وہ منع کرتی، اُسے جان بوجھ کر کرتا۔ باپ سے ڈھیٹ ہو گیا۔ باپ اَور بیٹے من محتّ کا بندھن نہ رہا۔"[১৭]

("বন্ধু বান্ধবদের কথায় অমরকান্ত দ্বিতীয়বার বিবাহ করে ফেললেন। সাত বছরের ওই ছেলে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গেই তাঁর নতুন মাকে অভ্যর্থনা জানাল। তবে শিগগিরই সে বুঝতে পারল, যে দৃষ্টিতে সে তার নিজের মা'কে দেখতো, নতুন মা তার জেদ বা আবদারকে সে প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখন। সে ছিল তার নিজের মায়ের একমাত্র স্নেহের পুতলি, অত্যন্ত জেদি, অত্যন্ত দুরন্ত। মুখ থেকে কিছু বেরোলে তা না করে ছাড়ত না। (প্রতি তুলনায়) নতুন মা কথায় কথায় শাসন করেন। শেষে এমন হল যে, মাকে সে আর দেখতে পারতো না; যা তিনি বারণ করতেন তাই সে করত। বাবার সঙ্গেও বনিবনা রইল না। পিতা-পুত্রের স্নেহের বন্ধন নষ্ট হয়ে গেল।")

দাদী বাবার এই বিয়েতে খুশী ছিলেন না, তাই তিনি জমিনপুর থেকে তাঁর নিজের গ্রামে চলে যান, আর ঐখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিমাতা গৃহে প্রবেশ করতেই আরম্ভ হল সংসারে অশান্তি। কোপ দৃষ্টি পড়ল বালক ধনপতের ওপর। বিমাতাঁর অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে বালক একান্তে অশ্রু বিসর্জন করতো আর নিজের স্নেহময়ী মা'র স্মৃতিচারণ করে দিন যাপন

---

[১৫] মুন্সি প্রেমচান্দ, *প্রেম চল্লিছি (প্রথম খন্ড)*, দারুল আশয়াত পাঞ্জাব, লাহোর, ১৯৪২, পৃ: ৩।
[১৬] জি. কে. মানিক টাল, *প্রেমচন্দ : হায়াতে নূর*, মুদ্রন পাবলিশার্স হাউজ, নয়া দিল্লী, ১৯৯৩, পৃ. ৩৯।
[১৭]আমরিত রায়, *প্রেমচান্দ ঃ কলম কা ছিপাহী*, ছাহিতীহ একাডেমী, দিল্লী, সন- ১৯৯২, পৃ: ৪০।

করতো। যতদিন যায় অত্যাচার যেন ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে ছেলের মন টেকেনা ঘরে। যতটা সম্ভব সময় কাটাতে লাগলো সে ঘরের বাইরে। এ সময়কার মনের ব্যাথা তিনি পরবর্তী কালে তাঁর *'সোতেলী মা'* গল্পে সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন,

"ایک روز میں منو کے ساتھ بابو جوالا سنگھ کے مکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ جوالا سنگھ نے منو سے پوچھا۔ کیوں منو! تمھاری نئی اماں تمھیں خوب پیار کرتی ہیں نا؟ آنسو کے کئی قطرے اس کی آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ جوالا سنگھ نے میری طرف ناہمدردانہ انداز سے دیکھ کر منو سے کہا۔ کیوں روتے ہو بیٹا؟ منو نے برجستہ کہا۔ 'روتا نہیں ہوں۔ آنکھ میں دھواں لگ گیا تھا'۔"[১৮]

("একদিন আমি (পিতা দ্বিতীয় বিয়ের পর) পুত্র মুন্নুকে নিয়ে বন্ধু বাবু জ্বালা সিং এর বাড়িতে বসে ছিলেন। জ্বালা সিং শিশু মুন্নুকে জিজ্ঞেস করে- কি মুন্নু ! তোমার নতুন মা তোমাকে খুব ভালবাসে তাই না ? মুন্নুর চোখ বেয়ে অশ্রুসজল হল। জ্বালা সিং বন্ধুর দিকে অদয়াশীল দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুন্নুকে বললো, তুমি কাঁদছ কেন মুন্নু, তখন শিশু মুন্নু বলে-"কই কাঁদিনি তো! চোখে ধোঁয়া লেগে গিয়ে ছিলো"।)

শিশুর মনে মাতৃ বিয়োগ যে কি মর্মান্তিক আঘাত হানে, প্রেমচাঁদ তাঁর বিভিন্ন গল্পে তা দেখিয়েছেন।

শিক্ষাজীবন -

বিমাতার নিষ্ঠুরতাঁর কারণে প্রেমচাঁদের দিনগুলো অতি কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল। তাঁর যে আশা আকাংখা ছিল তা নিষ্ঠুরতা ও সাংসারিক অভাবে বিলিন ছিল। তাঁর মনের ইচ্ছা মত বাহিরের কোন আহার করা এ কথা ভাবতেই পারতেন না। যদি কখনও পিতা আদর করে দু-এক পয়সা হাতে দিতেন পুত্র তা সযত্নে জমা করে রাখত। দারিদ্র্যের কষাঘাতে, বিমাতার অমানুষিক ব্যবহারে এবং পিতার ঔদাসীন্যে ব্যতিব্যস্ত বালক ধনপতের জীবন ক্রমেই দুর্বিষহ হয়ে উঠতে লাগল। এমনি সময় ধনপতের ছাত্রজীবন আরম্ভ হয়। তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী বালকের হাতে খড়ি হলো তখ্‌তীর (কালো রং করা কাঠের টুকরো) ওপর লিখা; তবে অ, আ, ক, খ, নয় আলিফ, বে, পে দিয়ে, মানে উর্দু অক্ষর দিয়ে। প্রেমচাঁদের যখন ছয় সাত বছর বয়স তখন পরিবারের পুরোনো রীতি অনুসারে লালগঞ্জ নামে পাশের এক গ্রামে এক মৌলবি সাহেবের কাছে ফারসি এবং সাথে সাথে উর্দু ভাষা রপ্ত করার জন্য পাঠানো হয়। প্রেমচাঁদ দু-বছর তাঁর কাছ থেকে ফারসি এবং সাথে সাথে উর্দু ভাষা শিখেন। ড. গুওনকা বলেন-

آٹھویں سال میں لمہی گاؤں سے میل سوا میل دور لال پور گاؤں میں ایک مولوی صاحب کے یہاں اردو، فارسی کی تعلیم شروع ہوئی۔[১৯]

---

[১৮] আমরিত রায়, *প্রেমচান্দ ঃ কলম কা ছিপাহী*, ছাহিতীহ একাডেমী, দিল্লী, সন- ১৯৯২, পৃ. ৩৫।
[১৯] মানিক টাল, প্রেমচান্দ ঃ হায়াতে নূর, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৩, পৃ. ৩৬।

("আট বছর বয়সে লমহী গ্রাম থেকে মাইল, সোয়া মাইল দূরে লালপুর গ্রামে এক মৌলভী সাহেবের কাছে ১৮৮৮ সালে প্রেমচাঁদ উর্দু, ফার্সী, শিক্ষা শুরু করেন।")

পেশায় ওই মৌলবি সাহেব ছিলেন একজন দরজি। প্রেমচাঁদ খেলাধুলায় অন্যান্যদের চাইতে একটু বেশীই মত্ত ছিলেন। মৌলবি সাহেব খামখেয়ালি স্বভাবের ঢিলেঢালা মানুষ হওয়ার কারনে তার খেলাধূলোয় কোন অসুবিধা হয়নি। এ বিষয়টি স্মৃতিচারণ করে প্রেমচাঁদ *'চুরি'* গল্পে লিখেন,

اس میں شک نہیں کہ ان مولوی صاحب نے ان کی فارسی کی بنیاد خوب پکی کر دی تھی کہ اس پر محل کھڑا ہو سکا۔

پرائیویٹ طور پر جب انٹر اور بی۔اے کرنے کی نوبت آئی اس وقت نواب کو یہ طے کرنے میں ایک منٹ نہ لگا کہ

مضمون فارسی ضرور ہونا چاہیے۔ [২০]

("এতে সন্দেহ নেই যে, ঐ মৌলভী সাহেবতার ফারসীর উপর ভিত্তি খুবই শক্ত করে দিয়েছিলন। প্রাইভেট ভাবে যখন ইন্টার ও বি.এ করার সুযোগ আসল তখন নবাবের ফারসী বিষয়টি নিতে এক মিনিটও সময় লাগত না।")

সাত আট বছরের বালক ধনপত রায় রাতের বাসি রুটি খেয়ে আর কিছু ছোলামটর নিয়ে গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়তো। প্রেমচাঁদের পত্নী শিবরানী দেবী নিজে *'প্রেমচাঁদ ঘর মে'* নামক বইতে এই সময়কার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় যে, ধনপত মাঝে মাঝেই মাদ্রাসা না গিয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে ভালবাসত। এর একটাই কারণ ছিল ভাল শিক্ষকের অভাব। যে সব মৌলবীরা এই সব মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন তাদের অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল ছিল না, তাই শিক্ষা দানের প্রতি তাদের মধ্যে তেমন কোন আগ্রহ দেখা যেত না। তারপর পড়া না পারলে ছাত্রদেরকে নিষ্ঠুর ভাবে বেত্রাঘাত করার প্রথা ছিল, যার জন্যে তাদের মনে পড়াশুনার প্রতি অনুরাগের পরিবর্তে বিরাগই জন্মাত। না ছিল তাদের কোন শিক্ষাদানের রীতি-নীতি, না পরীক্ষা নেওয়ার সুব্যবস্থা। ছাত্রদের মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধির সঞ্চার ও তাঁর বিকাশ করার কোন চেষ্টাই এ মৌলবীরা করতেন না। তাই প্রায়ই ক্ষেতে খামারে ঘুরে প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রতিই ধনপতের বিশেষ আগ্রহ ছিল। এমনি ভবঘুরের জীবনে যখন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে ধনপত রায় তখনই পিতা অজায়ব রায়ের পদোন্নতি হয় এবং তাকে গোরখপুরে বদলী করা হয়। ধনপতকে পিতাঁর সঙ্গে নতুন শহরে যেতে হয়। এখানে পিতা একটি অতি নোংরা পরিবেশযুক্ত বাড়ি ভাড়া নেন, যার মাসিক ভাড়া ছিল দেড় টাকা মাত্র। বাড়িটি এতই কদর্য ও অস্বাস্থ্যকর ছিল যে ধনপত নিজেই পাশের এক তামাকওয়ালার বাড়িতে চলে যেত। শিবরাণী দেবীর লেখা থেকে জানা যায় যে, সেখানে ধনপতকে একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে ধনপত যেন নতুন প্রেরণা পায় এবং মন দিয়ে লেখাপড়া আরম্ভ করে। গল্প উপন্যাস পড়ার এমন এক নেশা তাকে পেয়ে বসে যে, এ শহরেরেই এক বইয়ের দোকানে বসে বালক ধনপত উর্দুর নামী ও দামী সব লেখকের বই পড়ে শেষ করে ফেলে।

---

[২০] মানিক টাল, প্রেমচান্দ ঃ হায়াতে নূর, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৩, পৃ. ৩৬-৩৭।

এখানেই এক তামাকের দোকান ওয়ালার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে সে *'তিলস্মে হোশরুবা'* নামক বৃহত্তম পুস্তকের সবকটি ভাগ শেষ করে ফেলে। সে সময় উর্দুতে রেনল্ডের বইয়ের অনুবাদ পরপর প্রকাশিত হচ্ছিল, সে সব বইও সে পড়ে শেষ করে। এভাবে উপন্যাসগুলির অধিকাংশই ছিল রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের। কিছু গল্প কাহিনী ছিল আজগুবি কল্পনার ওপর ভিত্তি করে লেখা, যার সঙ্গে সমাজের বা বাস্তব জগতের মিল ছিল না। অল্প বয়সের ছেলে-মেয়েদের মনে শিহরণ জাগাবার অপূর্ব ক্ষমতা ছিল চমকপ্রদ ঘটনা ও কল্পলোকের রাজকুমার বা শাহজাদীকে নিয়ে লেখা এই বইগুলোতে । দেখা যেত ধনপত তার প্রতিদিনের ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যেত সে সব রম্য রসে মগ্ন থেকে।

কিন্তু সাথে সাথে এখানে তিনি তাঁর লেখাপড়ার কার্যক্রম চালিয়ে যান। গোরখপুর স্কুলে তিনি ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই তিনি অস্টম শ্রেনী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। পনেরো বছর হতে না হতেই বাড়ির লোকজন তাঁর বিয়ে দিয়ে দেয়, যা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার ছিল। ষোলো বছর হতে না হতেই সংসারের সমস্ত বোঝা ঐ ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে ১৮৯৭ সালে বাবা মারা যান। ফলে ওই বৎসর তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারলেন না। কিন্তু তিনি কখনও ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাস হারাননি। জন্ম থেকেই তিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন যে তিনি স্কুলে পড়ার খরচ জোগাতে পারতেন না। কঠিন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে প্রেমচাঁদ ১৮৮১ সালে দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। নতুন উদ্যম নিয়ে তিনি পড়াশুনা আরম্ভ করেন। অংক তাঁর পক্ষে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ালো। তিনি দুই দু'বার ইন্টরমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে অংকের জন্যে অকৃতকার্য হন। ভাল কলেজে ভর্তি হওয়ার আশা তাঁর তখনই ক্ষীণ হয়ে এসেছিল যখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা তিনি দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন। কলেজে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারেও তাকে কি কষ্ট করতে হয়েছিল তাঁর বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েগেছেন,

"میٹرک امتحان دیا، سیکنڈ ڈویشن میں پاس ہوئے۔ جو بھی مجبوریاں اُس کی رہی ہوں۔ سیکنڈ کلاس کا نتیجہ یوہ ہوا کہ کوئینز کالج میں ان کا داخلہ حاصل کرنا ایک مسئلہ بن گیا، کیوں کہ داخلہ تو چاہے مل بھی جاتا، پر فیس قایدے کے مطابق صرف اوّل درجے والوں ہی کی مُعاف ہو سکتی تھی اور فیس دے کر پڑھنے کی حالت اُن کی نہیں تھی۔ حُسن اتّفاق سے اُسی سال ہندو کالج کھل گیا۔ میں نے اُس نئے کالج میں پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ پرنپلا تھے مسٹر رچرڈسن، ان کے مکان پر گیا۔ وہ پورے ہندوستانی لباس میں تھے۔ کرتا اور دھوتی پہنے، فرش پر بٹھیے کچھ لکھ رہے تھے۔ مگر مزاج کو تبدیل کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ میری گزارش سن کر آدھی ہی کہنے پایا تھا۔ بولے کہ گھر پر میں کالج کی بات چیت نہیں کرتا، کالج میں آؤ، خَیر کالج

میں گیا، مالا قات تو ہوئی پر یاس انگیز فیس معاف نہ ہو سکتی تی۔اب کیا کروں ؟ اگر معززین کی سفارشیں لا سکتا، تو شاید میری درخواست پر غور ہوتا، لیکن ایک دیہاتی نوجوان کو شہر میں جانتاہی کون تھا؟" [২১]

(ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেই এবং দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করি। দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে কুইন্‌স কলেজে ভর্তি হওয়া কষ্ট সাধ্য হয়ে যায় কারন প্রফেসার কায়েদের হিসাব মতে কুই্‌স কলেজে শুধু মাত্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণদেরই মাইনের ছাড় দেওয়া হত। আর ফিস দিয়ে পড়াশোনার অবস্থা তার ছিল না। সৌভাগ্যবশত সেই বছরেই হিন্দু কলেজ খুলে গিয়েছিল। আমি ঠিক করলাম যে নতুন কলেজে পড়বো। প্রিন্সিপাল ছিলেন মিঃ রিচার্ডসন। তাঁর বাড়ি গেলাম। তিনি বিশুদ্ধ ভারতীয় পোষাকে ছিলেন। ধুতি-পাঞ্জাবী পরে মাটিতে বসে কিছু লিখছিলেন। কিন্তু মেজাজটা পাল্টানো এত সহজ ছিল না। আমার বিষয়টা শুধু তাকে অর্ধেকটাই বলতে পেরেছিলাম, তিনি বললেন যে, ঘরে আমি কলেজের কোন কথা বলিনা, কলেজে এসো। যাক, গেলাম পরে কলেজে। সাক্ষাৎ তো হলো, কিন্তু হতাশ হতে হলো। মাইনে থেকে মুক্তি সম্ভব ছিল না। আর কি করার? যদি কোন প্রসিদ্ধ লোকের প্রশংসাপত্র আনতে পারতাম তাহলে হয়তো বা আমার আবেদনের উপর চিন্তা ভাবনা করা হতো। কিন্তু গ্রাম্য যুবককে শহরের কেই বা চিনতো ?)

কারো সুপারিশ পাবার আশায় প্রত্যেকদিন সকালে বাড়ি থেকে বের হতাম। বারো মাইল পথ হেঁটে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতাম। কাকে বলি ? এত কষ্ট করার পর কয়েক দিনের মাথায় একটা সুপারিশ পেয়ে গেলাম। ইন্দ্রনারায়ণ সিং নামে এক ঠাকুর হিন্দু কলেজের ব্যবস্থা সমিতির সদস্য ছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লাম। আমার প্রতি তাঁর মনে করুণার উদ্রেক হলো। তিনি সুপারিশ করে একটা পত্র দিলেন। সে সময় আমার আনন্দের সীমা ছিল না। সানন্দে গৃহে ফিরলাম। পরের দিনই অধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সাধনা ছিল। কিন্তু বাড়ি পৌছেই এলো জ্বর এবং দু'সপ্তাহ পর্যন্ত নড়তেও পারলাম না। নিমের রস পান করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। একদিন দরজার সামনে বসেছিলাম, এমন সময় এক পুরোহিত এসে উপস্থিত। আমার অবস্থা দেখে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন এবং তক্ষুনি মাঠে গিয়ে একটি শিকঁড় নিয়ে এসে সেটাকে ধুয়ে সাতটি গোল মরিচ চুর্ণ করে ওটার সঙ্গে মিশ্রিত করে আমাকে খাইয়ে দিলেন। ম্যাজিকের মত কাজ করলো। জ্বর আসতে ঘন্টা-খানেক বিলম্ব ছিল। এই ঔষধটা যেন জ্বরের কন্ঠরোধ করে ফেললো, আমি বারংবার পন্ডিতজীকে সেই শেকড়ের নাম জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু তিনি নাম না বলে বললেন, নাম বলে দিলে ঔষধের কাজ হবে না।

একমাস পর আমি পুনরায় মিঃ রিচার্ডসনের সঙ্গে দেখা করলাম এবং সুপারিশটি দেখালাম। অধ্যক্ষ মহাশয় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, এতদিন কোথায় ছিলে ?

প্রেমচাঁদঃ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম।

রিচার্ডসনঃ কি অসুখ ?

প্রেমচাঁদঃ আমি এই প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। যদি জ্বর বলি তবে সাহেব হয়তো আমাকে মিথ্যাবাদী ভাববেন। আমার মতে জ্বর অতি সাধারণ জিনিস তাঁর জন্যে এত দীর্ঘ মেয়াদী অনুপস্থিতি অনাবশ্যক ছিল। এমন কোন রোগের নাম বলতে হবে যা কষ্টকর আবার করুণার উদ্রেক করবে। তখন আমার এমন কোনো রোগের নামও মন পড়লো না। আমি যখন ঠাকুর ইন্দ্রনারায়ণ সিং এর সঙ্গে সুপারিশের জন্যে সাক্ষাৎ করেছিলাম

---

[২১] আমরিত রায়, *প্রেমচান্দ ঃ কলম কা ছিপাহী* , সাহিত্য একাডেমী, দিল্লী, ১৯৯২, পৃঃ ৫২।

তখন তাকে হৃদয় সংক্রান্ত রোগের কথা বলেছিলাম। সেই কথাই আমার মনে এলো। প্রেমচাঁদ অধ্যক্ষকে বললেন,

প্রেমচাঁদ: Palpitation of heart, Sir

রিচার্ডসন: সাহেব বিস্মিত হয়ে আমার পানে তাকালেন এবং বললেন, এখন তুমি পুরো সুস্থ হয়েছ ?

প্রেমচাঁদ: আজ্ঞে হ্যা।

রিচার্ডসন: আচ্ছা এডমিসন ফর্ম পুরণ করে আনো।

আমি ভাবলাম উদ্ধার পেলাম। ফর্ম নিলাম, পুরণ করলাম এবং জমা দিলাম। সাহেব তখন কোন ক্লাস নিচ্ছিলেন। তিনটের সময় আমি ফর্ম ফিরে পেলাম। তাতে লেখাছিল, এর যোগ্যতার পরিমাপ করা হোক।[২২]

এ আবার এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। আমার মন উদাস হয়ে গেল। ইংরেজী ব্যতীত আর কোন বিষয়ে আবার পাশ করার আশা আমার ছিল না। বীজগণিত এবং রেখাগণিতের নাম শুনলে তো আমার অন্তর আত্মা কেঁপে উঠতো। যেটুকু মনে ছিল তা, অনেকটা ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু কিই বা আমার করার ছিল। ভাগ্যের ওপর ভরসা করে ক্লাসে গেলাম। অধ্যাপক সাহেব বাঙ্গালী ছিলেন। ইংরেজি পড়াচ্ছিলেন। বিষয় 'ওয়াশিংটন ইরবিং' এর রিপভ্যান ভিঙ্কিল ছিল। আমি পিছনের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লাম এবং দু'চার মিনিটের মধ্যেই বুঝে ফেললাম যে, অধ্যাপক মহাশয় নিজের বিষয়ের পন্ডিত ছিলেন। ঘন্টা পড়ার পর তিনি আমাকে আজকের পড়া সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন এবং আমার ফর্মের ওপর লিখে দিলেন সন্তোষজনক।

দ্বিতীয় ঘন্টাটি ছিল বীজগণিতের। এর অধ্যাপকও ছিলেন বাঙ্গালী। আমি ফর্মটা দেখালাম। নতুন সংস্থাতে সাধারণত এমন ছাত্ররাই আসে যারা আর কোথাও জায়গা পায় না। এখানেও সেই অবস্থাই ছিল। ক্লাসে অযোগ্য ছাত্র ভরা ছিল। যারা আগে এসেছে তাঁরাই ভর্তি হয়ে গেছে। পেটে ক্ষিধে থাকলে ঘাসপাতা সবই রুচিকর মনে হয়। এখন পেট ভরে গেছে। বেছে বেছে ছাত্র নেওয়া হচ্ছিল। অধ্যাপক সাহেব আমার পরীক্ষা নিলেন এবং আমি অকৃতকার্য হলাম। ফর্মে গণিতের স্থানে লিখে দিলেন অসন্তোষজনক।

প্রেমচাঁদকে আবার নিরাশার অন্ধকার ঘিলে ফেললো। তিনি ফর্মটা নিয়ে আর অধ্যক্ষের নিকট গেলেনই না। সোজা বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন। তিনি গণিতকে তাঁর পক্ষে অলক্ষনীয় গৌরীশংকর চূড়া বলে মনে করতেন। ইন্টারমিডিয়েটে দু'দুবার গণিতে ফেল করার পর যখন গণিত ঐচ্ছিক বিষয় হয়ে গেল তখন তিনি ইন্টারমিডিয়েট দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন। ইন্টার পাশ করতে তার আঠারো বছর বয়স হয়ে গিয়েছিল।[২৩] আর্থিক দুরাবস্থার জন্য তাঁর শিক্ষাজীবন খুব বিলম্বিত হয়। ইন্টার পাশ করার পর তিনি 'গর্ভমেন্ট সেন্ট্রাল কলেজ' এলাহবাদে ১৯০৩-১৯০৪ সেশনে ভর্তি হন এবং ১৯০৪ সালে 'জেনারেল ইংলিশ টিচার্স সার্টিফিকেট' পরিক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।[২৪] একই সঙ্গে 'গর্ভমেন্ট সেন্ট্রাল

---

[২২] Madan Gopal, *Munshi Premchand: A Literary Biography,* Asia Publishing House, Bombay, 1964. P- 24.
[২৩] জি. কে. মানিক টালা, *প্রেমচান্দ ঃ খায়াত-ই-নূর*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ১৯৯৩, পৃ. ১৮২।
[২৪] মানিক টালা, *জামানাহ : প্রেমচাঁন্দ নম্বর*, কউমি কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগ উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, জুলাই ২০০২, পৃ. ১৭।

কলেজ' এলাহাবাদ হতে হিন্দি ও উর্দু সাহিত্যেও বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৬ সালে এফ.এ. এবং একই কলেজ থেকে ১৯১৯ সালে বি.এ. পাস করেন।[২৫]

বৈবাহিক জীবন, প্রথম বিবাহ –

দ্বিতীয় মায়ের পিড়াপিরিতে বাবা অজায়ব রায় প্রেমচাঁদকে ১৮৯৭ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেন। প্রেমচাঁদের *"জিন্দেগী কা যুহর"* এর এক জায়গায় এ প্রসংঙ্গে তিনি লিখেন,

"১৫ বছর বয়সে পিতা অজায়ব লাল তাকে বিয়ে করিয়ে দেন, আর এই বিয়ের সালের পরে তাঁর পিতাঁর মৃত্যু হয়। ঐ সময় তিনি নবম শ্রেণীতে পড়তেন।"[২৬]

অজায়ব রায় এর দ্বিতীয় শ্বশুর প্রেমচাঁদের ভাল থাকার কথা চিন্তা করে বছতী শহর থেকে দশ মাইল দূর রমওয়াপুরের এক ছোট খাট জমিনদারের মেয়ের সাথে প্রেমচাঁদের বিয়ে দিয়ে দেন। এমন একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়, যে তাঁর মনের সুখ-শান্তি সব নষ্ট করে দেয়। বিপদ আরো ঘনিয়ে আসে যখন এর ঠিক এক বছর পরেই তাঁর বাবা সংসারটাকে অকুলে ভাসিয়ে দিয়ে পাড়ি দেন পরলোকে। স্বাভাবিক ভাবেই সংসারের সমস্ত দায়িত্ব সেই যুবকের ঘারে চাপে। প্রেমচাঁদের নিজেই আত্মজীবনী মূলক প্রবন্ধে নিজের সম্পর্কে লিখেন,

> "شادی ہو گئی۔ پتا جی کو معلوم ہوا کہ میری بیوی بہت بد صورت ہے۔ یہ شادی میری چاچی کے پتا نے ٹھیک کی
> تھی۔ پتا جی چاچی سے بولے لالہ جی نے میرے لڑکے کو کوئن مس دھیل دیا۔ میرا گلاب سالڑکا اور اس کی کہ
> بیوی، میں تو اس کی دوسرے شادی کر دوگا۔"[২৭]

("বিয়ে হয়ে গেল, পিতাজী জেনে গেলেন আমার বৌ সুন্দর নাহ। এই বিয়ে আমার চাচীর (সৎ মাতা) পিতা ঠিক করেছিলেন। পিতা চাচীকে বললেন- "লালাজী আমার পুত্রকে জলে ফেলে দিলেন। দুঃখের কথা, আমার এই গোলাপের মত সুন্দর ছেলে আর তাঁর বৌ এমন! আমি তাকে দ্বিতীয় বিয়ে করাবো।")

বিমাতা ও আমার স্ত্রীর মধ্যে মিল ছিল না। প্রতিদিন ঝগড়া হতো। বিমাতা আমর স্ত্রীর উপর শাসন করতো। বিমাতা আমার কাছে একান্তে নালিশ করতো। মাঝে পড়ে আমার হতো বিপদ। বিমাতা না থাকলে হয়তোবা আমাদের দু'জনের জীবন কোন প্রকারে কেটে যেত। যুবক ধনপত চতুর্দিক থেকে এভাবে শৃঙ্খলিত থাকলেও কখনো ভেঙ্গে পড়েননি। বিপদ যতই ঘনীভূত হয়েছে তাঁর সংগ্রামের মনোবৃত্তি ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রেমচাঁদ

---

[২৫] নিতাই বসু, *মুনশি প্রেমচন্দ*, গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা, পৃ. ১০-১৩।
[২৬] জীবন সার, *হংস*, (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৩২), *'কাফন'*, দিল্লী, পৃ. ৫৬।
[২৭] প্রফেসার শাকিলুর রহমান, *প্রেমচাঁদ কা ফান*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ১৯৯৩, পৃ. ২০১।

লিখেছেন- পায়ে লোহার নয় অষ্টধাতুর শৃঙ্খল ছিল আর আমি তাই নিয়ে পর্বত চূড়ায় আরোহন করতে চাইতাম।

শেষের দিকে প্রেমচাঁদ আর এই বউয়ের সাথে পেরে উঠতে পারছিলেন না। সৎ মার বুদ্ধিতে প্রেমচাঁদের তার সাথে সংসার করাটাই দায় হয়ে পড়েছিল। চটুল ও কুটিল স্বভাবের স্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর বনিবনা হচ্ছিল না। ক্রমেই অবস্থা সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। কটুভাষিণী স্ত্রী ঝগড়া বিবাদ করে প্রায়ই তার বাবার বাড়ি চলে যেতো। অবশেষে ১৯০৫ সালে সে তার বাবার বাড়ী চলে যাওয়াটা শেষ বারের মতই চলে যাওয়া ছিল। কারণ এরপর সে আর শ্বশুরবাড়ি মুখোই হয়নি। ধনপতও তাকে আনার চেষ্টা করেননি।

প্রেমচাঁদের প্রেম -

প্রেমচাঁদ ১৮৯৬-১৮৯৭ সালের দিকে প্রথম এক মুসলিম নারীর প্রেমে পড়েন। তখন তার বয়স ছিল প্রায় ষোল বছর। ১৮৯৫ সালে যখন তিনি প্রথম বিবাহ করেন তখন তিনি বেনারসে কুইন্স কলেজে নবম শ্রেনীতে পড়তেন। বিয়ের আনুমানিক ১১ বছর পর ১৯০৬ সালের মে বা জুন মাসে দারিদ্রতাঁর কারনে তার প্রথম স্ত্রী চিরদিনের জন্য তার বাবার বাড়ীতে চলে যায়। সেই সময়ে প্রেমচাঁদ বস্তিতে ছোট একটা ঘরে বসবাস করতেন এবং মাসে পাঁচ রুপির বিনিময়ে একটি টিউশনি করতেন। সে এক উকিল সাহেবের ছেলেকে পড়াত, উকিল সাহেব খুশি হয়ে তাকে তার বাড়ীর উপরের একটি ঘরে থাকতে দিতেন। ঐ সময়কালে তিনি এক মুসলিম গরীব নারীর প্রেমে পড়েন। দ্বিতীয় বিয়ের পর ও প্রেমচাঁদের এই প্রেমটি জীবিত ছিল। প্রেমচাঁদ নিজে বলেন,

"اگر وہ خاتوں مسلمان نہ ہوتی تو شاید پریم چند اس سے شادی کر لیتے۔" [২৮]

("যদি ঐ মহিলাটি মুসলমান না হত, তাহলে অবশ্যই প্রেমচাঁদ তাকে বিয়ে করতেন।")

এটা সত্য যে, প্রেমচাঁদের প্রথম অবস্থায় তিনি ঐ মেয়েকে মনে প্রাণে ভালবেসে ফেলেছিলেন। কিন্তু ধর্মের প্রতি তার আদর্শ ছিল অটল। সে চেয়েছিল তার জীবনে এমন কোন হিন্দু মেয়ে আসুক যে কিনা তার সব সময়ে খেয়াল রাখে, তার মতাদর্শী হয়, তার ঘর সামলায়, তাকে ভালবাসে। কিন্তু তার মাথায় কোন সময়ই ঐ মুসলমান মেয়েকে বিয়ের করার ইচ্ছা আসেনি।

দ্বিতীয় বিবাহ -

অনুমান করা যেতে পারে যে প্রথম স্ত্রীর পিত্রালয়ে গমনের পর বাড়িতে কেবল চাচী থাকাতে কর্তৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না এবং তাই গৃহে কিছুটা শান্তি ফিরে এসেছিল। তবে সে শান্তি দীর্ঘ স্থায়ী হয়নি। কারন

---

[২৮] জি. কে. মানিক টালা, *প্রেমচান্দ ঃ খায়াত-ই-নূর*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ১৯৯৩, পৃ. ১০২।

প্রেমচাঁদকে দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়েছিল। তবে বিয়ের ক্ষেত্রে তার এ শর্ত ছিল যে, মেয়েটিকে বাল্য বিধবা হতে হবে। আত্মীয় স্বজনেরা স্বাভাবিক কারনেই বেঁকে বসেন- এ কেমন কথা। দেখতে সুপুরুষ, সদা হাস্যময় একটি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী যুবক কিনা শেষকালে বিধবা বিবাহ করবে ? হাজার অনুরোধের পরেও প্রেমচাঁদের মন গললো না। তিনি দৃঢ় ভাবেই তাঁর মতামত জানিয়ে দিলেন। অনন্যোপায় হয়ে এমন মেয়েরই খোঁজ করা হতে লাগলো। সহজেই পাওয়া গেল। ফতেহপুর জেলার সলীমপুর নামক গ্রামের একটি মেয়েকে অতি শৈশবেই যার বিবাহ হয়েছিল এবং শৈশব উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই যে বৈধব্যের অভিশাপ নিয়ে জীবন আরম্ভ করেছিল। মেয়েটি বিশেষ লেখাপড়াও জানতো না। শিবরানি দেবী নামের এহেন বাল্য বিধবাকে ১৯০৬ সালে শিবরাত্রির দিন প্রেমচাঁদ দ্বিতীয় বিবাহ করেন। প্রেমচাঁদের সাহিত্যে বিবাহকে আত্ম বিকাশের একটি মাধ্যম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর মতে বিবাহের উদ্দেশ্য হল নারী এবং পুরুষ একে অপরের উন্নতিতে সাহায্য করবে। সম্ভবত এই কারনেই প্রেমচাঁদ দ্বিতীয় বিবাহ করেন। কাছাকাছি ওই সময়েই সম্ভবত প্রেমচাঁদ তাঁর ছোট উপন্যাস *প্রেমা*––উর্দুতে, *হম্ সুর্মা য়ো হম্ সওয়ার*-- হিন্দিতে রচনা করেন যা ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয়। এতে এক নায়ক এক বিধবাকে বিয়ে করেছে বলে দেখানো হয়েছে।[২৯]

آخر 1906 کے پھاگن میں شوراتی کے دن شادی ہو گئی۔ نواب کے ساتھ بارات، ایک ان کے چھوٹے بھائی مہتاب کے

علاوہ اور کوئی رشتہ دار نہ تھا، بس دو چار دوست اور ہم جولی جن میں منشی دیا نرائن نگم خاص تھے۔ [৩০]

("অবশেষে ১৯০৬ সালের ফাগুনে শুভ রাত্রিতে তার বিয়ে হয়ে যায়। নবাবের বর যাত্রীতে এক তার ছোট ভাই মেহতাব ছাড়া তার নিকটতম আত্মীয় স্বজন কেহ ছিল না। আর দু'চারজন বন্ধু এবং বিশেষ মেহমান মুন্সি দয়া নারায়ন নিগাম ছিলেন।")

স্ত্রী হিসেবে শিবরাণী দেবী –

প্রেমচাঁদ প্রথম বিয়ে পনের বছর বয়সে করেছিলেন। প্রথম বিবাহটি তার সৎ মা করিয়েছিল। প্রথম স্ত্রী বিদায় হওয়ার পর প্রেমচাঁদ ঘরের কাউকে না বলেই এক রকম লুকোচুরি করেই বাল্য বিধবা শিবরাণী দেবীকে বিবাহ করেন। শিবরাণী সম্পর্কে প্রেমচাঁদ বলেন- শেষ পর্যন্ত যে বিধবা মেয়েকে তিনি বিয়ে করলেন তিনি মাত্র এগারো বছর বয়সে তাঁর স্বামীকে বিয়ের তিন মাসের মধ্যেই হারিয়েছিলেন। এই নববধূর নাম শিবরানী শ্রীবাস্তব। প্রেমচাঁদের চাচী (সৎ মা) প্রথমে যদিও তাকে মেনে নিতে পারেন নি, তথাপি যখন তাকে মেনে নিতেই হলো, তখন তিনি প্রেমচাঁদের কথা শিবরাণীকে আবার শিবরাণীর কথা প্রেমচাঁদকে বলে তাদের উস্কিয়ে দিতে থাকেন। যাতে তাদের সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হয়। চাচীর কথায় প্রেমচাঁদ কয়েকবার তার স্ত্রীর গায়ে হাতও তুলেন। বিয়ের বেশ কয়েক বছর পর পর্যন্ত প্রেমচাঁদ এই দাম্পত্য জীবনকে সহজ ভাবে নিতে পারেননি। পরে সে আস্তে আস্তে তার ভুল বুঝতে পারেন। এ কারনে প্রেমচাঁদ তাঁর প্রিয় সুহৃদ বন্ধু ইন্দ্রনাথ মদনকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,

---

[২৯] প্রেমচন্দ, *প্রেমচন্দ: গল্প সংগ্রহ*,পশ্চিম বাংলা একাডেমি, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ১০।
[৩০] অমরিত রায়, *প্রেমচান্দ ঃ কলম কা ছিপাহি*, সাহিত্য একাডেমি, নয়া দিল্লী, ১৯৯২, পৃ. ১০১।

'আমার দাম্পত্য জীবনে রোমাঞ্চকর বলে কিছুই ছিল না। তা ছিল একেবারে সাদামাটা। আমার প্রথম পত্নী ১৯০৪ সালে মারা যান। সে ছিল অভাগা স্ত্রী, দেখতে একদম ভালো ছিল না। যদিও তাঁকে নিয়ে আমি মোটেই সুখী ছিলাম না, তবু কোনও রকম অভাব-অভিযোগ ছাড়াই মানিয়ে চলার চেষ্টা করেছি, ঠিক যেমন করে প্রাচীন পন্থী স্বামীরা করে থাকেন। শিবরাণীকে পেয়ে আমি বেশ আনন্দে আছি। তাঁর সাহিত্যে রুচি আছে, মাঝে-মাঝে ছোটোগল্পও লিখে থাকেন। তিনি একজন সাহসী, নির্ভীক, দৃঢ়চেতা, আস্থাশীল, ভুল স্বীকারে সক্ষম, অত্যধিক উৎসাহ ও প্রেরণাদায়িনী পত্নী। ১৯৩০-৩১ সালে শিবরাণী দেবী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। কারণ তিনি প্রতিবেশী নারীদের আইনভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য সংগঠিত করেন। তাঁদের নিয়ে তিনি লবন আইন ভাঙতে অগ্রসর হলেন এবং ১৯৩১ সালের ১১ মার্চ তারিখে তিনি গ্রেফতার হন।

শিবরাণী ছিলেন স্বামীর যোগ্য সহচারী। রাজনৈতিক মতাদর্শে তিনি সর্বদা স্বামীর পাশে দাঁড়িয়েছেন, রাজনীতি করেছেন এবং কারাবাস ও ভাগ্যে জুটেছিল তাঁর। শিবরাণী দেবীর দয়া মাখা চরিত্রের একটি প্রমাণ হল- প্রেমচাঁদ শিবরাণী দেবীকে বিবাহের পূর্বে তাকে বলেননি যে আগে তার একটি বিয়ে হয়েছিল। অবশেষে যখন শিবরাণী দেবী জানতে পারলেন যে, তার পূর্বে একটি বিবাহ হয়েছিল। তখন তিনি চাচ্ছিলেন যে প্রথম বিবিও তার সাথে থাকুক যদিও তার এই চাওয়া পূরণ হয়নি।[৩১] এটা শীবরাণী দেবীর মহা উদারতার একটি প্রতিফলন। যা তার চরিত্রকে আরো উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। তার বাবা পূর্বের এক জমিদার ছিলেন। জমিদার মেয়েদের উদারতা, ধৈর্য, সাহসিকতার প্রমাণ তার এই স্বদিচ্ছার প্রমাণ।

সাংসারিক জীবনে 'শিবরাণী দেবীর' সঙ্গে শ্বাশুরীর সংঘাত লেগে থাকবারই কথা। কিন্তু নববধূ নীরবে সব রকম অত্যাচার সহ্য করে যেতেন। যখন অসহ্য বোধ হতো তখন পিত্রালয়ে চলে যেতেন, তাঁর লেখা থেকেই জানা যায় যে, তিনি বছরের বার মসের দশ মাস কাটাতেন পিত্রালয়ে এবং দু'মাস শ্বশুরালয়ে। শিবরাণী দেবী অত্যন্ত সৎ, আত্মপ্রত্যয়ী, নির্ভয়, স্বভিমানী, প্রভাবশালী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্না মহিলা ছিলেন। প্রেমচাঁদ নিজে যেহেতু কোমল স্বভাবের মানুষ ছিলেন, তাই এমন জীবন সঙ্গিনীই বোধ হয় তাঁর প্রয়োজন ছিল। মনে হয় এজন্যই প্রেমচাঁদের জীবনে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দেখতেন যে লোকটা কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পয়সা রোজগার করে সংসারের এতগুলো লোকের পেট চালাচ্ছে, তাঁরই নিজের ঘরে কোন স্থান নেই। বাইরে থেকে আসা একটা মেয়ে কিই বা করতে পারে ? তাই তিনি ডাক এলেই পিত্রালয়ে চলে যেতেন এবং প্রেমচাঁদ বিবাহ করেও সেই নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রথম আটটি বছর এভাবেই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই কেটেছে কিন্তু একদিনের একটি ছোট ঘটনা গৃহের পরিবেশ পাল্টে দেয়। শিবরাণী পিত্রালয় থেকে আহ্বান পেয়ে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময় প্রেমচাঁদ বাধা দেন। তর্কযুদ্ধে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রেমচাঁদ পত্নীর গালে এক চপ্টাঘাত করে বসেন। পত্নী অপমানে, দুঃখে, বেদনায় মর্মাহত হয়ে অন্ধকার ঘরে বসে থাকেন। প্রেমচাঁদ ও অনুতপ্ত হলেন। সন্ধ্যে বেলা বাইরে থেকে এসে স্ত্রীকে স্বান্তনা দিতে চেষ্টা করেন। তাঁরপর স্বামী-স্ত্রীর

[৩১] মানিক টাল, *প্রেমচাঁন্দ : কুচ নয়ি মোবাহেছ*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, আক্টোবর- ১৯৮৮, পৃ. ৯৩।

মধ্যে ঠিক হয় যে, পারিবারিক কর্তৃত্বের চাবি কাঠিটি ভবিষ্যতে শিবরানীর হাতেই থাকবে। বিমাতার এই অন্যায় অত্যাচার আর সহ্য করা হবে না। স্বামীর নিলিপ্ততায় যে অভিমান বশে এতদিন নিশ্চুপ হয়ে শত অপমান ও লাঞ্চনা সহ্য করে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ছিলেন এবং সেই স্বামীর অনুমতি পেয়ে তিনি গৃহের সব চাবিকাঠি নিজের আঁচলে বাঁধলেন। প্রথমটা শাশুড়ি প্রতিবাদে মুখর হওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু যখন বুঝতে পারলেন যে স্বামী স্ত্রীতে বিরোধ বা মনোমালিন্য সৃষ্টি করে আর কলকাঠি নিজের হাতে রাখা সম্ভব হচ্ছে না, তখন তিনিও নীরবে হাত গুটিয়ে নিলেন। এখন থেকেই শিবরাণী দেবীর সতেজ রূপ বা শাসনের চাপে চাপা পড়ে গিয়েছিল উদঘাটিত ফল। এবার সর্বার্ধে শিবরাণী দেবী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী হলেন। তাঁর বিপদে আপদে, চিন্তা চেতনায় সমব্যথী হয়ে উঠলেন। চাকরী থেকে ইস্তফা দেওয়ার ব্যাপারে যখন প্রেমচাঁদ চিন্তিত তখন শিবরাণী দেবী তাকে সাহস যুগিয়ে আশ্বাস দিলেন, আপনি সংসার চালাবার কথা চিন্তা করবেন না। সে যে করে হোক চলবেই। যদি দেশ চায় বলিদান, তবে তাতে বিলম্ব করা উচিত নয়।

এমনি বহু ঘটনায় প্রেমচাঁদকে দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছেন শিবরাণী দেবী। যে শিবরাণী দেবী সামান্য হিন্দীর জ্ঞান নিয়ে নববধূ রূপে প্রেমচাঁদের গৃহে প্রবেশ করেছিলেন সেই শিবরাণী স্বামীর সংস্পর্শে গল্প লেখিকা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ও করেছিলেন। তাঁর লেখা গ্রন্থ *'প্রেমচাঁদ ঘর মে'* আজও প্রেমচাঁদের সর্বাধিক প্রামাণিক তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ বলে ধরা হয়। এটি না পড়লে পরিবারের এক সদস্য রূপে মানুষ প্রেমচাঁদের চরিত্রটা আমাদের নিকট অস্পষ্ট থেকে যেত।

এই শিবরাণী দেবী *'প্রেমচাঁদ ঘর মে'* বইতে বস্তী থাকাকালীন এক ঘটনার কথা লিখেছেন যাতে তাঁর নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্পর্কে কিছু আভাস পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন,

এক দিনের ঘটনা। আমি বস্তী যাচ্ছিলাম। উনি অসুস্থ ছিলেন। রাত্রি বেলা। পেট ভার ছিল। আমরা তিনজন ছিলাম। গাড়িতে প্রচন্ড ভীড় ছিল। আমি তাঁর জন্যে বিছানা পেতে দিয়েছিলাম। তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। মেয়েও ঘুমিয়ে পড়েছিল। দুজন যাত্রী এলো। বললো, অন্যদের বসবার জয়গা নেই আর ইনি ঘুমোচ্ছেন।

শিবরাণী:	তোমরাও কোথাও বসে পড়ো।
যাত্রী:	ওকে উঠিয়ে দাও।
শিবরাণী:	উনি অসুস্থ।
যাত্রী:	শরীর অসুস্থ তো বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল কেন ?
শিবরাণী:	বক্ বক্ করো না।
যাত্রী:	গাড়ীর ভাড়া কি শুধু তোমরাই দিয়েছ ?
শিবরাণী:	আচ্ছা, যেখানে জায়গা পাও সেখানে বসে পড়।
যাত্রী:	উনাকে উঠিয়ে বসবো।
শিবরাণী:	উঠাও ! দেখি আমি।

ও এগিয়ে এলো। আমি রেগে গেলাম। ক্রুদ্ধ হয়ে আমি বললাম, খবরদার যদি সামনে হাত বাড়িয়েছ তো গাড়ি থেকে নীচে ফেলে দেব। আমাদের দুজনের কথায় ওর ঘুম ভেঙ্গে গেল। উনি তাড়াতাড়ি উঠতে চাইলেন। আমি বললাম আপনি কেন উঠছেন ?

প্রেমচাঁদ: উঠতে দাও, কেন ঝগড়া করেছো ?

শিবরাণী: এই গাধাগুলোর সঙ্গে সোজা ভাবে কাজ হবে না। এরা মানুষ নয় পশু। আমি আপনার অবস্থার কথা বললাম, তবু এদের বুদ্ধি খোলে না। এরা জোর দেখাতে এসেছে। আমি এদের গাড়ী থেকে ফেলে দেবো। ওরা যখন আমার রাগ দেখলো তখন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। কয়েকটি স্টেশন অবধি ওরা দাড়িয়েই রইলো। যখন ওরা নেমে গেল তখন প্রেমচাঁদ বললেন- তুমি খুব সাহসী তো! এমন ধমক দেওয়ার সাহস আমার হতো না। [৩২]

এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় প্রেমচাঁদের পত্নী শিবরাণী দেবী অসীম সাহসী মহিলা ছিলেন। তিনিই স্বামী-পুত্র-কন্যার সত্যিকারের রক্ষক। বিপদে-আপদে স্বামীর পাশে এসে দাড়াবার ক্ষমতা তাঁর ছিল এবং তা প্রেমচাঁদ নিজেও জানতেন, তাই তিনি বলেছেন- আমাকে 'প্রেমচাঁদ' হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন শিবরাণী দেবী। [৩৩]

প্রেমচাঁদের সন্তানাদি -

শিবরাণী দেবী ক্রমেই ছ'টি সন্তানের জননী হন, যাদের মধ্যে তিনটি জীবিত ছিল। তাঁর মধ্যে দুটি পুত্র ও একটি কন্যা। মেয়ে সবার বড়, নাম কমলা। পুত্র শ্রীপতাপ রায় জন্ম গ্রহন করেন ১৯১৮ সালে। তিনি আজও পারিবারিক ট্রাডিশন ঘরে থেকে প্রকাশক ও লেখক রূপে হিন্দী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলছেন। তৃতীয় সন্তান অর্থাৎ সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রী অমৃত রায় জন্ম গ্রহণ করেন ১৯২২ সালের আগষ্ট মাসে। প্রেমচাঁদ নিজের সন্তানদের এতই ভালবাসতেন যে, নিজের হাতে রাত্রে শিশুদের ভেজা কাপড় ও কাঁথা পাল্টাতেন, সে কাপড় চোপড় সকালে নিজের হাতে ধুয়ে শুকিয়ে ঘরে তুলতেন, বাচ্চাদের কান্না কাটির সময় তাদের কাঁধে ফেলে পায়চারি করতে করতে ঘুম পাড়াতেন, জ্বর বা অন্যান্য অসুস্থতার সময় রাত জেগে সকলের সেবা করতেন, দরকার হলে রান্না ঘরের কাজ কর্ম সারতেন। পরিশ্রান্ত হয়ে কাজের পর ঘরে এলে ঘন্টাখানেক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলায় মশগুল থাকতেন। বলতেন এই সন্তানরাই আমার ভবিষ্যতের কাজের প্রেরণা যোগাবে। এককথায় বলতে গেলে তিনি পরিবারের সকলের সুখ সুবিধার জন্য জুতা সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ অবধি সবই করতেন।

---

[৩২] শিবরানী দেবী, *প্রেমচাঁদ : ঘর মে*, আঞ্জুমান তারাক্কি উর্দু (হিন্দী), নয়া দিল্লী, ২০০৭, পৃ. ৪৩-৪৪।
[৩৩] ইনশা, *আদিবু কি হায়াত মুয়াশিকাহ*, উর্দু বাজার, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ: ২৫৩।

পিতৃ বিয়োগের পর -

পিতাঁর মৃত্যুর পর বিমাতা, তাঁর দুটি সন্তান, নিজে এবং স্ত্রী এতগুলি পেটের ক্ষুধার অন্ন জোগাবার ভার তাঁর কাধে চাপার কারণে ধনপত যেন চোখে মুখে অন্ধকার দেখতে লাগলো। তখন তাঁর কাছে একটি কানাকড়িও ছিল না। পিতার সঞ্চিত সব অর্থ তার চিকিৎসায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি লিখেছেন- "ঘরে যা সঞ্চয় ছিল তা পিতার ছ'মাসের অসুস্থাবস্থায় চিকিৎসায় এবং শেষকৃত্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমার আকাঙ্খা ছিল উকিল হওয়ার আর এম.এ. পাশ করার।"

খালি গায়ে ছিন্ন বস্ত্রে লমহী থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে গিয়ে স্কুল করে আবার রাত্রে ফিরে আসত প্রেমচাঁদ ক্লান্ত শরীর নিয়ে। এক মুঠো ছোলা পুটলি করে বেঁধে নিয়ে যেত ক্ষুধার তাড়না থেকে মুক্তির জন্যে। তাই খেয়ে পেট ভরে জলপান করে রাত অবধি সময় অতিবাহিত করত। প্রতিদিন দশ-বারো মাইলের হাটা সেই যুবকের পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠলো। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন- "পায়ে ছিল না জুতো, গায়ে ছিল ছেঁড়া জামা। দ্রব্যমূল্য আকাশ ছোয়া, জব টাকায় বিশ সের। স্কুল থেকে সাড়ে তিনটের দিকে ছুটি পেতাম। কাশীর কিংস কলেজে পড়তাম। হেডমাস্টার মাইনে মওকুপ করে দিয়েছিলেন। পরীক্ষা মাথার ওপর ঝুলছিল। আমি 'বাশফাটকে' একটি ছাত্রকে পড়াতে যেতাম। শীতের দিন। চারটার সময় পৌছতাম। পড়িয়ে ছটায় মুক্তি পেতাম। সেখান থেকে আমর বাড়ি ছিল পাঁচ মাইল দূরে। দ্রুত হাঁটলেও আটটার পূর্বে ঘরে পৌছাতে পারতাম না। পরেরদিন ভোরে আটটায় আবার বাড়ি থেকে রওনা হতে হতো, কখনো ঠিক সময়ে স্কুলে পৌছতে পারতাম না। রাতে খাওয়া শেষে কুপি জ্বালিয়ে পড়তে বসতাম, আর না জানি কখন ঘুমের কোলে ঢলে পড়তাম। তবু সাহস সঞ্চয় করেছিলাম।"

অবশেষে ভগবানেরও বোধ হয় বালকের কষ্ট ও অধ্যবসায় দেখে দয়ার উদ্রেক হলো। তিনি এক উকিলের বাড়িতে একটি ছেলেকে পড়াবার কাজ জুটিয়ে দিলেন। মাইনে মাত্র পাঁচ টাকা। উকিল বাবু ছিলেন সহৃদয় ব্যক্তি, তাই তাঁর আস্তাবলের ওপর একটি কাঁচা খুপরিতে তাঁর বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেন। এই সময়কার ধনপতের জীবন কাহিনী তাঁরই লেখায় শোনা যাক- "সৌভাগ্যবশত একজন উকিলের ছেলেদের পড়াবার কাজ পেয়ে গেলাম। বেতন মাসে পাঁচ টাকা। দু'টাকায় নিজের খরচ চালিয়ে তিন টাকা বাড়িতে পাঠাতে মনস্থ করলাম। উকিল সাহেবের আস্তাবলের ওপরে একটি মাটির ঘর ছিল। তাঁর মধ্যে থাকবার অনুমতি নিয়ে নিলাম। একটি চটের টুকরো পেতে নিলাম। বাজার থেকে একটা ছোট বাতি কিনে আনলাম এবং শহরে বাস করতে লাগলাম। বাড়ি থেকে কয়েকটি বাসনপত্রও নিয়ে এলাম। একবার খিচুড়ি বানিয়ে বাসনপত্র ধুয়ে গ্রন্থাগারে চলে যেতাম। গনিত তো ছিল একটি অজুহাত, পড়তাম উপন্যাস ইত্যাদি। বঙ্কিমবাবুর উর্দু উপন্যাস যা পুস্তকালয়ে ছিল সব পড়ে ফেললাম। যে উকিল সাহেবের ছেলেকে পড়াতাম তাঁর শ্যালক আমার সঙ্গে ম্যাট্রিক পড়তো। তাঁরই সুপারিশে আমি এই কাজটি পেয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। তাই যখন দরকার

পড়তো তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে নিতাম। মাইনে পেলে হিসেব হয়ে যেত। কখনও দু'টাকা বাঁচতো কখনও তিন টাকা। যেদিন মাইনের দু'তিন টাকা হাতে পেতাম, সেদিন আমার সমস্ত সংগ্রামের বাঁধ ভেঙ্গে যেত। মিষ্টির দোকানের দিকে টেনে নিয়ে যেত। দু'তিন আনার খেয়ে তবেই উঠতাম। সেদিনই বাড়ি যেতাম আর দু'আড়াই টাকা দিয়ে আসতাম। দ্বিতীয় দিন থেকে আবার ধার দেনা করা আরম্ভ করতাম, কিন্তু কখনো কখনো ধার চাইতেও সংকোচ করতাম আর দিনভর না খেয়ে কাটিয়ে দিতাম। এভাবেই চার পাঁচ মাস কাটলো। এরই মধ্যে এক কাপড়ের দোকান থেকে দু-আড়াই টাকার কাপড় কিনেছিলাম। প্রতিদিন ওদিক দিয়েই যেতাম। আমার উপর তাঁর বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল। মাস দু'মাস হয়ে গেলেও আমি তাঁর টাকা দিতে না পারায় সেদিক দিয়ে যাতায়াতই বন্ধ করে দিলাম। ঘুরতি পথে চলে যেতাম। তিন বছর পর তাঁর টাকা শোধ করতে সক্ষম হলাম। সেই সময়ে শহরের এক কোদাল চালক মজুর আমার নিকট হিন্দী পড়তে আসতো। উকিল সাহেবের পিছন দিকেই তাঁর বাড়ি। ..... আমি তাকে 'জান লো ভাইয়া' ডাকতাম। একবার আমি তাঁর কাছ থেকেও আট আনা ধার করেছিলাম। সেই পয়সা সে পাঁচ বছর পর আমার বাড়ি গিয়ে আদায় করেছিল। পড়ার ইচ্ছে আমার তখনও ছিল, তবে দিন দিন হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। ইচ্ছে হতো কোথাও চাকুরী জুটিয়ে নেই। কিন্তু চাকরি কেমন করে পাওয়া যায় আর কোথায় পাওয়া যায় তাই জানতাম না।"

কাপড়-চোপড় বিহীন প্রেমচাঁদের কন্‌কনে শীতের দিনগুলো নিদারুন কষ্টে কাটতো। এক পয়সা করে ছোলা কিনে তাই খেয়ে আর আকণ্ঠ জলপান করে দু'তিনটে দিন কোন রকমে কাটলো। ধার দেওয়ার লোকেরা সবাই তাকে আর ধার দিতে অস্বীকার করলো। আগের ধার শোধ না করতে আর কেউ নতুন করে ধার দেয় না। তাই ধনপতের যেন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। হটাৎ রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে তাঁর মনে একটা কথার উদয় হলো। বাড়ি ফিরে সে বছর দুই পূর্বে কেনা একটা নতুন বই খুজে বের করলো। বইটি হলো যাদব চন্দ্র চক্রবর্তীর অংকের বই। অতি যত্নে কিনে রেখেছিল অংক শেখার বাসনায়। একবার বইটি হাতে নিয়ে মনে হলো, বইটি বিক্রি করে দেই। সযত্নে বইটা জায়গায় রেখে দিয়ে আবার চিন্তা ভাবনায় ডুব দিলাম। কিন্তু না আমার আশা কোথাও এক বিন্দুও দেখা যায় না। এবার মনে দৃঢ়তা এনে ভাবনা চিন্তাকে দূরে ফেলে দিয়ে বইটা কুড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বারংবার বিবেক বাধা দিচ্ছিল, বলছিল ধনপত তুমি না এম.এ. পড়ার স্বপ্ন দেখ, তুমি শেষ কালে বই বিক্রী করতে যাচ্ছ ? কিন্তু না সংকল্প অটল রাখলাম। দোকানে বইটি দিলাম। দোকানী বিক্রেতার অবস্থা বুঝতে পারলো। একটা টাকা বের করে এগিয়ে দিল। বললো- এর বেশী দিতে পারবো না। বেচারা ধনপত সেই একটা টাকা হাতে নিয়ে দোকান থেকে নেমে আসে, কিন্তু সেই সময় হঠাৎ এক শ্মশ্রুকারী সৌম্য ভদ্রলোক তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি চাকরী করতে চাও" ? বেচারা ধনপত যে সম্প্রতি ম্যাট্রিক পাশ করেছে, এমন আজগুবি কথা শুনে চমকে ওঠে। ভদ্রলোক পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস কারে "ম্যাট্রিক পাশ করেছো তো; চাকরী করবে ?" আচমকা এক অপরিচিতের মুখে এমন কথা শুনে ধনপত নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। সামলে নিয়ে বললো- "কোথায় পাবো চাকরী? কে দেবে আমায় চাকরী? তবে হ্যাঁ ম্যাট্রিকটা পাশ করেছি।"

এই ভদ্রলোক ছিলেন একটি ছোট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি কিছুদিন ধরে একজন নির্ভরযোগ্য সহকারী শিক্ষক খোঁজতে ছিলেন। মুখোমুখি কথাবার্তা হয়ে গেল। মাইনে আঠারো টাকা। কিন্তু বিপদাপন্ন ধনপতের জন্যে এ যেন অভাবনীয় সুযোগ। পরের দিন সাক্ষাতের সময় জেনে নিয়ে ধনপত বাড়িমুখো হলো। আনন্দে সে আজ আত্মহারা। মাটিতে যে পা পড়ছিল না। হাওয়ায় ভেসে মুহূর্তে যেন বাড়ি পৌছে গেল। মনে হলো যেন জীবন শুধু অন্ধকারময় নয়, দুঃখ কষ্টই এ সার নয়; এতেও আছে আলো, আছে সুখ ও আনন্দ।

চাকরী জীবন –

বিশ বছর বয়সে প্রেমচাঁদ চাকুরি জীবন শুরু করেন। ২ জুলাই, ১৯০০ সালে প্রেমচাঁদ 'সরকারি জেলা স্কুলে' পঞ্চম শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। বিশ রুপি তার মাসিক বেতন নির্ধারণ করা হয়। এখান থেকেই তার সরকারী চাকুরি শুরু হয়। ভাল পড়ানোর জন্য পরে তাকে স্থায়ী ভাবে স্কুল শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২১ সেপ্টেম্বর সরকারি ভাবে 'প্রতাপ নগরে' শিক্ষক রূপে তিনি বদলী হন। এখানে সে ৫ জুলাই, ১৯০২ সাল পর্যন্ত ছিলেন। পরে বেতন ঠিক রেখে দু'তিন বছর শিক্ষকতার বদৌলতে তিনি 'সরকারি ট্রেনিং কলেজ' এলাহাবাদে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করেন। এ প্রসংঙ্গে অমরিত রায় বলেন,

لہذا، نواب نے الہ آباد جا کر ٹریننگ لینے کا فیصلہ کیا اور تقریباً دو برس پرتاپ گڑھ میں رہنے کے بعد محکمے سے دو سال
کی چھٹی لے کر الہ آباد پہنچا اور 6 جولائی 1902 کو ٹریننگ کالج کی پریپرٹی کلاس میں داخل ہوا۔ [৩৪]

("অবশেষে, নবাব এলাহবাদে ট্রেনিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং দু'বছর প্রতাপ ঘরে থাকার পর সেখান থেকে দু'বছরের ছুটি নিয়ে এলাহবাদে পৌছান এবং ৬ জুলাই, ১৯০২ পর্যন্ত ট্রেনিং কলেজে প্রিপেড ক্লাসে প্রবেশ করেন।")

এখানে প্রথম বছর তাকে প্রিপ্রেরেটরি ক্লাসে শিক্ষা লাভ করতে হয়। তাঁরপর তিনি জুনিয়র ক্লাসে উত্তীর্ন হন। এলাহাবাদে এই একমাত্র ট্রেনিং কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন একজন ছাত্র দরদী উদার মতাবলম্বী ভদ্রলোক যার নাম ছিল ক্যাম্পলষ্টর। এখান থেকেই তিনি ৩০ এপ্রিল, ১৯০৪ সালে 'জুনিয়র সার্টিফিকেটেড টিচার' পরীক্ষা প্রথম বিভাগে পাশ করেন। ধনপতের অধ্যাবসায়ে সন্তুষ্ট হয়ে অধ্যক্ষ মহাশয় তাকে 'ট্রেনিং কলেজের মডেল স্কুলের' প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করে দেন। তিনি সেখানেই হোস্টেলে থাকবার জায়গা পেয়ে গেলেন। পরবর্তীতে প্রেমচাঁদ এই ইংরেজ অধ্যক্ষের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যে বছর তিনি ট্রেনিং কলেজ থেকে পাশ করেন সে বছরেই তিনি ওরিয়েন্টাল এলাহাবাদ ইউনির্ভাসিটির স্পেশাল ভার্ণাকুলার পরীক্ষার হিন্দী এবং উর্দু পাশ করেন। ১৩ মে, ১৯০৫ সালে প্রেমচাঁদ সেখানে বদলি হন। সেখানে তিনি ১৬ জুন, ১৯০৯ সাল পর্যন্ত অবস্থান করেন।

---

[৩৪] অমরিত রায়, *প্রেমচান্দ ঃ কলম কা ছিপাহি*, সাহিত্য একাডেমি, নয়া দিল্লী, ১৯৯২, পৃ. ৭১।

পরে ১৯০৫-১৯০৮ সাল পর্যন্ত 'গভর্ণর স্কুল কানপুর' এ 'সহকারী শিক্ষক' হিসাবে বহাল থাকেন। পাশাপাশি তিনি ৪ ডিসেম্বর, ১৯০৭ থেকে ২৯ এপ্রিল, ১৯০৯ সাল পর্যন্ত কানপুরে 'সাব ডিস্ট্রিক ইন্সপেক্টর' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আর তিনি সেখানে ছয় বছর কাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। পরে মুহুবাহ মিরপুরের 'ডিস্ট্রিক বোর্ড' থেকে আবার ২৪ জুন, ১৯০৯ থেকে জুলাই, ১৯১৪ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছর 'সাব ডিস্ট্রিক ইন্সপেক্টর' হিসেবে কাজ করেন। পরে যখন তার আর ভাল লাগছিল না, তখন তিনি 'বস্তির সরকারী স্কুলে' ১২ মে, ১৯১৫ সালে যোগদান করেন, সেখানে তিনি ১২ আগস্ট, ১৯১৬ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। মদন গোপাল মুন্সি প্রেমচান্দঃ এ লিটারারী বায়োগ্রাফী বইতে লিখেন,

> When Premchand was transferred on promotion- in august 1916 to become the Assistant Master at the Normal High School, Gorakhpur, Mrs. Premchand was in the final stages of pregnanncy. The family left basti by train on August 18 and arrived at Gorakhpur the same evening. School teachers and pupils had had prior intimation and he was therefore accorded a warm reception. [২৩]

("এরপর প্রমোশন ও বদলী হয়ে ১৯১৬ সালে আগস্ট মাসে এক সাধারণ উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে গৌরখপুর আসেন। শ্রীমতি প্রেমচাঁদ সে সময় গর্ভবতীর চূড়ান্ত পর্যায় ছিলেন। ১৮ আগস্ট, প্রেমচাঁদ স্বপরিবারে ট্রেনে করে বস্তি থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ঐদিন সন্ধ্যায় গৌরখপুরে পৌছান। ঐ স্কুলে পূর্ব থেকেই নোটিশের মাধ্যমে জানিয়ে দওয়া হয়েছিল যে, প্রেমচাঁদ স্বপরিবারে আসছেন, সেখানে তিনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দ্বারা উষ্ণ অভ্যর্থনা পান।")

পরে ২৩ জুন, ১৯২১ সালে কানপুর 'মারওয়ারি' স্কুলের চার্চ প্রেমচাঁদকে বেতওয়ার প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। ঐ বছর প্রেমচাঁদের দ্বিতীয় ছেলে 'আমরিত রায়' জন্ম গ্রহণ করেন। মারওয়ারি স্কুল থেকে প্রেমচাঁদ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ সালে ইস্তফা দিয়ে একবারের জন্য বেনারস চলে যান।

বদলি ও রোগের সাথে যুদ্ধ -

ধনপত রায় যখন হমীরপুরে বদলি হলেন, তখন থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হতে লাগল। সেখানকার জল হাওয়া যেন তাঁর পক্ষে আতংকের বস্তু হয়ে দাঁড়ালো। তাঁর ওপর খাওয়া দাওয়ার কোনো সুব্যবস্থা না থাকায় শরীরে যেন ভাঙ্গন ধরল। প্রায়ই তিনি পেটে ব্যথা অনুভব করতেন। মাঝে মাঝে ব্যাথা এমন কষ্টকর হয়ে দাড়াতো যে, তিনি মাটিতে পড়ে গলা কাটা ছাগলের মত ছট্‌ফট্‌ করতেন। আগেই বলেছি যে প্রেমচাঁদ ভোজন বিলাসী ছিলেন। রকমারি রান্না দেখলেই তিনি নিজের রসনাকে সংযম করতে পারতেন না। খাওয়ার সময় তিনি পেটের অসুখের কথা ভুলে যেতেন। পেটপুরে খেয়ে ফেলতেন। এজন্য তাঁর পরের দিন তারা খেসারত দিতে হতো উপবাস করে। পেটের এ রোগ যাকে একবার ধরে, সময়ে সাবধান না হলে তাঁর আর রক্ষে থাকে না। বাজারে কোন দোকানে গমের পাকৌড়া বা দই বড়া বা অন্য কিছু মুখরোচক ব্যঞ্জন দেখলেই পকেটে পয়সা থাকলে তাঁর

[২৩] Madan Gopal, *Munshi Premchand: A Literary Biography*, Asia Publishing House, Bombay, 1964. P- 114.

পক্ষে সামলে চলা কঠিন হয়ে পড়তো। এ সব অত্যাচারের পরিণাম স্বরূপ আমাশা ও গ্যাষ্ট্রিক পাকা পোক্ত ভাবে তাঁর উপরে আস্তানা গাড়তো। এ রোগই শেষ পর্যন্ত তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যখন প্রেমচাঁদ বুঝতে পারলেন যে বাঁচতে হলে হমীরপুর তাকে ত্যাগ করতেই হবে তখন তিনি ১৯১৪ সালে এই আশা নিয়ে বদলির জন্য দরখাস্ত করলেন যে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বদলি করা হলে হয়তো বা এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। কিন্তু তাঁর আশা নিরাশায় পরিনত হলো। কারণ তাকে বদলি ঠিকই করা হলো, কিন্তু তা এমন একটি পন্ড গ্রামে যেখানে তাঁর স্বাস্থ্য আরো খারাপ হয়ে গেল। এ জায়গাটি হলো নেপালের তরাই অঞ্চলে বস্তি জেলায়। এখানে না ছিল তাঁর মানসিক ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায়, না ছিল স্বাস্থ্য ভালো রাখার কোন উপকরণ। তাই দিন-দিন তাঁর রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এমন একটি পর্যায় আসে যখন তিনি সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। তিনি চিকিৎসার জন্য ছয় মাসের ছুটি নেন। ছুটির পরেই তিনি লখনৌ চলে যান এবং হাসপাতালে ভর্তি হন। বেশ কিছুদিন চিকিৎসার পরও যখন তিনি রোগ মুক্তির কোন লক্ষণ দেখতে পেলেন না তখন আবার বেনারসে চলে আসেন। এখানে বন্ধু বান্ধবদের পরামর্শে তিনি কবিরাজী চিকিৎসা করান। কয়েক মাসের নিয়মিত চিকিৎসায় রোগ কিছুটা প্রশমিত হয়। সম্পূর্ণ রোগমুক্তি হওয়ার পূর্বেই ছুটি শেষ হয়ে যাওয়ায় তাকে আবার কর্মস্থলে দিরে যেতে হয়। কিন্তু এখানে এসেই পুনরায় রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ববস্থায় ফিরে আসে। ক্রমশ এমন অবস্থা হলো যে তাঁর পক্ষে পরিদর্শনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করার উপায় রইলো না। অনন্যোপায় হয়ে তিনি বদলীর জন্যে দরখাস্ত করেন। দরখাস্ত মঞ্জুর হয় এবং ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে কুস্তীর সরকারী স্কুলে তিনি সহকারি শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। পরে তিনি আবার গৌরকপুর বদলী হন।

চাকুরি হতে ইস্তফা ও প্রেস প্রতিষ্ঠা –

প্রেমচাঁদ ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ। চাকুরি করা তাঁর মুল প্রবৃত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ ছিল না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীবিকার জন্যে তাকে চাকুরির এই পেশা গ্রহণ করতে হয়েছিল। তিনি বহুবার বন্ধু বান্ধবদের নিকট চাকুরির ব্যাপারে নিজের অনিচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। তৎকালীন সরকারী চাকুরি মানেই হলো ওপর ওয়ালার তোষামোদ, পায়ে তেল দেওয়া, জ্বী হুজুরী করা। তিনি নিগম সাহেবকে একটি পত্র লিখে চাকুরির প্রতি তাঁর তিক্ত মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, 'আমি তো তোয়াজ করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছি। আমি চাই এমন কাজ করতে যাতে নিজের মনের আবেগের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হতে পারি।' দেশের তৎকালীন রাজনীতির জোয়ারে তিনি গা ভাসিয়ে দেননি ঠিকই কিন্তু দেশ ও দশের ডাকে সাড়া দিয়েই তিনি শেষকালে তাঁর চাকুরি হতে ইস্তফা দেন। শিক্ষকতায় তাঁর নাম ডাক ছিল তাই ছাত্রবন্ধুরা তাদের সর্বাধিক প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরুর এই বিচ্ছেদে অশ্রুসিক্ত হয়ে ব্যথিত হৃদয়ে বিদায় জানালেন। শ্রীমতি শিবরাণী দেবী এ সম্পর্কে লিখেছেন- 'পদত্যাগ পত্র দাখিল করবার পূর্বে প্রেমচাঁদ দুটি বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন। তিনি নিজেও ঘুমোতে পারেন নি। ভাবতে লাগলাম তাকে একটি বিরাট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। পুরাতন জীবনের সংস্পর্শ ত্যাগ করে নতুন পথ

গ্রহণ করতে হবে।' তাকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে শিবরাণী দেবী বললেন- 'যখন সিদ্ধান্ত ভাল তখন তাকে অনুসরণ করতে সংকোচ কেন ? যা ভেবেছ তাই করে ফেলো।' [৩৬]

এবার সাহিত্যিকের নতুন জীবন আরম্ভ করলেন। এতদিনে সাহিত্যকর্ম করেও তিনি সাহিত্যিকের জীবন যাপন করার সুযোগ পাননি। এবার পরিপূর্ণ ভাবে নিজেকে সাহিত্য রস সাগরে নিমজ্জিত করার সুযোগ পেয়ে যেন তিনি হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ পেলেন। আসলে প্রেমচাঁদ বেশ কিছু কাল থেকেই সত্যাগ্রহীদের ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার চলছিল, তাঁর জন্যে নিজের সরকারি চাকুরির কথা ভেবে ভেবে হীনমন্যতায় ভুগছিলেন। তাঁর প্রথম রচনা *'সোজে-ওতন'* এর ওপর অন্যায়ের কুঠারাঘাতের কথা তাঁর বারবার মনে হতো। মনে হতো তাঁর লেখার ওপর অন্যায় অঙ্কুশের কথা। ক্রমশ ইংরেজদের প্রতি তাঁর মনে ঘৃণা সঞ্চিত হচ্ছিল। তিনি নিজে অগ্রজ প্রতিমা নিগম সাহেবকে তাঁর পুত্রের বিয়ের নিমন্ত্রণের উত্তরে লিখে জানালেন- 'আপনি ইংরেজদের অযথা আমন্ত্রন জানিয়েছেন। ওরা এটাকে বন্ধুত্ব বলে ভাবে না, চাটুকারিতা ভাবে।'

সরকারি চাকুরিরত অবস্থাতেই তাঁর মনে মনে উদ্যোগ ছিল প্রেস খুলে নিজের একটি স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করার। প্রেসের জন্যে যে পরিমাণ টাকা দরকার তা তাঁর কাছে ছিল না। পরবর্তীতে কয়েকজন সঙ্গী জুটিয়ে এদিক ওদিক থেকে টাকার জোগাড় করে শেষ পর্যন্ত তিনি একটি প্রেস খোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ প্রসংঙ্গ তুলে ধরে প্রেম গোপাল মিত্র লিখেন,

"جب پریم چند نے 1921 میں سرکاری عہدے سے استعفٰی دیا تو گورھپور سے ایک اردو اخبار نکالنا چاہتے تھے

مگر وہاں سے ایک پرانے اخبار نے دوبارہ اشاعت کا اعلان کر دیا۔ پریم چند نے بعد میں بنارس میں اپنی سرسوتی

پریس لگایا۔ اس میں صرف ہندی کا کام شروع کیا۔ اردو میں بھی اشاعت کا ارادہ تھا۔" [৩৭]

("১৯২১ সালে যখন প্রেমচাঁদ সরকারি চাকুরি হতে ইস্তফা দিলেন, তখন গৌরপুরে একটা উর্দু পত্রিকা বের করতে চেয়ে ছিলেন। কিন্তু সেখানে এক পুরানো পত্রিকা যা মাসে দুই বার ছাপানোর কথা জানিয়ে দিল। প্রেমচাঁদ অবশেষে বেনারসে 'স্বরস্বতী' প্রেস চালু করেন। সেখানে শুধু হিন্দির জন্য কাজ করা হত। তার উর্দুতেও কাজ করার ইচ্ছা ছিল।")

এই প্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বরস্বতীর সেবা করা। প্রেমচাঁদের জীবনের অনেকটা সময় এই প্রেস ছিনিয়ে নেয়। লেখার সময় অনেকটা কমে আসে। সারা দিন প্রেসের জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ক্লান্ত দেহে যখন দিনান্তে বাড়ি ফিরতেন তখন আর যেন শরীর বইতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর সেই ক্লান্তি দূর হয়ে যেত ঘন্টাখানেক নিজ সন্তানদের সঙ্গে খেলাধূলা করার পর। তিনি এবং শিবরাণী দেবীও এটা স্বীকার করেছেন যে নিজের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলাধূলা করার পর তিনি যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্যম ফিরে পেতেন। ঘন্টাখানেকের

---

[৩৬] অমরিত রায়, *প্রেমচান্দ ঃ কলম কা ছিপাহি*, সাহিত্য একাডেমি, নয়া দিল্লী, ১৯৯২, পৃ. ৩২১-৩২২।
[৩৭] প্রেম গোপাল মিত্রা, *প্রেমচাঁদ শাহনাছ : মদন গোপাল*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ১৫৬।

এই মনোরঞ্জন তাঁর শরীরে যেন সঞ্জীবনী সুধার কাজ করতো। তাঁরপর ছেলে মেয়েরা ঘুমালে তিনি রাত জেগে লিখতে বসতেন।

প্রেসে কর্মচারীগণের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল অতি সৌহার্দ্যপূর্ণ। তাদের অভাব অভিযোগ ও সুখ দুঃখের প্রতি তাঁর প্রখর দৃষ্টি থাকতো। কিন্তু এত সহানুভূতিশীল এবং পর দুঃখ কাতর পরিচালক পেয়েও কর্মচারীরা বিশেষ সুখী ছিল না, তাঁর কারণ প্রেস ম্যানেজার। এই প্রেস ম্যানেজারের অন্যায় কার্যকলাপের প্রতিবাদে একবার কর্মচারীরা ধর্মঘট করে বসে। শিবরাণী দেবীর লেখা থেকে জানা যায় যে প্রেমচাঁদ এতে বেশ ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি শিবরাণী দেবীকে বলেন যে কর্মচারীরা যদি পাঁচ মিনিট দেরী করে আসে তবে ম্যানেজার তাদের প্রচন্ড ভাবে ধমকান, মাইনে কাটেন, বরখাস্ত করার কথা বলেন। তাদের কাজে বিন্দুমাত্র ভুলত্রুটি হলেই কৈফিয়ৎ তলব করেন, এসব প্রেমচাঁদের ভালো লাগতো না। কিন্তু আসলে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে তিনি কিছু বলতেন না বলে ম্যানেজার ধরে নিয়েছিলেন যে তাঁর এই কাজে মালিকের সমর্থন আছে। এ সময় তাকে প্রচুর আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। ১৯৩১ সাল থেকে 'জাগরণ' নামে পাক্ষিক পত্রিকার সাপ্তাহিক রূপ দেন তিনি। এই প্রেস থেকেই প্রেমচাঁদ "হংস" নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন।[৩৮] তাঁরই সম্পাদনায় এই মাসিক পত্রিকাটি হিন্দী সাহিত্য জগতে এক আলাড়ন সৃষ্টি করে। এই পত্রিকাটির একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে। এটির নামকরণ করা হয়েছিল - "বাপী বিশেষাঙ্ক।" এই সংখ্যাটি চোখে না দেখলে অনুমান করা কঠিন যে, এটার জন্যে সম্পাদক কি পরিশ্রমটাই না করেছেন। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন এবং তাঁরপর তাঁর বন্ধু জৈনেন্দ্র এই দায়িত্বভার সাফল্যের সঙ্গে বহন করেন। শেষের দিকে শিবরাণী দেবী স্বয়ং "হংস"র সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পত্রিকাটির আরো কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা আজও সাহিত্য জগতে সমাদৃত যার মধ্যে আছে 'প্রেমচাঁদ স্মৃতি অংক', 'একাঙ্কী নাটক অংক', 'রেখাচিত্র অংক', 'প্রগতি অংক' এবং 'কাহানী অংক'।

প্রেমচাঁদ যখন প্রেস চালাচ্ছেন, *'হংস'* পত্রিকা প্রকাশনা ও সম্পাদনা করছেন তখন হঠাৎ ১৯২৪ সালে 'আলবর' রাজ্য থেকে রাজাসাহেবের একটি চিঠি তিনি পান; যাতে তিনি অনুরোধ করেছিলেন যে, প্রেমচাঁদ যদি দয়া করে তাঁর কাছে থাকেন তবে তিনি তাকে গাড়ি, বাড়ি এবং ৪০০ টাকা মাসোহারা দিতে প্রস্তুত আছেন। প্রেমচাঁদ চিঠিটি শিবরাণী দেবীকে পড়ে শোনালেন এবং তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। আসলে তিনি তাঁর পূর্বেই তাঁর অসম্মতি জ্ঞাপন করে একটি পত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শিবরাণী দেবীর উত্তর শুনে তিনি স্বস্তি পাননি। আসলে প্রেমচাঁদ ছিলেন স্বাধীনচেতা। চাকুরি করা তাঁর পোষাত না। অভিমানী এই মানুষটির মনে লোভ বলে বিশেষ কিছু ছিলনা। এই জন্যে পরবর্তীকালে তিনি কোথাও চাকুরীতে টিকে থাকতে পারেননি।

---

[৩৮] নিতাই বসু, *মুন্সি প্রেমচন্দ*, গ্রন্থতীর্থ, ৬৫-৩এ, কলেক স্ট্রিট, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৩৭।

বোম্বাইতে অবস্থান (১৯৩৪-১৯৩৫) -

ঐ সময়টা ছিল প্রেমচাঁদেরই। দেখা যায়, কথা সাহিত্যে তখন প্রেমচাঁদের দেশজোড়ে নাম। ভারতীয় চলিচ্চিত্র জগতের হলিউড বোম্বাইতে তখন গল্পের অভাব। দেশী বিদেশী গল্পের জগাখিচুড়ি করে কাহিনী ভাড়া করা হতো এবং তারই চলচিত্র রূপায়ণের কাজ চলতো। তাই ১৯৩৪ সালে যখন বোম্বাই চলচিত্র জগতে থেকে তাঁর ডাক এল তখন তিনি আনন্দের সঙ্গেই তা গ্রহণ করে নিলেন। বোম্বাইয়ে অজন্তা মুভিটোন ফিল্ম কোম্পানির থেকে তিনি একটা আমন্ত্রণ লিপি পান যাতে তাঁকে বাৎসরিক ১০০০০ টাকা দেওয়ার কথা বলে বোম্বাইতে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। প্রেমচাঁদ ভাবছিলেন প্রেস ও পত্রিকা যদি চালাতে হয় তবে এ সুযোগ আমার হাতছাড়া করা উচিত নয়। টাকার অভাবে দুটিরই দৈন্য দশা চলছে। মাসিক খরচ প্রায় হাজার ছয়েক টাকা। বোম্বাই থেকে যদি এই টাকা দেয়া হয়, তবে আর্থিক অনটনের সুরাহা হবে। কিন্তু বাদ সাধলেন শিবরাণী দেবী। তিনি যখন জানলেন তখন ঘোরতর আপত্তি জানালেন। তিনি বললেন- আপনার এই স্বাস্থ্য, এত কাজের চাপ উপরন্ত বিদেশ ভ্রমন, এ আমন্ত্রণ আপনি প্রত্যাখ্যান করুন। প্রেমচাঁদ বললেন- তুমিই ভেবে দেখ, না গিয়ে তো চলছে না। এখানে যা আয় হয় তা নিজেদের খরচে শেষ হয়ে যায়। এই 'হংস' আর 'জাগরণ' কি করে চলবে ?

শিবরাণী দেবী বললেন- তবুও, এর জন্যে আমি আপনার বোম্বাই যাওয়া উচিৎ মনে করিনা।

প্রেমচাঁদ বললেন- এই হাতীগুলিকে যখন গলায় বেঁধেছো তখন তাদেরকে খানা দেবে না ? এগুলোকেও তো জীবিত রাখতে হবে।

শিবরাণী একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন- আপনি যা করেন তাতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যায়।

প্রেমচাঁদ বললেন- আরে মহাশয়া! এসব কথা তো সহস্রাব্দবার হয়েছে। এখন যখন এগুলোর সঙ্গে গাটছড়া বাঁধা হয়েছে তখন এগুলোকে চালাতেই হবে। আর একটা কথা বলি। ওখানে গেলে যে বিশেষ লাভটা হবে তা হলো এই উপন্যাস এবং গল্প লেখায় যে লাভ হচ্ছে তাঁর চাইতে অনেক বেশী লাভ হতে পারে এগুলোর চলোচ্চিত্রটি দেখিয়ে। যারা গল্প, উপন্যাস পড়বে তাঁরা তার থেকে লাভবান হবেন কিন্তু চলচ্চিত্রের দ্বারা সব অঞ্চলের মানুষই লাভবান হতে পারবেন।

শিবরাণী দেবী ব্যক্তিগত লাভের প্রশ্ন উঠিয়ে বললেন- কিন্তু তাতে আমার কি লাভ ?

প্রেমচাঁদ বললেন- এটা তো তোমার ভুল ধারণা, লোকেদের লাভের জন্যে কি আমি লিখি ? নিজের আত্মার শান্তির জন্যে আমি যা কিছু লিখি তা যত বেশী মানুষ বুঝতে পারবে, দেখতে পারবে, পড়তে পারবে, আমার সন্তুষ্টি ততই বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয় লাভটা হবে এই যে 'হংস' এবং 'জাগরণে'র জন্যে বেশী টাকা দিতে সক্ষম হবো। ওরা ৯০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা ছাড়া এক বছর বোম্বাইতো, তারপর ওরা ঘরে বসে আমাকে দশ হাজার টাকা দিবে।

উপরোক্ত কথোপকথনের বিবরণ শিবরাণী দেবী নিজেই *"প্রেমচাঁদ ঘর মে"* গ্রন্থে লিখেছেন। যাই হোক শেষপর্যন্ত যাওয়াই ঠিক হলো। অর্থের টানাপুরার কথা বুঝাতে গিয়ে প্রেমচাঁদ জৈনেন্দ্রকে একটা চিঠি লিখেন- চিঠির

কয়েকটি অংশ তুলে ধরছি। "১৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৩ সালে সরস্বতী প্রেস থেকে লেখা পত্রে তিনি লিখছেন- তুমি সেবাসদন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছো। বোম্বাইর এ কোম্পানীর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা চলছিল। ওরা আমাকে ৭৫০ টাকা দেওয়ার কথা বলেছিল। আমি ৭৫০ টাকাই যথেষ্ট ভেবে স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু টাকা পাইনি। *কর্মভূমি*'র অনুবাদের জন্যে এক গুজরাটী প্রকাশক ৪০০ টাকা দেবে কথা দিয়েছিল। দেওয়ালীর পর টাকা পাঠাবার কথা ছিল। কিন্তু সেও চুপ করে আছে। দুটো চিঠি দিয়েছি কিন্তু উত্তর পাইনি। আরো কয়েক স্থান থেকে টাকা পাবার আশা ছিল কিন্তু কেহই কোন খবর দিল না।" [৩৯]

১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪ সালে তিনি আরেকটি পত্রে লিখেছেন- "প্রথমবার ঠিক করেছিলাম যে *"হংস"* তাঁকে (লিডার প্রেসের মালিক) দিয়ে দিই, শুধু প্রেসটা চালাই। কিন্তু সমস্ত বিপদের মূলেই তো এই প্রেসটা। কি জানি কোন কুক্ষণে এটার জন্ম। দশ সহস্র টাকা এবং একাদশ বৎসরের পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে গেল। এই প্রেসের জন্যে কত বন্ধুদের বিরাগ ভাজন হলাম, কত লোকের বিশ্বাস হারালাম, কত মহামূল্যবান সময় যা লেখা পড়ায় কাটতো, নিরর্থক প্রুফ দেখে কাটিয়েছি। আমার জীবনের এটা সর্বাধিক বড় ভুল।"

এই পত্রেই তিনি অন্যত্র লিখেছেন- "লাহোরে আমার উর্দু গ্রন্থের জন্যে ১০০০ টাকা পাওনা ছিল। বছরের পর বছর তাগাদা দিয়ে দিয়ে এখন জানতে পারলাম যে ওদের কাছে টাকা পাওয়া যাবে না।"[৪০]

চলচ্চিত্রে পথযাত্রা -

১৯৩৩-১৯৩৪ সালে লেখা এই পত্রগুলির বয়ান স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে এই সময় প্রেমচাঁদ চূড়ান্ত অর্থনৈতিক অনটনের মধ্যে দিন যাপন করছিলেন। তাই তিনি চলচ্চিত্র প্রযোজকদের এই লোভনীয় আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারেন নি। বোম্বাইতে তিনি একটি বাড়ি ভাড়া করেন এবং পহেলা জুলাই, ১৯৩৪ সালে সেখানে কাজে যোগদান করেন। কিন্তু দূর থেকে যা তাঁর পক্ষে অতি সহজ মনে হয়েছিল তা কর্মক্ষেত্রে এসে তাঁর অতি কঠিন মনে হতে লাগলো। এর কারনগুলি তাঁর বন্ধুদেরকে লেখা পত্রগুলিতে বেশ ভালভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। জৈনেন্দ্রকে ৩ আগষ্ট, ১৯৩৪ সালের লেখা চিঠিতে তিনি লিখেছেন- "সিনেমার জন্যে গল্প লেখা বড়ই কঠিন মনে হচ্ছে। এমন গল্পের প্রয়োজন যা মঞ্চস্থও করা যায় আবার অভিনেতাদের জন্যেও সহজ হয়। গল্প যতই ভাল হোক, যদি যোগ্য পাত্র না পাওয়া যায় তবে তা চিত্রে রূপায়িত হবে কি করে ? আমার মনে হয় বৈচিত্রের কোন দরকার নেই। আমার দুটো গল্পই সাধারণ।"

আরো কিছুদিন যেতে না যেতেই প্রেমচাঁদের কাছে ব্যাপারটা অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়। ২৮ নভেম্বরের চিঠিতে তাঁর এই মনোভাবটা আরো ভাল ভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন- "আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম তাঁর একটার ও পূর্তি সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। এই প্রযোজকরা যে ধরণের গল্প তৈরী করে এসেছেন তাঁর থেকে

---

[৩৯] অমরিত রায়, *প্রেমচান্দ ঃ কলম কা ছিপাহি*, সাহিত্য একাডেমি, নয়া দিল্লী, ১৯৯২, পৃ. ৬৪৪।
[৪০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৬।

কিছু মাত্রও এদিক ওদিক হবে না। ভালগারিটিকে এরা এন্টারটেনমেন্ট ভ্যালু বলেন। এদের বিশ্বাস অদ্ভুত। রাজা-রাণী, তাদের মন্ত্রিদের ষড়যন্ত্র, সকল লড়াই, চুম্বনই এদের মুখ্য সাধন। আমি সামাজিক গল্প লিখেছি, যে গুলো শিক্ষিত সমাজও দেখতে চাইবে কিন্তু ঐ গল্পগুলি নিয়ে ফিল্ম তৈরী করতে ওদের আপত্তি, কারণ কি জানি এগুলো চলবে কি না! এই বছরটা তো কাটাতেই হবে। ঋণী হয়ে গিয়েছি এখন থেকে মুক্তি পেলে নিজের পুরাতন আড্ডায় গিয়ে বসবো। সেখানে টাকা নেই কিন্তু আত্মসন্তুষ্টি তো আছে। এখানে তো মনে হচ্ছে যেন জীবনটা নষ্ট করছি।” [৪১]

উপরোক্ত চিঠির বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে তাঁর বোম্বাই প্রবাসকাল সুখের ছিল না। তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন তাঁর মধ্যে একটা আশা এই ছিল যে তিনি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য অধিকতর লোকের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন। তাঁর সেই আশা পূরণ হয়নি। তাঁর লেখা গল্প অবলম্বনে *‘মজদুর’* নামে যে চলচ্চিত্রটি রিলিজ হয় সেটা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন- *‘মজদুর’* এ আমি এত কম এসেছি যে তার নাম নামান্তর। ফিল্মের নির্দেশক-ই সব। লেখক লেখনীয় রাজা হলেও এখানে নির্দেশকেরই রাজত্ব এবং সে রাজ্যে লেখকের হুকুম চলতে পারে না, নির্দেশকের আদেশ মানলেই লেখক সেখানে থাকতে পারে। লেখকের এ কথা বলার সাহস নেই যে “আমি সাধারণের রুচি জানি।” নির্দেশক জোর দিয়ে বলে, ‘আপনি জানেন না, আমি জানি জনতা কি চায় এবং আমরা তো এখানে জনতাকে শোধরাতে আসিনি। আমরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খুলেছি, ধন উপার্জনই আমাদের উদ্দেশ্য। জনতা যা চাইবে আমরা তাই দেব।” এর উত্তর এই, “আচ্ছা বাবা। আপনাকে সেলাম জানাই। আমি বাড়ি চললাম।” আমি তাই করছি। মে মাসের শেষে কাশীতে বসে এই বান্দা উপন্যাস লিখছে।” [৪২]

এই চিঠির বাকী অংশে লিখেছেন- এমন লোকের পাল্লায় পড়েছি যারা না জানে হিন্দী, না জানে উর্দু। ইংরেজিতে অনুবাদ করে এদের গল্পের মর্ম বোঝাতে হয় অথচ কাজ কিছুই হয় না।

“মিল মজদুর” ফিল্ম কেমন করে তৈরী হল? এই মাসের এক প্রবন্ধে ললিত কুমার নামক এক অভিনেতা বলেছেন যে, প্রেমচাঁদ তার *‘মিল মজদুর’* গল্প শেষ করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। গল্প শেষ হতেই তাঁকে তার উর্দু অনুবাদ করতে হলো কেননা ফিল্ম কোম্পানীর নির্দেশক মিঃ ভুটানী এবং তাঁর সঙ্গী মিঃ খলীল আফতাব হিন্দী জানতেন না। পুনরায় সিনেরিয়োর সুবিধার জন্য এবং ভুটানী সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী গল্পে কয়েকটি পরিবর্তন সাধন করতে হলো। কিছু নতুন কথা যোগ করা হলো আর কিছু কথা বাদ দিতে হলো। যে রূপ প্রথমে নির্ধারন করা হয়েছিল তাঁর সম্পূর্ণটা বাদ দেওয়া হলো এবং গল্পটিকে নতুন রূপ দেওয়া হলো। এতে শুধু প্লটেই পরিবর্তন হলো না বরং কয়েক স্থানে বাস্তব অর্থ এবং ভাষার মাধুর্য ও ক্ষুন্ন হলো। তারপর শুটিং আরম্ভ

[৪১] পত্র সংখ্যা ৮২, পৃ. ১৪১-৪২।
[৪২] পত্র সংখ্যা - ৪৩, পৃ. ৮৩।

হলো এবং পুনরায় কয়েক স্থানে পরিবর্তন করা হলো। যাইহোক, দিন-রাত পরিশ্রম করার পর তিন মাসে ফিল্ম তৈরী সম্পন্ন হলো। এই ফিল্ম থেকে কোম্পানীর অনেক আশা ছিল কেননা এতে এমন একটি সাময়িক সমস্যা অঙ্কিত হয়েছিল যার মধ্যে ধনী অর্থাৎ শিল্প মালিক এবং মজদুরদের মধ্যে সংঘর্ষ চিত্রিত হয়েছিল। প্রেমচাঁদের এই উদ্দীপনা মূলক ছবিতে এই সমস্যাটি অতি সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। মালিকের আত্মকেন্দ্রিক যথেষ্ট ব্যবহার, অত্যাচার, দমন-পীড়ন এবং শ্রমিক শ্রেণীর দুর্দশা, তাদের বৌ, ছেলে-মেয়ের দৈন্যদশা আর তাঁর দুষ্পরিনাম ইত্যাদি সমস্ত তথ্যগুলি অতি স্পষ্ট ও দক্ষতার সঙ্গে এতে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল।

এই ফিল্মের ওপর সেন্সর বোর্ডের কুদৃষ্টি পড়ে এবং এর অনেকটা অংশ কেটে কুটে বাদ দেওয়া হয় এবং তাঁরপর রিলীজ অর্ডার পাশ হয়। ছবিটির এমন দুর্দশা করে দেওয়া হয় যে কতিপয় বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখতে গিয়ে প্রেমচাঁদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে এবং শোনা যায় যে তিনি তা পুরোটা না দেখে হল থেকে বেরিয়ে আসেন। বোম্বাই সরকার এই ছবিটিকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর পাঞ্জাব সরকার অনুমতি দিয়ে ছিলেন কিছুদিন তাঁর প্রদর্শনীও চলে কিন্তু তাঁরপর ওরাও এটাকে নিষিদ্ধ করেদেন। তাঁরপর এই ঘটনার প্রায় দেড় বৎসর পর ভুটানী সাহেব এতে আরো কিছু কাঁট-ছাঁট করে *‘গরিব মজদুর’* নাম দিয়ে প্রদর্শনীর অনুমতি পত্র বের করে আনেন। এ সব কারণেও প্রেমচাঁদের আশা ভঙ্গ হয়েছিল।
চলচিত্রের জন্য তিনি আরেকটি গল্প লেখেন *‘নবজীবন’* নামে যার বোম্বাই মার্কা নাম ছিল *‘শেরদিল আওরাত’*। এই গল্পের ছবিও তাঁর ইচ্ছানুসারে তৈরী হয়নি। কোম্পানীর কর্তা ব্যক্তিদের ওপর তিনি এত বিরক্ত হয়েছিলেন যে তিনি মনে মনে ঠিক করে ফেলেন- যথাশীঘ্র সম্ভব তাঁকে মোম্বাই ত্যাগ করতেই হবে। এমন কি বেনারস থাকাকালীন *‘সেবাসদন’* উপন্যাসের যে ফিল্মরাইট মহালক্ষ্মী মুভিটোনকে মাত্র ৭৫০ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেছিলেন তাঁর ও ছবি যখন ইতিমধ্যে প্রদর্শিত হলো তখন প্রেমচাঁদ তো তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

বোম্বাই থাকা কালীন তাঁর অমূল্য সময় কাটতো শুধু শুয়ে বসে। তিনি নিজের কথা বলতে গিয়ে লিখছেন- “সাতটার সময় উঠি। সাড়ে আট্টায় প্রাত: ভ্রমন থেকে ফিরি। জল খাবার খাই। ন’টায় খবরের কাগজ পড়ি। কখনও এক ঘন্টা কখনও কিছু বেশি। কখন কখনও কেউ দেখা করতে এলে তাতেই এগারোটা বেজে যায়। স্নানের পর ষ্টুডিও যাই। কিছু কাজ থাকলে সারি, না হলে উপন্যাস পড়ি। পাঁচটায় বাড়ি ফিরি। হিন্দীর পত্র-পত্রিকাগুলো উল্টে-পাল্টে দেখি। চিঠি পত্র লিখি, খাই, আর ঘুমোই। এই আমার দিনচর্চা। মাসে এক আধটা গল্প লিখি আর হংসর জন্যে দু-এক পৃষ্ঠা নোট-ব্যাস।”

বোম্বাই চলচ্চিত্র জগতের যে দু:সহ অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রেমচাঁদ ফিরে এলেন তাঁরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কয়েকটা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। *“ফিল্ম আউর সাহিত্য”* নামক প্রবন্ধে বলেছেন- “চলচিত্র আমাদের কুৎসিত ভাবনা গুলিকে স্পর্শ করে আমাদেরকে নেশাগ্রস্থ করে দেয় এবং এর কোনো ঔষধ প্রযোজকদের কাছে নেই। যতক্ষণ একটি জিনিসের চাহিদা আছে ততক্ষণ তা বাজারে আসবেই তাকে কেউ রোধ করতে পারে না। সে সময় বহু

দূরে যখন চলচিত্র এবং সাহিত্য একই সূত্রে বাধা থাকবে। মানুষের রুচি যখন এমন পরিকৃত হয়ে যাবে যে সে নিম্নগামী সব জিনিসকে ঘৃণা করবে তখনই সিনেমা সাহিত্যে সুরুচিবোধটা দেখা যাবে।” বোম্বাই থেকে বেনারসে ফিরেই তিনি ১৪ মে, ১৯৩৫ সালে জৈনেন্দ্রের একটি পত্রের উত্তর দিতে গিয়ে লিখছেন,

> بمبئی سے کیالایا؟ کل6300 ٹکا ملے۔اس میں1500 ٹکالڑکوں نے لیے،400 ٹکا لڑکی نے،500 ٹکاپریس نے۔
> دس مہینے میں بمبئی کا حرچ بڑی کھایت سے بھی2500 ٹکاسے کم نہ ہوسکا۔وہاں سے کل1400 ٹکالے کراپناسامنہ
> لیے چلاآیا۔ [৪৩]

(“বোম্বাইতে কি লাভ হল ? সর্বসাকুল্য ৬৩০০ টাকা পেলাম। তাঁর থেকে ছেলেরা ১৫০০ টাকা নিয়েছে, ৪০০ টাকা মেয়ে নিয়েছে, ৫০০ টাকা প্রেসে নিয়েছে। দশ মাসে বোম্বাই এ খরচ হয়েছে প্রায় ২৫০০ টাকা। সেখান থেকে শুধু ১৪০০ টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরেছি। এই টাকা প্রেসের জন্যে খরচ হবে।”)

প্রথম গল্প লিখন -

প্রেমচাঁদ নিজেই বলেন,

> پہلے پہل1907 میں ئیں نے کہانیاں لکھناشروع کی اور1901 ہی میں سے ناول لکناشر عوکیا۔میراایک ناول
> 1902 میں شائع ہوااوردوسرا1904 میں لیکن کہانیاں سب سے پہلے1907 ہی میں لکھیں۔میری پہلی کہانی
> کام نام تھا"دنیاکاسب سے انمول رتن" وہ1907 میں رسالہ'زمانہ' میان چھپی اس کے بعد میں نے زمانہ میں
> چارپانچ کہانیاں اور لکھیں۔1909 میں پانچ کہانیوں کامموعہ7 "سوزوطن" کے نام سے زمانہ پریس کانپور سے شائع
> ہوا۔ [৪৪]

(“আমি ১৯০৭ সালে প্রথম গল্প লেখা শুরু করি এবং ১৯০১ সাল থেকে প্রথম উপন্যাস লিখি। আমার প্রথম উপন্যাস ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয়টি ১৯০৪ সালে কিন্তু গল্প ১৯০৭ সালেই লিখি। আমার প্রথম গল্পটির নাম হল *‘দুনিয়া কা ছবছে আনমুল রতন’*, যা ১৯০৪ সালে ‘জামানা’ পত্রিকায় ছাপা হয়। এরপর আমি ‘জামানা’ পত্রিকায় আরো চার পাঁচটি গল্প লিখি। ১৯০৯ সালে আমি পাঁচটি ছোটগল্প *‘ছুজে ওয়াতন’* এর নামে জামানা প্রেস থেকে প্রকাশ করি।”)

‘জামানা’র সম্পাদকের লেখা থেকে বোঝা যায় যে, ১৯০৪ সালেই ধনপত রায় ‘জামানা’র স্থায়ী লেখক হয়ে গিয়েছিলেন।

---

[৪৩] অমরিত রায়, *প্রেমচান্দ ঃ কলম কা ছিপাহি*, সাহিত্য একাডেমি, নয়া দিল্লী, ১৯৯২, পৃ. ৭৩৭।

[৪৪] প্রেমচাঁদ, *জামানাহ*, ইনজির জামানা বুক এজেন্সি, কানপুর, পৃ. ০৮।

১৯০১ এবং ১৯০২ সালে যে দুটি উপন্যাসের কথা প্রেমচাঁদ নিজে লিখেছেন সে দুটির নাম সম্ভবত: ছিল *'কৃষ্ণা'* এবং *'হাম খুরমা আউর হাম সবাব'*। মুনশী জাগেশ্ব প্রসাদ বর্ম্ম বেতাবে লিখেছেন যে, প্রেমচাঁদের প্রথম উপন্যাস ছিল *'প্রেঁমা'* যা হিন্দীতে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর মতে এটার উর্দু নাম ছিল *'প্রতাপচন্দ্র'*। পুস্তকটির লেখকের স্থানে নাম ছিল ধনপত রায়। বর্ম্মাজী যাই বলুন তাঁর কথার সমর্থন কিন্তু কোথাও পাওয়া যায় না।

১৮৯৩ সালে মামুকে নিয়ে লেখা নাটকটি অপ্রকাশিতই রয়ে গেলো। কিন্তু ১৮৯৪ সালে ১৪ বৎসর বয়সে তিনি আরেকটি নাটক লেখেন, *'হোনহার বীরবানকে চিকনে চিকনে পাত'* নাম দিয়ে। এরপর ১৮৯৮ সালে থেকে তিনি উর্দুতে উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন। সে বছরই *'ইসরারে মোহব্বত'* নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে *"আওয়াজে খলক"* পত্রিকায়। একই সময়ে তিনি দ্বিতীয় উর্দু উপন্যাস লেখেন *'রুঠী রানী'* নামে। এটা ছিল ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা উপন্যাস। এর বছর দুই পরেই ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয় *'প্রেঁমা'*। পুনরায় বছর দুই পরে ১৯০৪-১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয় *"হাম খুরমা আউর হাম সবাব'* নামক উপন্যাস। নারী জীবনে বৈধব্যের যে কি জ্বালা তাঁরই স্বরূপ উদঘাটন করেছেন এই পুস্তক দু'টিতে। এ সব রচনা তাঁর প্রারম্ভিক রচনা হিসেবে স্বীকৃত।

উর্দু পত্রিকা 'জমানা'র সম্পাদকের সঙ্গে যে পত্রালাপ হয় তা প্রকাশিত হয়েছে যাতে বোঝা যায় যে ক্রমশ তিনি এ কথাটা উপলব্ধি করতে পারছিলেন যে, গল্প ও উপন্যাসের ভাষাকে করতে হবে সহজ সরল প্রাঞ্জল অথচ প্রাণবন্ত। প্রসাদগুণ থাকা একান্ত ভাবেই বাঞ্চনীয়। প্রেমচাঁদ যত বেশী পাঠকের সংস্পর্শে এসেছেন সাধারণ মানুষের নৈকট্য লাভ করেছেন তাঁর লেখন শৈলী ততই পরিস্কৃত ও প্রবাহময় হয়ে উঠেছে।

প্রেমচাঁদের প্রকৃত সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ হয় ১৯০৫ সালে যখন তিনি এলাহাবাদ থেকে বদলি হয়ে এলেন কানপুরে। প্রেমচাঁদের প্রাথমিক লেখাগুলির অধিকাংশ মুদ্রিত হয় এই কানপুর থেকে প্রকাশিত উর্দু পত্রিকা *'জমানায়'*। এই পত্রিকার সম্পাদক মুনশী দয়ানারায়ন নিগমরে সঙ্গে তাঁর পূর্বেই পরিচয় হয়ে গিয়েছিল পত্রালাপের মাধ্যমে। তাই যখন তিনি কানপুরে বদলি হয়ে এলেন তখন উভয় পক্ষেরই সুবিধে হয়! যদিও নিগম সাহেব অপেক্ষা প্রেমচাঁদ দু'তিন বছরের বড়ই ছিলেন কিন্তু প্রেমচাঁদ তাকে অগ্রজ রূপেই মান্য করতেন এবং তাঁর সব কাজে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। নিগম সাহেবের পরামর্শ তাঁর পক্ষে আদেশের সমতুল্য ছিল। প্রেমচাঁদের মৃত্যুর পর নিগম সাহবে 'জমানা' পত্রিকার একটি স্বারক অঙ্ক প্রকাশিত করেন, তাতে তিনি নিজেই লিখেছেন- "আশ্চর্যের বিষয় এই যে বয়সে আমার চেয়ে বড় হয়েও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে বড় ভাই বলে মনে করতেন। যখন আমরা ঠাট্টা-তামাসা করে দিন কাটাতাম তখনও তিনি আমার কথার মূল্য দিতেন এবং আমাকে বিশেষ সন্মান করতেন। আমার পরিচিতরা তাঁর পরিচিত এবং আমার বন্ধুরা তাঁর বন্ধু ছিল।"

নবাব রায় থেকে প্রেমচাঁদ -

১৯০৮ সালের শেষের দিকেই প্রেমচাঁদ জেলা বোর্ডের সাব ইন্সপ্রেক্টর পদে উন্নীত হয়ে কানপুরে ছেড়ে মহোবায় বসবাস করতে থাকেন। মহোবায় তিনি এক নাগাড়ে প্রায় দু'বছর থাকেন। মহোবায় অবস্থান কালেই তা সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস *'রুঠী রাণী'* প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে তিনি রাজপুতদের অদম্য সাহস ও বীরত্বের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। এই সময় তাঁর কয়েকটি ঐতিহাসিক কাহিনীও প্রকাশিত হয় যার মধ্যে *'রাণী সারন্ধ'*, *'বিক্রমাদিত্য কা তেগা'*, *'রাজা হরদৌল'* ইত্যাদি ছিল। এই গল্প উপন্যাসের দ্বারা তিনি ভারতীয়দের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা করতে চেয়েছিলেন। মূমূর্ষু জাতির মধ্যে অতীতের গৌরবময় উজ্জ্বল দীপশিখা প্রজ্জলিত করতে চেয়েছিলেন। পূর্ব পুরুষের বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে ঘুমন্ত নিষ্ক্রিয় ভারতবাসীকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। আসলে ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ভারতে যে জাতীয় জাগরণ আসে তাঁরই সংস্পর্শ লাগে প্রেমচাঁদের সাহিত্যে। প্রেমচাঁদ নিজে বলেছেন যে, ১৯০৭ সালে লেখা *"দুনিয়া কা সবসে অনমূল রতন"* তাঁর প্রথম গল্প। এ গল্পে পৃথিবীর সর্বাধিক অমূল্য রত্ন কি তাঁরই উত্তর দিতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে দেশের জন্য যারা প্রাণ বিসর্জন দেয় তাদের রক্তই হল সেই অমূল্য সম্পদ। দেশে গণজাগরণের যে তিন অধ্যায় বঙ্গ ভঙ্গকে কেন্দ্র করে আরম্ভ হয়েছিল। দেশের গণজাগরণের যে নতুন অধ্যায় বঙ্গ ভঙ্গকে কেন্দ্র করে আরম্ভ হয়েছিল তাঁরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এ সময় আরও কয়েকটি সুন্দর গল্প লেখেন। পাঁচটি গল্প নিয়ে *'সোজে ওয়াতন'* নামক তাঁর প্রথম গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়। এই গল্প সংকলনটি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। প্রেমচাঁদ আত্মজীবনী মূলক প্রবন্ধে এই ঘটনাটির যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন আমি তা তুলে ধরছি,

"সে সময় আমি শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ইন্সপ্রেক্টর রূপে হমীরপুরে নিযুক্ত ছিলাম। বইটি প্রায় ছ'মাস পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। একদিন রাত্রে আমি আমার শিবিরে বসেছিলাম। এমন সময় জেলাধীশের পরোয়ানা এলো এক্ষুনি আমার সঙ্গে দেখা কর। শীতের দিন, সাহেব ট্যুরে বেরিয়েছেন। আমি গরুর গাড়ি ঠিক করে রাতে ৩০-৪০ মাইল অতিক্রম করে সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর সামনে *'সোজে ওয়াতন'* এর একটি কপি রক্ষিত ছিল। আমার মাথা যেন একটা ধাক্কা খেলো। সে সময় আমি 'নবাব রায়' নামে লিখতাম। আমি এ ব্যাপারে কিছু শুনেছিলাম যে, সী.আই.ডি. পুলিশ এ বইয়ের লেখককে খোঁজ করছে। বুঝে গেলাম, ওরা আমাকে খুঁজে পেয়েছে এবং তাঁরই কৈফিয়ত তলব করার জন্যে আমাকে ডেকে পাঠনো হয়েছে। সাহেব জিজ্ঞেস করলেন– এ বইখানা তুমি লিখেছ ? আমি তখন জ্বি হ্যা বললাম। প্রেমচাঁদের ভাষায়,

"صاحب نے ایک ایک کہانی کا مطلب پوچھا اور آخر میں بگڑ کر کہا تمھاری کہانیوں میں سیڈیشن بھرا ہوا ہے۔ اپنی خوش قسمتی سمجھو

کہ انگریزی راج میں ہوا، اگر مغلوں کا راج ہوتا تو تمھارے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ تم نے انگریزی راج کی ہتک کی ہے۔" فیصلہ

یہ ہوا کہ "سوز وطن کی ساری جلدیں سرکار کے حوالے کر دوں اور صاحب کی اجازت کے بغیر کچھ نہ لکھوں۔ میں نے

سوچا چلو سستے چھوٹے۔ ایک ہزار کاپیاں چھپی تھیں، ابھی مشکل سے تین سو بکی تھیں۔ باقی سات سو کاپیاں میں نے زمانہ پریس سے

منگوا کر صاحب کی خدمت میں پیش کر دیں۔ میں نے سوچا تھا بلا ٹل گئی۔ مگر افسروں کی اتنی آسانی سے تسلی نہ ہو سکی۔ [৪৫]

(“সাহেব আমার প্রতিটি গল্পের উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলেন, অবশেষে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন- তোমার গল্পে রাজদ্রোহ ভরা আছে। তোমার ভাগ্য ভাল যে ইংরেজদের রাজত্বে বাস করছো। মোঘলদের শাসন হতো তো তোমার দুটি হাতই কেটে ফেলা হতো। তোমার গল্পগুলি একপেশে। তুমি ইংরেজ সরকারের বদনাম করেছ ইত্যাদি। ঠিক হলো যে আমি যেন *‘সোজে ওয়াতনের’* সমস্ত কপি সরকারের হাতে তুলে দেই এবং সাহেবের অনুমতি ব্যতীত যেন কখনও কিছু না লিখি। আমি মনে মনে ভাবলাম, যাক কমের ওপর দিয়েই গেল। সহস্র কপি ছাপা হয়েছিল। মাত্র শ তিনেক কপি বিক্রি হয়েছিল, অবশিষ্ট ৬০০ কপি আমি ‘জমানা’র কার্যালয় থেকে আনিয়ে সহেবের হেফাজতে অর্পণ করলাম। আমি ভেবেছিলাম বিপদ কাটল, কিন্তু কর্তা ব্যক্তিদের এতে তৃপ্তি হল না।”)

পরে আমি জানতে পারলাম যে, সাহেব এই বিষয়টা নিয়ে জেলার অন্য কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। পুলিশ সুপারিয়েন্টেড, দু’জন ডেপুটি কালেক্টর এবং ডেপুটি ইন্সপেক্টর যাদের অধীনে আমি কাজ করতাম তারা আমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে বসলেন। একজন ডেপুটি কালেক্টর গল্পের থেকে উদ্ধৃত করে প্রমাণ করলেন যে, ওর আদি থেকে অন্তিম পর্যন্ত গল্পে রাজদ্রোহ ছাড়া কিছুই নয়। রাজদ্রোহও সমান্য পর্যায়ের নয়। সংক্রামক পর্যায়ের। পুলিশ দেবতা বললেন– এমন ভয়ঙ্কর লোককে নিশ্চয়ই কঠিন সাজা দেওয়া উচিত। ডেপুটি ইন্সপেক্টর সাহেব আমাকে স্নেহ করতেন। তিনি এই প্রস্তাব দিলেন যে, তিনি বন্ধু ভেবে আমাকে রাজনৈতিক চিন্তাধারার গভীরতা জানবার চেষ্টা করে সমিতির নিকট একটি রিপোর্ট দেবেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে আমাকে বুঝিয়ে দেবেন এবং রিপোর্টে লিখে দেবেন যে লেখকের কেবল লেখায় উগ্র, রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। সমিতি তাঁর প্রস্তাব স্বীকার করে নেয় যদিও পুলিশ দেবতা তখনও পায়তারা করতে থাকলেন।

পুস্তকটিতে মুদ্রকের নাম না থাকায় মুন্সী দয়া নারায়ণ নিগমেরও পাঁচ টাকা জরিমানা দিতে হয়। তিনি এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত থাকার দরুন পরবর্তীকালে এ ঘটনা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, *‘সোজে ওয়াতন’* এর যত কপি ছিল তা তিনি অফিসারকে দিয়ে দেন, কিন্তু তাঁর নিকট যে স্টক অবশিষ্ট ছিল তাঁর খবর কেহই নিল না, তাই পুস্তকগুলি রক্ষা পেয়ে গেল এবং আস্তে আস্তে তা বিক্রি হতে লাগল। অফিসাররা প্রেমচাঁদের লেখার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল তাকে তিনি উচিত বলে স্বীকার করবেন না। খোলাখুলি ভাবে বিরোধিতা করতে সক্ষম না হলেও ‘প্রেমচাঁদ’ নাম নিয়ে তিনি পূর্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহের সঙ্গে লিখতে লাগলেন।

প্রেমচাঁদ অবশ্য নাম পরিবর্তনের জন্যে দু:খিত ছিলেন। নিজের এই ক্ষোভের কথা তিনি ‘জমানা’র সম্পাদক নিগম সাহেবের নিকট লেখা একটি পত্রে জানিয়ে ছিলেন। তিনি লিখেছেন– প্রেমচাঁদ নামটা ভালই, আমার ও

---

[৪৫] প্রেম গোপাল মিত্রা, *প্রেমচাঁদ শাহনাছ : মদন গোপাল*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ১৫৩।

পছন্দ হয়েছে। আফসোস এইটুকুই যে নবাব রায় নামটাকে প্রসিদ্ধ করবার জন্যে যে পাঁচ ছয়টি বৎসর পরিশ্রম করলাম তা ব্যর্থ হলো।

সাহিত্য চর্চা -

মূলতঃ কানপুর গভর্নমেন্ট স্কুলে থাকা কালীন প্রেমচাঁদের সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত ঘটে। উর্দু পত্রিকা 'জামানা'র সম্পাদক দয়া নারায়ণ নিগমের সঙ্গে এখানে তাঁর পরিচয় হয় এবং এই পরিচয় ক্রমশ পরিণত হল অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতায়। প্রেমচাঁদের পক্ষে এই যোগাযোগ যথেষ্ট শুভদায়ক হয়েছিল। এরপর থেকেই 'জামানা' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রেমচাঁদের গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে।

১৯০৩ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত উর্দু *'আওয়াজ-এ-খালক'* নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রেমচাঁদের বিখ্যাত উপন্যাস *'আসরারে মাআবিদ'* বা *'মন্দির রহস্য'* প্রকাশিত হলে প্রেমচাঁদ জগৎ বিখ্যাত হয়ে উঠেন। অবশ্য প্রেমচাঁদ প্রথম দিকে উর্দু ভাষার সাহিত্য চর্চা শুরু করলেও পরবর্তীতে তিনি হিন্দীতে বেশ কিছু কাজ করেছেন। তাঁর হিন্দী উপন্যাসগুলোর মধ্যে *'কৃষ্ণা'* অন্যতম। ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশকে প্রেমচাঁদের লেখায় *স্বদেশ প্রেম* উজ্জ্বল ভাবে ফুটে উঠে। ১৯০৭ সালে তাঁর লেখা *'দুনিয়াকা সবসে আনমূল রতন'* (পৃথিবীর সবচেয়ে অমূল্য রত্ন) প্রকাশিত হয়। এটি স্বদেশ ভক্তির একটি উঁচু স্তরের কাহিনী।

> پریم چنداپنی کتابت کی کہانیوں کاعام طور پر 1914 کے بعد ہندی میں ترجمہ کرتے ہیں۔پریم چند نے خود کہا، "میری پہلی تحریریں 1901 اور پہلی کتاب 1903 میں شائع ہوئی تھیں۔اس تحریر کے نتیجے میں تسکین کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔پہلے میں عصری واقعات کے بارے میں لکھتا تھااور پھر موجودہ اور ماضی کے ہیروز کے منحنی خطوط قاری کے محل کے سامنے پیش کرتا تھا۔میں نے پہلے اردو میں کہانیاں لکھنا شروع کی تھیں۔پھر میں نے ہندی میں لکھنا شروع کیااور اسے 'سوراسوتی' کو بھیج دیا۔اس وقت میرا ہندی ناول 'سباسدان' شائع ہوا تھا۔ [৪৬]

("প্রেমচাঁদ তাঁর স্বরচিত গল্পগুলোকে ১৯১৪ সালের পরে সাধারণত নিজেই হিন্দীতে অনুবাদ করেন। প্রেমচাঁদ নিজেই বলেন, "আমার প্রথম লেখা ১৯০১ ও প্রথম বই ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই লেখার ফলে আমার অহংবোধের তৃপ্তি ছাড়া অন্য কোন রকমের লাভ হয়নি। প্রথম প্রথম আমি সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে লিখতাম তাঁরপর বর্তমান ও অতীতের বীরদের রেখাচিত্র পাঠক মহলের সামনে উপস্থাপন করি। আমি প্রথমে উর্দুতে গল্প লিখতে শুরু করি। তারপর হিন্দীতে লিখতে আরম্ভ করি এবং *'স্বরস্বতী'* নামক পত্রিকায় পাঠাতে থাকি। এই সময়ে আমার হিন্দি উপন্যাস *'সেবাসদন'* প্রকাশিত হয়"।)

বিশ শতকের পূর্বে হিন্দী সাহিত্যে ছোট গল্পের উপস্থিতি ছিল বিরল। প্রেমচাঁদের আগে হিন্দী সাহিত্যে ছোটগল্প হিসেবে যা প্রচলিত ছিল তাঁর পটভূমি ছিল অবিশ্বাস্য ও রোমাঞ্চকর। বলা যায় প্রেমচাঁদের হাত ধরেই হিন্দী

---

[৪৬] মানিক টাল, *প্রেমচান্দ : হায়াতে নূর*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৩, পৃ. ১৫৮-১৫৯।

সাহিত্যে ছোটগল্পের বিকাশ ঘটে। প্রেমচাঁদের ছোটগল্প *'দুনিয়া কা সব সে আনমূল রতন'* যখন প্রকাশিত হয়, তখন তাঁর বয়স ছিল সাতাশ। এর দু'বছর পর *'সোজে ওয়াতন'* নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে সরকার কর্তৃক তা বাজেয়াপ্ত হয়। তাই অনেকে মনে করেন, প্রেমচাঁদ প্রায় অর্ধেক আয়ুষ্কাল অতিক্রম করে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। আর জীবনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ অতিক্রম করার পর ১৯১০ সালে *'সোজে ওয়াতন'* বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর 'জামানা' পত্রিকায় ছদ্মনাম ব্যবহার করে উর্দু গল্প লিখতে শুরু করেন। *'বড়ে ঘর কি বেটি'* প্রেমচাঁদের এই সময়ের অনবদ্য রচনা। এরও প্রায় পাঁচ বছর পর প্রেমচাঁদ *'সৌত'* নামে হিন্দী ছোটগল্প লিখেন।[৪৭]

প্রেমচাঁদের ছোটগল্পের সংখ্যা ২৮৮টি, যদিও তাঁর পুত্র অমৃত রায়ের হিসেব মতে তা প্রায় ৩০০।[৪৮] তবে হিন্দী ছোটগল্পগুলোর অধিকাংশই উর্দু ছোটগল্পের অনুবাদ বা ভাবানুবাদ। তাই এইগুলোকে একটি গল্প হিসেবে গণনা করলে তাঁর ছোটগল্পের সংখ্যা ২৮৮টি দাড়াঁয়।

প্রেমচাঁদের ছোটগল্প সমগ্রগুলো নিম্নরূপ -

১. *সোজ-এ-ওয়াতন* (*سوز وطن*) -পাঁচটি ছোটগল্প নিয়ে কানপুর 'নওয়াব রায়: জামানা প্রেস' থেকে জুন, ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয়।

২. *প্রেম পচিসি* (*پریم پچیسی*) - প্রথম অধ্যায়ে বারটি ছোটগল্প পাঞ্জাবের 'দারুল আসায়াত প্রেস' থেকে ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয় এবং *প্রেম পচিসি* (*پریم پچیسی*) -দ্বিতীয় অধ্যায়ে তেরটি ছোটগল্প পাঞ্জাবের 'দারুল আসায়াত প্রেস' থেকে ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. *প্রেম বাত্তিসি* (*پریم بتیسی*) - প্রথম অধ্যায়ে পনেরটি ছোটগল্প কানপুর 'জামানা প্রেস' থেকে আগস্ট, ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয় এবং *প্রেম বাত্তিসি* (*پریم بتیسی*) -দ্বিতীয় অধ্যায়ে ষোলটি ছোটগল্প কানপুর 'জামানা প্রেস' থেকে আগস্ট, ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়।

৪. *খাকে পারওয়ানা* (*خاک پروانہ*) - ষোলটি ছোটগল্প নিয়ে লখনৌ 'নিগার প্রেস' থেকে ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়।

৫. *খাব ও খেয়াল* (*خواب وخیال*) - চৌদ্দটি ছোটগল্প নিয়ে দিল্লী 'লাজপুত রায় ইন্ডাস্টিজ লাহোর প্রেস' থেকে ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়।

[৪৭] নিতাই বসু, *মুনশি পেমচঁন্দ*, গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা, পৃ. ১৩-২২।

[৪৮] ড. নাঈম আনিস, *প্রেমচাঁন্দ : হায়াত আউর খেদমত*, মুসলিম ইনস্টিউট পাবলিকেশন, কলকাতা, ডিসেম্বর- ২০১০, পৃ. ১৮৮।

৬. *ফেরদোস-এ-খেয়াল* (فردوس خیال) -বারোটি ছোটগল্প নিয়ে এলাহাবাদ 'ইন্ডিয়ান প্রেস' থেকে ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয়।

৭. *প্রেম চালিসি* (پریم چالیسی) - প্রথম অধ্যায়ে বিশটি এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশটি, মোট ৮০টি গল্প নিয়ে লাহোর 'গিলানী ইলেক্ট্রিক প্রেস' থেকে ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়।

৮. *আখেরী তোহফা* (آخری تحفہ) - তেরটি ছোটগল্প নিয়ে লাহোর 'নারায়ন দত্ত ছেহগুল ইন্ডাস্টিজ প্রেস' থেকে ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়।

৯. *যাদেরাহ* (زادراہ) - পনেরটি ছোটগল্প নিয়ে দিল্লী 'হালী পাবলিশার্স হাউজ কিতাব ঘর প্রেস' থেকে ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়।

১০. *দুধ কি কিমত* (دودھ کی قیمت) - নয়টি ছোটগল্প নিয়ে দিল্লী 'ইসমত বেক ডিপু প্রেস' থেকে ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়।

১১. *ওয়ারিদাত* (واردات) - তেরটি গল্প নিয়ে দিল্লী 'মাকতুবাহ জামায়াত প্রেস' থেকে ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়। [৪৯]

প্রেমচাঁদের প্রসিদ্ধ উপন্যাসগুলো নিম্নরূপ -

১. *আসরারে মাআবিদ* (اسرار معابد) - এটা প্রেমচাঁদের প্রথম উপন্যাস যা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আওয়াজে খালক'এ অক্টোবর ১৯০৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯০৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। উর্দুতে প্রথমে ১৯০৫ সালে ও হিন্দিতে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়।

২. *হাম খারমাও হাম ছাওয়াব* (ہم خرما و ہم ثواب) - উপন্যাসটি লখনৌ 'ছাওয়াল এজেন্ট সিদ্দিক বেক ডিপু প্রেস' থেকে উর্দুতে ১৯০৭ সালে ও হিন্দিতে ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. *কিশনা* (کشنا) - উপন্যাসটি উর্দুতে ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয়।

৪. *রুঠি রানী* (روٹھی رانی) - উপন্যাসটি কানপুর 'জামানা প্রেস' থেকে উর্দুতে ১৯০৭ সালে ও হিন্দিতে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়।

[৪৯] ড. মির্জা হামিদ বেগ, উর্দু *আফসানুকি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একাডেমিক আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ২০১-২০৩।

৫. *জালওয়াএ ইসার* (جلوہ ایثار) - উপন্যাসটি এলাহবাদ ‘ইন্ডিয়ান প্রেস’ থেকে উর্দুতে ১৯১২ সালে ও হিন্দিতে ১৯২১ সালে প্রকাশিত হয়।

৬. *বাজার-ই-হুস্ন* (بازار حسن) - উপন্যাসটির প্রথম খণ্ডটি লাহোর ‘দারুল আসাআত পাঞ্জাব প্রেস’ থেকে উর্দুতে ১৯১৬ সালে ও হিন্দিতে ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং *বাজার-ই-হুস্ন* (بازار حسن) - দ্বিতীয় খণ্ডটি লাহোর ‘দারুল আসাআত পাঞ্জাব প্রেস’ থেকে উর্দুতে ১৯২১ সালে ও হিন্দিতে ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয়।

৭. *গোশা-এ-আফিয়াত* (گوشۂ عافیت) - উপন্যাসটি লাহোর ‘দারুল ইসমত পাঞ্জাব প্রেস’ থেকে উর্দুতে ১৯২৮ সালে ও হিন্দিতে ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়।

৮. *চোগান-এ-হাছতি* (چوگان ہستی) - উপন্যাসটি লাহোর ‘দারুল ইশাআত পাঞ্জাব প্রেস’ থেকে উর্দুতে ১৯২৭ সালে ও হিন্দিতে ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়।

৯. *পারদাএ মজায* (پردہ مجاز) - উপন্যাসটি লাহোর ‘লাজপুত রায় ইন্ডাস্ট্রিজ লাহোর প্রেস’ থেকে উর্দুতে ১৯৩১ সালে ও হিন্দিতে ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়।

১০. *নিরমলা* (نرملا) - উপন্যাসটি লাহোর ‘গিলানী ইলেক্ট্রিক প্রেস বুক ডিপু’ থেকে উর্দুতে ১৯২৯ সালে ও হিন্দিতে ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়।

১১. *বেওয়াহ* (بیوہ) - উপন্যাসটি বেনারস ‘সরস্বতী প্রেস’ থেকে উর্দুতে ১৯৩২ সালে ও হিন্দিতে ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয়।

১২. *গবন* (غبن) - উপন্যাসটি লাহোর ‘লাজপুত রায় ইন্ডাস্ট্রিজ লাহোর প্রেস’ থেকে উর্দুতে ১৯৩২ সালে ও হিন্দিতে ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়।

১৩. *ময়দান-এ-আমল* (میدان عمل) -উপন্যাসটি বেনারস ‘সরস্বতী প্রেস’ থেকে উর্দুতে ১৯৩৪ সালে ও হিন্দিতে ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়।

১৪. *গোদান* (گئودان) -উপন্যাসটি বেনারস ‘সরস্বতী প্রেস’ থেকে উর্দুতে ১৯৩৭ সালে ও হিন্দিতে ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়।

১৫. *মঙ্গল সুত্র* (منگل سوتر) -উপন্যাসটি বেনারস 'হিন্দুস্তানী পাবলিশার্স হাউজ প্রেস' থেকে উর্দুতে প্রকাশ হয়নি কিন্তু হিন্দিতে ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়। [৫০]

এছাড়া প্রেমচাঁদ যে সকল ইংরেজী লেখকদের গল্প উর্দু ও হিন্দিতে অনুবাদ করেছেন, নিচে সেগুলোর দেওয়া হল -

১. ইংরেজী লেখক 'মাটার লাংক' এর *"Sightless"* গল্পটি '*শাবতার*' (شب تار) নামে উর্দুতে অনুবাদ করেন যা 'জামানাহ' পত্রিকায় ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয়।
২. 'গুলজার দি'র *"Silver Box"* গল্পটি হিন্দিতে '*চান্দি কি ডিবিয়া*' (چاندی کی ڈبیا) নামে অনুবাদ করেন যা 'হিন্দুস্তানী একাডেমি, এলাহবাদ' থেকে ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়।
৩. 'গুলজার দি'র *"Justice"* গল্পটি হিন্দিতে '*ন্যায়*' (نیاے) নামে অনুবাদ করেন যা 'হিন্দুস্তানী একাডেমি, এলাহবাদ' থেকে ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়। পরে উক্ত গল্পটি উর্দুতে '*ইনসাফ*' (انصاف) নামে 'হিন্দুস্তানী একাডেমি, এলাহবাদ থেকে ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়।
৪. 'গুলজার দি'র *"Strife Strike"* গল্পটি হিন্দিতে '*হরতাল*' (ہڑتال) নামে অনুবাদ করেন যা 'হিন্দুস্তানী একাডেমি, এলাহবাদ থেকে ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়।

নাট্যকার -

প্রেমচাঁদের প্রতিভা ছোটগল্প ও উপন্যাসের মধ্যেই সীমিত ছিল না। তিনি একজন নাট্যকারও ছিলেন। তার লিখিত নটকগুলোর তালিকা নিম্নরুপঃ

১. *কারবালা* (کربلا) -যা হিন্দিতে 'মাধুরি' পত্রিকায় ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়।
২. *রুহানী শাড়ি* (روحانی شادی) - এই নাটকটি উর্দুতে 'ইসমত বেগ ডিপু' দিল্লী থেকে ডিসেম্বর, ১৯৩৩ সালে এবং হিন্দিতে 'স্বরস্বতী প্রেস' থেকে 'প্রেম কি বিদায়ী' শিরোনামে প্রকাশিত হয়।
৩. *সংগ্রাম* (سنگرام) - কলকাতার 'হিন্দু প্রেস এজেন্সি' থেকে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়।

---

[৫০] *মাগরিবে বাঙ্গাল : প্রেমচান্দ নম্বর*, ইনফরমেশন এন্ড কালচারাল এফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট অফ গভমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ভলিয়মঃ ৫১, ইস্যু নম্বরঃ ১৫-১৭, কলকাতা, ১ আগস্ট - ১ সেপ্টেম্বর ২০০৪, পৃ. ১০০।

৪. *চান্দি কি ডিবিয়া* (چاندی کی ڈبیا) - হিন্দিতে 'হিন্দুস্তানী একাডেমী' থেকে ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়।[৫১]

শিশুতোষ রচনা -

এছাড়াও প্রেমচাঁদের কয়েকটি শিশুতোষ গল্প রয়েছে, যেমন-

১. *মন মোদক* (من مودک) - হিন্দিতে প্রকাশিত হয়।

২. *কুত্তেকি কাহানী* (کتّے کی کہانی) - উর্দুতে প্রকাশিত হয়।

৩. *জংগল কি কাহানী* (جنگل کی کہانیاں) - উর্দুতে প্রকাশিত হয়।[৫২]

অনুবাদ -

প্রেমচাঁদ একজন দক্ষ অনুবাদক ছিলেন। উর্দুতে তিনি কয়েকটি বই অনুবাদ করেন। যেমন- গান্ধীজির লিখা ইংরেজি রূপান্তর থেকে *'ভগবদ্‌গীতা'*, শরৎচন্দ্রের *'ষোড়শী'* এবং *'শ্রীকান্ত'* ১ম খণ্ড এর ইংরেজী রূপান্তর থেকে উর্দু অনুবাদ করেন যথাক্রমে *আউরাত* ও *সপেরান* নামে। বঙ্কিমচন্দ্রের *'কপালকুণ্ডলা'* উপন্যাসের অনুবাদ করেন একই নামে। গৌরীশঙ্কর ওঝার মূল হিন্দি রচনা থেকে প্রেমচাঁদ উর্দুতে নতুন গ্রন্থ রচনা করলেন *'কুরান-এ-কুস্তা মে হিন্দুস্থানী তাহদিব'* শিরোনামে। প্রেমচাঁদ রবীন্দ্রনাথের দুটি উপন্যাসও উর্দুতে অনুবাদ করেছিলেন *'বউ ঠাকুরানীর হাটে' 'দুলহান্'* নামে এবং *'নৌকাডুবি' 'তুফান'* নামে অনুবাদ করেন।

প্রগতিশীল লেখক সংঘ গঠন -

প্রেমচাঁদের জীবন প্রদীপ অল্পতেই নিভে গিয়েছিল। কে জানতো বিধাতা অকালেই এমন একটি এক জীবনের অবসান ঘটাবেন। কিন্তু পরপারের ডাক আসবার আগেই তিনি চেয়েছিলেন তাঁর মত প্রগতিশীল লেখকদের নিয়ে একটা সংস্থা গড়ে তুলবেন। এ ইচ্ছেটা অনেক দিন ধরেই তিনি পোষণ করে রেখেছিলেন তাঁর মনে। কিন্তু কিছুতেই সেই সুযোগটা আসছিল না। অবশেষে সেই দিনটা এল ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ সালে। সেদিন সুপ্রসিদ্ধ উর্দু লেখক সাজ্জাদ জহীর সাহেবের বাড়িতে একত্র হলেন হিন্দি উর্দুর কিছু স্বনামধন্য কথা সাহিত্যিকরা যার মধ্যে ছিলেন মুন্সী প্রেমচাঁদ, মুন্সী দয়া নারায়ন নিগম, মৌলানা আব্দুল হক প্রমুখ এই সভায় আরো অনেক উঠতি সাহিত্যিকরাও যোগ দেন যাদের ওপর ভবিষ্যতের ভার বহন করবার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। এই সভায়

[৫১] প্রেম গোপাল মিত্রা, *প্রেমচাঁদ শাহনাছ : মদন গোপাল*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়ী দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৫৮-৬৩।

[৫২] ড. মির্জা হামিদ বেগ, *উর্দু আফসানুকি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ২০৬-২০৭।

সর্বসম্মতিক্রমে Progressive Writers Association নামে একটি সাহিত্যিক সংস্থা স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কতিপয় সাহিত্যিক তাদের প্রমোদ দৃপ্ত কণ্ঠে এবং সাবলীল ভঙ্গীতে জানালেন যে, দেশ আজ প্রগতিশীল লেখকদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। তাঁর আশ্বাসে সংশয়ের ঘোর কেটে গিয়ে তাদের মনেও এল নতুন জোয়ার। গঠিত হলো "প্রগতিশীল লেখক সংঘ" এবং এক বছরের মধ্যেই এই সংস্থা এবং এ সদস্যরা যে কাজ সম্পন্ন করলো তা সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় স্বর্নাক্ষরে লিখিত আছে। প্রেমচাঁদ কয়েক মাসের মধ্যেই চলে গেলেন কিন্তু যে পথের নির্দেশ তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন তাই ভবিষ্যতের পাথেয় হয়ে রইলো।[৫৩]

এই সংস্থা গঠিত হওয়ার দু-তিন বছর পূর্বেই প্রেমচাঁদের চিন্তালোকে একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল। দরিদ্র নিপীড়িতদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও করুণা যেন অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করেছিল। *'কফন'*এর মত গল্পের সৃষ্টি এই পরিবর্তনেরই ফল। তিনি যদি আর কিছু কাল বেঁচে থাকতেন তবে এ ধরণের আরো গল্প আমরা নিশ্চয়ই পেয়ে ধন্য হতাম।

ব্যক্তি প্রেমচাঁদ -

দরদী কথাশিল্পী প্রেমচাঁদ ব্যক্তি জীবনে ছিলেন একবারেই সাদাসিধে। না পোষাকে না চালচলনে না কথাবার্তায় কোনো ক্ষেত্রেই তাঁর জৌলুস ছিল না। হাঁটুর কিছু নীচে মিলের ধুতি, গায়ে মাকিনের হাতে কাচা জামা এবং পায়ে পামসু এই ছিল তাঁর চির পরিচিত চোহারা। বাজে খরচ হবে ভেবে তিনি বাদামী রঙের কিরমিচের জুতো পরতেন যাতে রং না লাগালেও চলে। নিজের জন্য তিনি নূন্যতম খরচ করতেন। তিনি সুখে স্বচ্ছন্দে বেশ জাকজমকের সঙ্গে জীবন কাঁটাতে পারতেন। কিন্তু প্রেমচাঁদ রাজকীয় সম্মান এই বলে উপেক্ষা করেছেন যে ওখানে খোলা হাওয়া নেই, নেই ঠাণ্ডা মিষ্টি কুয়োর জল, মাথার ওপর নেই উম্মুক্ত নীল আকাশ, পথে শোনা যাবে না মিষ্টি বাঁশিতে দেহাতী সুর অথবা পাখির কলকাকলি। ইচ্ছে করলেই যিনি দু-চার লাখ টাকায় সম্পত্তি রেখে যেতে পারতেন সেই মানুষটি বিনা চিকিৎসায় তিল তিল করে কষ্ট ভোগ করে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছেন।

প্রেমচাঁদ কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫ সালে জনেন্দ্রর কে লিখা এক চিঠির মাধ্যমে তিনি তার প্রতি দিনের কর্মজগ্য উপস্থাপন করেন। তিনি লিখেন,

"আমি প্রতিদিন সাতটা বাজে ঘুম থেকে উঠি, সাড়ে আট টায় গোসল করি, তার পর নাস্তা সারি, নয়টায় খবরের কাগজ পড়ি, কখনো ঘন্টা আবার কখনো এর থেকে বেশী সময় লাগিয়ে দেই। কখনো কেহ দেখা করতে আসলে কথা বলতে বলতে এগারোটা বেজে যেত, হাত মুখ ধয়ে স্টুডিওতে যেতাম। যদি কাজ থাকতো

[৫৩] Madan Gopal, *Munshi Premchand : A Literary Biography,* Asia Publishing House, Bombay, 1964. P- 422-426.

করতাম, আর না থাকলে উপন্যাস পড়তাম। পাঁচটার দিকে ফিরে আসতাম। তার পর হিন্দি পত্রিকাগুলো উলট পালট করে দেখতাম, চিঠি লিখতাম, খাওয়া দাওয়া করতাম, অবেশেষে ঘুমিয়ে যেতাম। এটাই আমার প্রতিদিনের রুটিন।” [৫৪]

প্রেমচাঁদ তাঁর ছেলে মেয়েদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করতেন। তাঁর স্ত্রী ও পুত্রদের লেখা থেকে জানা যায় যে, তাঁরাও পিতার সঙ্গে বন্ধুর মতই ব্যবহার করতেন। তিনি কখনও ছেলেমেয়েদের বকাবকি করতেন না বা মারধোরও করতেন না। ছেলে মেয়েরাও বাবাকে এতই ভালবাসতো যে বাবার সঙ্গ ছাড়া রাতে খেতে বসতো না। সংসারে অভাব অনটন ছিল। কিন্তু প্রেমময় পিতাঁর স্নেহ-প্রীতি, দু'কূল ছাপানো ভালবাসা ছিল ভরপুর।

ব্যক্তি প্রেমচাঁদ সম্পর্কে খুব কমই বলা বা লেখা হয়েছে। নতুন লেখকদের কাছে প্রেমচাঁদ ছিলেন প্রেরণার কল্পবৃক্ষ। তিনি যে কত নতুন লেখকদের প্রেরণা জুগিয়েছেন তা গুনে বলা যাবে না। এমন বহু উপন্যাসিক ও গল্প লেখককে তিনি প্রেরণা দিয়েছেন যারা পরবর্তী যুগে ও বর্তমানে উর্দু ও হিন্দি সাহিত্যের উচ্চাসনে বসে আছেন। এদের মধ্যে শ্রী উপ্রেন্দ্রনাথ অঙ্ক, অজ্ঞেয় রাধাকৃষ্ণ, জৈনেন্দ্র, গঙ্গাপ্রসাদ, ধীরেশ্বর সিংহ, ধীরেনকৃমুর জৈন, সুভদ্রাকুমারী চৌহান প্রমুখ। আজকের ছায়াবাদী যুগের শ্রীমতী মহাদেবী বর্মাও তাঁর কাছে প্রশংসাপত্র পেয়ে সাহিত্য কর্মে প্রেরণা পেয়েছিলেন। [৫৫]

প্রেমচাঁদ এদের পথ-প্রদর্শন করেছেন, সহযোগিতা করেছেন, উপদেশ ও নির্দেশ দিয়েছেন। বাইরের চাকচিক্য সম্বন্ধে উদাসীন এই মানুষটির যে কত বড় মাপের হৃদয় ছিল তা অল্প কথায় বলা যাবে না। বস্তুত মানুষ হিসেবে প্রেমচাঁদের তুলনা মেলা ভার।

প্রেমচাঁদের মতে লক্ষ্মী ও স্বরস্বতীর একত্রে বসবাস সম্ভব নয়। এক পত্রে তিনি লিখেছেন “যে লোক ধন সম্পদের নেশায় থাকে তাঁর মহাপুরুষ হওয়ার কল্পনা আমি করতেই পারি না। আমি যখন কোনো মানুষকে সম্পদশালী দেখি তখনি আমার মনে হয় তাঁর মধ্যে শিল্পবোধ এবং বুদ্ধিমত্তার একান্ত অভাব আছে। আমার মনে হয় এই ব্যক্তিটি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে- যে সমাজ ব্যবস্থা ধনীর দ্বারা দরিদ্রের শোষণের কাঠামোর উপর দণ্ডায়মান স্বীকার করে নিয়েছেন। তেমনি কোনো বড়লোকের নাম যে লক্ষ্মীর বর পুত্রও আমাকে আকর্ষণ করে না। খুব সম্ভব এর জন্য দায়ী আমার ব্যক্তিগত জীবনের অসাফল্যতা। আমিও হয়তো লোভ স্বরণ করতে অসমর্থ হতাম। কিন্তু আমি খুশী যে আমার স্বভাব এবং ভাগ্য আমাকে সাহায্য করেছে এবং আমার মন দরিদ্যের সঙ্গেই আবদ্ধ। এতে আমি আধ্যাত্মিক সান্তনা পাই”। [৫৬]

একবার দিল্লীতে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন হচ্ছে। প্রেমচাঁদের তখন দেশ জড়া নাম ডাক। তিনিও নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন। বড় বড় সব সাহিত্যিকদের জমায়েত। প্রেমচাঁদ অতি সাধারণ পোষাকে বিভিন্ন স্থান থেকে

[৫৪] অমরিত রায়, *প্রেমচান্দ ঃ কলম কা ছিপাহি*, সাহিত্য একাডেমি, নয়া দিল্লী, ১৯৯২, পৃ. ৭১৯।
[৫৫] প্রেমচাঁদ, প্রেমচাঁদ স্মৃতি, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১৪২।
[৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

আগত সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিশে গেলেন। কে কাকে চেনে, নারকেল দড়ির খাট পড়েছে লাইন দিয়ে। তাঁরই একটায় তিনিও স্থান করে নিলেন। সকলের সঙ্গেই স্নান সেরে আহারের সন্ধানে এগোলেন। স্বেচ্ছাসেবক তাঁকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করেলেন "টিকিট" ?

প্রেমচাঁদ জিজ্ঞেস করলেন- টিকিট ? কোথায় পাওয়া যাবে?

স্বেচ্ছাসেবকের নির্দেশিত স্থান থেকে টিকিট কিনে তিনি আহারের জন্য অপেক্ষমান লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিছুক্ষন অপেক্ষা করার পর হঠাৎ জৈনেন্দ্রের দৃষ্টি পড়ল লাইনে অপেক্ষমান শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার প্রেমচাঁদের প্রতি। তিনি বললেন- 'আপনি এখানে লাইনে দাঁড়িয়ে' ?

প্রেমচাঁদ বললেন- কেন সবাইতো দাঁড়িয়ে আছেন।

প্রেমচাঁদ নিজেকে সকলের একজন বলে মনে করতেন। অহঙ্কার কখনো তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। সাহিত্যিকদের রাজনীতি বা দলাদলিরও তিনি ছিলেন উর্দ্ধে। তিনি বড় লেখক হতে পারেন কিন্তু মানুষ হিসেবে একবারে জনতারই একজন ছিলেন। এটা তাঁর বিশ্বাস ছিল। ছোটগল্প সম্রাট হয়েও তাঁর মধ্যে কেউ কখনও পায়নি সাম্রাজ্যের গন্ধ। তিনি নিজেকে *'কলম কা ছিপাহী'* মনে করতেন। মজদুরের পুঁজি হল শ্রম। তাই *'কলম কা ছিপাহী'* প্রেমচাঁদ আজীবন বাঁচার সংগ্রাম করে গেছেন। আজ তাঁর বংশধরদের টাকার অভাব নেই। পিতাঁর গল্প উপন্যাস তাঁদের অর্থাবাই কেবল দূর করেনি। দু-হাত ভরে দিয়েছে ও দিচ্ছে এবং সন্দেহ নেই যে ভবিষ্যতেও আরো বেশী করেই দেবে। অথচ এই দুর্ভাগ্য দেশে প্রচুর পরিশ্রম করেও লেখক প্রেমচাঁদ ভাল করে খেয়ে পরে থাকবার মত স্থান করতে পারেন নি। অভাব অনটনই ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। আবার এও সত্য যে অর্থাভাবই তাঁকে সাহিত্য কর্মে প্রেরণা জোগাতো, যাকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন 'ধনের শত্রুতা'। তাঁর বিশ্বাস ছিল- ধনসম্পদ মানুষকে স্বার্থান্ধ করে দেয়। দয়া, মায়া, মমতা, সহানুভূতির স্থান নেই সম্পদশালীর হৃদয়ে। ধনাভাবের মধ্যেই তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন মানবতাঁর এবং প্রাচুর্যের মধ্যে অমানবিকতার। তাঁর এই চিন্তাধারাই সম্ভবত তাঁকে সাম্যবাদের দিকে আকৃষ্ট করেছিল।

প্রেমচাঁদ বাস্তব অর্থেই কর্মযোগী ছিলেন। ভাগ্যের উপরও তার বিশ্বাস ছিল না। ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে প্রেমচাঁদ তাঁর অনুজ প্রতিম উপন্যাসিক জৈনেন্দ্রকে বলেন, "আমি ভগবান পর্যন্ত পৌছাতে সক্ষম নই। আমি ততটা বিশ্বাস করতে পারি না। যখন দেখি শিশুরা কাঁদছে, রুগী ছট্‌ফট্ করছে, তখন কি করে বিশ্বাস করি বল ? এখানে ক্ষুধা আছে, কষ্ট আছে, তাপ আছে। এমন অবস্থায় যদি এই দুনিয়ায় ভগবানের রাজ্য না দেখতে পাই তবে কি তা আমার অপরাধ ? অবস্থাটা আরো কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তখনি যখন ঈশ্বরকে স্বীকার করে

তাঁকে আবার করুণাময় বলে ধরে নিতে হয়। আমার তাঁকে করুণাময় বলে মনে হয় না। এমন অবস্থায় সেই দয়ার সাগরের ওপর আস্থা কি করে জ্ঞাপন করি" ? [৫৭]

অপর একটি পত্রে জৈনেন্দ্রকে তিনি লিখেন,

"তুমি আস্তিকতাঁর দিকে অগ্রসর হয়েছো। অগ্রসর বা বলি কেন, পুরোপুরি ভক্ত হয়ে উঠেছো। আমি সন্দেহের বশে পাকাপাকি নাস্তিক হয়ে যাচ্ছি"। [৫৮]

ভালো দিক গুলোই প্রেমচাঁদের ভিতরে প্রতীয়মান ছিল। কিন্তু প্রতিটি মানুষের মাঝেই ভালো-খারাপ মিশ্রণ থাকে এটাই জগতের নীতি ও রীতি। মানুষ ফেরেস্তা না যে তার মধ্যে কোন ভুল থাকবে না। প্রেমচাঁদ মানুষের থেকে কোন আলাদা জন্তু না।

প্রেমচাঁদের শখ -

কলম কাগজের ব্যবহারই ছিল প্রেমচাঁদের প্রধান শখ, ভালবাসা ও ভাললাগা। প্রয়াণের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত প্রেমচাঁদকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে দেখা গিয়েছে। শিবরাণী দেবী তাঁর আরাম ও বিশ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু প্রেমচাঁদ মনে করতনে আরাম বিশ্রাম মানুষকে নিষ্ক্রিয় ও অলস করে দেয়। তাই তিনি অসুস্থ ও দূর্বল শরীর নিয়েও সর্বদা সক্রিয় থাকার চেষ্টা করতেন। বারবার শারীরিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েও তিনি সর্বদা তার লেখালেখিতে মগ্ন ছিলেন। প্রেমচাঁদ পড়তেও খুব ভালোবাসতেন। সে ভালোবাসা এমন ছিল যে, যে কোন রকম বই পেলেই তিনি তা পড়তেন। সে তালিকায় রোমাঞ্চ সিরিজের বই, দুঃসাহসী কাহিনী, ডিটেকটিভ উপন্যাস, স্কট, থ্যাকারে, ডিকেন্স, হার্ডি, হ্যুগো, রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয় প্রমুখের রচনাও ছিল। এই ধরণের বিচিত্র অধ্যয়নের ফলে তাঁর বিচার শক্তি গভীরতা লাভ করে। ফলে, জীবনের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল।

দরদী প্রেমচাঁদ -

ব্যক্তি প্রেমচাঁদের দরদীয়তার পরিচয় পাওয়া যায় শিবরাণী দেবীর লেখা, *'প্রেমচাঁদ ঘর মে'* গ্রন্থ থেকে। ১৯২৯ সালের ঘটনা! একবার প্রেমচাঁদ শিবরাণী দেবীকে নিয়ে রেলের 'ইন্টার ক্লাসে' করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি স্টেশনে গাড়ি থামতেই বহু কৃষক এক সঙ্গে সেই কামরায় উঠে পড়লো। প্রচণ্ড ভীড় হয়ে গেল। একটু নিশ্চিন্তে যাওয়া আশা ঘুচে গেল। প্রেমচাঁদ ওদের জিজ্ঞেস করলেন- আপনারা কোথা থেকে আসছেন আর যাবেনই বা কোথায় ? তাঁরা জানাল যে তাঁর শীতলা দেবীর দর্শনপ্রার্থী। গ্রাম থেকে এক সাথে বেরিয়েছিলেন। জন প্রতি খরচ পড়েছে পনেরো ষোল টাকা।

---

[৫৭] প্রেমচাঁদ, প্রেমচাঁদ স্মৃতি, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ২৬।
[৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

প্রেমচাঁদ যেন আঁতকে উঠলেন। তখনকার দিনে একটা কৃষকের পক্ষে পনেরো ষোল টাকা খরচ করে শীতলা দেবীর দর্শনের জন্যে ট্রেনে যাতায়াত করা একটু অস্বাভাবিক ছিল। তিনি তাদেরকে বোঝাতে থাকেন এ বিষয়ে যে, এই টাকা দিয়ে তোমরা চার মাসের অন্নের জোগাড় করতে পারতে। বাইরে দেবীর দর্শনের জন্যে না বেরিয়ে তোমরা বাড়িতেই পূজো করে টাকা বাঁচাতে পারতে। তোমরা সুখে থাকলে, আনন্দে থাকলে ভগবানও সুখী হন।

ভীড় এত বেশী বেড়ে গিয়েছিল যে, শিবরাণী দেবীর দারুণ অসুবিধা হচ্ছিল। তৃতীয় শ্রেণীতে না চড়ে চড়লেন ইন্টার ক্লাসে। তাতেও এই অশিক্ষিত লোকগুলির এত ভীড়। শিবরাণী দেবী চাইছিলেন যে এরা তৃতীয় শ্রেণীতে চলে যাক। তিনি প্রেমচাঁদ কে বললেন- পরে বোঝাবেন, আমার তো দম বন্ধ হয়ে আসেছে।

প্রেমচাঁদ বললেন- এদের জন্যে জেলে যাও, লড়াই করো, আর এদেরকেই তাড়াতে চাইছো ? এই গরীব লোকগুলোর প্রতি আমার করুণা জাগছে। বেচারারা ক্ষুধার্থ। ধর্মের পেছনে দৌড়োচ্ছে।

শিবরাণী দোবী বললেন- গাড়ীতে বসে সব শিখিয়ে ফেলবেন না।

প্রেমচাঁদ- তাহ'লে বলো কখন বোঝাই এদের ?

শিবরাণী- এদেরকে নিয়েই তো আপনি পুঁথির পর পুঁথি লিখছেন।

প্রেমচাঁদ- এরা তো আমার বই পড়ে না। তবে হ্যাঁ, যদি আমার উপন্যাসগুলির ওপর ফিল্ম তৈরী করে গ্রামে গ্রামে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হতো তবে এরা দেখতো।

এই ঘটনাটি থেকে বোঝা যায় যে প্রেমচাঁদ একজন দরদী মানুষ ছিলেন। তাঁর মনে গরীর কৃষকদের প্রতি কত সহানুভূতি ও করুণা জমা ছিল। তিনি তাদের সমস্যা সম্পর্কে কতটা চিন্তা ভাবনা করতেন। তিনি এ কথাটা বুঝতে পেরে ছিলেন যে এই অশিক্ষিত দরিদ্র গ্রাম্য ধর্মভীরু মানুষগুলিকে জাগাতে হলে অথবা ঠিক পথে আনতে গেলে আবশ্যক এমন একটা মাধ্যম যা তাদের জ্ঞানচক্ষু খুলে দেবে। এরা পড়তে জানেনা। কিন্তু যদি এদের জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাসকে চলচিত্রে রূপায়িত করে এদের চোখের সামনে তুলে ধরা যায় তবে নিশ্চই এরা শিক্ষা গ্রহন করতে পারবে।

মৃত্যুকাল -

বোম্বাই থেকে বেনারসে ফিরে প্রেমচাঁদের স্বাস্থ্য আরও খারাপ হয়ে পড়েছিল। দিন দিন রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শরীর রক্তশূণ্য, পেটে অসহ্য ব্যথা। ক্রমশ: যেন পেটটা ফুলে উঠছিল। হাত-পা ঝিমিয়ে পড়ছিল। প্রেমচাঁদের পরম বন্ধু অগ্রজ প্রতিম “জমানার” সম্পাদক শ্রী দয়ারাম নিগম লিখেছেন– “মৃত্যুর পনেরো দিন পূর্বে টেলিগ্রাম করে আমাকে বেনারসে ডেকে পাঠালেন। সমস্ত পথ কাটলো উৎকণ্ঠায়। তাঁর সঙ্গে সেই শেষ দেখার কথা জীবনে বিস্মৃত হব না। সেই প্রেমচাঁদ যিনি তাঁর লাল ফর্সা মুখের জন্য হাজারে একজন ছিলেন এমন পিঙ্গল বর্ণ

এবং দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন যে চেনা কঠিন মনে হয়েছিল। কোটরগত চোখ, ভাঙ্গা গাল আর কঞ্চির মত সরু হাত-পা দেখে আমার চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এলো। তাঁর সেই হাস্য মণ্ডিত মুখ যা কথা বলারও অবকাশ দিত না এখন অশ্রুর বন্যায় ভাসছে। তাঁর উঠে বসার শক্তিটুকুও ছিল না। শুয়ে শুয়েই হাত দুটি ধরে বুকে জাপটে ধরলেন যেমন ভয়ার্ত শিশু কাঁদতে কাঁদতে বুকে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করে। এত দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন যেন হাঁপাচ্ছিলেন।" মদন গোপাল প্রেমচাঁদের আত্মজীবনীতে তার মৃত্যুর সময়কাল নিয়ে লিখেন,

> "Three o'clock in the morning of October- 08, 1936. He told Jainendra to go to sleep. Soon thereafter, he went into a come. Morning he could neither move nor speak. He was no more" [৫৯]

("০৮ অক্টোবর, ১৮৩৬ রাত ০৩ টার দিকে সে তার ছেলে জয়নেন্দ্রাকে ঘুমাবে বলে শুয়ে পড়লেন। ছেলে সেখানেই ছিল। সকালের দিকে তার কোন নড়াচড়া বা কোন কথাবার্তা ছিল না। বুঝা গেল সে আর নাই")

প্রেমচাঁদ ১৮৩৬ সালের ০৮ অক্টোবর, রোজ বৃহস্পতিবার রাত ০৩ টার দিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রেমচাঁদের জীবনে না আছে নাটকীয় ঘটনা, না আছে কোন তত্ত্বকথা। নিজের সম্পর্কে তিনি লিখে গেছেন-

"আমার জীবন এক মসৃণ সমভূমি, এতে কোথাও কোথাও গর্ত থাকলেও কোন পাহাড়, পর্বত, গহন অরণ্য, গভীর খাদ কিংবা ভগ্নস্তুপ নেই। যারা পাহাড় ভ্রমনে অভিলাষী তাঁদের এখানে এসে হতাশ হতে হবে।" [৬০]

প্রেমচাঁদের আকস্মিক অকাল মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে মর্মাহত হন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ জীবনের বহু রকম মৃত্যুশোক সহ্য করেছেন, মৃত্যুর যন্ত্রণা তাঁর হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করেছে। প্রেমচাঁদের অকাল মৃত্যুশোকও কবিকে কম আহত করেনি। তাঁর আহত ছবিটি ফুটে উঠেছে প্রেমচাঁদের পুত্র অমৃত রায়ের কলমে। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত তাঁর *'কলম কা সিপাহী'* গ্রন্থটিতে তিনি শেষ বাক্যটি সংযোজন করেছেন এইভাবে,

"ایک رتن ملا تھا تم کو، تم نے کھو دیا۔" [৬১]

("একটি রত্ন পেয়েছিলে, আজ তুমি সেটি হারালে"।)

এই উক্তির সুগভীর ও ব্যাপক তাৎপর্য অনুধাবন করলে প্রেমচাঁদকে রবীন্দ্রনাথ কতটা গুরুত্ব দিতেন তা বোঝা যায়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে রবীন্দ্রনাথ যে তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন, তার মূল লিপিটি বিশ্ব ভারতীর বরীন্দ্র ভবনে সুরক্ষিত আছে। তা হল,

---

[৫৯] Madan Gopal, *Munshi Premchand: A Literary Biography,* Asia Publishing House, Bombay, 1964. P- 454.
[৬০] প্রেমচন্দ, *প্রেমচন্দ ঃ গল্প সংগ্রহ*, পশ্চিম বাংলা একাডেমি, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ১৩।
[৬১] অমরিত রায়, *প্রেমচান্দ ঃ কলম কা ছিপাহি*, সাহিত্য একাডেমি, নয়া দিল্লী, ১৯৯২, পৃ. ৮১৫।

> “The literary reputation and worth of Premchandji transcended the proviniceal boundaries and his loss is loss to all of us.” [৬২]

এইসব আচরণ অভিমত ও স্বীকৃতির মধ্যে জহুরী রবীন্দ্রনাথের উদার ও মহৎ মনের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই শক্তি ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতা দিয়েই তিনি প্রেমচাঁদকে পরম আপন করে নিয়েছিলেন, প্রেমচাঁদ তার স্নেহ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠে ছিলেন।

---

[৬২] নিতাই বসু, *মুন্সি প্রেমচন্দ*, গ্রন্থতীর্থ, ৬৫-৩এ, কলেক স্ট্রিট, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৭০।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রেমচাঁদের উর্দু ছোটগল্পে সমাজ চিত্র

প্রেমচাঁদ গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় বিচরণ করলেও ছোটগল্পকার হিসেবেই বেশি জনপ্রিয়। তিনি ছিলেন কালের কষ্টি পাথরে উত্তীর্ণ এক যুগ শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে আদর্শ ভিত্তিক গল্প তিনি রচনা করেছেন। গল্পের উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছেন সমসাময়িক কাল, সমাজ ও পরিবেশ থেকে। তাঁর ছোটগল্পে সুক্ষ্ম জীবনবোধের শিল্পরূপ যতখানি প্রকাশিত হয়েছে, অন্যদের রচিত ছোটগল্পে তা পাওয়া যায়নি বলে বিজ্ঞজনেরা মনে করেন। সমাজ বাস্তবতা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং স্বল্প পরিসরে চরিত্রায়ন প্রেমচাঁদের ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

১৯০৬ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত প্রেমচাঁদের সাহিত্য সাধনার সময়কাল। এ সময়ে তিনি প্রায় তিনশত ছোটগল্প রচনা করেছেন। তাঁর কথা সাহিত্যে ভারতবর্ষের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্মীয় অবস্থা অত্যন্ত সচেতন ভাবে উঠে এসেছে। বিশেষ করে তাঁর ছোটগল্পে সামাজিক চিত্র ফুটে উঠেছে বিপুল ভাবে। সামাজিক চেতনার এমন কোন দিক নেই যা চিত্রায়িত হয়নি তার রচনায়। প্রেমচাঁদের গল্প থেকে আমরা বুঝতে পারি, সে যুগে জীবনের মূল্য ছিল অর্থ ভিত্তিক। তৎকালের সমাজ সভ্যতা, সংস্কৃতির বিকাশ সাধন, মহাজনী সভ্যতা, পারিবারিক জীবন, শিক্ষা, আদালত, কোট-কাছারী, এমনকি সরকারী দপ্তর প্রভৃতি কোন কিছুকেই প্রেমচাঁদ বাদ দেননি। প্রেমচাঁদের ছোটগল্পে মহাজনী সভ্যতার ব্যপ্তি, ধর্ম আশ্রিত মূল্যবোধের দূর্বলতা, অর্থনিয়ন্ত্রিত মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠাতা চোখে পরার মত। প্রেমচাঁদ মানুষের দুরবস্থা ও মানুষ সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তিনি দেখিয়েছেন সে সরকারী কর্মকর্তার চেয়ে সুদদাতা শ্রেণীর সামাজে বিশেষ স্থান দখল কারেছিল। প্রকৃতপক্ষে এর সকলেই শোষক শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে। তাছাড়া রয়েছে শ্রমিক, গরিব চাষী, ভূমিহীন কৃষক, দিনমজুর এবং প্রজা যাদের জমিদার যে কোনা মুহূর্তে জোরপূর্বক কাজে লাগাতে পারে। এরাই হলো শোষণের শিকার। তদুপরি সবচেয়ে নিপীড়িত ও নির্যাতিত শ্রেণী হলো হরিজন, যারা অচ্ছুত, যাদের স্পর্শ করলে অভিজাত শ্রেণীর জাত যায়। প্রেমচাঁদ অনেক গল্পে সামাজের এইসব অবহেলিত অস্পৃশ্যদের বেদনাদায়ক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে সুন্দভাবে। অবশ্য শেষের দিকের গল্পগুলোতে সামাজিক অবিচারের চিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। মোহান্ত, স্বামী, পাণ্ডা এবং পুরোহিতরা সাধারণ মানুষের ধর্মীয় ভীতি, কুসংস্কার ইত্যাদিকে পুঁজি করে সাধারণ মানুষকে কিভাবে প্রতারিত করে থাকে প্রেমচাঁদ সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পে। এমনকি একন্নবর্তী পরিবার, পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, ভাই-ভাই সম্পর্ক, শ্বাশুড়ী আর জামাতার সম্পর্কে প্রেমচাঁদের গল্প থেকে বাদ পড়েনি; যুগ যুগ ধরে ভারতের পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কার ও আচারর যে করুণ কাহিনীর সৃষ্টি করেছে তাও ফুটে উঠেছে প্রেমচাঁদের লিখনীতে। যেমন বাল্যবিবাহ, বিধবাদের পুনঃবিবাহ

নিষিদ্ধকরা, বৃদ্ধের সাথে কিশোরীর বিবাহ, বহুবিবাহ, ভাগ্য গণনার উপর ভিত্তি করে বিবাহ ইত্যাদি। এসব মারাত্মক সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা প্রেমচাঁদের গল্পে বিধৃত হয়েছে নিপুণ ভাবে।

প্রেমচাঁদের জন্ম, বেড়ে উঠা মোটকথা জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে গ্রামে। তাঁর চিরচেনা সেই গ্রামকে তিনি তাঁর গল্পে তুলে এনেছেন অতি যত্নে। তিনিই প্রথম শহর এবং নগর সভ্যতার কবল মুক্ত হয়ে গ্রামের দিকে মনোযোগ দেন। গ্রামীন সমাজের মধ্যে কৃষক সমাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মূলত কৃষি ক্ষেত্রে কৃষকই প্রধান চালিকা শক্তি। তবে তার সমকালে কৃষকদের মুখে হাসি ফুটাতে প্রদান বাধা ছিল গ্রাম্য জমিদার, মহাজন ও ইংরেজ প্রশাসন। তাদের দাবী দাওয়ার কারণে কৃষকেরা সব সময় কুণ্ঠাসা থাকত। প্রেমচাঁদ তার অধিকাংশ ছোটগল্পের ভিতরে কৃষকের দুর্দশা তুলে ধরেছেন।

প্রেমচাঁদ দেখলেন যে উত্তর প্রদেশের রাজস্ব ব্যবস্থা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইংরেজ তার স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন ছিল। তাদের প্রণীত ভূমি ব্যবস্থা দ্বারা ভূস্বামী শ্রেণীর বাংলার জমিদারদের প্রজা বা কৃষক শোষণ এবং পীড়নে কোন অংশ কম ছিল না। জমি বন্দোবস্ত বা পুনবাস্তাবের সময় প্রজার নিকট থেকে তালুকদারদের 'নজরানা' আদায় প্রায় প্রথাসিদ্ধ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছিল। বাংলা ও উত্তর প্রদেশের রাজস্ব ব্যবস্থার সামান্য তারতম্য থাকলেও কৃষকদেরকে শোষণ পীড়ন প্রক্রিয়ায় তেমন তফাৎ নেই। জমিদার ও মহাজনের দ্বারা বাংলার কৃষকের মতো উত্তর প্রদেশের কৃষকেরা শোষিত ও নির্যাতিত হয়েছে। "মুন্সী প্রেঁমচান্দ কৃষকদের উপর জমিদারের অত্যাচার এবং কৃষকের দুরবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি তার ছোটগল্পের বহু স্থানে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেনঃ কৃষকদের উপর কর্তৃত্ব করবার অধিকার জমিদারগণ পেয়েছে সংযোগবশত এবং কৃষকদের প্রতিবাদীনতার কারনে।" [১]

সে অর্থে প্রেমচাঁদের ছোটগল্পে যে সামাজিক বৈষম্য চিত্র লক্ষ্য করা যায় তা মূলত: গ্রামীণ জমিদার ও কৃষক সমাজই। তিনি স্বচক্ষে যা দেখেছেন, তাঁর আশেপাশে যা কিছু ঘটেছে তার একটি পরিপূর্ণ রূপ তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন। প্রেমচাঁদের এই সমস্ত গল্প থেকে উত্তর ভারতের গ্রামীণ জীবনাচরনের একটি স্পষ্ট চিত্র পাঠকের সামনে ফুটে উঠে। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য সমালোচক আলী জাওয়াদ যায়দী বলেন,

"پریم چند کے افسانوں میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں حیثیت رکھتی ہے وہ دیہاتی زندگی کی صحیح اور ہو بہو مرقع کشی ہے۔

کسانوں کی زبوحالی اور زمینداروں، پولیس والوں اور سرمایداروں کی چیرہ دستوں کا حال پڑھ کے ہمدردی اور احساس عمل کتنے

آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے" [২]

---

[১] মুনশী প্রেমচঁন্দ, *বিবিধ প্রসঙ্গ-১*, হংস প্রকাশন, এলাহাবাদ, ১৯৮০, পৃ. ২৬৩।
[২] প্রেমচাঁদ, *প্রেমচাঁদ কী যিন্দিগী আউর তাছনীফাত পর এক নযর*, জামানাহ পত্রিকা, সংখ্যা, পৃ. ১৭৫।

(প্রেমচাঁদের গল্পে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে তা হল গ্রামের সঠিক ও যথার্থ চিত্র অংকন। কৃষকদের করুণ অবস্থা এবং জমিদার, পুলিশ ও সাম্রাজ্যবাদীদের নিপীড়নের কথা জানার পর হৃদয়াবেগে অশ্রু সজল হয়ে উঠে।)

প্রেমচাঁদের সমাজ ভিত্তিক ছোটগল্পের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে আছে কৃষক সমাজ। গ্রামীণ জীবন প্রেমচাঁদের সমাজ ভিত্তিক ছোটগল্পের ভিত্তি, আর এর প্রাণ হল কৃষক সমাজ। এই কৃষক শ্রেণীর উপর শাসক শ্রেণীর লালসা, তাদের উপর অত্যাচার-অনাচার, বেঁচে থাকার জন্য নুন্যতম অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে প্রেমচাঁদের গল্পে। তিনি তাদেরকে স্বচক্ষে দেখেছেন, তাদের সংস্পর্শ লাভ করেছেন। তাদের ঐশ্বর্য ও দারিদ্রতা, গৌরব ও লজ্জা, শক্তি ও দূর্বলতা, আনন্দ ও যন্ত্রনা, প্রীতি ও ঘৃণা, দ্বন্দ্ব ও মিলন, আত্মগ্লানি ও আত্মসম্মানবোধ, আদর্শবাদ ও নীতিহীনতা প্রভৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করেছেন। এ কারণেই তাঁর লেখায় কৃষকদের প্রতি গভীর সমবেদনা লক্ষ্য করা যায়। জমিদার ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে যে শ্রেণী বৈষম্য প্রেমচাঁদ লক্ষ্য করেছেন তাঁকে উপনীত হয়ে অসংখ্য গল্প রচনা করেছেন। সে সকল গল্পে জমিদার ও কৃষক শ্রেণীর সামাজিক চিত্রটি একে একে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

কৃষক হরখু এবং তার ছেলে গিরিধারীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে *কুরবানী* (قربانی) গল্পটি। গল্পটি মে, ১৯১৮ সালে ‘স্বরস্বতী’তে প্রথমে হিন্দীতে প্রকাশিত হয়। পরে ‘প্রেম বত্তিছি’র প্রথম অধ্যায় এবং ‘দিহাত কে আফছানে’ তে প্রকাশিত হয়।[৩] এ গল্পে প্রেমচাঁদ অসঙ্গত ও কৃষক স্বার্থবিরোধী ভূমি ব্যবস্থার প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন। ইংরেজ আমলে ভূমির মালিক হয় কৃষকের পরিবর্তে জমিদার এবং এই জমি থেকে কৃষককে উচ্ছেদ করার অধিকার লাভ করে ভূস্বামীরা। এই ব্যবস্থার ফলে কৃষকের দুর্ভোগ, দারিদ্র্য এবং ভূমিহীন শ্রমিকে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া উপস্থাপিত হয়েছে এ গল্পে।

গল্পে দেখা যায় কৃষক হরখু জীবনে কোনোদিন ঔষধ খাননি। কিন্তু এবার আশ্বিন মাসে ম্যালেরিয়ার কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি। দীর্ঘ পাঁচ মাস ভুগে সি ঠিক হোলির দিনে দেহত্যাগ করে। হরখু মারা যাওয়ার আগে পাঁচ বিঘা জমি, দুটি বলদ ও একটি লাঙ্গল রেখে যান। পাঁচ-পাঁচ বিঘে জমি কুয়োর পাশে, সার-গোবরে বোঝাই আলদিয়ে ভরা ঐ জমিতে তিন তিনটে ফসল হয়। হরখু মরতে না মরতে চারদিক থেকে জমিগুলোর উপর হামলা হতে থাকে। হরখু ছেলে গিরিধারী বাবার শ্রদ্ধাশান্তি নিয়ে ব্যস্ত। অবশেষে গিরিধারী খুব ধুমধাম করে বাবার মরদেহ শ্মশানে নিয়ে যায় ও শ্রাদ্ধশান্তি জাঁক জমকের সাথে পূর্ন করে এবং কয়েকখানা গাঁয়ের বাহ্মনকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়। হরখু মরতে না মরতে চারদিক থেকে জমিগুলোর উপর হামলা হতে থাকে। ওদিকে গাঁয়ের মতলববাজ চাষীরা ঐ জমি নেওয়ার জন্য লালা ওঙ্কারনাথকে মোটা সালামী ও কয়েক বছরের খাজনা আগাম দিতে

[৩] আব্দুল কাভী দাছনভী, *প্রেমচাঁন্দ*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগ উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ২০১১, পৃ. ১৪।

রাজী হয়। কেউ কম কেউবা বেশী খাজনা দিয়ে ঐ জমিগুলো তাদের কবজায় নিতে মুখিয়ে ছিল। কিন্তু তিনি তাদের এই সুযোগ না দিয়ে গিরধারীকে খাজনা হিসেবে আট টাকা ও সালামি একশত টাকা এক সপ্তাহের মধ্যে দেয়ার জন্য বলেন। গিরিধারী ও ওঙ্কারনাথ এর ভাষায়,

گردھاری: "سرکار میرے گھر میں تو اس وقت روٹیوں کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اتنے روپے کہاں سے لاؤں گا، جو کچھ جمع جتھا تھی، وہ دادا کے کریا کرم میں خرچ ہو گئی، اناج کھلیان میں ہے، لیکن دادا کے بیمار ہو جانے سے اب کی ربیع بھی اچھی نہیں ہوئی۔ میں روپیہ کہاں سے لاؤں۔"

اونکارناتھ: "ہاں زیر بار تو تم ہو رہے ہو، تم نے کریا کرم خوب دل کھول کر کیا، لیکن یہ تو دیکھو کہ میں اتنا نقصان کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ میں تمھارے ساتھ دس روپے سال کی رعایت کر رہا ہوں یہ کیا کم ہے۔"

گردھاری: نہیں سرکار آپ ہماری بڑی پرورش کر رہے ہیں، تم نے دسدا سے ہمارے اوپر دیا کی سے، لیکن اتنا بخرانہ میرا کیا نہ ہو گا۔ میری ہمت نہیں بڑتی، آپ کو نارائن نے بہت کچھ دیا ہے، اتنی پرورش اور کیجیے۔"[৪]

(গিরিধারী- হুজুর, আমার ঘরে তো এখন খাওয়াই রুটিও জুটছে না। এতগুলো টাকা কোত্থেকে দেব ? যা কিছু পুঁজিপাটা ছিল, বাবার কাজে শেষ হয়ে গেছে। ফসল তো এখনো খামারে। তার উপর বাবার অসুখের জন্য ফসলটাও ভালো হয়নি, টাকা কোত্থেকে জোগাড় করব হুজুর ?
ওঙ্কারনাথ- তা তো ঠিকই, তুমি ক্রিয়া করম খুব ভাল ভাবে করেছ, তাই তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে আমি তোমাকে কিছুটা ছাড় দিয়ে বছরে দশ রুপি করে খাজনা দিতে পারবে, এটা করে দিতে পারি। এটা কম কিসের বল? তবে আমি কিন্তু এর চেয়ে বেশী ছাড়তে পারি না।
গিরিধারী- না, হুজুর, অমন কথা বলবেন না। আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন, কিন্তু এতটা আমি দিতে পারবো না। তবে এটা না পরিশোধ করার মতও সাহস আমার কম নয়। আপনাকে নারায়ন অনেক দিয়েছেন, আর একটু আমার প্রতি দয়া করুন।)

তথাপি ওঙ্কারনাথ রাজি না হয়ে রেগে গিয়ে বললেন, সেলামীতে একটা পয়সাও ছাড় হবে না। এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা দাখিল করলে জমি চাষ করতে পাবি, নইলে নয়' আমি অন্য কোনও ব্যবস্থা করে ফেলব। গিরিধারী মনের দুঃখে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। একশ টাকার ব্যবস্থা করা ওর ক্ষমতার বাইরে। এদিকে গিরিধারী এক সপ্তাহের ভিতর পাওনা শোধ না করাতে কালিকাদীন একশত টাকা সালামী দিয়ে ও বিঘে মাথাপিছু দশ টাকা খাজনা দিয়ে জমিগুলো নিয়ে নেয়। সেদিন দুঃক্ষে হতাশ হয়ে গিরিধারী বাবা বাবা বলে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে আর বাড়িতে সেদিন উনুন জ্বলেনি। অভাবগ্রস্ত গিরিধারী তুলসী বেনেকে পঞ্চাশ টাকা দেওয়ার জন্য মঙ্গলসিংহের কাছে আশি টাকার বলদ ষাট টাকায় বেঁচে দেয়। সেই দুঃখ সইতে না পেরে গিরিধারী তার জমির পাশের কুয়ার ধারে

---

৪ প্রেমচাঁদ, 'কুরবানী', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, *(মদন গোপাল সম্পাদিত)*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১০, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ২০০-২০১।

কাঁদতে থাকে। পরদিন সকালে কালিকাদীন লাঙল নিয়ে তার জমিতে চাষ করতে যায়। তখনও কিছুটা অন্ধকার ছিল। বলদ দু'টোকে লাঙলে জুততে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ সে দেখে গিরিধারী গায়ে ফতুয়া, মাথায় পাগড়ী ও লাঠি নিয়ে ক্ষেতের আলে দাঁড়িয়ে আছে। কালিকাদীন বলে- আরে গিরিধারী তুমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছো আর ওদিকে বেচারী সুভাগী তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। কোথা থেকে আসছ ? বলতে বলতে বলদ দুটোকে রেখে গিরিধারীর দিকে এগোয়। গিরিধারী পিছু হটতে থাকে। পেছাতে পেছাতে পিছনের কুয়োটাতে লাফিয়ে পড়ে। কালিকাদীন চিৎকার করে ওঠে। হাল বলদ সব ওখানেই ফেলে রেখে পালায়। সারা গাঁয়ে হৈ হৈ শুরু হয়। লোকেরা নানা রকমের জল্পনা কল্পনা করতে থাকে। কালিকাদীনের আর গিরিধারীর জমিতে যাবার সাহস হয় না। কালিকাদীন আর গ্রামের অন্য কেউ ঐ জমির পাশে কোন সময় যায় না, কারণ এখন গিরিধারীর কান্না ও তার ঘুরাঘুরির আওয়াজ ঐ জমির আশ পাশে পাওয়া যায়। সে কাউকে কিছু বলে না, কাউকে জ্বালাতন করে না। সে শুধু তার জমিগুলোকে দেখেই সন্তুষ্ট থাকে। সাঁঝের বাতি জ্বলবার পর ওদিকটার রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে যায়। লালা ওঙ্কারনাথের খুব ইচ্ছা যে জমিগুলো কেউ কিনে নিক, কিন্তু গায়ের লোকেরা ঐ জমি কেনার নামও মুখে আনতে ভয় পায়।

কুরবানী গল্পে জমিদারের প্রতি প্রেমচাঁদের এক ধরনের দরদ লক্ষ্য করা যায়। জমিদার ওঙ্কারনাথের চরিত্রের মধ্য দিয়ে এ দরদ আভাসিত। ওঙ্কারনাথের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে এই বক্তব্য স্পষ্ট হয় যে, জমিদারগণ ইংরেজের দাবি মেটানোর জন্য বাধ্য হয়েই কৃষকের নিকট থেকে খাজনা আদায় করে, তাদের ওপর বল প্রয়োগ করে। সুতরাং কৃষকের দারিদ্র্যের জন্য আসলে দায়ী ইংরেজ সরকার ও তার প্রশাসনিক দুর্নীতি, অসহায় জমিদারগণ নয়।[৫] ওঙ্কারনাথের এই বক্তব্যের উপস্থাপন ভঙ্গি দ্বারাই এর প্রতি প্রেমচাঁদের সমর্থন প্রকাশিত হয়।

কুরবানী গল্পে দেখা যায় কৃষক হরখুর মৃত্যুর পর তার পুত্র গিরিধারী পিতার জমির বন্দোবস্ত পায় না। জমিদার নজরানা এবং অধিক রাজস্বের লোভে অন্য কৃষককে জমির বন্দোবস্ত দেয়। এই গল্পে কৃষকের সঙ্গে জমির অন্তরঙ্গ সম্পর্কটি হৃদয়স্পর্শী ভাষায় অংঙ্কিত হয়েছে। "ক্ষেত গিরধারীর জীবনের অংশ হয়ে গেছে। এর এক এক আঙ্গুল জমি তার রক্তে রাঙা। এর এক এক পরমানু তার ঘামে ভেজা।"[৬] এই জমি হারিয়ে গিরিধারীর মনে হয় সেদিনই যেন তার সত্যিকার পিতৃবিয়োগ ঘটল। এখানে অংকিত হয়েছে কৃষকের সঙ্গে গরুর সম্পর্কটিও। প্রেমচাঁদ এই সম্পর্ককে পিতা-কন্যার সম্পর্ক বলে বর্ণনা করেছেন। জমি এবং গরু হারিয়ে কৃষক গিরিধারী অনেকটা মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে নিজের জমির ধারে কুয়ায় পড়ে প্রাণ হারায়। একে আত্মহত্যা বললেও অত্যুক্তি হয় না গিরিধারীর মৃত্যুর কারুণ্যের মধ্য দিয়ে প্রেমচাঁদ ভূমি ব্যবস্থার অসঙ্গতি ও অযৌক্তিকতা এবং তার ফলে কৃষকের দুরবস্থা তুলে ধরতে চেয়েছেন।

---

[৫] মুনশী প্রেমচন্দ, *বলিদান*, মান সরোবর-৮, পৃ. ৬৬

[৬] প্রগুক্ত, পৃ. ৬৭।

ভূমিহীন কৃষকের মজুর হয়ে যাওয়ার বর্ণনা রয়েছে *কুরবানী* গল্পে। একটি ঐতিহাসিক পট পরিবর্তন, এক নতুন যুগ পুঁজিবাদী অর্থনীতির, শিল্প বিকাশের ইঙ্গিত রয়েছে এই গল্পে। এ বিষয়ে প্রেমচাঁদের মনোভাবের পরিচয়ও পাওয়া যায় এখানে। শিল্পের বিকাশকে প্রেমচাঁদ সহজে মেনে নিতে পারেননি। স্বাধীন কৃষকের শ্রমিক হয়ে যাওয়া তাঁর নিকট দাসত্ব ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। মজুরীর কথা ভাবতেই তার (গিরিধারীর) হৃদয় ব্যাকুল হয়ে যায়। এতদিন স্বাধীনতা আর সম্মানের সুখ ভোগের পর অধম চাকরির আশ্রয় নেওয়ার চেয়ে মরে যাওয়াই তার নিকট ভাল মনে হয়। সে যতদিন কৃষক ছিল, তাকে গ্রামের সম্মানিত মানুষের মধ্যে গণনা করা হত, গ্রামের কোনো ব্যাপারে তার বলবার অধিকার ছিল। তার ঘরে অর্থ ছিল না, কিন্তু সম্মান ছিল। ..... এখন তাকে কে ডাকবে। কে তার দুয়ারে আসবে।"[৭] কেবল গিরধারীর ভাবনায় নয়, বরং প্রেমচাঁদ সরাসরি *কুরবানী* গল্পের শেষে এ জীবনকে অপমানিত অসম্মানিত বলে উল্লেখ করেছেন,

> کالکادین نے اب گردھاری کے کھیتوں سے استعفادے دیا ہے کیوں کہ گردھاری کی روح ابھی تک اپنے
> کھیتوں کے چاروں طرف منڈلاتی رہتی ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی اپنی کھیتوں کو دیکھ کر اسے تسکین
> ہوتی ہے۔انکارناتھ بہت کوشش کرتے ہیں کہ زمین اٹھ جائے۔ لیکن گاؤں کے لوگ اب اس کی طرف
> تاکتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ [৮]

(কালিকাদিন গিরিধারীর জমি ছেড়ে দিয়েছে। কারণ গিরিধারী এখনও তার জমির চারপাশে ঘুরঘুর করে। অন্ধকার হওয়া মাত্রই আলো এসে বসে আর মাঝে মধ্যে রাতের বেলা ওদিক থেকে ওর কান্নার আওয়াজ শোনা যায়। সে কাউকে কিছু বলে না, কাউকে জ্বালাতন করে না। সে মুধু তার জমিগুলোকে দেখেই সন্তুষ্ট থাকে। সাঁঝের বাতি জ্বলবার পর ওদিকটার রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে যায়। লালা ওঙ্কারনাথের খুব ইচ্ছে যে জমিগুলো কেউ নেক, কিন্তু গাঁয়ের লোকেরা এখন ও জমির নাম মুখে আনতেও ভয় পায়।)

প্রেমচাঁদের এ মন্তব্য থেকে কৃষি অর্থনীতি এবং কৃষকের প্রতি তার পক্ষপাত বুঝে নিতে কষ্ট হয় না।

জমিদার ও মহাজনদের নির্মম শোষণবৃত্তির ফলে বহু কৃষকের ফসল ফলানো জমি দেনার দায়ে ক্রোকে বিক্রয় হয়ে মহাজনদের গর্ভে ঢুকেছে এবং কৃষকরা সেজেছে ভূমিহীন দিনমজুর শ্রেণী। বাকী খাজনার দায়ে ভূমি নিলামে উঠে বিক্রি হয়ে গেছে। এভাবে বহু কৃষক ভূমিহীন হয়ে দিনমজুরে পরিনত হয়েছে। *পৌষ কি রাত* (پوس کی رات) প্রেমচাঁদের এমনই একটি বিখ্যাত গল্প। মে, ১৯৩০ সালে 'মাধুরী'তে প্রথমে হিন্দিতে এবং পরে 'প্রেম চল্লিছি'তে প্রকাশিত হয়।[৯] এ গল্পেও কৃষকের দারিদ্রতার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। গল্পের নায়ক হল্কু পরিশ্রম করে জমি চাষ

---

[৭] মুনশী প্রেমচন্দ, *বলিদান*, মান সরোবর-৮, পৃ. ৬৮

[৮] প্রেমচাঁদ, 'পৌষ কি রাত', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ, (মদন গোপাল সম্পাদিত)*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১০, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ২০৮।

[৯] আব্দুল কাভী দাছনভী, *প্রেমচাঁন্দ*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ২০১১, পৃ. ২১।

করে কিন্তু তা থেকে যা ফসল আসে তা দিয়ে জমির খাজনা দেওয়াও সম্ভব হয় না। তাকে মজুরি করেই খাজনা পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু এর পরও সহ্য করতে হয় জমিদারের পীড়ন, দেখতে হয় তার রক্তচক্ষু।

সহনা খাজনা নিতে আসলে হল্কু তার স্ত্রী মুন্নিকে তার কম্বল কিনার তিন টাকা তাকে দিয়ে দিতে বলে। মুন্নি টাকাটা প্রথমে দিতে চাইছিল না কিন্তু পরে সহনার গালাগালির ভয়ে মুন্নি তাকে তিন টাকা খাজনা বাবদ দিয়ে দেয়। পৌষ এসে গেছে প্রায়, কম্বল কিনার নেই কোন টাকা, হাড় কাঁপানো শীত থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যাবে ? তাইতো হল্কুর চোখে মুখে অজানা এক আতঙ্ক। প্রেমচাঁদের ভাষায়,

ہلکو تھوڑی دیر تک چپ کھڑا رہا اور اپنے دل میں سوچتا رہا۔ پوس سر پر آگیا ہے بغیر کمبل کے رات کو وہ کسی
طرح کھیت پر نہیں سو سکتا۔ [১০]

(হল্কু কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল আর মনে মনে চিন্তা করতে লাগল, পৌষ মাস মাথার উপর এসে গেছে। কম্বল ছাড়া মাচায় রাতে কিছুতেই সে শুতে পারবে না।)

পৌষের অন্ধকার রাত। আকাশের তারাগুলোও যেন শীতে থর থর করে কাঁপছে। রাত্রিতে কন কনে শীতে ক্ষেত পাহারার উদ্দেশ্যে হল্কু আখের পাতার ছাউনির নিচে বাঁশের মাচার উপর ও তার পোষা কুকুর জাবরা মাচার নিচে পাহারা দিতে শুরু করে। বেচারা হল্কু উত্তর দিকের হিমেল বাতাসের কারণে একটি পুরনো মোটা সুতি চাদর দ্বারা নিজেকে কোনমতে মুড়ি দিয়ে হি হি করে কাঁপতে থাকে আর ঐ দিকে জাবরা মুকখানাকে পেটের ভীতর ঢুকিয়ে কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে।

প্রচন্ড শীতে আর থাকতে না পেরে হল্কু জবরাকে আস্তে করে তুলে ওকে কোলে টেনে নেয়। জাবরার মাথাটাকে আস্তে আস্তে চাপড়াতে থাকে। কুকুরটার গা থেকে না জানি কেমন একটা দুর্গন্ধ আসে, তবু হল্কু তাকে কোলে জাপটে ধরে এমন আরাম পায় যা সে ইদানিং কয়েক মাস পায়নি। আজ হল্কুর কুকুরের প্রতি কোন ঘৃণা নেই। সামাজিক দারিদ্রতা তাকে আজ এই অবস্থায় পরিবেস্টিত করে ফেলেছে। জাবরা বোধ হয়ে ভাবে এই বুঝি স্বর্গ। হল্কুর নিষ্পাপ মনেতে কুকুরটির প্রতি লেশমাত্র ঘৃণাও নেই। এই যে দারিদ্র্য ওকে আজ এই অবস্থায় এনে ফেলেছে তা ওর মনকে মোটেই আহত করেনি। এই অদ্ভুত বন্ধুত্ব তার হৃদয়ে সমস্ত দরজা খুলে দিয়েছে। আর তার প্রতিটি অনুকণাকে যেন আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলেছে। হল্কুর অবস্থা তুলে ধরতে ইংরেজী লেখক Nandini Nopany and P. Lal বলেন,

---

[১০] ড. ওমর রাইছ, *'পৌষ কি রাত'*, *প্রেমচাঁদ কে নমায়েন্দাহ আফছানে*, এডুকেশনাল বুক হাউজ, আলীগড়, ২০১০, পৃ. ১১০।

Halku’s dos jabru who keeps body-snuggling company with his master through the chilly night. Halku’s last sentence happiness ends the story on an unexpected but characteristically Premchandian note of cautious optimism.[১১]

এভাবে এক ঘন্টা কেটে গেলেও শীতে কারো চোখে ঘুম নেই। রাত যেন শীতকে হাওয়ার ঝাপটা দিয়ে আরও মানিয়ে তোলে। হল্কু উঠে বসে হাঁটু দুটোকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে দু’হাঁটুর মাঝখানে মাথাটা গুঁজে নেয়। তবুও শীত মানে না। মনে হয়, যেন সব রক্ত জমে বরফ হয়ে গেছে। ধমনীতে রক্তের বদলে বরফ বইছে। সে ঝুঁকে আকাশের দিকে তাকায়। রাত এখনো অনেক বাকী ! হল্কুর ক্ষেত থেকে একটু দূরে একটি আম বাগান। পাশের অহরহ ক্ষেতে গিয়ে কয়েকটা গাছ উপড়ে নিয়ে তা দিয়ে ঝাড়ু বানিয়ে হাতে ঘুঁটে সে বাগানের দিকে যায়। জাবরা তাকে দেখে কাছে এসে লেজ নাড়তে থাকে। হল্কু বলে, আর তো থাকতে পারছি নারে জবরু। চল, বাগানে পাতা জড়ো করে আগুন পোহাই। একটু গা গরম করে নেই, তারপর এসে শোব, এখনো অনেক রাত। জাবরা কুঁই-কুঁই করে সম্মতি জানিয়ে আগে আগে বাগানের দিকে এগিয়ে যায়।

ঘন্টাখানিক পরে পাতা সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বাগনে আবার অন্ধাকার ছড়িয়ে পড়ে। ছাইয়ের নিচে কিছু কিছু আগুন রয়েছে, যা বাতাসের ঝাপটা এলে একটু জ্বলে পরক্ষনেই আবার নিভে যায়। হল্কু আবার চাদর গায়ে জড়িয়ে নিয়ে গরম ছাইয়ের পাশে বসে গুন গুন করে একটা গান করে। গা টা ওর গরম হয়েছে বটে, কিন্তু আস্তে আস্তে আবার শীতে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। জোরে রজারে ঘেউ ঘেউ করে জবরু ক্ষেতের দিকে ছুটে যায়। হল্কুর যেন মনে হয় এক পাল জানোয়ার ওর খেতে এসে ঢুকেছে। বোধ হয় নীল গাইয়ের পাল। ওদের দাপাদাপি, ছুটোছুটির আওয়াজও পরিষ্কার ওর কানে আসে। মনে হচ্ছে যেন ওরা ক্ষেতের ফসল খাচ্ছে। ওদের চিবানোর চর্-চর্ আওয়াজও শোনা যায়। হল্কু মনে মনে বলে- নাহ, জবরু থাকতে কোনো জানোয়ারের সাধ্যি নেই খেতে ঢুকতে। ও ছিঁড়েই ফেলবে তাকে। এ আমার মনের ভুল। কই, আর তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না। আমি কী যে ভুল শুনি ! নীল গাইগুলো হল্কুর ক্ষেতটাকে সাবার করে দেয়। সেই দুঃখে মুন্নি সকালে হল্কুকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে বলে- এই টং তুলে লাভ হলো কি ? সারা ক্ষেত ছারখার হয়ে গেছে। আর তুমি এখনো ঘুমাও। মুন্নীর কথা শুনে হল্কু ক্ষেত-খামারী করা ছেড়ে দিয়ে দিনমজুরীকে বেছে নেয়। এ প্রসঙ্গে স্ত্রী মুন্নী তার স্বামীকে যে কথা শুনায় তা সহজে হৃদয়ে রেখাপাত করে। মুন্নী তার স্বামীকে বলে,

اب مجوری کرکے مال گجاری دینی پڑے گی، تو چھوڑدو کھیت۔[১২]

---

[১১] Nandini Nopany and P. Lal, *Twenty Four Stories by Premchand*, Vikas Publishing House, New Delhi, 1980, P- 16.

(এখন দিনমজুর খেটে জমির খাজনা শুধতে হবে। ক্ষেত-খামারী তুমি ছেড়ে দাও।)

এভাবে প্রেমচাঁদ দরদ ভরা মন নিয়ে কৃষকের শ্রমিকে পরিণত হওয়ার স্বার্থক ছবি ফুটিয়ে তুলেন। তিনি নিজেও তাদের দুঃখে দুঃখী, তাদের শোকে শোকার্ত। শ্রমজীবী কৃষক-মজুরদের দমিয়ে রাখতে ও শোষণ করতে জমিদার শ্রেণীর তুলনা নেই। এরা যেমন ছিল প্রভাবশালী তেমনি অত্যাচারী, প্রেমচাঁদের *পৌষ কী রাত* গল্পের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কৃষক সমাজের ওপর বিশেষ একশ্রেণীর সামন্ত প্রভুদের তথাকথিত শ্রেণীর যে শোষণ, পীড়ন ও নির্যাতনের চিত্র এঁকেছেন- তাতে ব্যক্তিগত ভাবে লেখকের অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আছে সত্য কিন্তু এই সামন্ত বা জমিদারী উচ্ছেদের স্বপক্ষে তাঁর কোন বলিষ্ঠ বক্তব্য কোথাও নেই।

প্রেমচাঁদের এরকম শত-শত ছোটগল্পে কৃষক ও মহাজন বা জমিদারের মধ্যে ভেদাভেদ, সামাজিক ভাবে তাদের মধ্যে দুরত্ব, জমিদারের অমানবিক অগ্নিচক্ষু আর পরিশেষে কৃষকের সব কিছু নিঃশেষ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি তার লিখনীতে পাওয়া যায়। প্রেমচাঁদের আর একটি অনবদ্য গল্প হলো *তাহরিক খায়ের* (تحریک خیر) । গল্পটি জুলাই, ১৯২১ প্রকাশিত হয়। বেগার খাটানো জমিদার কর্তৃক প্রজাপীড়নের আরেকটি দিক যা *তাহরিকে খায়ের* গল্পের উপজীব্য বিষয়। প্রেমচাঁদের ছোটগল্পে জমিদার ও মহাজনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিবাদ করতে দেখা যায় কখনো কখনো। কখনো এই প্রতিবাদ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের রূপ নেয়, আবার কখনো তা কেবল দু-এক জনের আবেগ ও ক্রোধের ফসল হয়েই থেকে যায়। গল্পে দেখা যায়, বেনারস জেলার বীরা গ্রামে সন্তানহীনা ভুনগি এক বৃদ্ধা বিধবা বাস করত। সহায় সম্পদ বলতে বড় আকারের একটা উনুন ছাড়া আর কিছুই ছিল না তার। গ্রামের লোকেরা ছোলা, ভুট্টা কিংবা ছাতু তার উনুনে ভাজত, এর ফলে তারা যা দিত তা দিয়ে তার দৈনিক আহার চলতো। গ্রামের জমিদার পন্ডিত উদয়ভানু পান্ডের এলাকায় বুড়ির থাকার কারণে বুড়িকে তার শস্য দানাগুলো ভাজার পাশাপাশি অন্যান্য কাজও বেগার ভাবে খেটে দিতে হত। চৈত্র মাস হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংক্রান্ত পর্ব বিধায় তখন শস্য দানা ভাজার ধুম পড়ে যায়। এসময় শস্য দানা ভাজার জন্য গ্রামের লোকেরা দলে দলে বুড়ির কাছে আসতে থাকে। ব্যস্ত বুড়ির কাছে তখন জমিদারের শস্য ভরা বড় বড় ঝুড়ি এনে তা তিন দিনের মধ্যে ভাজার হুকুম দিয়ে যায়। বুড়ি এই সময়ের মধ্যে এতগুলো শস্য ভাজতে না পারার কারণে জমিদার পেয়াদা তার উনুন ভেঙ্গে ফেলে। পুরো মাস যাবার পর জমিদার খাজনা নিতে বুড়ির বাড়ীতে এসে দেখে বুড়ি নতুন উনুন তৈরী করেছে। জমিদার তখন তার হুকুম ছাড়া উঁনুন বানানোর কারণে লাথি মেরে উনুন ভেঙ্গে ফেলে ও বুড়ির কোমরে বেশ কয়েকটি লথি মারে। প্রেমচাঁদ বুড়িকে শারিরীক ভাবে নির্যাতন এবং তার রাগ-অনুরাগ অনুধাবন করে তার ভাষায় এ ভাবে ব্যক্ত করেন,

---

[১২] ড. ওমর রাইছ, *'তাহরিক খায়ের'*, *প্রেমচাঁদ কে নমায়েন্দাহ আফছানে*, এডুকেশনাল বুক হাউজ, আলীগড়, ২০১০, পৃ. ১১৭।

اب اسے غصّہ آیا۔ کمر سہلاتی ہوئی بولی۔ ٹھاکر۔ تمھیں آدمی کا ڈر نہیں ہے تو دیوی دیوتا کا ڈر تو ہونا چاہیے۔

مجھے اس طرح اجاڑ کر کیا پاؤ گے؟ کیا اس چار انگل دھرتی میں سونا نکل آئے گا۔ میں تمھارے ہی بھلے کو

کہتی ہوں۔ گریب کی ہائے بری ہوتی ہے۔ میرا دل مت دکھاؤ۔ [১৩]

(এবার তার রাগ হয়। কোমরে হাত বুলোতে বুলোতে সে বলে ওঠে- মহারাজ, মানুষের ভয় তোমার না থাক, কিন্তু ভগবানের ভয় থাকা উচিত। আমাকে এভাবে উচ্ছেদ করে তুমি কী পাবে ? এই চার আঙুল জমি থেকে কি সোনা বেরিয়ে আসবে ? আমি তোমার ভালোর জন্য বলছি, গরিবের অভিশাপ নিয়ো না। আমাকে আর দুঃখ দিয়ো না।)

জমিদার প্রচন্ড ক্ষেপে যায়। তিনি তার পেয়াদাদের বুড়ির বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিতে বলে। পেয়াদারা জমিদারের কথা মত বুড়ির বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। বুড়ির তার বাড়ীতে আগুন দেখে নিজেকে আর দমিয়ে রাখতে পারেনি। তৎক্ষনাৎ সে ঐ আগুনে ঝাপ দিয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। প্রেমচাঁদের বিভিন্ন ছোটগল্পের পাতায় পাতায় প্রজাদের উপর জমিদার শ্রেণীর বিভিন্ন শোষণ নিপীড়নের কাহিনী এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

প্রেমচাঁদ *কফন* (کفن) গল্পটি রচনা করেছেন সমকালীন সামাজিক দিকগুলো অবলোকন করে, যা প্রতিনিয়ত সমাজে ঘটে যাচ্ছিল। *কাফন* গল্পে ঘীসু ও মাধবের নৈরাশ্য, কর্মবিমুখতা ও অমানবিক আচরণ কৃষকের শোষিত ও বঞ্চিত জীবনকে অধিকতর প্রকট করে তোলে। গল্পটি সর্বপ্রথম উর্দুতে মাসিক পত্রিকা 'জামানাহ'তে ডিসেম্বর ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। এর কয়েক সাল পরে হিন্দিতে মাসিক 'চান্দ'তে এপ্রিল, ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। [১৪] গল্পের ইঙ্গিতময় ব্যঞ্জনা পাঠকের আবেগ প্রবণ হৃদয় ও যুক্তি নির্ভর মস্তিষ্ক উভয়কেই স্পর্শ করে। গল্পে দেখা যায়, চামারের সংসারে বুধিয়া প্রসব বেদনায় ছটফট করছে আর ঐ দিকে মাধব ও তার বাবা ঘিসু আগুনে পুড়া আলু খাচ্ছে। ঐ কাজের মধ্যে ফাঁকিবাজী ও আলসের কারণে গ্রামে ওদের খুব বদনাম ছিল। তাই কেউ তাদের কাজ দিতে চাইতোনা। ঘিসু ছেলে মাধবকে তার বৌয়ের কাছে যেতে বললে সে রাগ হয়ে তার বাবাকে যেতে বলে। মাধব বাবাকে বলে, যদি বুধিয়া বাচ্চা প্রসব করে, ঘরে তেল, গুড় কিছুই নেই, তখন কী অবস্থা হবে তাদের। ঘিসু ছেলেকে স্বান্তনা দেয়, আমার ওতো কিছুই ছিল না, তার পরও তো আমার ন-নটা ছেলে। ভগবানের উপর বিশ্বাস হারাস না, এক রকম জোড়া তালি দিয়ে কাজ চলে যাবে। সকালে মাধব উঠে দেখে বউ ও তার সন্তান মারা গেছে। কান্না কাটি করতে করতে কাফনের কাপড় কেনার জন্য সাহায্য পাবার আশায় তারা জমিদারের কাছে যায়। জমিদার তাদের দুই জনের উপর আগে থেকেই অনেক ক্ষ্যাপা ছিল। কারন জমিদার কখনোই তার কাজে ঘীসু ও মাধবকে কাছে পাননি। *কফন* গল্পে জমিদারের রাগ এভাবে তুলে ধরা হয়,

---

[১৩] প্রেমচাঁদ, 'কফন', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, *(মদন গোপাল সম্পাদিত)*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১০, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৫০১-৫০২।
[১৪] মানিক টাল, *প্রেমচাঁন্দ : কুচ নয়ি মোবাহেছ*, মর্ডান পাবলিশান হাউজ, নয়া দিল্লী, আক্টোবর- ১৯৮৮, পৃ. ১৪৭।

دور ہو یہاں سے۔"لاش گھر میں رکھ سڑا۔یوں تو بلانے سے بھی نہیں آتا۔آجب غرض پڑی تو آکر خوشامد کر رہا

ہے۔حرام خور کہیں کا۔بد معاش" [১৫]

(দূর হ সামনে থেকে। এমনিতে তো ডাকলে আসিস না। আজ গরজ পড়েছে, তাই এসে খোশামোদ করছিস। হারামখোর, বদমাশ কোথাকার।)

কিন্তু বৌ মারা গেছে শুনে তাদের দুই টাকা দেন। আর পাড়া প্রতিবেশীদের কাছ থেকে চারআনা, একআনা জোগার করে মোট পাঁচ টাকা জমিয়ে কাফনের কাপড় ও কমদামি লাকড়ি কিনতে বের হয়। বউয়ের কথা ভুলে গিয়ে মাধব আর তার বাবা এক মদের বারে গিয়ে এক বতল মদ ও কিছু মাছ কিনে বাহিরে বসে পড়ল। পুরো নেশাগ্রস্থ হয়ে মাধব বাবাকে বলে, কাফনের কাপড়ের কিসের দরকার, এমনিতেই রাত হয়ে গেছে। কে দেখতে যাবে লাশকে পড়ানো হয়েছে কিনা। পুড়লে তো কাফনের কাড়পটি আগে পুড়ে যাবে। কে যে এই বাজে নিয়ম বের করেছে। বেঁচে থাকা অবস্থায়ত বুধিয়া উদলা শরীলে ছিল। এখন মরে গেছে বলে তাকে কাফনের কাপড় কেন পড়াতে হবে ? প্রেমচাঁদের ভাষায়,

"کیسا برا رواج ہے کہ جسے جیتے جی تن ڈھانکنے کو چیر ھڑا بھی نہ ملے اسے مرنے پر نیا کپھن چاہیے۔"[১৬]

(কেমন তরো যে বাজে রেওয়াজ সব, বেঁচে থাকতে গা ঢাকার জন্য একখানা ছেঁড়া তেনাও যে পায়নি, মরলে তার জন্য নতুন কাফন চাই।)

বাকি টাকা থেকে তারা দু'সের পুড়ি, চাটনি, মেটের কাচি ও আচার কিনে খাওয়ার পর কিছু পয়সা বাঁচল, সে কয়টা পয়সা তারা এক ভিক্ষারীকে দিয়ে দিল। মাধব খুশীতে বউকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলতে লাগল, এমন মৌজের সন্ধ্যেটা সে পেল তার মরা বউয়ের বদৌলতে। তার বউ ভালো ছিল, মরে গেল আর ভালো জিনিস খাইয়ে গেল। এই বলে মাধব বউয়ের জন্য কাঁদতে লাগলো। তখন ঘিসু মাধবকে শান্তনা দিয়ে বলতে লাগলো, বউ মারা গেছে ভালোই হয়েছে। এই অভাবগ্রস্থ সংসারে সে কতই না কষ্ট করেছে। ভগবান তাকে সর্গে রাখবেন। পুরো মাতাল হয়ে ঘিসু গান গাইতে লাগলো- "ঠগিনী, কেঁয়ো নৈনা ঝমকায়ে। ঠগিনী"। ছেলেও বাবার সাথে সুর মিলাতে লাগলো। কখনো তারা গান গাইতে গাইতে একজন অপরজনকে জড়িয়ে ধরছে আবার নাঁচতে নাঁচতে ঢলে পড়ছে, কখনো লাফাচ্ছে। এই ভাবে তারা রাস্তার মধ্যে লুটিয়ে পড়ল। অন্যান্য মাতালরা তাদের কান্ডকারখানা দেখে তাকিয়ে রইল। গল্পের শেষে দেখা যায়, মৃতের জন্য কাফনের কাপড় না কিনে মদ খেয়ে টাল হয়ে পড়ে থাকে

---

[১৫] ড. ওমর রাইছ, '*কফন*', *প্রেমচাঁদ কে নমায়েন্দাহ আফছানে*, এডুকেশনাল বুক হাউজ, আলীগড়, ২০১০, পৃ. ২২৯।
[১৬] প্রেম গোপাল মিত্তল, '*কফন*', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৮৩২।

তারা। অলসতা ও দারিদ্রতা মানুষকে কিভাবে পশুত্বে পরিণত করে তা অত্যন্ত নিপুণভাবে প্রেমচাঁদ এই গল্পে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। ইংরেজী কবি David Rubin অল্প কথায় *কফন* এর ঘটনা এভাব তুলে ধরেণ,

> There is hardly any plot. Modho's wife Budhiya dies in child birth; his father and he are low-caste village ne'er-do-wells. Their problem is to get money to buy a shroud for her cremation. By the time they collect the money, they are tired and thirsty; they go to a toddy shop where they spend the entire sum on cheap liquor. They get drunk and delirious, having rationalized to themselves that providing pleasure for the feeling living is a better way of spending money than getting a shroud for the feeling less dead. [১৭]

প্রেমচাঁদ তাঁর ছোটগল্পে মহাজনি শোষণের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কেন কৃষক বাধ্য হয় মহাজনের নিকট ঋণ গ্রহণ করতে আর মহাজন দরিদ্র কৃষকের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে কিভাবে তাকে সর্বস্বান্ত করে। তিনি এটিও দেখিয়েছেন, যে কৃষক একবার ঋণ গ্রহণ করে তার আর কোনোক্রমেই নিস্তার নেই, শীঘ্রই সে পরিণত হয় ভূমিহীন মজুরে। শোষণের ক্ষেত্রে সমাজ, ধর্ম কিভাবে মহাজনের সহায়ক হয়েছে তা প্রেমচাঁদের দৃষ্টি এড়ায়নি। আইনের ফাঁকে কেমন করে মহাজনেরা সরকারি নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে কৃষক শোষণ অব্যাহত রেখেছে তার চিত্রও অঙ্কন করেছেন প্রেমচাঁদ। গ্রামের অজ্ঞ, অশিক্ষিত, দরিদ্র জনসাধারণের আয়ের উৎস ছিল অত্যন্ত সীমিত। অভাবেরর সময় গ্রামের লোক সুদখোর মহাজনের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়। মহাজনরা এ সুযোগে চক্রবৃদ্ধি হারে চড়া সুদে টাকা ধার দিত, অল্পদিনে সেই দেনা সুদে আসলে স্ফীত হয়ে উঠত, কৃষকদের ঋণের বোঝা কোন দিনই শেষ হত না, বরঞ্চ দেনার দায়ে অনেক সময় ভিটেমাটি পর্যন্ত নিলাম হয়ে যেত। মহাজনের শোষনের ক্ষেত্রে জমিদার, জমিদারের কর্মচারী, সরকারি কর্মচারীর সহায়তার প্রক্রিয়া চিহ্নিত হয়েছে প্রেমচাঁদের বিভিন্ন ছোটগল্পে।

ধর্ম এবং ধর্মীয় সংস্কার কেমন করে কৃষক শোষণের ক্ষেত্রে মহাজনের সহায়ক হয়, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় প্রেমচাঁদের *সোয়া সের ঘেঁহু* (*سوا سیر گیہوں*) গল্পের মাধ্যমে। এই গল্পটি নভেম্বর ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়। এই গল্পটিতে অনেকে হয়ত অতি কথনের প্রলেপ বা চমক আবিষ্কার করবেন। কিন্তু এই প্রলেপ খুব পাতলা এবং স্বচ্ছ। এই স্বচ্ছ আবরণটুকু সরালে দেখা যাবে গল্পটি সুদৃঢ় বা বাস্তব ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। গল্পের প্রথমেই কৃষকের

---

[১৭] David Rubin, *Widows, wives, and other heroines* : twelve short stories, New York : Oxford University Press, Delhi, 1998, P- 56.

দারিদ্র্য অত্যন্ত সহজে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কৃষক শঙ্করের দারিদ্র্য কেবল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রেমচাঁদের ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা সর্বময় গ্রামীণ দারিদ্র্য এবং কৃষকের পশুতুল্য জীবন যাপনকে উপস্থিত করে যাদের দৃষ্টিত গমের আটা 'দেবতার খাদ্য'। এই বোধ দীর্ঘ বঞ্চিত জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা সৃষ্ট। গল্পের নায়ক শঙ্কর গ্রামের একজন নীচুজাতের কৃষক ছিল। সে ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে ও গরিব। নিজের কাজ নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত থাকত, অন্য কারও ব্যাপারে কখনো নাক গলাত না। সে কোনো প্রকার প্রতারণা ও চালাকি জানত না। সে সাধু অথবা মহাত্মার খুব ভক্ত ছিল। নিজে না খেয়ে থাকত কিন্তু যদি কোন সাধু তার বাড়িতে পা রাখত, তবে তাকে আতিথিয়তা না করে যেতে দিতো না। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় একজন সাধু তার বাড়ীতে এসে হাজির হলো। শংকরের বাড়িতে শুধু যবের আটা ছিল। এটাতো একজন মহাত্মাকে দেয়া যায় না। শংকর দারুণ চিন্তায় পড়ে যায়, এই মহাত্মাকে রাতে কি খেতে দেবে। মহল্লায় অনেক লোক বসবাস করে কিন্তু তাদের মাঝে উচুজাতের দেবতুল্য কেউ ছিল না। মহল্লায় কারও বাড়িতে গমের আটা পাওয়া গেল না। সৌভাগ্য বশত সে গ্রামের মহাজন পুরুতের বাড়িতে কিছু গমের সন্ধান পায় আর তার কাছ থেকে সোয়া সের গম ধার করে নিয়ে আসে। তার স্ত্রী এই গম পিষে মহাত্মার জন্য আহার তৈরী করে দেয়। সাধু বাবা রাতে আহারের পর ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে শংকরকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করে চলে যায়। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবছর ঠাকুরকে দু'বার গম দিতে হতো। শংকর ভাবল এ সামান্য সোয়া সের গম ঠাকুরকে ফেরৎ দেওয়া লাগবে না। ধান কাটার মৌসুমে ঠাকুর তার বাড়িতে এলে শংকর যা দিত তার বদলে দ্বিগুন গম দিয়ে নিজেকে ঋনমুক্ত মনে করলো। কিন্ত সময় মত সে ঠাকুরকে গম দেওয়ার সময় গম পরিশোধের কথা কিছুই বলে নি। ঠাকুরও কোনোদিন শংকরকে গম ধারের কথা মনে করিয়ে দেয়নি। বেচারী শংকর কখনও ভাবেনি, এই ধার শোধ করত তার প্রাণান্ত হবে। দীর্ঘ সাত বছর কেটে যাবার পর ঠাকুর এখন মহাজনে পরিণত হন। সে এখন সুদী ব্যবসা শুরু করেন। এর মধ্যে শংকরের জীবনে ছোট ভাইয়ের বাড়ী থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে অনেক উত্থান-পতন ঘটে যায়।

এই ভাবে আরো সাত বছর কেটে যাওয়ার পর একদিন সন্ধ্যায় পুরুত মহাজন তার গতিরোধ করেন, আর তাকে সুদে আসলে পাওনা গম বাবদ সাড়ে পাঁচ মন গম দিয়ে দিতে বলে। শংকর বিস্মিত হয়ে বললো, আপনি ভুল করছেন, আপনি কেন; আমার কাছে কেউ এক আউন্স গম বা এক কনা দানাও পায় না। মহাজন তখন তার পূর্বের সোয়া সের গম ধার নেওয়ার কথা মনে করিয়ে দিল এবং বললো এখন সুদে আসলে তা সাড়ে পাঁচ মণে উন্নিত হয়েছে। তুমি কি সে ধারের কথা অস্বীকার করছো। শংকর বললো, একথা সত্যিই যে নির্দিষ্ট ভাবে ধার শোধের কথা বলিনি, কিন্তু বছরের একবার শোধ বা উপহার দেয়ার সময় সব সময় দুই-এক সের বাড়তি গম যোগ করে দিয়েছি। এখন আপনি আমার কাছে সাড়ে পাঁচ মন গম দাবি করছেন। কিন্তু আমি এত গম কোথায় পাব ? ঠাকুর জবাব দেয়, হিসাব এক জিনিস আর উপহার অন্য জিনিস। যা কিছু আমাকে দিয়েছ সব ছিল উপহার। উপহারের কিন্তু হিসেব রাখা হয় না। তুমি ইচ্ছে করলে, পাঁচ সেরের স্থলে পঁচিশ সের দিতে পারো। আমার হিসেবের খাতায়

তোমার নামে সাড়ে পাঁচ মণ গম পাওনা লেখা আছে। তুমি যে কোনো লোককে হিসাব করার জন্য বলতে পার। গম ফেরৎ দিলে তোমার নাম খাতা থেকে কেটে দেব, অন্যথায় হিসাব চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকবে। শংকর মহাজনের কাছে অনুনয় বিনয় করতে থাকলে মহাজন জবাব দেন, আমি আর একটি কণাও তোমাকে দিতে রাজি নই। তুমি এ জগতে আমার পাওনা আদায় না করলে পরকালে তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। ধর্ম এবং ধর্মীয় সংস্কার কেমন করে কৃষক শোষনের ক্ষেত্রে মহাজনের সহায়ক হয় তার ইঙ্গিত করেছেন প্রেমচাঁদ সোয়া সের ঘেঁহু গল্পে।

মহাজনের কথায় শংকর ভয়ে কেঁপে উঠে, সে শিক্ষিত হলে হয়তো জবাবে বলতে পারতো, ভালোকথা, আমি পরলোকে তা পরিশোধ করব। সেখানে দেনাপাওনার হিসেব এ জগতের চেয়ে মারাত্মক হবে না। অন্তত এ ব্যাপারে সাক্ষী পাওয়া যাবে না। তাই চিন্তার কোনো কারণ নেই। আসলে বিপ্র মহারাজ যখন শঙ্করের নিকট ধার নেয়া গমের দাম নিতে আসে তখন শঙ্কর ইচ্ছা করলে তা অস্বীকার করতে পারত। যেহেতু এই ঋণের কোনো লিখিত দলিল ছিল না। কিন্তু অশিক্ষিত কৃষক শঙ্করের মনে ধর্মভীতি ও ব্রাহ্মণ ভীতির কারণেই সে ঋণ শোধ করতে সম্মত হয়। ব্রাহ্মতেজ সম্পর্কে তার মনে আজীবন যে সংস্কার জমা হয়েছে এ তারই ফল। এই অশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায় কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না, এটি পূর্বজন্মের পাপের শাস্তি বলেই মেনে নেয়। প্রেমচাঁদ এখানে সমাজের ও ধর্মের আচার-বিচার ও নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে ব্যক্তি জীবনের একটি সামঞ্জস্য খুঁজে পেতে চেয়েছেন। এতে সামাজিক সংস্কার আর হিন্দু ধর্মীয় মূল্যবোধকেই প্রকারান্তরে সমর্থন করে ব্যক্তির প্রতি অহেতুক অন্যায় করা হয়েছে। প্রেমচাঁদের ভাষায়,

اس فصلہ کی کہیں اپیل نہ تھی۔ مزدور کی ضمانت کون کرتا؟ کہیں پناہ نہ تھی، بھاگ کر کہاں جاتا؟ دوسرے روز سے اس نے پنڈت جی کے یہاں کا کام کرنا شرع کر دیا۔ سوا سیر گیہوں کی بدولت عمر بھر کے لیے غلامی کی بیڑیاں پاؤں میں ڈالنی پڑیں۔ اس بدنصیب کو اب اگر کسی خیال سے سکین ہوتی تھی تو اسی سے کہ یہ سب میرے پچھلے جنم کا بھوگ ہے۔ عورت کو وہ کام کرنے پڑتے تھے جو اس نے کبھی نہ کیے تھے۔ بچے دانہ دانہ کو ترستے تھے۔ لیکن شنکر چپ دیکھنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکتا تھا، وہ گیہوں کے دانے کسی دیوتا کی بد دیا کی طرح تمام عمر اس کے سر سے نہ اترے۔ [১৮]

---

[১৮] প্রেমচাঁদ, 'সোয়া সের ঘেঁহু', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, *(মদন গোপাল সম্পাদিত)*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৩৮৭।

(এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো আপিল চলে না। মজুরের জামিন কে হবে ? কোনো জায়গাও নেই, পালাবে কোথায় ? পরের দিন থেকে সে বিপ্রজির ওখানে কাজ করতে শুরু করে দিল। সোয়া সের ঘীর কারনে জীবনভর দাসত্বের শৃংখল পায়ে পড়তে হল। এই দূর্ভাগ্য শান্তি বয়ে আনতে পারে এমন ভাবনায় যে, এ সবকিছু পূর্ব জন্মের পাপের ফসল। এখন তার স্ত্রীকে এমন সব কাজ করতে হয় যা কোনো দিন করতে হয়নি। ছেলেরা খাবার জন্য ছটফট করে, কিন্তু চুপচাপ দেখা ছাড়া শংকরের আর কিছু করার থাকে না। ওই গমের দানা কোনো দেবতার অভিশাপের মতো সারা জীবন তার মাথা থেকে আর নামল না।)

অবশেষে শংকর ও মহাজন উভয়ের সম্মতিতে ঋণের পরিমান হিসাব করে ধার্য করা হলো ষাট টাকা। ষাট টাকার উপর আবার শতকরা তিন টাকা সুদে দলিল সম্পাদিত হলো। এক বছরের মধ্যে ঋণ শোধ করতে না পারলে, সুদের হার শতকরা সাড়ে তিন ভাগে উন্নীত হবে। দলিল রেজিস্ট্রি ও স্ট্যাম্প বাবদ ব্যয় এক টাকা আটানা শংকরকেই বহন করতে হবে। গ্রামের লোকজন ঠাকুরকে অভিশাপ দিল সত্যিই, কিন্তু কেউ তার মুখোমুখি হলো না, কারণ সবাইকে মহাজনের দ্বারস্থ হতে হয়। গ্রামে এমন কোনো সাহসী লোক নেই যে ঠাকুরকে অস্বীকার করতে পারে। শংকর এক বছর যাবৎ অমানষিক হারভাঙ্গা পরিশ্রম করে, একবেলা খায়তো অন্য বেলা উপোস থাকে, শীত-গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে, জামা-কাপড় বিবস্ত্র অবস্থায় ষাট টাকা এক বছরে জোগাড় করে মহাজনের কাছে গেল। মহাজনকে এই ষাট টাকা নিয়ে বাকি পনের টাকা তিন মাসের মধ্যে শোধ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু মহাজন পুরো টাকা এক সাথে দিতে বলেন নতুবা পুরো টাকা শোধ না করলে তোমাকে শতকরা সাড়ে তিন টাকা হারে সুদ দিতে হবে। তোমার মর্জি হলে টাকা রেখে যেতে পার নতুবা নিয়ে যাও।

এভাবে আরো তিন বছর কেটে যাবার পর মহাজন শংকরকে হিসাবের খাতা খুলে দেখায় যে, ষাট টাকা দেওয়ার পরও সে আরও একশত বিশ টাকা পাওনা আছে। শংকর বলে, এই দেনা আমি এ জগতে নয় বরং পরলোকে শোধ করে দিব। ঠাকুর রেগে গেলে শংকর বলে, আপনি আমার একটি বলদ ও আমার কুঁড়ে ঘড়টি নিয়ে নেন। ঠাকুর বলেন, এগুলো আমার দরকার নেই। পরিশোধ করার মত তোমার কাছে অনেক কিছু আছে। তুমি টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত আমার ক্ষেতে বেগার খেটে দেবে। বিনিময়ে তোমার স্ত্রী-পুত্র ও তোমাকে সকালে নাস্তার জন্য আধ সের বার্লি দেব। তোমার পরনের জন্য জামা আর গায়ে দেয়ার জন্য কম্বলও দেব। অবশেষে সে এক মুঠো গমের জন্য ঠাকুরের ক্ষেতে বিনা বেতনে বেগার কাজ শুরু করে। তার স্ত্রী কোনোদিন কায়িক পরিশ্রম করেনি অথচ এখন তাকে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়। বিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল, শংকর আর বেঁচে নেই। কিশোর থেকে যৌবনে পদার্পণকারী শংকরের ছেলেটি এখন ঠাকুরের বাড়িতে দৈনিক বেগার খাটে। একমাত্র ভগবানই জানেন, কবে ছেলেটি বাবার দায় থেকে মুক্তি পাবে ? প্রেমচাঁদ এভাবে সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাস্তব ঘটনাগুলো খুজে বের করে পাঠককে সজাগ করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তার মতে পৃথিবীতে এখনও এমন ঠাকুরের ন্যায় মহাজনের অভাব নেই।

মহাজন দ্বারা কৃষকের সর্বশান্ত হওয়া নিয়ে লেখা প্রেমচাঁদের আরো একটি গল্প হলো *মুক্তিধন (مکتی دھن)*। লালা দাউদয়াল উচ্চহার সংগ্রহকারী একজন সুদী ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর মূল পেশা কাছারীতে মোক্তারী করা, আর তা থেকে সঞ্চিত টাকা শতকরা পচিঁশ টাকা থেকে ত্রিশ টাকা সুদে রোজগার করা। তার কাজ কারবার অবশ্য নিম্নবর্গের লোকেদের নিয়ে। সে উচ্চবর্গের লোকেদের থেকে দূরে থাকত, তার কারণ হলো- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা কায়স্থকে টাকা ধার দেওয়ার চেয়ে কুয়োয় ফেলে দেওয়া অনেক ভালো। লালা দাউদয়াল একদিন কাছারী থেকে বাড়ীতে ফিরছিলেন, এমন সময় সে দেখলো, যা মদন গোপালের ভাষায়,

রহমান, এক অতি গরীব মুসলমান কৃষক। তিনি তার তিন সের দুধ দেয়া বলিষ্ট চেহারার গাঁই গরু সাথে একটা সুন্দর ফুটফুটে বাছুর, অভাবের তারণায় বাজারে বিক্রি করতে এসেছে। আর তা নেওয়ার জন্য ক্রেতাদের ভীড় জমে গেছে। কিন্তু কেউ তাকে মনের মত দাম দিতে চাচ্ছে না। তিনি গভীর ভাবে গাভীটির দিকে তাকান। আর কসাইয়ের কাছে গরুটি বিক্রি করতে তিনি সম্পূর্ণ নারাজ, যদিও তারা তাকে চল্লিশ টাকা দিতে রাজি হচ্ছিল। লালা দাউদয়ালের গাঁই গরুটির প্রতি লোভ হয়। সে দাম জিজ্ঞাস করলে রহমান পঞ্চাশ টাকা চায়, অপর দিকে লালা দাউদয়াল কেনার জন্য ত্রিশ টাকায় থেমে থাকে। পরে উভয়ের মধ্যে পয়ত্রিশ টাকায় রফা দফা হয়।[১৯] আসলে রহমান ছোট থেকে এই গরুটিকে লালন পালন করে আসছিল। লালা দাউদয়াল কে গরুটি দেওয়ার পরও অন্যান্য ক্রেতারা গরুটির দাম চল্লিশ টাকা পর্যন্ত হাকায়। কিন্তু সে তাদের কাছে তা বিক্রি করেনি। কারণ জানতে চাইলে সে বলল- তারা সবাই কসাই, গরুটি নিয়ে তারা জবাই করে ফেলবে। আর আপনি লালা দাউদয়াল একজন সাচ্চা হিন্দু, আপনি গরুটিকে আদর করে লালন পালন করবেন। বলতে বলতে সে গরুটি সহ লালা দাউদয়ালের পিছু পিছু বাড়িতে এসে দাম বুঝে নিল। রহমানকে দেখে লালা দাউদয়ালের শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে গেলো। মনে মনে তিনি বললেন,

بھگوان ! اس شرینی (درجہ) کے منشیہ میں بھی اتنا سوجنیہ اتنی سہر دیتہ (نرم دلی) ہے۔ یہاں تو بڑے تلک ترپُنڈ دھاری مہاتما قصایوں کے ہاتھوں گئوئیں بیچ جاتے ہیں۔ ایک پیسے کا گھاٹا بھی نہیں اٹھانا چاہتے۔ اور یہ غریب 5 روپے کا گھاٹا سہہ کر اس لیے میرے ہاتھ گئو بیچ رہا ہے کہ یہ کسی قصائی کے ہاتھ نہ پڑ جائے۔ غریبوں میں بھی اتنی سمجھ ہو سکتی ہے۔[২০]

---

[১৯] Madan Gopal, *Munshi Premchand: A Literary Biography,* Asia Publishing House, Bombay, 1964. P- 246.

[২০] প্রেমচাঁদ, 'সোয়া সের ঘেঁহু', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ, (মদন গোপাল সম্পাদিত)*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ২৭৬।

("হে ঈশ্বর, আজ তুমি আমাকে মানুষের একি অপরূপ রূপ দেখালে ? প্রতিদিন খারাপ খারাপ লোক দেখে দেখে ভাল মানুষের কথা যেন ভুলেই গেছিলাম। আজ এ পথ দিয়ে না গেলে এই নিম্নবর্গের লোকেদের মধ্যে এতো দয়া মায়া থাকে জানতেই পারতাম না। কত সব বড় বড় কপালে তিলকধারী মহাত্মা নির্দয় কসাইদের হাতে এরা গরু বিক্রী করে। এক পয়সাও লোকসান করতে চায় না। কিন্তু এই দুরন্থ গরীব লোকটা পাঁচ টাকা লোকসান হচ্ছে জেনেও আমার কাছে তার গাঁইটা বিক্রী করেছে কেন ? তার উত্তর একটাই এবং মহত সেটা, গাঁইটা যাতে কোনো কসাইয়ের হাতে না যায়। ভাবতে অবাক লাগে, গরীব মানুষের মধ্যে এতখানি বোধশক্তি আছে!")

এদিকে হজ্জের সময় ঘনিয়ে আসলে রহমানের বৃদ্ধ মা ছেলেকে হজ্জে যাওয়ার কথা বলে। রহমান গরীব মানুষ, হজ্জে যেতে হলে কমছে কম দুইশত টাকা লাগবে। কোথা থেকে এত টাকা পাবে। কে তাকে এত টাকা ধার দিবে। মায়ের শেষ ইচ্ছা তার পূরন করতেই হবে। অনেক চিন্তা ভাবনার পর রহমান ঠিক করল, লালা দাউদয়ালে কাছেই ধার চাইবে। অন্যান্য ঋণ দাতার চাইতে তিনি ভালো মানুষ। তবে তিনি এক কথার মানুষ। সে এটা জানতো যে, টাকা না দিতে পারলে তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তবে তার বড় গুন হল, তিনি কাউকে ঠকান না, কারণ তার হিসেব পত্র সব পরিষ্কার, কাচের মতো স্বচ্ছ। এসব কথা গভীরভাবে চিন্তা করে রহমান তার কাছে যাওয়ার স্থির করল। সে আবার এও ভাবে, কথা ঠিক রাখতে না পারলে তার কী হবে ? তার শর্ত মতে তিনি তো নালিশ না করে আর ছাড়বেন না। বাড়ি-ঘর, গরু-বাছুর, সব নিলামে তুলে ছাড়বেন। তবু বিকল্প পথের কোনো আশা দেখতে না পেরে শেষ পর্যন্ত রহমান দাউদয়ালের কাছে গিয়ে হাজির হলো।

লালা দাউদয়াল সব কিছু শোনে শতকরা বত্রিশ টাকা হারে রহমান কে দু'শো টাকা ধার দিল। তার মধ্যে সে একশো টাকা পেলো আর বাকী টাকা থেকে কিছু টাকা ঋণের চুক্তিপত্র লেখার জন্য, কিছু টাকা নজরানা দিতে আর কিছু টাকা গেলো দালালীতে। অবশেষে রহমান ঘরে কিছু গুড় মজুত ছিল সেটা বেঁচে তার স্ত্রীকে সব কিছু বুঝিয়ে সুঝিয়ে মাকে সঙ্গে নিয়ে হজ্জে যায়। হজ্জ থেকে ফিরার পর দু'বছর পূর্ণ হলে লালা দাউদয়াল রহমানের বাড়ীতে লোক পাঠায়। কিন্তু রহমান তার মা অসুস্থ, অনেক খরচপাতি হয়ে গেছে, তার উপর আখের ক্ষেতে ভাল ফলন হয়নি ইত্যাদি অপারগতা প্রকাশ করে একবছরের সময় চেয়ে টাকা পরিশোশ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। দাউদয়াল গম্ভীর গলায় বললেন, সুদের হারটা যে বেড়ে শতকরা বত্রিশ টাকা হয়ে যাবে ? রহমান নির্বিকার ভাবে বলল, 'কি আর করা যাবে, হুজুরের যা মর্জি তাই হবে।' ঘরে ফিরে দেখে তার অসুস্থ বৃদ্ধ মা চিরদিনের জন্যে চোখ বুজেছেন। মাতৃবিয়োগের শোক সামলে নিয়ে মায়ের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াকলাপের জন্য সে পাড়া প্রতিবেশিদের কাছ থেকে ধার নিয়ে দাফন কাফন সমাপ্ত করলো। এখন মায়ের আত্মার শান্তির জন্য যাকাত, ফিতরা, কবরটা বাঁধানো, জ্ঞাতিদের খাওয়ানো, গরীবদের খৈরাত করা, কোরান পাঠ করানো এ সব করা প্রয়োজন। এত টাকা কোথা থেকে পাবে। তিনদিন হলো আগের টাকা পরিশোধের সময় দু'বছরের শর্ত পেরিয়ে গেছে। তথাপি আর অন্য কোন উপায়ন্ত না দেখে রহমান লালা দাউদয়াল এ দারস্ত হলো। দাউদয়াল পুনরায় দু'শত টাকা দিতে গিয়ে বললেন, এরই মধ্যে তোমার সুদে আসলে তিনশো টাকা ঋণ হয়ে গেছে আমার কাছে, আজ আবার দু'শো টাকা নিলে দু'বছর পরে সেটা সাতশো টাকায় গিয়ে দাঁড়াবে, এই হিসেবটার কথা কি ভেবে দেখেছো ? এ কথার উত্তরে রহমান বললো,

"غریب پرور۔اللہ دے تو دو بیگہ ادکھ میں پانچ سو آ سکتے ہیں۔اللہ نے چاہا تو میاد کے اندر آپ کی کوڑی کوڑی ادا

کردوں گا۔" [২১]

('গরীবের মা-বাপ খোদা যদি দয়া করেন, তাহলে দু'বিঘে জমি থেকে আখের যে ফলন হবে তা বিক্রী করে পাঁচশো টাকা পাবো। খোদার করুণা হলে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই আশা করি আপনার দেনা ঠিক মিটিয়ে দিতে পারবো'।)

দু'শত টাকা নিয়ে রহমান তার মার অন্তষ্টিক্রিয়া পুরোপুরি শেষ করার পর লালা দাউদয়ালের টাকা পরিশোধ করার জন্য সে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অবিরাম পরিশ্রম করতে লাগলো। তার কাছে রাত দিন সবই সমান, আলো আর অন্ধকারের মধ্যে কোনো তফাত নেই। বাড়িতে তার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরাও তার কাজে যথেষ্ট সাহায্য সহযোগীতা করছে। এবার প্রকৃতির দয়ায় ফসল খুবই ভাল হয়েছে। এতো বেশি আখের ফলন হয়েছে যে, হাতির দল খেয়েও তা শেষ করতে পারবে না। বিঘে প্রতি তার সাতশো টাকা লাভ হবে। রহমান ভাবে গুড়ের টাকা যেই ঘরে আসবে সবটাই দিয়ে আসবে লালা দাউদয়ালে কাছে। যদি দয়া করে তিনি তা থেকে দু'চার টাকা তাকে দেন তাহলেই নেবো, নইলে এ বছরটা খুঁদকুঁড়ো খেয়েই কাটিয়ে দিব।

প্রকৃতির কি নির্মম পরিহাস, হঠাৎ দমকা হাওয়া এসে আখ ক্ষেতে আগুন ধরিয়ে সারা বছরের সমস্ত অর্থ, পরিশ্রম বৃথা করে দিয়ে পুড়ে ছাই করে দেয়। ঘরে ফিরে এসে লালা দাউদয়ালের ঋণের টাকা শোধ দেবার চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ে। নিজের জন্যে সে আর ভাবে না, সে তার ছেলে মেয়েদের কথাও ভাবে না, কারণ বস্ত্রহীনতাই হল ভারতীয় কৃষকের পরিচয়, কিন্তু এখন তার একমাত্র চিন্তা হলো দাউদয়ালের ঋণের টাকাটা কী ভাবে শোধ দেবে ? নির্দিষ্ট দু'বছর সময় শেষ হতে যাচ্ছে। দু'চারদিনের মধ্যেই দাউদয়ালে লোক হয়তো ঋণ শোধের জন্য তাগাদা দিতে আসবে। কিন্তু তার কাছে কি করেই বা মুখ দেখাবে সে ? রহমান ভাবে, তার কাছে গিয়ে সে অনুরোধ করবে, আরো বছর খানেক সময় দেবার জন্য। তিনি যেরকম ভাল লোক, হয়তো তার অনুরোধ রেখে তাকে আরো একটা বছর সময় দেবেন। কিন্তু আর একটা বছর পিছিয়ে গেলে যে ঋণের সাতশো টাকা ন'শোতে গিয়ে ঠেকবে। ওদিকে দাউদয়াল তার বাড়ির প্রবেশ পথের সামনে পায়চারি করছেন, রহমান ছুটে গিয়ে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, 'হুজুর, আমি বড় বিপদে পড়েছি। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ তা বুঝতে পারবে না।' লালা দাউদয়াল সব কিছু জেনেও না জানার ভান করে রহমানকে বললো,

داؤدیال۔اب کیا صلاح ہے؟دیتے ہو یا نالش کردوں؟ [২২]

(দাউদয়াল- এখন এই সমস্যার সমাধান কি ? টাকা ফিরত দিবে না নলিশ করবো ?)

---

[২১] প্রেমচাঁদ, 'সোয়া সের গেঁহু', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ, (মদন গোপাল সম্পাদিত)*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ২৮০।
[২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩।

রহমান আবার তাকে করজোড় করে টাকা ফেরৎ দেওয়ার অঙ্গিকার করলো, কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হলো না। এভাবে মাহজন কতৃক কৃষকের দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে উচ্চহারে সুদ গ্রহণের সে প্রবণতা সমাজে ছিল তা প্রেমচাঁদের *মুক্তিধন* গল্পের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে।

বেটি কা ধন (بیٹی کا دھن) গল্পে কৃষকের প্রতি জমিদারের অত্যাচার ও অনাচারের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। গল্পটি ‘জামানা’ পত্রিকায় নভেম্বর, ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়। জীতন সিংহ অত্যাচারী জমিদার। তার বেগারের দৌরাত্ম্যে প্রজাগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সুক্খু চৌধুরীজেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করে জমিদারের অত্যাচারের বিষয়ে। জীতন সিংহ তার প্রতিশোধ নেয়, সুক্খু চৌধুরীর বিরুদ্ধে বকেয়া খাজনা আদায়ের মামলা দায়ের করে। একদিনের ব্যবধানে মামলার তারিখ ফেলা হয়। ঘোর বর্ষার কারণে চৌধুরী আদালতে উপস্থিত হতে পারে না। শীঘ্রই তার নিকট ক্রোকের নোটিশ পৌছায়। সুক্খু চৌধুরী জমিদারকে ভালো করেই চেনে, সে জানে জীতন সিংহের নিকট অনুরোধ করে কোনো ফল হবে না। অধর্ম জেনেও অবশেষে সুক্খ চৌধুরী কন্যার অলংকার বন্ধক রেখে অর্থ সংগ্রহ করে জমিদারের অর্থ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। *বেটি কা ধন* গল্পে মহাজনের হৃদয় পরিবর্তনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। যে ঝগড়ু সাহু জমিদরের বিরুদ্ধে সুক্খু চৌধুরীর নালিশ করবার কথা জানিয়েছিল জীতন সিংহকে, যে কৃষকের সম্পত্তি হস্তগত করবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, সেই মহাজন ঝগড়ুই কন্যার সম্পত্তি ভোগের ‘অধর্ম’ থেকে চৌধুরীকে রক্ষার জন্য বিনা বন্ধকে ঋণ প্রদান করে। সুক্খু চৌধুরীর চোখে সে দেবতা হয়ে যায়, আর তখন মহাজনের চরিত্র ঐতিহাসিক সত্য থেকে দূরে সরে যায়। লেখক ঝগড়ু মহাজনের মধ্যে ব্যক্তিগত অন্তর্দ্বন্ধ ও চরিত্র পরিবর্তনের মনস্তাত্ত্বিকতা দেখাতে চাননি বলে, উক্ত মহাজনকে তার শ্রেণীর প্রতিভূরূপেই শুধু বিচার করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

প্রেমচাঁদের এমন অনেক ছোটগল্পের ভিতরই মহাজন, জমিদার, ব্রাক্ষণ এবং নিচু জাতের সমাজ চিত্র লক্ষ্য করা যায়, তেমনি আরেকটি গল্প হলো *নসিব কি বদসুরত এসতেহযা* (نصیب کی بدصورت استہزا) জোখু পিপাসায় কাতর হয়ে ঘটিতে মুখ দিতেই নোংরা গন্ধ পাওয়া মাত্রই স্ত্রী গংঙ্গিকে দেখতে বলেন, গঙ্গী ঘটিতে নাক দিয়েসেও দুগন্ধ পায়। তৃষ্ণার্থ স্বামীকে পিপাসা দুর জন্য রাত নয়টার সময় ঠাকুরদার কুয়ার দিকে রওনা দেয়। ঠাকুরদা একজন ব্রাক্ষণ ছিলেন, তিনি শুধু মাত্র মানুষের আর্শীবাদ নিতেন ও নিষ্ঠুর ভাবে নিচু লোকদের লাঠি পেটা করতেন। অপরদিকে সাহুজির কুয়া যিনি সুধী ব্যবসা করে মানুষকে ঠকাতেন। তার কুয়া ছাড়া আর কোন কুয়া ছিল না। গ্রামের সকলেই সে কুয়া থেকে পানি পান করত।

কিন্তু তারা গংঙ্গির মত নিচু জাত লোকদের পানি নিতে দিতেন না। গংঙ্গি কোন উপায় না পেয়ে ঘটি আর দড়ি নিয়ে পানি নিতে ঠাকুরদার কুয়ার কাছে গেল। ঠাকুরদা তখনও বারান্দায় বসে ছিল। গংঙ্গি তাকে দেখে চাতালের পিছনে

লুকিয়ে থাকল। যখন ঠাকুরদা ঘুমানোর জন্য বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকল, তখন গংঙ্গি চাতালে উঠে ইস্ট নাম জপতে জপতে ঘটিটাকে কুয়োর মধ্যে ফেলল। ঘটি পানি ভর্তি করে চাতালে উপর রাখতে যাবে এমন সময় ঠাকুরদা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। ভয়ে গংঙ্গির হাত থেকে ঘটিটা পানিতে পড়ে বিকট আওয়াজ হল। আওয়াজ পেয়ে ঠাকুর বাবাজি কুয়োর সামনে আসল। গঙ্গি ভয়ে পিছন দিকে না তাকিয়ে সোজা বাড়িতে এসে হাজির হল। এসে দেখে পিপাসায় কাতর স্বামী নাক বন্ধ করে দুর্গন্ধ পানি পান করছে। গঙ্গি কান্না শুরু করল আর বলতে লাগলো,

"ভাগ্যের নিষ্টুর পরিহাসের কারনে যে আজ সমাজ থেকে তারা পরিত্যক্ত। আর এ কারনে স্বামীর পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত জল খেয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া আর কোন পথ নেই।"[২৩]

উচু নিচু ভেদাভেদ পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকেই চলে আসছিল। জমিদার-কৃষক, মহাজন-শ্রমিক, মনিব-চাকর, সব সমাজেই এই বিপরীত মেরুর অবস্থান বিরাজমান ছিল। প্রেমচাঁদ যেমন জমিদার-কৃষক, মহাজন-শ্রমিক এর কথা তার লিখনীর মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন, তেমনি মনিব-চাকরের সামাজিক অবস্থা তুলে ধরতে তিনি কোন কার্পন্য করেননি। যার প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করি *আসলাহ* (*اصلاح*) গল্পে। গল্পটি এপ্রিল ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়। এই গল্পে ক্ষুদ্র পরিসরে প্রেমচাঁদ শ্রম শোষণ, পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সভ্যতার বিভিন্ন দিকের সমালোচনা করেছেন। এই গল্পে তিনি প্রমান করতে চেয়েছেন, শ্রমের উপযুক্ত মূল্য না পেয়ে দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষ নিরুপায় হয়েই অসৎ পথ অবলম্বন করে। গল্পে দেখা যায়, দুর্গা ডক্টর মেহরা বার-এট-ল এর বাড়ীতে মাসে পাঁচ টাকার বিনিময়ে মালির কাজ করত। দুর্গা তিন সন্তান ও স্ত্রী নিয়ে কোনো মতে সংসার চালাতো। দূর্গার স্ত্রী প্রতিবেশীদের গম পিষে দিত। উভয়ের যা টাকা আয় হত তা দিয়ে তাদের কোন মতে সংসার চলে যেত। বাড়তি আয়ের আশায় সে মালিকের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বাগানের ফুল, ফল চুরি করে বাজারে নিয়ে পূজারীদের কাছে বেঁচে দিত। এ সবই ছিল তার বাড়তি আয়। সে কয়েক বার ডক্টর বাবুকে তার কষ্টের কথা জানিয়ে বেতন বাড়ানোর অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু মালিক মনে করতেন চাকরের টাকা বাড়ানো একটা সংক্রামক ব্যাধি, যা আস্তে আস্তে অন্যদের ভিতরেও ছড়িয়ে পড়ে। তিনি সোজাসোজি বলে দিলেন,

"دیکھو میں تمھیں جبرا تو نہیں روکتا، تمھارا یہاں نباہ نہیں ہوتا۔ کہیں اور تلاش کرو۔ میرے لیے مالیو کا قحط نہیں ہے۔"[২৪]

('দেখ, আমি তো তোমাকে বেঁধে রাখিনি, তোমার যদি না পোষায় তো অন্য কোথাও চলে যাও। আমার এখানে মালীর আকাল হবে না'।)

---

[২৩] পৃথ্বীরাজ সেন, সৌরেন দত্ত, *মুন্সী প্রেমচন্দ: গল্পসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, কামিনী প্রকাশালয়, ৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলকাতা, নভেম্বর- ২০০৯, পৃ. ৪৯৭।

[২৪] প্রেমচাঁদ, 'আছলাহ', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৩৭৩।

ডক্টর সাহেব বাগান প্রেমী ছিলেন। তিনি ফল-ফুল, বাগানের শাক-সবজি চাষ অনেক পছন্দ করতেন। তিনি তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের বাসায় তার বাগানের ফল-ফুল, শাক-সবজি নিয়ে যেতে পছন্দ করতেন। মাঝে মাঝে তিনি ফলের মৌসুমে সবাইকে দাওয়াত করতেন, আবার তার বাগানে মাঝে মাঝে পিকনিক করতেন। আর নিজের বাগানের সব কিছুর জন্য গর্ববোধ ও আনন্দিত হতেন।

তিনি প্রতিদিন সকাল বেলা নিজে তার বাগানে এসে ঘুরে যেতেন। তার ফল-ফুল দেখে তিনি খুশি হতেন। একবার বন্ধুদের ডেকে তিনি তার বাগানের সবচেয়ে সুস্বাদু ফল সুফেদা আম খেতে দাওয়াত করলেন। বাগানে তার বন্ধুদের নিয়ে গেলেন নিজের হাতে আম পেড়ে খাওয়ার জন্য। কিন্তু আমের বাগানে গিয়ে তিনি আশ্চার্য ও লজ্জিত হলেন। কারণ বাগানে গিয়ে দেখেন, গাছে একটাও আম নেই, যা সকালেও তিনি দেখে গেছিলেন। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, এটা নিশ্চয়ই মালীর বদমাইসি। আজ আমি তার হাড়গুঁড় এক করে ফেলব। ব্যাটা পাজি আমাকে কিভাবে ধোঁকা দিল। আমি অত্যন্ত লজ্জিত যে, আপনাদের অহেতুক কষ্ট দিলাম। এসব বলতে বলতে তিনি নৈরাশ্য ও বেদনা ভরে চেয়ারে বসে পড়লেন। বন্ধুরা সান্তনা দিতে গিয়ে তাকে বলল, ‘চাকরদের ব্যাপার সব জায়গাতেই এই রকম। এ জাতটাই পাজি। আমাদের কষ্ট হল বলে আপনি দুঃখ করবেন না। সুফেদা নাই বা হল, অন্য আম তো রয়েছে।’ ডক্টর সাহেব ব্যথিত ভাবে তাদের বললেন, সবই ঠিক আছে তবে সুফেদা আমটি এত মিষ্টি ও মসৃন, যা আপেল কেও হার মানায়। এই মালি আজ এমন অনর্থ ঘটাল যে, ইচ্ছে হচ্ছে নিমক হারামটাকে গুলি করে শেষ করে দেই। এখন সামনে পেলে ওকে আধমরা করে দিতাম। মালি বাজারে গিয়েছিল। সবাইকে আপ্যায়ন করে বিদায়ের পর ডক্টর মেহরা হাতে হান্টার নিয়ে ক্রোধের প্রতিমূর্তি হয়ে মালির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ইচ্ছে করে দূর্গা রাতে মালিকের বাড়ীতে ফিরছিল। কারণ পাকা চোরের সবচেয়ে বড় বন্ধু হল সময়। আস্তে আস্তে সময় যতই যাবে ততই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা যাবে। কিন্তু ঢুকার পথে সে দেখল মালিক হান্টার নিয়ে তার অপেক্ষায় বসে আছে। সে মনে মনে ভাবতে লাগল। আজ ধরা পড়ে গেছি। মালিক সব জেনে গেছে। আর ডক্টর সাহেব মালিকে দেখে ফেলেছেন। তার আর কোন পালানোর পথ নাই। ডক্টর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার বাগানের সুফেদা আম কোথায় ? কে চুরি করেছে এগুলো ? আমার তোকে চোর মনে হচ্ছে। যদি তুই নিয়ে থাকিস, তাহলে এগুলো এনে দে। নাইলে অবস্থা খুব খারাপ হবে। দূর্গা জবাবে বলল, মালিক আমি বাজারে যাবার সময়ও গাছে আমগুলো দেখে ছিলাম। হুজুর, আপনি মালিক। আপনার যা ইচ্ছা আপনি করবেন। তবে আমি আম পাড়িনি। আপনিই বলেন, এতদিন আপনি আমাকে রেখেছেন, কোনদিন কি একটা পাতায় হাত দিয়েছি ?

ডক্টর সাহেব তার কথায় বিশ্বাস না করে তিনি তাকে বললেন, প্রথমে তুমি ঘটিতে জল নেবে,তাতে তুলসী পাতা দেবে, তারপর শপথ করে বলবে, ‘আমি যদি আম পেড়ে থাকি তবে আমাকে যেন আমার ছেলের মুখ দেখতে না

হয়।' তাহলে আমার বিশ্বাস হবে। দূর্গা খুব বড় গলায় নিজের সাফাই গাইছিল, তবু মনে তার ভয় ঢুকে গিয়েছিল। সে তার ডেরায় গেল ঠিকই, কিন্তু ঘটিতে করে জল নেবার সাহস তার হল না। তার হাত কাঁপতে লাগল। সে ঠিক করল- 'আমি গঙ্গা মার নামে শপথ করব না। যদি এতে আমার চাকরি চলে যায়, যাক। দরকার হলে আমি দিন মজুরি খাটবো। কোদাল চালালেও সন্ধ্যা নাগাদ রাতের আটার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' সে ডক্টর এর সামনে এসে বলল, হুজুর আমি গঙ্গা জল দিয়ে শপথ করতে পারবো না। এখন আপনার যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। ধরে নিন আমি আপনার চাকর আম পেড়েছি। দিন-রাত তো আপনার হুকুমই তামিল করি। একবারের মত আমাকে মাফ করে দেন। আর কোনদিন এমন অন্যায় হবে না। এ কথা শুনে ডক্টর কি করেছিলেন তা প্রেমচাঁদের ভাষায়,

ڈاکٹر صاحب اتنے فیاض نہ تھے۔انھوں نے یہی احسان کیا کہ درگا کو پولیس کے سپرد نہ کیا اور نہ اسے ہنٹر لگائے۔
اس کے مذہبی اعتقاد نے انھیں کچھ نرمی کی جانب مائل کر دیا تھا۔ مگر ایسے بدنیت شخص کو اپنے یہاں رکھنا غیر ممکن
تھا۔انھوں نے اسی دم درگا کو معزول کر دیا اور اس کی باقی تنخواہ جرمانہ میں ضبط کر لی۔ [২৫]

(ডক্টর মহোদয় এতটা উদার ছিলো না। তবে তিনি এই বড়ো উপকারটুকু করলেন যে, দুর্গাকে পুলিশে দিলেন না কিংবা তার উপর হান্টার ব্যবহার করলেন না। দূর্গার ধর্ম বিশ্বাস ডক্টর সাহেবকে কিছুটা নরম করে ফেলেছিল। তবে এমন দুর্বলচিত্ত লোককে নিজের কাছে রাখাও ছিল অসম্ভব। তার অর্ধেক মাসের বেতন কেটে রেখে তিনি সেই মুহূর্তে চাকরি থেকে বিদায় করে দিলেন।)

কয়েক মাস পরে একদিন ডক্টর সাহেব তার বন্ধু প্রেমশংকর বাবুর (তিনিও একজন বাগান প্রেমী ছিলেন) কাছ থেকে গাছের ভালো কলম আনার জন্য তার বাগানে গেলেন। সেখানে তিনি দূর্গা মালিকে দেখে ফেললেন। ডক্টর সাহেবের মনে সে সময় দুর্গার প্রতি এক বিচিত্র ঈর্ষার উদয় হল। যে নরাধমকে তিনি দণ্ড দিয়ে নিজের কাছ থেকে তাড়ালেন, তার আবার চাকরি হয় কিভাবে ? দূর্গা তাকে দেখে কুয়োর পাশে দাড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে আবার নিজের কাজ করতে লাগল। তার এই ব্যবহার ডক্টর সাহবের হৃদয়ে ছুরির ফলার মতো বিধল। তার কাছে থেকে বেরিয়ে আসা দূর্গার পক্ষে মঙ্গলদায়ক হয়েছে, এই কথা ভেবে ডক্টর সাহেবের অত্যন্ত ক্রোধ হল। নিজের উদারতার জন্য তার যে অহংকার ছিল তাতে খুব আঘাত লাগল। সে তার বন্ধুকে বলল, দূর্গা কতদিন হল তার বাগনে কাজ করে। প্রেমশংকর বললেন-প্রায় ছ'সাত মাস ত হবেই। তখন মেহরা পুরোনো সব ঘটনা তাকে বলল, আরো বলতে লাগল, তুমি তাকে বিদায় করে দাও ভাল থাকতে চাইলে। না হলে সে তোমার বাগানের সব ফল-ফুল লোটপাট করে ফেলবে। সে অনেক বিশ্বাসঘাতক লোক আর এত ধূর্ত যে ধরা মুশকিল। প্রেমচাঁদ তার এই ছোটগল্পে চাকরের

[২৫] প্রেমচাঁদ, 'জুলুস', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১০, ডিসেম্বর, ২০০১,, পৃ. ৩৭৭।

প্রতি মনিবের জিদ, তাকে সামাজিক ভাবে অন্যের কাছে হেয় করা ও সমাজ থেকে এই জাতিকে ভিন্ন করার উচ্চকাংক্ষার মানসিকতা ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন।

মার্চ ১৯৩০ সালে 'হংস'তে প্রথম *জুলুস* (*جلوس*) গল্পটি প্রকাশিত হয়। পরে 'প্রেম চল্লিছি'তে প্রকাশ পায়।[২৬] স্বাধীন ভারতবর্ষ এবং পূর্ণ স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সমাজের উচু শ্রেণীর মানুষের চেয়ে সাধারণ গরীব মানুষরাই বেশী অংশ গ্রহণ করেছিল, আর তাদের আন্দোলন দেখে একদল মানুষ মজা নিত। এমনই একজন শমভুনার্থ এবং দীনদয়াল। তাদের মতে সমাজের বৃত্তবানরা এগিয়ে না আসলে সাধারন মানুষ কখনোই সফল হতে পারবে না। তাদের এই সব আলোচনা শুনে ম্যাকু প্রতিবাদ জানায়। সে বলে যারা প্রাসাদসম বাড়ি, গাড়ি, টাকা-পয়সার মালিক তারা কখনো এ পথে এসে ইংরেজদের বিরাগভাজন হবে না। তাই আজ তারা আর সাধারন মানুষের কষ্ট বুঝে না। তাদের আলোচনার এক পর্যায়ে চৌরাস্তায় মিছিল নিয়ে বৃদ্ধ নেতা ইব্রাহিমের নেতৃত্বে একদল সেচ্ছাসেবক হাজির হয়। কিন্তু তাদের পথ আটকে দাঁড়ায় দারোগা বীরবল এবং একদল সেপাই। ইব্রাহিম আলি দারোগাকে অনুরোধ জানায়, তারা শান্তিপূর্ণ ভাবে মিছিল করবে, তাদেন যেন বাধা না দেয়। কিন্তু বীরবল ডি.এস.পি'কে আসতে দেখে বীরত্ব দেখানোর জন্য মিছিলের উপর ঝাঁপিয়ে পরেন। এতে করে ইব্রাহিম আলি সহ অনেক স্বেচ্ছাসেবক আহত হয়। এখানে নিম্নশ্রেণী মানুষের দেশাত্ববোধতার জন্য লড়াই দেখা যাচ্ছে। মানুষের এই শ্রেণী বৈষম্য লেখক এখানে বুঝানোর চেষ্টা চালিয়েছেন। তাদের এইভাবে জীবন দিতে দেখে ম্যাকু, শম্ভুনাথ সহ অনেক দোকন বন্ধ করে শত শত মানুষ মিছিলে যেতে শুরু করে। এই অবস্থান মিছিলের কর্মীরা ইব্রাহিমকে পতাকার বাঁশ, উষ্ণীষ এবং রুমাল দিয়ে তৈরি অস্তায়ী স্ট্রেচারে করে যার যার বাড়ি ফিরে যায়। গল্পেদেখা যায় বীরবলের আঘাতে ইব্রাহীম নিহত হয়।

تین دن کے مسلسل بخار اور تکلیف کے بعد آج اس زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ جس نے کبھی عہدے کی خواہش نہیں کی، کبھی منصب کے سامنے سر نہیں چھکایا۔ انہوں نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میری لاش کو گنگا میں غسل دے کر دفن کیا جائے اور میرے مزار پر سوراجیہ کا جھنڈا نصب کیا جائے۔[২৭]

(তিন দিনের প্রচণ্ড জ্বর আর রোগভোগের যন্ত্রণার পর আজ ইব্রাহিমের জীবনাবাসন ঘটে, যিনি কখনো ক্ষমতার জন্যে লালায়িত ছিলেন না, কখনো অধিকারের সামনে মাথা নত করেননি। মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি তার সমর্থকদের বলে গেছেন, আমার মৃতদেহ যেন গঙ্গায় স্নান করিয়ে কবর দেওয়া হয় আর আমার মাজারে যেন স্বাধীনতার পতাকা উত্তীর্ণ করা হয়।)

নারী-পুরুষ, উঁচু-নিচু, অভিজাত-অন্ত্যজ নির্বিশেষে, সমাজের নিপীড়িত ও অবহেলিত শ্রেণীর প্রতি প্রেমচাঁদের যে গভীর সহানুভূতি ও মর্মবেদনার প্রকাশ দেখা যায়, সেটা যে পাশ্চাত্য প্রভাবেই ফলশ্রুতি প্রেমচাঁদের উনিশ শতকের

---

[২৬] আব্দুল কাভী দাছনভী, *প্রেমচাঁন্দ*, কওমী কাউন্সিল বরাযে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ২০১১, পৃ. ২১।

[২৭] মুন্সি প্রেমচাঁন্দ, 'জুলুস', *মাজমুয়াহ মুন্সি প্রেমচাঁন্দ ঃ আফছানে*, ছংগে মিল পাবলিকেশন, লাহোর, ২০০২, পৃ. ৬০১-৬০২।

নবজাগরণের প্রভাব সংঘাত, একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে। প্রেমচাঁদের সমাজ-সচেতনতা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। মানুষের হাতে মানুষের অপমান ও লাঞ্ছনা, শ্রেণী ভিত্তিক সমাজের অন্যায়-অবিচার, নিচু তলার মানুষের বিশেষ করে হিন্দু নারীর দুঃখ বেদনা ও মর্মজ্বালা প্রেমচাঁদের শিল্পীসত্তাকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছিল। এই অভিজ্ঞতা ও বেদনাই তার সৃষ্টির উৎসমুখ খুলে দেয়। ভারতীয় হিন্দুসমাজে নারী জাতির প্রতি দীর্ঘদিনের অন্যায় ও অবহেলা প্রেমচাঁদকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল। নারীর অবহেলিত ও বঞ্চিত সামাজিক অবস্থান বিষয়ে প্রেমচাঁদ ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। এ বিষয়ে তিনি অজস্র ছোটগল্প রচনা করেন। নারীর অবহেলিত জীবনকে বিষয়বস্তু করে তিনি রচনা করেছেন বহু গল্প-উপন্যাস। প্রেমচাঁদ নারীর সমান অধিকার দাবি করেন যেমন তার প্রবন্ধে তেমনি তাঁর কথা সাহিত্যেও। সে জন্যই তিনি ছোটগল্পের নারী চরিত্রকে আন্তরিক সহানুভূতি ও দরদ দিয়ে অংকিত করেছেন।

পরিবারে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। তার উপরই অনেকাংশে নির্ভর করে পরিবারের সুখ-শান্তি। নারীকে উপজীব্য করে প্রেমচাঁদ অসংখ্য পারিবারিক গল্প রচনা করেছেন। তাঁর এই সমস্ত গল্পগুলো সে সময়ে বেশ আলোড়ন তুলেছিল। প্রেমচাঁদের এ গল্পগুলো তৎকালীন সমাজের নারীদের জন্য যে আদর্শ ছিল তা সহজেই অনুমেয়। এমনি একটি গল্প হল *বড়ে ঘর কি বেটি* (*بڑے گھر کی بیٹی*) । যা জামানায় ডিসেম্বর, ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়। এটাই প্রথম ছোটগল্প যেখানে প্রেমচাঁদ নামে ছাপা হয়।[২৮] গল্পের নায়িকা আনন্দী এক উঁচু পরিবারের মেয়ে। তার পিতা এক ছোট রিয়াসাতের তালুকদার ছিল। আলিশান অট্টালিকা, একটি হাতি, তিনটি ঘোড়া, পাঁচজন উর্দিপরা সৈনিক, ঘোড়ার গাড়ি, শিকারী কুকুর, শিকারী পাখি, চিল, বাজ, বিছানাপত্র, কাঁচ, হাতিয়ার, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, ঋণ মোটকথা একটি মহামান্য তালুকদারের যে সব প্রয়োজন সব কিছুর সুবিধা-ই ছিল আনন্দীর বাবা ভুপসিং এর। তিনি ছিলেন একজন হাসি-খুশী ও যোগ্য মানুষ। তবে তার একটাও ছেলে সন্তান ছিল না। পর পর সাত সাতটি জীবিত মেয়ের পিতা হন তিনি। তার সমান বা তার চেয়ে উঁচু পরিবারে তাদের বিয়ে দেয়া তার রিয়াসাতকে ধূলায় মিশিয়ে দেয়ার নামান্তর ছিল। প্রথমে আবেগে তিন মেয়ের বিয়ে মন খুলে দিয়েছেন। যখন পনের বিশ হাজার টাকা ঋণ হয়ে গেল, তখন তার চোখ খুললো। হাত গুটিয়ে নিল। আনন্দী ছিল চতুর্থ কন্যা। সে তার অন্যান্য বোনের তুলনায় সবচেয়ে সুন্দরী ও ভাল চরিত্রের ছিল। এজন্য ভুপসিং ঠাকুর তাকে অনেক বেশী আদর করতেন। ঠাকুর সাহেব অত্যন্ত দ্বিধাদ্বন্দে ছিলেন তাকে কোথায় বিয়ে দিবেন। তিনি ঋণের বোঝা বারুক তা যেমন চাচ্ছিলেন না, আবার মেয়েটি নিজেকে দুর্ভাগী মনে করুক, এ সুযোগও দিতে চাচ্ছিলেন না। একদিন শ্রীকান্ত কোনো চাঁদা নিতে তার কাছে এলো। সম্ভবত নাগরী প্রচারের চাঁদা। সৌভাগ্যক্রমে জমিদার-পুত্র শ্রীকান্তর সাথে তাঁর দেখা হয়। ছেলেটির ব্যবহারে ঠাকুর ভূপসিং মুগ্ধ হন। তার উপর শ্রীকান্ত ইংরেজীতে বি.এ ডিগ্রি অর্জন সত্ত্বেও ইংরেজদের সামাজিকতার সমর্থক নয়। বরং এর বিপরীতে অধিকাংশ সময় দৃঢ়তার সাথে ইংরেজদের সমালোচনা করেন। এ জন্য গ্রামের

[২৮] আব্দুল কাভী দাছনভী, *প্রেমচাঁন্দ*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ২০১১, পৃ. ১১।

লোকেরা তাকে সম্মানের চোখে দেখে। দশমীর দিনে খুব আবেগের সাথে রাম লীলায় অংশ নেয়। তখন নিজেই কোনো চরিত্রে সঙ সাজে। তার কারণেই গৌরীপুরে রামলীলার প্রবর্তন হয়েছে। প্রাচীন প্রথা ধরে রাখার প্রবনতা তার চেয়ে বেশী আর কেউ নেই। বিশেষত একান্নবর্তী পরিবারের সে জোরালো সমর্থক। "উনিশ শতকের বাঙালি হিন্দু সমাজের যৌথপরিবার প্রথারয় বর-কনের বিয়েকে কোন কারণেই একটি নতুন সংসার তৈরির উদ্দেশ্যে দুটি আত্মার মিলন বলা চলেনা। বরং তদানীন্তন পুরুষসমাজের দৃষ্টিতে বিয়েটা ছিল Sankar Sengupta এর ভাষায়,

> 'A social institution to serve the whole household of the bridegroom.' [১]

(সমাজে বধূরা শ্বশুর গৃহে স্বামী এবং শ্বাশুড়ি উভয়ের দ্বারা অবহেলিত ও নিগৃহীত হত।")

বর্তমানের বধূরা বড় পরিবারের সাথে মিলে থাকাকে যেভাবে ভয় পায়, তা দেশ ও জাতির জন্য অশনি সংকেত মনে করে শ্রীকান্ত। এ কারনে অবশ্য গ্রামের বধূরা তাকে ভাল চোখে দেখে না। কোনো কোনো সম্ভ্রান্ত মেয়েতো তাকে তার দুশমন মনে করে। বরং তার মতামত হলো যদি নিজে সব টেনশন নিয়ে, সব কাজ নিজ থেকে করে দিয়েও পরিবারের সাথে মানিয়ে নেয়া না যায়, তাহলে প্রতিদিনের ঝগড়ার চেয়ে, জীবনকে তিক্ত করে তোলার চেয়ে আলাদা রান্না করেই খাওয়া ভাল। শ্রীকান্তের বাবা বেণীমাধব সিংহের এককালে জমিদারী ছিল। এখন আর সে অবস্থা নেই। ধুমধামের সাথে শ্রীকান্তের সাথে আনন্দীর বিয়ে হলো।

আনন্দী দেবী নতুন বাড়িতে এসে এখানকার চালচলন একটু ব্যতিক্রমই পেল। যে আনন্দ আর বিলাসিতায় সে ছোটবেলা থেকে অভ্যস্ত ছিল এখানে তার অস্তিত্বই নেই। হাতি ঘোড়া তো দূরে থাক, একটি সুসজ্জিত ছোট আকৃতির একটা গাড়িও নেই। বাগান বাড়ী নেই, এমনকি ঘরের জানালা পর্যন্ত ছিল না। মাটিতে গালিচা, দেয়ালে ছবিও ছিল না। সাদাসিদে গ্রামীণ বাড়ি। আনন্দী অল্প দিনেই এসব পরিবর্তনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিল। সবার সাথে আন্তরিকভাবে মিশে গেল। ফলে তার মনে হতো কোনোদিন কষ্টই দেখেনি।

একদিন দুপুরের সময় লাল বিহারী সিং দুটি মুরগী নিয়ে এলো। তার ভাবীকে বলল, তাড়াতাড়ি গোশত রান্না করে দিও, আমার অনেক ক্ষিদে পেয়েছে। আনন্দী মূল রান্না শেষ করে তার জন্য অপেক্ষা করেছিল। গোশত রান্না করতে গিয়ে কৌটায় দেখলো ঘি এক পোয়ার চেয়ে বেশী নেই। বড়ো ঘরের মেয়ে অল্প দিয়ে দেয়ার সবক ভাল করে পায়নি। সে সবটুকু ঘি গোশতে ঢেলে দিল। লাল বিহারী খেতে বসে দেখলো, ডালে ঘি নেই। সে বলল, 'ডালে ঘি দাওনি কেন ?' আনন্দী জবাবে বললো,

---

[১] Sankar Sengupta, A *study of women of Bengal,* 1st ed. Cal. 1970, P- 182.

آنندی: آج تو کل یاد بھر تھا وہ میں نے گوشت میں ڈال دیا۔ جس طرح سوکھی لکڑی جلدی سے جل اٹھتی ہے اسی طرح بھوک سے باؤلا انسان ذرا ذرا سی بات پر تنک جاتا ہے۔ لال بہاری سنگھ کو بھاوج کی یہ زبان درازی بہت بری معلوم ہوئی۔ تیکھا ہو کر بولا۔ "میکے میں تو چاہے گھی کی ندی بہتی ہو"

عورت گالیاں سہتی ہے، مار سہتی ہے، مگر میکے کی نندا اس سے نہیں سہی جاتی۔ آنندی سنھ بگیر کر بولی "ہاتھی مرا تو بھی نو لاکھ کا دہاں اتنا گھی روز نائی کہار کھا جاتے ہیں۔"

لال بہاری جل گیا۔ تھالی اٹھا کر پٹک دی اور بولا۔ "جی چاہتا ہے کہ تالو سے زبان کھینچ لے۔"

آنندی کو بھی غصہ آگیا۔ چہرہ سرخ ہو گیا۔ بولی۔ "وہ ہوتے تو آج اس کا مزہ چکھا دیتے۔"

اب تو جوان اجڑ تھا کر سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس کی بیوی ایک معمولی زمیندار کی بیٹی تھی۔ جب جی چاہتا تھا اس پر ہاتھ صاف کر لیا کرتا تھا۔ کھڑاؤں اٹھا کر آنندی کی طرف زور سے پھینکی اور بولا "جس کے گمان پر پھولی ہوئی ہو اسے بھی دیکھوں گا اور تمھیں بھی۔"

آنندی نے ہاتھ سے کھڑاؤں روکی۔ سر بچ گیا مگر انگی میں سخت چوٹ آئی۔ غصے کے مرے ہوا میں ہلتے ہوئے پتے کی طرح کانپتی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ عورت کا زور اور حوصلہ، غرور اور عزت مرد کی زات سے ہے۔ اسے شوہر کی طاقت اور مرد کی ہمت کا گھمنڈ ہوتا ہے۔ آنندی خون کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ [৩০]

(আনন্দী : আজ তো মাত্র এক পোয়া ঘি ছিলো। সবটুকু গোশতে ঢেলে দিয়েছি। যেভাবে শুকনো কাঠ খুব দ্রুত জ্বলে ওঠে, তেমনি ভাবে ক্ষুধার্ত মানুষ ছোটছোট ব্যাপারে ক্ষেঁপে যায়। লাল বিহারী সিং-এর কাছে ভাবীর এ গলা বাড়ানো খুব লাগলো। রেগে গিয়ে বলল, 'তোমার বাপের বাড়িতে মনে হয় ঘি এর নদী বয়ে চলে!'

মেয়েরা গালি সহ্য করে নেয়, মারধর সহ্য করে নেয়, কিন্তু বাপের বাড়ির নিন্দা সে সইতে পারে না। আনন্দী মুখ ভেংচিয়ে বলল, 'হাতি মরলেও নয় লাখ। সেখানে এটুকু ঘি কুমার নাপিতরা প্রতিদিনই খায়।'

আনন্দীর রাগ চরমে উঠে গেছে। চেহারা লাল হয়ে গেছে সে বলল, তিনি যদি থাকতেন তাহলে আজ মজাটা দেখিয়ে দিতেন। এবার গোয়ার যুবক নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। তার স্ত্রীর এক সাধারণ জমিদারের মেয়ে ছিল। যখন মন চাইতো তখন তার উপর হাত চালিয়ে দিতো। এবার আনন্দীর দিকে জোরে খড়মটি নিক্ষেপ করে বলল, যার ভরসায় তুমি ফুলে আছো তাকেও দেখে নিব আর তোমাকেও।

---

৩০ ড. ওমর রাইছ, 'বড়ে ঘর কি বেটি, *প্রেমচাঁদ কে নমায়েন্দাহ আফছানে*, এডুকেশনাল বুক হাউজ, আলীগড়, ২০১০, পৃ. ২৮।

আনন্দী হাত দিয়ে খড়ম ফেরালো। মাথা বেঁচে গেল তবে আংগুলে প্রচন্ড আঘাত পেল। রাগে গোস্বায় পাতার মতো থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে হাওয়ায় দুলে দুলে তার ঘরে গিয়ে দাঁড়ালো। স্ত্রীর শক্তি–ক্ষমতা, গর্ব-মর্যাদা তার স্বামী কেন্দ্রীক। স্বামীর শক্তি, স্বামীর সাহস তার অহংকার হয়। আনন্দী সব হজম করে চুপ করে গেল।)

শ্রীকান্ত সিং প্রতি শনিবার বাড়িতে আসে। এটা বৃহস্পতিবারের ঘটনা। আনন্দী এর মধ্যে কোনো খাওয়া দাওয়া করল না। স্বামীর পথ চেয়ে থাকলো, আর শেষ পর্যন্ত যথারীতি শনিবার সন্ধ্যায় সে এলো। বাড়ীতে এসেই উঠানে দেশ-গ্রামের লোকদের সাথে বসে কথা বললো। কিছু নতুন শালিসের বিষয় শুনলো। সিদ্ধান্তও দিলো। কথা-বার্তা বলতে রাত দশটা বেজে গেল। প্রথম দু'তিন ঘন্টা অত্যন্ত অস্থিরতায় কাটালো আনন্দী। রাতের খাবারের সময় হয়ে এলো। পঞ্চায়েত শেষ হলো। বৈঠকখানা যখন নীরব হলো তখন লাল বিহারী বললো, 'ভাইয়া, আপনি ঘরে বলে দিবেন, একটু মুখ সামলে যেন কথা বলে। অন্যথা একদিন সত্য-সত্যই খুন খারাবি হয়ে যাবে।'

বেণী মাধব সিং তা সমর্থন করে বললেন, 'পুরুষদের সাথে তর্ক করা বৌদের জন্য ভালো না।' লাল বিহারী : সে বড় লোকের মেয়ে ঠিক আছে, আমরাতো আর কামার কুমার নই। শ্রীকান্ত : আরে, ব্যাপার কী ? লালবিহারী : কিছুই হয়নি। এমনিতে নিজে নিজে জ্বলে উঠলো। বাপের বাড়ির সামনে আমাদেরকে তো কিছুই মনে করে না। শ্রীকান্ত খাওয়া দাওয়া করে আনন্দীর কাছে গেল। সেও গম্ভীর হয়ে বসে ছিল। এ বেঁচারাও কিছুটা রেগে ছিল। আনন্দী জিজ্ঞাসা করলো, শরীরটা ভালো তো ? শ্রীকান্ত বলল, অ-নে-ক ভালো। আজকাল ঘরে তুমি কী ঝড় বইয়ে দিচ্ছ ? আনন্দী তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। রাগে গোস্বায় শরীর ঘেমে গেল। সে বলল, 'যে আপনার কাছে এ আগুন লাগিয়েছে তাকে পেলে মুখ পুড়িয়ে দিতাম।' শ্রীকান্ত : এতো চটছো কেন ? বিষয়টাতো খুলে বলবে ?

আনন্দী : কী আর বলবো ? ভাগ্য ! না হলে একটা গুমূর্খ যে একটা চাপরাশির কাজ করার যোগ্যতাও রাখে না, সে আমাকে এভাবে খড়ম দিয়ে মেরে আবার বুক ফুলিয়ে চলতে পারতো না। তার কান টেনে ছিড়ে ফেলতাম। তারপরও আপনি জিজ্ঞাসা করছেন, ঘরে ঝড় বইয়ে দিচ্ছি কেন ? শ্রীকান্ত : বিস্তারিত বলোতো। আমি তো কিছুই জানি না।

আনন্দী : গতপরশু আপনার আদরের ভাই আমাকে গোশত রান্না করতে বলল। কৌটায় ঘি একপোয়া থেকে সামান্য বেশী ছিল। আমি পুরোটাই গোশতে ঢেলে দিলাম। যখন খেতে বসলো তখন বলল, ডালে ঘি নেই কেন ? ব্যস, এতেই আমার বাপের বাড়ি তুলে গালি-গালাজ শুরু করলো। আমি সইতে পারিনি। আমিও বললাম, সেখানে এতটুকু ঘি নাপিত কুমাররাই খেয়ে থাকে। এটা কেউ খোঁজও রাখে না। ব্যস এতটুকু কথাতেই এ জালিম আমার দিকে খড়ম ছুঁড়ে মারলো। আমি যদি হাত দিয়ে না ফেরাতাম তাহলে মাথা ফেটে যেতো। তাকেই জিজ্ঞেস করুন, আমি যা বলেছি তা সত্য নাকি মিথ্যা ? শ্রীকান্তের চোখ লাল হয়ে গেল। সে বলল, এতো বেড়ে গেছে। এতো দেখি অনেক খারাপ হয়ে গেছে।

আনন্দী কাঁদতে লাগলো। এটা তো মেয়েদের অশ্রু পুরুষের রাগে তেল ঢেলে দেয়ার কাজ দেয়। শ্রীকান্ত সহনশীল মানুষ। সম্ভবত সে কখনো রাগ করেনি। তবে আজ আনন্দীর অশ্রু বিষাক্ত পানীয়ের মতো প্রভাব ফেললো। সারা রাত এ পাশ ওপাশ করে কাটালো। সকাল হতেই তার বাবার কাছে নিয়ে বলল, 'বাবা, এ বাড়িতে আমার আর জায়গা হবে না।' এ কথা বা এ ধরনের আরও কোনো কথা বলার কারণে শ্রীকান্ত তার বন্ধুদেরকে কতবার যে গালমন্দ করেছে। যখন তার কোনো বন্ধু তাকে এমন কথা শুনাতো তখন সে তা নিয়ে হাসি তামাশা করতো। আর বলতো, তোমরা দেখি বৌয়ের গোলাম হয়ে গেছ। তাদেরকে আয়ত্বে রাখার পরিবর্তে তোমরা নিজেরাই তাদের আয়ত্বে চলে যাচ্ছ। আজ কিন্তু হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারের প্রবক্তা তার বাবাকে নিজেই বলছে- 'বাবা! এ বাড়িতে তো আর আমার জায়গা হবে না।' উপদেশ দাতার ভাষা তখন পর্যন্ত চলে যতক্ষণ সে ভালোবাসার কারসাজি থেকে বেখবর থাকে। ঠিক পরীক্ষার সময় নিয়ন্ত্রণ শক্তি আর জ্ঞান-বুদ্ধি অনেক সময় বিদায় নেয়। বেণী মাধব সিং পেরেশান হয়ে জিজ্ঞসা করলো, 'কেন ?'

শ্রীকান্ত : কারণ আমারও তো মান সম্মান আছে ? আপনার বাড়িতে বাড়াবাড়ি চলে। যে বড়দের প্রতি আদব দেখানোর কথা সেই বড়দের মাথায় চড়ে বসে। আমি তো অন্যের কৃতদাস হয়ে গেলাম। আমি বাড়িতে থাকি না। এখানে আমার অবর্তমানে বৌয়ের উপর খড়ম আর জুতা বর্ষণ হয়। কড়া কথা বলবে, ঠিক আছে। দু'য়েকটা কথা শুনিয়ে দিবে, তাও মেনে নেয়া যায়, কিন্তু আমাকে লাথি ঘুষি মারবে আর আমি সয়ে যাব তাতো হতে পারে না।

বেণী মাধব সিং কোন জবাব দিতে পারলেন না। শ্রীকান্ত সবসময় তাকে সম্মান করেই কথা বলে। তার এমন রাগ দেখে বুড়ঠাকুর বাকরুদ্ধ। শুধু এটুকু বললেন, 'বাবা! তুমি বুদ্ধিমান হয়ে একথা বলছো ? মেয়েরা এভাবে সংসার ধ্বংস করে দেয়। তাদের প্রশ্রয় দেয়া ভাল না।'

শ্রীকান্ত : এসব আমি জানি। আপনার দুয়ায় আমি এতো আহাম্মক নই। আপনি নিজেও জানেন, আমি গ্রামের কয়েকটি পরিবারকে আলাদা হবার ঝামেলা থেকে বাঁচিয়েছি। তবে ঈশ্বরের দরবারে যে নারীর মান-সম্মানের দায়িত্বশীল আমি, সেই নারীর সাথে এমন নির্যাতন মূলক আচরণ আমি করতে পারি না। আপনি বিশ্বাস করেন, আমি আমাকে অনেক নিয়ন্ত্রণ করছি। লাল বিহারীর কান টেনে দেইনি। এবার বেণী মাধব সিং-ও গরম হয়ে গেলেন। এ ঔদ্ধত্যের প্রতি কর্ণপাত না করে তিনি বললেন, লাল বিহারী তোমার ভাই। যখন সে ভুল করবে অবশ্যই তার কান মলে দিবে। তবে........................শ্রীকান্ত : লাল বিহারীকে এখন আমার ভাই মনে করি না। বেণী মাধব সিং : মেয়েদের পাল্লায় পড়ে! শ্রীকান্ত : জি, না। তার বেয়াদবি আর নির্দয়তার কারনে।

উভয়েই অনেকক্ষণ চুপ থাকলো। ঠাকুর মহাশয় ছেলের রাগ কিছুটা হালকা করতে চাচ্ছিলেন। তবে এটাও মানতে রাজি ছিলেন না লাল বিহারী কোনো বেয়াদবি বা নির্দয় কোনো কাজ করেছে। এ সময় কয়েকজন লোক হুক্কা

তামাক পান করার জন্য এসে বসলো। কয়েকজন মহিলা যখন শুনলো শ্রীকান্ত নিজেই বৌয়ের পক্ষ নিয়ে বাপের সাথে যুদ্ধাংদেহী অবস্থায় আছে তখন তারা মনে মনে খুবই খুশী হলো। আর উভয় পক্ষের অভিযোগপূর্ণ কথাগুলো শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে গেলো। কিছু হিংসুক সে গ্রামে ছিল, যারা এর পরিবারের শান্তি দেখে মনে মনে জ্বলছিলো। যারা মনে করতো শ্রীকান্ত তার পিতার সাথে তর্ক করেছে এটা তার অপরাধ। শ্রীকান্তের এতো লেখাপড়া করাটাও ভুল। বেণীমাধব সিং বড় ছেলেকে অনেক স্নেহ করেন, এটা তার অন্যায়। তিনি তার পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ করেন না। এটা তার নির্বুদ্ধিতা। এ ধরনের মানসিকতার লোকদের আজ আশাপূর্ণ হচ্ছে। হুক্কা পান করার বাহানায়, কেউ খাজনার রশিদ দেখানোর কৌশলে এসে বসে গেল। বেণীমাধব সিং বয়স্ক মানুষ। বুঝে গেলেন আজ একে থামানো কঠিন। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন বাইরের লোকদের হাত তালি দিতে দিব না। এজন্য যতই কষ্ট করতে হয় হোক। এক পর্যায়ে কথা বলার স্টাইল নরম করে নিয়ে বললেন, 'বাবা! আমি তোমার পর নই। তোমার মন যা চায় তা কর। এবার ছেলেটার ভুল হয়ে গেছে।'

পুত্র : তার এ ধরনের বাড়াবাড়ি কিছুতেই মাফ করতে পারব না। হয়তো সে এ বাড়িতে থাকবে, না হয় আমিই থাকব। আপনি যদি তাকেই বেশী পছন্দ করেন তাহলে আমাকে বিদায় দিন। আমি আমার দিক দেখব। আর যদি আমাকে রাখতে চান তাহলে তাকে বলে দিন যেখানে খুশী সেখানে চলে যাক। এটাই আমার শেষ কথা।

লাল বিহারী দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে চুপচাপ ভাইয়ের কথা শুনছিলো। সে ভাইকে অনেক সম্মান করতো। তার কখনও সাহস হয়নি। শ্রীকান্তের সামনে খাটে বসার, কিংবা হুক্কা পান করার অথবা পান খাওয়ার। নিজের বাবাকেও এতো আদর লেহাজ করতো না। শ্রীকান্তও তাকে মন থেকে ভালবাসতো। তার জানামতে লাল বিহারীকে সে কখনও ধমক পর্যন্ত দেয়নি। এলাহাবাদ থেকে বাড়ি আসার সময় অবশ্যই তার জন্য কিছু উপঢৌকন নিয়ে আসতো। ম্যাগডোরের একসেট জামা তাকে বানিয়ে দিয়েছিলো। গতবছর নাগ পঞ্চমির উৎসবে কুস্তিখেলায় তার চেয়ে দেড়গুন বড় যুবককে যখন হারিয়ে দিলো তখন খুশী হয়ে মঞ্চে গিয়ে তাকে গলা জড়িয়ে ধরেছিল। পাঁচ টাকা তাকে পুরস্কার দিয়েছিল। এমন প্রিয় ভাই থেকে লাল বিহারী সিং এ হৃদয় বিদারক কথা শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়লো। সে একটুও রাগ করলো না। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো। এতে কোনো সন্দেহ নেই, এখন লাল বিহারী তার কাজের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত। ভাই আসার একদিন পূর্বেও মনে মনে ভয় পাচ্ছিল, ভাইয়া জানি কী বলে ? আমি তার সামনে কী ভাবে যাব ? আমি তার সাথে কীভাবে কথা বলবো। আমি তার সামনে চোখ উঠিয়ে তাকাব কী ভাবে ? সে ভেবেছিল ভাইয়া ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে দিবে। এসব ভাবনার বিপরীতে তার ভাইকে অত্যন্ত রাগান্বিতই দেখছে। সে মূর্খ ছিল, তবু তার মন বলছিল, ভাইয়া আমার সাথে বাড়াবাড়ি করছে। যদি শ্রীকান্ত তাকে নির্জনে ডেকে নিয়ে দু'চারটে শক্ত কথা শুনিয়ে দিতো কিংবা দু'চারটা চড় মারতো তাহলেও সে এতো মর্মাহত হতো না। কিন্তু ভাইয়ার একথা বলা যে, 'তাকে আমি দেখতে চাই না' এটা লাল বিহারীর জন্য অসহ্য ছিলো। সে কেঁদে কেঁদে

বাড়িতে ঢুকলো, তার রুমে গিয়ে কাপড় পাল্টালো। চোখ মুছলো। যেন কিছু না বুঝে। এবার আনন্দী দেবীর ঘরের দরোজায় এসে বললো, 'ভাবী! ভাইয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি আমার সাথে থাকবে না। তিনি আমার চেহারা দেখতে চান না। তাই আমি যাচ্ছি। তাকে আর মুখ দেখাবো না। আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন।' এসব বলতে বলতে লাল বিহারীর গলা ভারী হয়ে এলো। লাল বিহারী যখন মাথা নত করে আনন্দীর দরোজায় দাঁড়িয়েছিল তখন শ্রীকান্তও চোখ লাল করে বাইরে থেকে এলো। ভাইকে দাঁড়ানো দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল। পাশ কাটিয়ে চলে গেল। মনে হচ্ছিল তার ছায়াটাও পাড়াতে চাচ্ছে না।

আনন্দী তার স্বামীর কাছে লাল বিহারীর ব্যাপারে অভিযোগ করেছিলো ঠিকই, কিন্তু এখন মনে মনে আফসোস করছে। সে ভাল মানসিকতার নারী। সে ভাবতেও পারেনি বিষয়টি এতটুকু গড়াবে। সে মনে মনে স্বামীর উপর ক্ষেপছিলো, তিনি এতো রাগ দেখাচ্ছেন কেন ? এটাও ভয় পাচ্ছিল, শ্রীকান্ত আবার আমাকে এলাহাবাদ যাবার কথা বলে বসে কিনা ? যদি বলেই বসে তখন আমি কী করব ? এসব চিন্তায় তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। এ অবস্থায় সে যখন লাল বিহারীকে দরোজায় দাঁড়িয়ে বলতে শুনলো, 'আমি এবার যাচ্ছি। মনের দাগ মুছে দেয়ার জন্য অশ্রুর চেয়ে বেশী কার্যকর আর কিছুই নেই। ইংরেজী কবি Nandini Nopany and P. Lal সংক্ষেপে *বড় ঘরকে বেটির* আনন্দীর ঘটনাটি বর্ণনা করেন এই ভাবে,

> *Bare Ghar ki Beti* is a simple, touching appreciation of the compassionate nature of a rich girl, Anandi, who gets married to Shrikanth Singh, whose family is financially much less affluent than Anandi’s. Anandi sparks off Tension between Shrikanth and his younger brother Lal Bihari when she reports Lal Bihari’s rude remarks about her parents to her husband. A major family crisis threatens and a break-up in imminent when the “rich daughter-in-law” suddenly resolves the problem by her genuine gentleness and forgiveness; she is after all, a girl “from a good family.” [৩]

---

[৩] Nandini Nopany and P. Lal, *Twenty Four Stories by Premchand*, Vikas Publishing House, New Delhi, 1980, P- 12.

শ্রীকান্তকে দেখে আনন্দী বলল, 'লালু বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক কাঁদছে।' শ্রীকান্ত : তাহলে আমি কী করব ? আনন্দীঃ ভেতরে ডেকে আনেন। আমার জিভ পুড়ে যাক। আমি কোথা থেকে এ ঝগড়া নিয়ে এলাম ? শ্রীকান্ত : আমি ডাকতে পারব না। আনন্দী : পরে আফসোস করবেন। সে অনেক অনুতপ্ত। বলা যায় না কোথাও চলে যেতে পারে। শ্রীকান্ত আর উঠলো না। ইতোমধ্যে লাল বিহারী আবার বলল, ভাবী! ভাইয়াকে আমার সালাম জানাবেন তিনি আমার মুখ দেখতে চাচ্ছেন না, তাই আমার মুখও তাকে দেখাব না। লাল বিহারী এসব বলে ঘুরে দাঁড়ালো। দ্রুততার সাথে বাইরের গেটের দিকে যেতে লাগলো এবং আনন্দী নিজের ঘর থেকে বের হয়ে তার হাত ধরে ফেলল। লাল বিহারী পিছনের দিকে তাকালা। চোখে অশ্রু নিয়ে বলল, 'আমাকে যেতে দিন।' আনন্দী : কোথায় যাবে ? লাল বিহারী : যেখানে আমার মুখ কেউ দেখবে না। আনন্দী : আমি তোমাকে যেতে দিব না। লাল বিহারীঃ আমি আপনাদের সাথে থাকার উপযুক্ত না। আনন্দী : তোমাকে আমার দিব্যি দিচ্ছি। তুমি এক কদমও সামনে বাড়াবে না। লাল বিহারী : আমার ব্যাপারে ভাইয়ার মন যতক্ষণ পরিস্কার না হচ্ছে ততক্ষণ এ বাড়িতে আমি কিছুতেই থাকব না।

আনন্দী : আমি ঈশ্বরের দিব্যি দিচ্ছি, তোমার ব্যাপারে আমার মনে কোনো কষ্ট নেই। এবার শ্রীকান্তের মন গলে গেল। সে বাইরে এসে লাল বিহারীকে গলায় জড়িয়ে ধরলো। দু'ভাই ফুপিয়ে ফুপিয়ে অনেকক্ষণ কাঁদলো। লাল বিহারী কান্নায় হেচকি দিয়ে বলল, ভাইয়া! আপনি কখনও বলবেন না, তোমার মুখ দেখব না, এ ছাড়া যেকোনো শাস্তি দিবেন তা সানন্দে মেন নিব।

শ্রীকান্ত কাঁপা কণ্ঠে বলল, লাল্টু এসব কথা ভুলে যা। ঈশ্বর চাইলে আর এসব বিষয় প্রয়োজন হবে না। বেণীমাধব সিং বাইরে থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। দু'ভাইকে এভাবে গলা জড়িয়ে থাকতে দেখে খুশী হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, বড় ঘরের মেয়েরা এমনই হয়। যে কোনো অবস্থা সামাল দিতে পারে। ঐ সময় উপস্থিত লোকেরা গ্রামের অন্যান্য লোকদের জানালো। তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রেমচাঁদের ভাষায়,

گاؤں میں جس نے یہ واقعہ سنا ان الفاظ میں آنندی کی فیاضی کی داد دی۔ "بڑے گھر کی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔"[৩২]

(গ্রামে যেলোকই এ কাহিনী শুনলো সবাই আনন্দীর উদারতার প্রশংসা করলো। আর বলতে লাগলো 'বড় ঘরের মেয়েরা এমনই হয়ে থাকে।')

[৩২] ড. ওমর রাইছ, 'ঘাস ওয়ালী, *প্রেমচাঁদ কে নমায়েন্দাহ আফছানে*, এডুকেশনাল বুক হাউজ, আলীগড়, ২০১০, পৃ. ৩৫।

নারীরা অবহেলিত কিন্তু আত্মসম্মান তাদের মধ্যেও বিরাজমান। প্রেমচাঁদের উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প *ঘাস ওয়ালী* (گھاس والی) তে কারই প্রমান পাওয়া যায়। গল্পটি ১৯২৯ সালে 'মাধুরীতে' প্রথমে হিন্দিতে প্রকাশিত হয়। পরে 'প্রেম চল্লিছি' প্রথম অধ্যায়তে উর্দুতে প্রকাশ পায়।[৩৩] এই গল্পে প্রধান চরিত্র তিনটি। মুলিয়া, চৈনসিংহ এবং মহাবীর। মুলিয়া এমন একটি মেয়ে যাকে দেখলে মনে হয় যে, বাগানে একটি গোলাপ ফুল ফুটে উঠেছে। বাদামি রং, হরিণীর মতো দুটি চোখ, টানা টানা চিবুক, গালে ঈষৎ লালিমা, টানাটানা চোখের পলক, চোখে অদ্ভুত সিক্ততা। মহাবীরের স্ত্রী হল মুলিয়া। সংসারের দৈন্যতার জন্য রোজ তাকে মাঠে ঘাস তুলে বিক্রি করতে হয়। সে তুলনায় মহাবীর এমন কোনো আকর্ষণীয় পুরুষ বা সম্পদশালী ব্যক্তি ছিল না। তা সত্ত্বেও মুলিয়া তার কাছে টিকে আছে। তার মধ্যে এমন কি গুন আছে ? এমন সব প্রশ্ন জাগে তাদের মনে, যারা মুলিয়াকে না পাওয়ার বেদনায় মর্মাহত। একদিন মুলিয়া কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে আসলো, কি হয়েছে স্বামী মহাবীর জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, কিছু হলে তো বলবো ? কিন্তু এমন কিছু ঘটনা ঘটে যায় যা মনের মধ্যে সারাজীবনের জন্য দাগ ফোরে দেয়, আজ মুলিয়া ঘাস কাটতে গিয়েছিল। তখনই তার সাথে চৈনসিংহের দেখা হয়। চৈনসিংহকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় হঠাৎ চৈনসিংহ তার হাতটা চেপে ধরে কম্পিত গলায় বললো, মুলিয়া আমার উপর কি তোর একটুও দয়া হবে না। মুলিয়া রেগে বললো,

مجھ سے دیا مانگتے ہو۔ اسی لیے تو کہ میں چمارن ہوں، نیچ جات ہوں اور نیچ جات کی عورت جرا سی آرجو بنتی، یا جرا سے لالچ یا جر سی گھڑکی دھمکی سے کابو میں آجاتی ہے۔ کتھا سستا سودا ہے ٹھاکر ہو نہ ایسا سستا سودا کیوں چھوڑنے لگے۔ چین سنگھ پر گھڑوں پانی بھر گیا۔ بلکہ سیکڑوں جوتے پڑ گئے۔ خفت آمیز لہجہ میں بولا۔ یہ بات نہیں سے ملیا میں سچ کہتا ہوں۔ اس میں اونچ نیچ کی بات نہیں ہے۔ سب آدمی برابر ہیں میں تو تیرے چرنوں پر سر رکھنے کو تیار ہوں۔ [৩৪]

(আমার কাছে দয়া চাইছ, সে তো এজন্য যে আমি চামরনী, নিচু জাত আর নিচু জাতের মেয়েছেলেগুলো একটুখানি ধমকধামক কিংবা একটুখানি লোভ দেখালেই তোমার হাতের মুঠোয় এসে যাবে। কত সস্তা সওদা! ঠাকুর যে, এত সস্তা সওদা কেন ছেড়ে দেবে ?
চৈনসিংহ লজ্জা পেয়ে বলে, মুলিয়া, ব্যাপারটা তা নয়। আমি সত্যি করে বলছি, এর মধ্যে উঁচু নিচু ব্যাপার নেই। সব মানুষই সমান। আমি তো তোর চরণে মাথা রাখতে রাজি।)

---

[৩৩] আব্দুল কাভী দাছনভী, *প্রেমচাঁন্দ*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ২০১১, পৃ. ২১।
[৩৪] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'ঘাস ওয়ালী', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৪৯৬।

চৈনসিংহের জীবনে নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চার হয়। উঁচু জাতের শক্তিশালী মানুষের কাছে নিচু জাতের সুন্দরী রুপবতী হাতের পুতুল নয় সেটা মুলিয়া বুঝিয়ে দিলেন চৈনসিংহকে। সে ভাবে মহাবীর যদি আজকের ঘটনার কথা শুনতে পায়, তাহলে এই ঠাকুর সম্প্রদায়ের উপর তার খুন চেপে যাবে। পরদিন মুলিয়া আর ঘাস কাটতে না যাওয়ায় শ্বাশুড়ি রাগান্বিত হয়ে বললো,

ساس نے ڈانٹ کر کہا۔ نہ تو اوروں کے ساتھ جائے گی، نہ ایکلی جائے گی، تو پھر کیسے جائے گی؟ صاف صاف کیوں نہیں
کہتی کہ میں نہ جاؤں گی۔ تو یہاں میرے گھر میں رانی بن کر بناہ نہ ہو گا۔ کسی کو چام نہیں پارا ہوتا۔ کام پیارا ہوتا ہے۔ تو بڑی
سندر ہے تو تیری سندرتا لیکر چاٹوں۔ اٹھا جھوا اور جا گھاس لا۔ [৩৫]

(শ্বাশুড়ি মুখঝামটা দেয়, আর কারও সঙ্গেও যাবি না, একাও যাবি না, তাহলে তুই যাবিটা কীভাবে ? সোজাসুজি এ কথা কেন বলছিলনা যে, আমি যাবনা ? আমার বাড়িতে তাহলে রাণী সেজে থাকা চলবে না। শুধু রূপ দিয়ে কী হবে, কাজও চাই। জানি তুই খুব রূপসী, তা আমি কি তোর রূপ ধুয়ে জল খাব ? নে ঝুড়ি নে, ঘাস তুলে আন।)

এভাবেই নারীরা ঘরে বাইরে সর্বত্র নিঃগৃহিত হয়। মুখ বোঝে সহ্য করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকে না। আলোচ্য গল্পের ভিতর দিয়ে সেটিই মুখ্য হয়ে উঠেছে। নারী উপজীব্য আরেকটি ছোটগল্প হলো *রোশনী* (روشنی)। ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২ সালে 'আদবী দুনিয়া'তে গল্পটি প্রকাশিত হয়।[৩৬] প্রেমচাঁদ তার *রোশনী* গল্পে একজন লন্ডন ফেরত উচ্চ শিক্ষিত তরুণের কথা বলেছেন, যার সংযুক্ত প্রদেশে পাহাড়ি এলাকায় সাব-ডিভিশনার হিসেবে চাকুরি হয়েছে। পাহাড়ি এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে সে মুগ্ধ হলেও বিদেশি উচ্চ শিক্ষার অহংকারের কারণে সেখানকার সাধারণ মানুষের ধর্ম বিশ্বাস, অজ্ঞতা, বস্ত্রহীনতা, অবহেলিত শিক্ষা ব্যবস্থা দেখে হতাশ হয়। তাদের নিচু শ্রেণীর মানুষ মনে করে। একদিন তার লঙ্গরখানার কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করতে কর্মস্থল থেকে আঠারো মাইল দূরে গজনপুর যাওয়ার প্রয়োজন হয়। হঠাৎ করে সে পাহাড়ী পথে কাল বৈশাখী ঝড়ের মুখোমুখি হয়, প্রচন্ড ঝড়ের দাপটে সে বেশ কয়েকবার ঘোড়ার পিট থেকে পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। ভয়ে আতঙ্কে তার উম্মাদ হওয়ার মত আবস্থা হয়। এই জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সে দূরে দেখতে পায়, কোন জমিদার উট নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাছে আসলে দেখতে পায়, সে এক নারী। নারী হয়েও তার সাহস দেখে সে ভীষণ লজ্জা অনুভব করে। যুবক তখন নারীকে গজনপুর যাওয়ার রাস্তাটা কোথায় জিজ্ঞাসা করলে সে বলে আমার সাথে আসুন, এই গ্রামের পরেরটিই গজনপুর।

[৩৫] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'রোশনী', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৪৯৪।
[৩৬] আব্দুল কাভী দাছনভী, *প্রেমচাঁন্দ*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ২০১১, পৃ. ২৩।

মিনিট পনেরোর মধ্যে চারদিকের আবহাওয়া একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন আমি ঐ যুবতীকে উপদেশ দেওয়ার ছেলে বললাম,

تم اس آندھی میں کہیں رک کیوں نہیں گئیں؟ [৩৭]

('তুমি এই দুর্যোগের মধ্যে পথে না চলে কোথাও দাঁড়িয়ে গেলেই তো পারতে!')

উত্তরে যুবতীটি বলে,

چھوٹے چھوٹے بچّے گھر پر ہیں۔ کیسے رک جاتی۔ مرد تو بھگوان کے گھر چلا گیا۔ [৩৮]

(ঘরে ছোট ছোট সব দুধের বাচ্চা রয়েছে। কেমনে দাঁড়াই বলো ? মরদটা তো কবেই ভগবানের ঘরে চলে গেছে।)

বাচ্চাদের খাবারের জন্য ঘাস বিক্রি করতে গিয়েছিলাম। সেখানে তার জীবন সংগ্রাম দেখে যুবক মুগ্ধ হয়। সৃষ্টিকর্তার উপর অগাধ বিশ্বাস নিয়ে কিভাবে সে ঝড়কে জয় করেছে। যুবক খুশি হয়ে অসহায় বিধবা মাকে বাচ্চাদের মিষ্টি খাবারের জন্য তাকে পাঁচ টাকা দিতে চাইলে মহিলা কোন ভাবেই গ্রহণ করেননি। সে পিছিয়ে গিয়ে বলল, না বাবুজি, ওটাকা আমি নিতে পারব না, ওটা রেখে দিন। আমি গরিব হতে পারি, কিন্তু ভিখারিনী নই। আমার সোয়ামীর কাছে ইজ্জতটাই ছিল সব থেকে দামি জিনিস। তার কাছে যা একদিন দামি ছিল, এখন তো তা আমারই হাতের মুঠোয়। না, ও আমি পারব না। ভগবান আপনার ভালো করবেন। ভগবানের কাছে আমি আপনার মঙ্গল কামনা করছি।

একজন বিধবা নারীর আত্মসম্পন্ন বোধ ও মৃত স্বামীর প্রতি তার অগাধ ভক্তি দেখে যুবকটি অবাক হয়ে যায়। সে তার কাছ থেকে জীবন সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে। একজন বিধবা নারীর পতি ভক্তি ও তার আত্মসম্মানের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে *রোশনি* নামক উক্ত গল্পের মাধে।

নারীরা সর্বদিক দিয়ে অবহেলিত ও বঞ্চিত ছিল। তাদের সামাজিক অবস্থান বিষয়ে প্রেমচাঁদ ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। প্রেমচাঁদ নারীর ন্যায্য সামাজিক অধিকার দাবি করেন যেমনি তার প্রবন্ধে, তেমনি তার কথাসাহিত্যেও। তার লিখনীতে দুর্বলের প্রতি প্রেমচাঁদের সহানুভূতি ছিল সব চেয়ে বেশি। হিন্দু সমাজে নারীরা সর্বাপেক্ষা দুর্বল। তাই দেখা যায়, প্রেমচাঁদের ছোটগল্পে সমাজের বিরুদ্ধে নারীর অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। নারীরা পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল বলেই সমাজে তাঁরা নিগৃহীত, লাঞ্ছিত। এ জন্য দুঃখও তাদের বেশি সইতে হয়। “এটা প্রেমচাঁদের কাছে গভীর বেদনা দায়ক বিষয় ছিল। নারীকে দেবীতে রূপান্তরিত করতে তার ততটা আগ্রহ ছিলনা, যতটা ছিল নারীর

---

[৩৭] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'রোশনী', *আফছানে তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৯০৯।
[৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০৯।

প্রকৃত মূল্য নিরূপণে। লেখক তাঁর কল্পনা দৃষ্টিতে নারীকে দেখেছেন, শুধু বিধাতার সৃষ্টি রূপে নয়। আপন অন্তরের সৌন্দর্যে তিনি মানসীর মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। *নিরাশিয়াহ* (نراشیہ) গল্পটিতে প্রেমচাঁদ নারীর বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। গল্পটি জুলাই, ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়। পুত্রসন্তান লাভে সবাই নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করে। অন্যদিকে কন্যা সন্তান জন্ম দিলে মনে করা হয় অপয়া হিসেবে। স্বামী ভাল করেই জানেন যে, এতে স্ত্রীর একা কোন দোষ নেই, তার নিজেরও কোন দোষ ক্রটি থাকতে পারে। স্ত্রীকে অভাগিণী বলে সম্বোধন করতে ও তার প্রতি রুঢ় আচরণ করতে তাদের রুচিতে বাধে না। গল্পে তিনটি কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ায় নিরুপমার শ্বশুর বাড়ির অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলছিল। তাদের মন্তব্য হলো, 'পূর্বজন্মের পাপ ছিল তাই একটার পর একটা মেয়ে প্রসব করে যাচ্ছে'। স্বামী ঘমন্ডীলাল বার বার কন্যা সন্তান জন্মের পিছনে স্ত্রীর কোন দোষ নেই, এতে স্বামীও দায়ী, তা বুঝেও না বোঝার ভান করে তার সাথে বাক্যালাপ বন্ধ করে দেয়। নিরুপমা দুঃখের সহিত ভাবে,

স্বামীর অর্থের কোনো অভাব নেই, তবু কোনো কিছুর সাধ জাগলে নিরুপমা কোনদিন সাহস করে সেটার জন্য আবদার করতে পারে না। নিজেকে সে অপরাধী ভাবে, সত্যিই তো অভাগিনী সে, তা না হলে ভগবান তার কোলে বারবার মেয়ে সন্তান দেবেনই বা কেন! প্রাচীনপন্থি নিরুপমা সারাদিন একেবারে নির্জলা উপবাস, অনেক ব্রত-আর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। নিষ্ঠার সঙ্গে এত সব করা সত্ত্বেও তার মনের বাসনা কিন্তু পূর্ণ হচ্ছে না। শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ও স্বামীর তরফ থেকে প্রতিদিনের গঞ্জনা, অবহেলা, উপেক্ষা ও অপমান সহ্য করতে করতে তার মনটা খিঁচিয়ে গেছে, সংসারের প্রতি তার মন বিষিয়ে উঠেছে। তার বড় ইচ্ছে কেউ তার সঙ্গে একটু মিষ্টি-মধুর কথা বলুক, একটু স্নেহ ভালবাসা দেখাক এবং স্বামী তাকে একটু আলিঙ্গনে আবদ্ধ করুক, কিন্তু কোনো ভাবেই তার ইচ্ছা আর পূরণ হয় না, বাড়ির কেউই তার কথা জিজ্ঞেস করে না, খোঁজ-খবর নেয় না। দুঃখের কথা জানিয়ে নিরুপমা তার বৌদি সুকেশিকে চিঠি লিখে সবকিছু জানায়। নিরুপমার চিঠির জবাবে সুকেশি লিখলেন, তোমার দাদাকে তোমার কথা বুঝিয়ে বলেছি, উনি খুব শীগগির তোমাকে এখানে নিয়ে আসবেন, তোমাকে একটা খবর দিয়ে রাখি, এখানে একজন সত্যিকারের মহাত্মা এসেছেন। তার আশীর্বাদ কখনো ব্যর্থ হয় না। আমি খুবই আশাবাদী, মহাত্মার আশীর্বাদে তোমার পুত্রসন্তান লাভ হবে। বৌদির চিঠিটা নিরুপমা তার স্বামীকে দেখালে তার মধ্যে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না। নির্লিপ্তভাবে সে বলল, 'সৃষ্টির ব্যাপারে মহাত্মাদের কোনো হাত নেই, সবই ঈশ্বরের হাত।' কয়েকদিন পরে নিরুপমা ভাইয়ের সাথে নিজ বাড়ি গেলো, সঙ্গে সে তার তিনটি মেয়েকেও নিলো। নিরুপমা মহাত্মার কথা জিজ্ঞাসা করলে বৌদি তাকে বুঝিয়ে বলে, তারা যেহেতু তোমার সাথে সব সময় খারাপ ব্যবহার করে, তাই আমি তোমাকে এমন কতগুলো উপায় বলে দিব যাতে তুমি কিছুদিন, বিশেষ করে দশমাস তো আনন্দ সুখে, আদর ভালবাসায় দিন কাটাতে পার। তোমার শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে বলবে যে, আমি মহাত্মাজীর সাথে দেখা

করে এসেছি। সে আমাকে কিছু নিয়ম কানুন দিয়েছে, বলেছে এগুলো অনুসরণ করলে তোমার ছেলে সন্তান হবে। অত:পর নিরুপমা চারমাস পরে শ্বশুর বাড়ীতে ফিরে এসে লোকজনকে তাই বলল। মিথ্যা আশ্বাস সকলে বিশ্বাস করল। তারপর শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, ননদ, স্বামী সকলে তার সেবা যত্নে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শ্বাশুড়ী, যিনি এই সেদিনও উঠতে বসতে নিরুপমাকে গালমন্দ করতেন, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে অতিষ্ঠ করে তুলতেন, তিনিই এখন তাকে এক মিনিটের জন্যেও চোখের আড়াল করতে চান না। নিরুপমাকে কেনো কাজ করতে দেখলে তিনি তাকে বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, না বৌমা, এখন থেকে কোনো কাজ তুমি করবে না, ও কাজটা আমিই করবো, তুমি রেখে দিয়ে একটু বিশ্রাম নাও তো। এই কটা মাস তুমি কোনো ভারী কাজ করবে না। এক এক করে অনেকগুলো মাস পার হয়ে যায়, প্রসবের দিন প্রায় আসন্ন হয়ে আসে, নিরুপমা তার অনুভূত লক্ষণ থেকে বেশ বুঝতে পারে যে, এবারও তার মেয়ে হবে। তবে সে তার মনের কথা মনের মধ্যেই চেপে রেখে দেয়, কারোর কাছে প্রকাশ করে না। নিরুপমাকে প্রসব করানোর জন্য একজন লেডী ডাক্তারকেও ডেকে আনা হয়েছে। এদিকে প্রসবের দিন আঁতুর ঘর থেকে দাইমা হঠাৎ মুখটা শুকিয়ে কাঠ করে বের হয়ে আসল। ওদিকে শ্বশুর বাড়ীর লোকদের আনন্দ উল্লাস দেখে দাই মা খিঁচিয়ে উঠল, 'এ তোমরা কি করছো, তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? বৌমার এবারেও মেয়ে হয়েছে। দাইমার কথা বিশ্বাস করতে চায় না ঘমন্ডীলাল। সে তার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে বলল, 'লেডী ডাক্তারকে গিয়ে বলো ভাল করে দেখতে'। ঠিক মতো না দেখে শুনেই এমন একটা অশুভ খবর দিতে এসেছো ? দাইমা কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বলল, 'লেডি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করতে যাবো কেন, আমি যে নিজের চোখে দেখে এসেছি হুজুর'। শ্বশুর বাড়ীর সবাই তা শুনে ক্ষেপে যায়, তারা সবাই মহাত্মার এমন চালাকি, বেয়াদবি, ভন্ডামির ব্যবসা, নিষ্ঠুর, অমানুষ বলে গালাগালি করতে থাকে। নবজাতকের একুশদিন পূর্ণ হলে পরে ঘমন্ডীলাল তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বললো, 'শেষ পর্যন্ত আবার মেয়েই হলো'।

এদিকে নিরুপমার জীবনে আবার সেই আগের দুঃখের দিনগুলো ফিরে এলো। শ্বশুর বাড়ীর সবাই এখন নিরুপমাকে হম্বি-তম্বি, গাল-মন্দ, অনাদর আর অপমান, দুর্গতির সীমা যেন আগের থেকেও ছাপিয়ে গেলো। কথায় কথায় অভাগা, পাপী, কুলক্ষণা আরও অনেক কটু কথা শুনাতে লাগলো। কয়েক মাস এভাবে নির্যাতিতা হয়ে শেষে নিরুপমা আবার তার বৌদিকে একটা চিঠি লিখল, 'বৌদি তুমি আমাকে আরো বেশী বিপদে ফেলে দিলে, এভাবে চলতে থাকলে আমি আর বাঁচবো না, আমি এই নিষ্ঠুর সংসার ছেড়ে একদিন চলে যাব'। ননদের চিঠি পড়ে তার মন মানসিকতা বুঝে সুকেশি বৌদি এবার সরাসরি নিরুপমার বাসায় এসে শ্বশুর বাড়ীর লোকজনকে বুঝাল যে, মহাত্মাজী যে নিয়ম কানুন দিয়েছিল, নিরুপমা তা ঠিক মত মানে নি, এমন তো হবার কথা নয়! তার মুখ থেকে একবার যা বেরোয় তার নড়চড় কখনো হয়না। ভাল কথা, নিরুপমা তুমি কি মঙ্গলচন্ডীর সব ব্রত করেছিলে তো ? তাদের পাঁচজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়ে ছিলে তো ? সে না বলল। সুকেশি বলে উঠল, আমি বার বার তোমাকে

বলে ছিলাম তাদের ভোজন করানোর জন্য, আর তুমি তা করনি, এই কারণেই তোমার ব্রত ঠিকমত পালন হয়নি। যার ফলে তোমার মেয়ে হয়েছে। তার কথা শুনে শ্বাশুড়ী নিরুপমাকে ধমকাতে লাগলো। অবস্থা বেগুতি দেখে সুকেশি তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদল করার জন্য বলল, 'এখন ওসব অতীত। ছেড়ে দিন, যা হবার হয়ে গেছে, এখন ভবিষ্যতের কথা ভাবুন। কাল মঙ্গলবার আবার ব্রত পালন করুন আর সাতজন ব্রাহ্মণ ভোজন করানোর ব্যবস্থা করুণ। এবার দেখবো, কেমন করে মহাত্মাজীর ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হয়। এবার যদি তা ঠিক মত মানা হয় তাহলে চতুর্থ কন্যা শিশুর পর পুত্র সন্তান হবে। ঘমন্ডীলাল বলল কিছুই হবে না, 'দেখবেন, আগের মতো এবারেও সব ব্যর্থ হবে'। সুকেশী জবাব দিল, জীজাজী, আপনি একজন বিদ্বান, বিচক্ষণ ব্যক্তি হয়েও এমন সংকীর্ণ মনের পরিচয় দিচ্ছেন ? আপনার কি এমন বয়স হয়েছে যে, এরই মধ্যে হতাশ হয়ে পড়ছেন! ক'টা ছেলে চাই আপনার ? দেখবেন, শেষে হিমসিম খেয়ে যাবেন, সামলাতে পারবেন না। শ্বাশুড়ী শান্ত গলায় বলল, বেশী ছেলে-পুলে হলে হিমসিম খাবো কেন, বরং মন ভরে যাবে। সুকেশী বলল, 'হ্যাঁ, ঈশ্বরের দয়া হলে মন আপনাদের নিশ্চয়ই ভরবে। আমার তো ভরে গেছে কানায় কানায়'। সাতদিন থাকার পর চলে যাবার আগে সুকেশী ননদকে পাখি পড়ানোর মতো খুব ভাল করে শিখিয়ে-পড়িয়ে বিদায় নিল। এবারও নিরুপমার আদর যত্ন আগের থেকে বেড়ে গেল। তাকে কোন কাজই করতে দেওয়া হত না। অনাগত পুত্র সন্তানের নামও পর্যন্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিলো। জোরাবলাল থেকে শুরু করে হরিশচন্দ্র সব নামই পালাক্রমে ভাবা হলো, কিন্তু সেই অনাগত শিশুপুত্রের জন্য কোনো নামই তাদের মন মত হলো না। অবশেষে ঘমন্ডীলালের তেজবাহাদুর নামটা রাখার ব্যাপারে সবাই সায় দিল। অবশেষে প্রসবের দিন ঘনিয়ে আসল, আঁতুড়ে ঘরে নিরুপমার আশঙ্কা আর ভাবনা কম হচ্ছে না। আশঙ্কার কথা ভেবে দুঃখও পাচ্ছে সে। তার এখন কেবল একটাই ভাবনা, এবার কী হবে ? প্রথম পুত্র, নাকি পঞ্চম কন্যা! দুঃখ কষ্টের কথা মনে করে শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগলো,

تین سال کسی طرح کوشل سے کٹ گئے اور مزے میں کٹ گئے، لیکن اب دپتی سر پر منڈرا رہی ہے۔ ہائے، کتنی پکشتا ہے نرپرادھ (بے قصور) ہونے پر بھی یہ دنڈ۔ اگر بھگوان کی اچھّا ہے کہ میرے گربھی سے کوئی پتّر نہ جنم لے تو میرا کیا دوش لیکن کون سنتا ہے۔ میں ہی ابھاگنی ہوں میں ہی تیاجّ ہوں۔ میں ہی کمھی ہوں۔ [৩৯]

(তিনটে বছর কোনো না কোনো কৌশলে ও আনন্দে কেটেছে। কিন্তু এখন তার মাথার ওপর বিপদের খাঁড়া ঝুলছে। এ আমার কী হলো ? আমি কতোই না অসহায়। নিরাপরাধ হয়েও দণ্ড নিতে হবে আমাকে, মেয়ে হলে আবার আমাকে বন্দিনী হয়ে থাকতে হবে এ বাড়িতে, ভগবানের ইচ্ছায় যা, পুত্র সন্তান জন্ম না নেয়, তাতে আমার কি অপরাধ। লোকজনের গঞ্জনা শুনতে হবে, অভাগী, পাপী, কুলক্ষণা, আরো কতো খারাপ খারাপ কথাই না শুনতে হবে।)

---

[৩৯] প্রেমচাঁদ, 'নিরাশীয়াহ', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৩২৫।

ছেলে না হওয়ার জন্য একা সেই কি শুধু দায়ী ? তার স্বামী নয় ! এ বিচার কে করবে ? ভগবান যদি ইচ্ছে করে আমার গর্ভে ছেলে না দেন, তার জন্য আমার কি অপরাধ ! আমি নিজেই কেবল আমার দুঃখের কথা বলে যাচ্ছি, আমার কথা কেউ শুনছে না। কে শুনবে, কেই বা একটু ভেবে দেখে এর প্রতিকার করবে ? আমি তো অভাগিণী, আমি অপয়া, পরিত্যক্তা। তাই আজ হয়তো আমাকে আবার বন্দিনীর জীবন যাপন করতে হবে। হে ঈশ্বর, এরপর কি হবে ? আমার আবার মেয়ে হলে, এক মুহূর্তে এখানকার এ যে আনন্দোৎসব, হৈ চৈ, সব স্তব্ধ হয়ে যাবে, বাড়িতে যেন কেউ মারা গেছে, সেই রকম শোকে সারা বাড়িটা ডুবে যাবে, সবাই তাকে গালিগালাজ করতে মুখর হয়ে উঠবে, আমার জীবন আবার অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে, নিরুপমা ভাবে আর কাঁদে। নিরুপমা তার অবস্থা দেখে এবার বুঝতে পারলো, তার এবারো মেয়ে হবে। সে বিরবির করতে লাগল, অনেক চালাকি, অনেক কৌশল তো করা হলো, এখন আর কোন আশা নেই। অথচ আমার কতোই না আকাঙ্খা ছিল, বাসনা ছিল, মেয়েদের বড় করে বিয়ে দেবো, তাদের বাচ্চাদের দেখে নিজের সব দুঃখ কষ্ট ভুলে গিয়ে সুখের মুখ দেখবো। সে সব আকাঙ্খা, বাসনা বুঝি শেষ হয়ে গেলো। ভগবান, তুমি তো ওদের পিতা, সৃষ্টিকর্তা, তোমার কাছেই ওদের রেখে চলে যাচ্ছি, তুমি ওদের রক্ষা করো। আমি এবার বিদায় নিচ্ছি। বিদায় সবার কাছ থেকে। প্রসবের দিন লেডি ডাক্তার আতুর ঘর থেকে বের হয়ে বলল,

پھر لڑکی ہے۔ماں کا حال اچھا نہیں ہے۔وہ اب نہیں بچ سکتی۔اس کا دل بند ہو گیا ہے۔[৪০]

(এবারো মেয়ে হয়েছে। মায়ের অবস্থা ভাল না। সে আর বাঁচবে না। তার হৃদপৃন্ড বন্ধ হয়ে গেছে।)

বিষয়টি ছিল এরকম যে, লেডী ডাক্তারের অশুভ সংবাদে যেন সারা বাড়ির ওপর বাজ আছড়ে পড়লো। একটা নিরবিচ্ছিন্ন নিরবতা নেমে এলো চারদিকে। ঘমন্ডীলাল ক্রুদ্ধ হয়ে চিৎকার করে উঠল, 'জাহান্নামে যাক সব। মেয়ের জন্ম দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার মা মরতে পারলো না ?' তখনো নিরুপমার প্রতি শাপ শাপান্ত শেষ হয়নি, লেডী ডাক্তার ফিরে এসে আবার একটা দুঃসংবাদ দিলেন, 'প্রসূতিকে বাঁচানো গেলো না, এইমাত্র হার্টফেল করে তিনি মারা গেছেন।

প্রেমচাঁদের ছোটগল্পে নারী চরিত্রের বিভিন্ন দিকের প্রকাশ মেলে। সমাজ শক্তির সঙ্গে নারী-হৃদয়ের দ্বন্দ্ব প্রেমচাঁদের সাহিত্যে প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। নারীকে দাসী করে সমাজের নিয়ম-কানুনগুলো তৈরি করা হয়েছিল। নারীর সতীত্ব, দেবীত্ব, মাতৃত্ব প্রভৃতি গালভরা বুলির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল নারীকে চিরকাল পুরুষের শাসনে রাখার অভিসন্ধি। আধুনিক ব্যক্তি সচেতনতার যুগে নারীর মনে যখন স্বাতন্ত্র্য কামনা এবং স্বাধিকার বোধ অঙ্কুরিত হল তখন রীতি-

---

[৪০] প্রেমচাঁদ, 'নিরাশীয়াহ', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৩২৫।

নীতি, ধর্ম ও নৈতিকতার নামে সমাজ তাকে অবনমিত করবার প্রয়াস পেয়েছে। তাই সামাজিক চৌহদ্দির ভেতরে নারীর ব্যক্তি হৃদয়ের ক্ষোভ প্রকাশের সুযোগ ছিল না। তাই সমাজ-সচেতন নারী দরদী প্রেমচাঁদের নারী চরিত্রের মিছিলে গুমরে মরেছে ব্যর্থ জীবনের চাপা ক্রন্দন। সমাজ রক্ষায় আগ্রহী লেখক হিন্দু সমাজের ভেতরে ভাঙ্গনের বীজ বপন করতে পারে এমন চরিত্রের পরিকল্পনা কমই করেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ব্যক্তির বেদনার প্রতি গভীর সহানুভূতিশীল, তাই ব্যক্তিকেও বিনা প্রতিবাদে সমাজের কূপকাষ্ঠে বলি দিতে পারেন নি। তাই সমাজের দোষ ত্রুটি প্রদর্শনের জন্য কতগুলো বিদ্রোহী ও প্রতিবাদী চরিত্রসৃষ্টি করেছেন। নারী ও পুরুষ চরিত্রের মধ্যে প্রেমচাঁদের অধিকাংশ গল্পেই পুরুষ দ্বারা নারী শোষণরীতি সমাজে যে ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তেমনি আবার নারী দ্বারাও পুরুষ শোষণ চরিত্র লিখতে তিনি ভুলেননি। তেমনকি একটি ছোটগল্প হলো *দফতরী* (دفتری) যা ১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে এ লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে দেখা যায়, ভদ্র দপ্তরী রফাকত হুসেন, যার মাসিক বেতন দশ টাকা ছিল। অফিসের বাবুদের কারো কোনো অন্যায় দেখলেও সে বলতে ছাড়ত না। এ স্পষ্টবাদিতার জন্যে সবাই ওকে প্রাপ্যের চেয়ে বেশী সমীহ করে চলত। জন্তু জানোয়ারের প্রতি তার আলাদা একটি টান ছিল। তাই বাড়িতে একটা মাদী ঘোড়া, একটা গাই, ক'টা ছাগল, একটি বিড়াল, একটা কুকুর আর গোটাকয়েক মুরগি লালন পালন করতো। কেউ তাকে কখনো তার মুরগির ডিম বিক্রি করতে, ছাগলের বাচ্চাদের কখনো কসাইয়ের ছুরি তলে পড়তে দেখেনি। তার পশু ভালেবাসার প্রতিফলের উদাহরণ স্বরুপ দেখা যায় যে, সে তার গরুর দুধ খেতে দিত কুকুরকে, বিড়ালের জন্য ছাগলের দুধ, তারপর যদি কিছু থাকত তখন সে তা পান করত। ভাগ্যক্রমে রফাকত এক পতিপরায়ন স্ত্রী পেয়েছিলেন। কখনো তার ছোট্ট ঘরের বাহিরে তার স্ত্রীর আওয়াজ বের হত না। সে খুব নম্র-ভদ্র ছিল, গয়না-কাপড়ের প্রতি তার কোন লালসা ছিল না। গরুর গোবর কুড়োতে, ঘোড়াকে ঘাস দিতে, পাশে বসিয়ে বিড়ালকে খাওয়াতে এমনকি কুকুরটাকে স্নান করাতে তার কোন ঘেন্না ছিল না। হঠাৎ বর্ষাকালে সাপের কামড়ে এমন অমায়িত স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। স্ত্রীর মৃত্যুতে রফাকত মুশরে পড়ে। এখন সে দফতরে যায়না, সন্ধ্যা হতে না হতেই সে স্ত্রীর কবরের পাশ শুয়ে থাকে। ঘরের ফেরার খেয়ালই থাকত না। ভোরবেলা ওঠে মাজারে গিয়ে ঝাঁট দেয়া, ফুলের মালা দিয়ে কবর সাজানো ইত্যাদিই এখন তার নিত্যদিনের কাজ হয়ে দাঁড়ায়। মাস কয়েক এভাবে কেটে যাবার পর রফাকত মুরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত্ত্ব পথিকের মতো, দফতরীও আবার দাম্পত্য-সুখের জলধারার দিকে ছুটল। আবার সে জীবনের সুখদায়ক অভিনয় দেখতে উৎসুক হল। মৃত পত্নীর সঙ্গে দাম্পত্য-সুখের স্মৃতি বিলীন হতে লাগল। ছ'টা মাস পরে তার আর চিহ্নমাত্রও রইল না। রফাকতের মহল্লা হতে অন্য প্রান্ত থাকত বড়সাহেবের এক আরদালী। ওর বাড়ি থেকেই রাফাকতের জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসে। প্রস্তাবে মিয়া রফাকতের আনন্দের সীমা রইল না। আদালী সাহেবের ইজ্জত খাতির মহল্লায় কোনো উকিলবাবুর চাইতে কম ছিল না। দফতরীর মনে হল এবার তার কপাল খুলেছে। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সমস্ত ক্রিয়া কর্ম চুকিয়ে ফেলল, নববধূ এল তার ছোট্ট ঘরে। কিন্তু অষ্টমঙ্গল পেরুতে না পেরুতেই শুরু হয়ে গেল নববধুর স্বরূপ উম্মোচন। বিধাতা ওকে রূপ থেকে বঞ্চিত

রেখেছিলেন, অবশ্য সেই ঘাটতি তিনি পুষিয়ে দিয়েছিলেন ওর বাক্যেন্দ্রিয়কে তীক্ষ্ণতর করে। তার প্রমাণ ওর অসাধারণ বাকপটুতা যা অহরহ পড়শীদের আমোদিত করতে এবং দফতরীর মুখে কালি মাখিয়ে দিতে লাগল। প্রথমে দিন আস্টেক সে বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দফতরীর চরিত্র অনুধাবন করল। তারপর একদিন বলল,

"تم بھی عجیب طرح کے آدمی ہو۔انسان جانور پالتا ہے۔اپنے آرام کے لیے۔نہ کہ محض دود سر کے لیے۔یہ کیا کہ

گائے کا دودھ کتے پیئیں۔ بکریوں کا دودھ بلیاں چٹ کر جائیں اور گھر کے آدمی تر سیں۔آج سے سب دودھ گھر میں

لایا کرو۔" [৪১]

('আজব লোক তো তুমি! লোক জন্তু জানোয়ার পুষে নিজের আরামের জন্যে। নিজে দুধ পান করার জন্য। এটা কেমন হচ্ছে যে, গরুর দুধ কুকুর খাবে, ছাগলের দুধ বিড়ালে খাবে এবং ঘরের লোক সব দেখে দেখে যাবে। আজ থেকে সমস্ত দুধ ঘরে তুলবে এবং এসব জন্তু জানোয়ার আমার সামনে থেকে সরিয়ে নাও। এটা মুসলমানের ঘর। এটা কি কোন সরাইখানা। শেষ কথা হল, ধর্ম বলে তো কোন কিছু আছে। যেটার ছায়া দেখা শুরু থেকে নিষেধ আছে সেটা পালন করে আমি শান্তি নিতে পারবো না। ')

বেতন পেয়ে আজকাল সে আর মাসকাবারী সওদা কেনে না, ঠান্ডা জল আর শুকনো রুটিতে আজকাল আর ওর তৃপ্তি হয় না, বাজার থেকে বিস্কুট কিনে আনে, ঠোঙ্গায় করে রাবড়ি খায়, সুপক্ক আম দেখে উতলা হয়। দশটা টাকার মূল্যই বা কতটুকু ? এক সপ্তাহেই তা শেষ হয়ে যেত, বরঞ্চ ঋণ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকত না। তার এমন হাল হলো যে, মাসের টাকাটা পেয়ে আগে পুরোটাই পাওনাদারদের দিতে হতো। আর মাসের প্রথম থেকেই আবার ধার করতে হতো। এতদিন সে অন্যদের উপদেশ দিত মিতব্যয়িতার, এখন লোকেরা ওকে বোঝায়, কিন্তু সে নির্বিকার ভাবে বলে- 'সাহেব, আজ জোটছে, খাচ্ছি। কালকের মালিক তো খোদা। দিলে খাব, না দিলে চুপচাপ পড়ে থাকব'। তার অবস্থা এখন সেই রোগীর মত, যে আরোগ্যের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে পত্যপথ্যের বিচার ত্যাগ করেছে, চির বিদায়ের আগে সবরকম চর্বাচূষ্য খেয়ে আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করতে চাইছে। মহাজনরা যে দিন বুঝলো যে, দফতরীর কাছ থেকে ঋণের টাকা আর পাওয়া যাবে না তখন তারা দফতরীর ঘোড়া, গরু ও ছাগল নিয়ে গেল। উপায়ন্ত না দেখে রফাকত তার স্যারের কাছে গিয়ে কটা টাকা ধার চাইলে সে তাকে রূঢ়ভাবে উত্তর দেয়, আমার কাছে এক পয়সাও নেই। দফতরী তৎক্ষণাৎ চলে যেতে থাকলে তার মনে দয়ার সঞ্চয় হলে দফতরীকে সে ডাক দিয়ে তাকে বুঝাতে চেষ্টা করে, এইভাবে ধার করে কি চিরদিন চলা যায় ? তুমি বিচক্ষণ লোক, বোঝই তো, আজকাল সবাই নিজের মাথার ঘামাতেই পাগল। কারো কাছে ফালতু টাকা থাকেই না। আর থাকলেও

---

[৪১] প্রেমচাঁদ, 'দফতরী', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১০, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৩৩৩।

ঋণ দিয়ে ঝঞ্জাট পোহাতে যাবে কেন ? তুমি অবস্থাটা একটু পাল্টানোর চেষ্টা কর!" ক্ষোভের সহিত দফতরী উত্তর দিল,

"حضور تقدیر کی گردش ہے اور کیا عرض کروں۔ آپ پر تو سب روشن ہے۔ جو چیز مہنے بھر کے لیے لاتا ہوں۔ وہ ایک دن میں اڑ جاتی ہے۔ اگر ایک دن دودھ نہ ملے تو جناب مہتا متھ مچادے۔ گوشت نہ پکے تو میری بوٹیاں توچ کھائے۔ خاندان کا شریف ہوں۔ یہ بے حرمتی نہیں برداشت ہوتی کہ کھانے پینے کے لیے بیوی سے بم چخ کروں۔ جناب ایسی تندمزاج ہے کہ ناک پر مکھی نہیں بیٹھے دیتی۔ بس اب خدا سے یہی دعا ہے کہ مجھے دنیا سے اٹھالے اور اس عذاب سے نجات دے۔ اس کے سوا مجھے تو کوئی اور صورت نہیں نظر آتی۔ میں سب کچھ کر کے ہار گیا۔"[৪২]

("হুজুর কী আর বলি বলুন, সবই সময়ের ফের। একমাসের জন্যে যা কিছু আনি, তা একদিনেই উড়ে যায়। আমার গৃহিণীর নোলার জ্বালায় একবারে নাজেহাল হয়ে উঠেছি। একটা দিন দুধ না জুটলে কুরুক্ষেত্র করে। একদিন মাংস না জুটতে পারলে আমার মাংসই খায়। ভদ্রলোকের ছেলে মশাই সামান্য খাওয়া নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে রোজ ঝগড়া-বিবাদ, এ বেইজ্জতি তো বরদাস্ত করা যায় না। যা করতে বলে চোখ বুজে তাই করি। এখন খোদার কছে এটুকুই প্রার্থনা, আমাকে তার কাছে ডেকে নিন। এছাড়া আমার আর কোন উপায়ই নেই। আমি সব কিছুতেই হেরে গেছি, সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি।")

কর্তা তখন তাকে পাঁচ টাকা দিয়ে বলল, এটা রাখো, এটা তোমার পৌরুষের প্রতি আমার দক্ষিণা। আমি কখনো ভাবতেও পারিনি তোমার অন্তরে এতটা বীরত্ব রয়েছে, তোমার হৃদয় এতখানি উদার। গৃহদাহের আগুনে ঝলসে যাচ্ছে যে বীর, সে রণক্ষেত্রের বীর সৈনিকের চাইতে কোন অংশেই হীন নয়। প্রেমচাঁদ এই ভাবে একই গৃহে দু'জন আলাদা আলাদা গৃহিণীর রূপায়ন চিত্রায়িত করেছেন। সমাজে বর্তমানেও এমন মহিলার বসবাস আছে যাদের কারণে পুরুষজাতি নির্বাক হয়ে তাদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে, যা *দফতরী* গল্পের মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়েছে।

সমাজে নারীর অবস্থা মূল্যায়নের প্রেমচাঁদের অমর সৃষ্টি *তেঁতর* (تیتر) ছোটগল্পটি অনন্য। যা ডিসেম্বর ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়। তিন ছেলের পর স্বামী দামোদর দত্তের স্ত্রী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে। পরিবারের সকলে তিন ছেলের পর মেয়ে হলে কুলক্ষণা হয় এই কুসংস্কারে বিশ্বাস করে। স্বামী রীতিমতো শিক্ষিত, এমন কি শিক্ষা বিভাগে চাকরিও করেন। তিনিই আবার এই সংস্কারকে প্রশয় দেন, এই ভেবে যে, তিন ছেলের পর মেয়ে হলে সে কুলক্ষণা হয়। তার বৃদ্ধা মা তো উঠতে বসতে সব সময় এই নবজাতকের উদ্দেশ্যে গালমন্দ, শাপশাপান্ত করে ছাড়েন আর

---

[৪২] প্রেমচাঁদ, 'দফতরী', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১০, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৩৩৮।

বলেন, এ মেয়ে অলক্ষুণে না হয়ে যায়, ও তেঁতর। তিনি অবাক হয়ে ভাবেন, কী কারণে এ বাড়িতে এলো সে। কোনো বন্ধ্যা মেয়ের গর্ভে জন্মালে কতোই না আদর যত্ন হতো এর। দামোদার মাকে বুঝিয়ে বলে, মেয়ে হয়েছে তো কি হয়েছে। তুমি চিন্তা করো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। তাই আমি বলি কি, গায়েনের দলকে ডেকে আনি, একটু গান-বাজনা না হলে লোকেরা আমাদের বদনাম করবে, আগের তিন তিনটি ছেলেদের বেলায় কতোই না ঘটা করে আনন্দো উৎসব হল অথচ মেয়ের বেলায় কিনা সব নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ থাকবে। তা হয় না। মা আপত্তি করে তাকে বুঝায়। অমঙ্গলের চিন্তায় দিনরাত আমার মাথা ঘুরছে, কী হয়, কী হয়, আবার কারো প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয় কিনা, কে জানে। আগে এক তেঁতর জন্মানোতে আমার শ্বশুর মশাই অসময়ে মারা যান। আর তাই তো এখন, তেঁতরের নাম শুনলেই ভয়ে আমার বুকটা ভীষণ কেঁপে উঠে। মেয়ে হওয়ার কারণে স্বামী, স্ত্রী ও শ্বাশুড়ী কেউই মেয়ে সন্তানটিকে দেখতে পারত না। সবসময় তার মরণ কামনা করত। তারা প্রার্থনা করত, এমন তেঁতর যেন কারো ঘরে না হয়।

বোন হয়েছে, দেখতেও অনেক সুন্দর হয়েছে, তাতেই তিন ভাইতো মহা খুশী। নিয়ম মাফিক ও সামাজিক রক্ষার্থে মেয়ের ষষ্ঠিপূজো হলো। মাঙ্গলিক কাজও সম্পন্ন হলো। তারপর যথারীতি গান-বাজনা, আদান-প্রদান, খাওয়া-দাওয়া সব কিছুই হলো নিয়ম-রীতি রক্ষা করার জন্য। মায়ের অবহেলা ও বুকের দুধ না পাওয়ার কারনে বাচ্চাটি দূর্বল হয়ে পড়ে। বড় ছেলে সিন্ধু প্রায়ই বলে, 'আমার কোলে বোনটিকে তুলে দাও না মা, বাইরে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।' কিন্তু মা তার রুক্ষ মেজাজ দেখিয়ে ধমক দেয়। সিন্ধুর সব ইচ্ছা তখন নিমেষে উধাও হয়ে যায়। তিন চার মাস যাবার পর দামোদার মনে বাচ্চাটির জন্য মায়া জন্মে, দামোদার ভাবে, এ অভাগিনী আমার ঘরে জন্ম নিয়ে কী এমন দোষ করেছে ? আমার বাবা ও মায়ের যদি কোনো বিপদ আসে, সেক্ষেত্রে তার কি অপরাধ ? সত্যি আমরা কতোই না নির্দয় যে, একটা অন্ধ কুসংস্কারের বশে কল্পনা করে নেওয়া অনিষ্টের ভয়ে আমরা তাকে অভিশাপ দিচ্ছি, এমন কি ওর মৃত্যু কামনা পর্যন্ত করছি। আর যদিও বা কোনো অমঙ্গল হয়েই যায়, তাহলে কি সত্যি সত্যি তার মৃত্যু কামনা করবো আমরা, তাকে কি খুন করবো ? যদি অপরাধই কিছু হয়ে থাকে, সেটা তার নয়, সব দোষ আমার, আমাদের। অথচ সব দোষ ওই নিরাপরাধ শিশুটার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে কেমন নির্বিচার নিষ্ঠুর ব্যবহার আমরা করেছি, এটি কি জঘন্য অপারাধ নয় ? সে মনে করে কুসংস্কারে বিশ্বাস করে বাচ্চাটিকে কষ্ট দেওয়া পাপ, ঈশ্বরও তাদের ক্ষমা করবে না। এই কথা ভেবে দামোদারের মনে ভীষণ অনুশোচনা হয়, মেয়েটিকে কোলে তুলে নিয়ে সে তাকে প্রাণ ভরে আদর করে, তার মুখে চুমু খায়। এই প্রথম মেয়েটি তার জন্মদাতার কাছ থেকে সত্যিকারের স্নেহের স্বাদ পেলো। তার আদর দেখে দামোদরের স্ত্রী ভীষণ বিরক্ত হয়, ক্রুদ্ধ স্বরে বার বার সে বলতে থাকল,

اسے پڑی رہنے کو ایسی کوں سی بڑی سندر ہے آبھاگن رات دن تو پران کھاتی رہتی ہے۔ مر بھی نہیں جاتی کہ جان چھوٹ جائے۔ [৪৩]

('ওকে ওর জায়গায় পড়ে থাকাটা কিইবা খারাপ, অভাগীতো রাতদিন আমাদের প্রাণে মারার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ও মরে গেলে আমাদের জীবনটা বেঁচে যেতো।')

ছাগলের দুধ খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে বড় ও ছোট ছেলে মিলে ছাগলের বাঁট মেয়ের মুখে ভরে দিলো। মেয়েটি চুক চুক শব্দে ছাগলের বাঁটটা চুষতে লাগলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই দুধের ধারা তার গলায় পৌছে গেলো। এ যেন নিভন্ত প্রদীপে তেলের যোগান দেওয়া হলো। ছাগলের দুধ পান করে মেয়ের মুখে এই প্রথম তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেলো। এই ভাবে স্বামী ও ছেলেরা গোপন সহযোগিতায় মেয়েকে দুধ খাওয়াতে শুরু করলো। কয়েক মাসে বাচ্চাটি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে গেলো। বাচ্চাটির হৃষ্টপুষ্টতা দেখে শ্বাশুড়ী ভাবলো, এতদিনেও মেয়েটা মরলো না কেন, কে জানে শেষ পর্যন্ত এ অলুক্ষণে মেয়ে তাদের সংসারে কি সর্বনাশ ডেকে আনে। এদিকে শ্বাশুড়ী বৌকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি বুঝি তেঁতরকে আদর যত্ন ও দুধপান করে সর্বনাশ ডেকে আনছো ?

সে বলে, শুনুন মা, আপনি যা ভাবছেন তা ঠিক নয়, 'আমি ওকে আমার বুকের দুধ খাওয়াইনি। ঈশ্বরের কসম- আমি বাচ্চাটির দিকে নজরও দেই না।

শ্বাশুড়ী বলল- 'তা আমি কি দুধ খাওয়াতে মানা করেছি,' সে উষ্মা প্রকাশ করে বললো, 'আমার কি এমন দায় পড়েছে যে, অকারনে আমি পাপের ভাগীদার হবো ?'

'তুমি কি আমায় পাগল ঠাওরেছো ? তুমি বললে দুধ খাওয়াওনি, আর আমি তা বিশ্বাস করে নেবো ? তুমি যদি দুধ না খাইয়েই থাকো, তাহলে সেকি শুধু হাওয়া খেয়ে খোদার খাসির মতো এমন চেহারা করেছে ?

'ভগবান জানেন মা, কি করে এমন হলো, ভাবতে গিয়ে আমিও কি রকম আশ্চর্য হচ্ছি।'

এদিকে শ্বাশুড়ী তাঁর নিরোপরাধ নাতনীর প্রতি যতই নিষ্ঠুর হোন না কেন, মায়ের কিন্তু বাচ্চাটির প্রতি স্নেহ মমতা বাড়তে থাকে। এই ভাবে আরো দুটো মাস চলে যাবার পর শ্বাশুড়ী ভাবে, কেন সংসারে কোন দুর্ঘটনা ও অমঙ্গল ঘটছে না। তিনি অকারণে চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তিনি মনে মনে ভাবেন, বউমার কেন জ্বর হচ্ছে না, ছেলে দামোদর সাইকেল থেকে পড়ে যাচ্ছে না কেন ? বউমার বাপের বাড়ি থেকে কারোর মৃত্যুর খবর আসছে না কেন ? সেরকম

[৪৩] প্রেমচাঁদ, 'তেতঁর', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৪০৯।

কিছু এলে তবেই আমার আশঙ্কার মর্যাদা রক্ষা হবে। অথচ তাঁর ছেলে দামোদর একদিন সাফ জানিয়ে দিলো তার মাকে, এসব তার অন্ধ কুসংস্কার, তেঁতর মেয়ে হলেই তার মা বাবার মধ্যে কেউ একজন অসময়ে মারা যায় না। একদিন দামোদর স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখলেন, তার মা খাটের ওপর নিশ্চুপ হয়ে পড়ে রয়েছেন আর তার স্ত্রী মার বুকে আগুনের সেঁক দিতে ব্যস্ত। দামোদর উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'মা তোমার কি হয়েছে, শরীর খারাপ? 'আসলে বুকের ব্যাথার ভান করে মরে যাবার ভয় দেখিয়ে ছেলে ও বৌকে বুঝাতে থাকে, তার মরার পেছনে ঐ তেঁতর মেয়েটিই দায়ী। দামোদার ধরে নিলেন, হয়তো তাঁর মা সত্যি সত্যিই আর বাঁচবেন না। বড় দুঃখ পেলো সে। যে মা তাকে এই পৃথিবীতে এনেছেন, পৃথিবীর আলো-বাতাসের স্বাদ অনুভব করিয়েছেন, অনেক কষ্ট করে তাকে লালন-পালন করেছেন, অকাল-বৈধব্য পেয়েও তার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছেন, এমন আদর্শময়ী মায়ের কাছে এক দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর কী মূলই বা আছে ? তাই মার আসন্ন মৃত্যুর শোকে ব্যাকুল হয়ে তাড়াতাড়ি পোশাক বদল করে মার মাথার কাছে বসে ভগবত পাঠ করতে শুরু করে দিলো দামোদর। ইংরেজী লেখক মদন গোপাল বৃদ্ধ মার অসুস্থতা অভিনয়ের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে বলেন,

> When the grandmother is unable to convince her son of the prospects of bad luck, she feigns sickness and puts up appearances as if all this sickness is due to the new arrival in the house. [৪৪]

বৃদ্ধা সারাটা দিন যন্ত্রণায় কাতরান, আর খাবার সময় হলেই সব যন্ত্রণা নিমেষে উধাও হয়ে যায়। দামোদর সুপুত্রের মতো মার মাথার পাশ বসে পাখার বাতাস করে, ভগবত পাঠ করে তার মার আসন্ন মৃত্যুর শোকে ব্যাকুল হয়ে চোখের জল ফেলে। বৃদ্ধার আসন্ন মৃত্যুর খবর সারা মহল্লায় ছড়িয়ে দিয়েছে সে। প্রতিবেশীরা রোগিনীকে শেষ দেখা দেখতে এসে সব দোষ চাপিয়ে দিলো সেই অসহায় নিষ্পাপ বালিকার ওপর। তাদের কথাগুলো ছিলো এরকম,

> ایک نے کہا۔ یہ تو کہو بڑی کشل ہوئی کہ بڑھیا کے سر گئی نہیں تو تینتر ماں باپ دو میں سے ایک کو لے کر تبھی
> شانت ہوتی ہے۔ دیو نہ کرے کسی کے گھر تینتر کا جنم ہو۔
>
> دوسری بولی۔ میرے تو تینتر کا نام سنتے ہی روئے کھڑی ہو جاتے ہیں۔ بھگوان بانجھ رکھے پر تینتر نہ دے۔ [৪৫]

---

[৪৪] Madan Gopal, *Munshi Premchand: A Literary Biography,* Asia Publishing House, Bombay, 1964. P- 244-245.

[৪৫] প্রেমচাঁদ, 'তেতঁর', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৪০৯ ।

(একজন (প্রতিবেশীতো) বলে উঠলো, এ অনেক ভালো যে, একজন বৃদ্ধার প্রাণ যাচ্ছে, নাইলে ওই সর্বনাশী তেঁতর মেয়ে তার মা-বাবা দু'জনের মধ্যে একজনকে নিয়ে তবে সে শান্ত হতো।' দেবী না যেন আর কারোর ঘরে তেঁতরের জন্ম হয়।

দ্বিতীয় (প্রতিবেশী) বলল, 'আমারতো তেঁতরের নাম শুনলেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। ভগবানের কোনো নারীকে বন্ধ্যা করে রাখেন, তবু তেঁতর যেন না দেন।')

এই ভাবেই ভারতবর্ষে কন্যাসন্তান জন্মের মাধ্যমে আদি মানুষের অসন্তুষ্টির দৃষ্টিপাতগুলো প্রেমচাঁদ তার কলম তুলির মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করেছেন।

প্রেমচাঁদ ভারতীয় নারীদের পতি ভক্তির দিকটি তুলে ধরতে ভুল করেননি। তাদের কাছে পতি দেবতা তুল্য। পতি সেবা পরম ধর্ম- এটি তাদের বিশ্বাস। এমনই একটি গল্প *ধোঁকা* (*دھوکا*)। 'জামানা' পত্রিকায় **১৯১৬** সালের নভেম্বর মাসে কানপুরে এটি প্রকাশিত হয়। গল্পে প্রেমচাঁদ গল্পের নায়িকা প্রভাকে আদর্শ স্বামী ভক্তি হিসেবে গড়ে তুলেছেন। বঠৌলীর রাজা রাও দেবীচন্দের একমাত্র মেয়ে হল প্রভা। রাজা রাও গান বাজনা অনেক পছন্দ করতেন। পারিবারিক সংস্কৃতির প্রভাবে এবং প্রতিনিয়ত গান বাজনার পরিবেশে থাকার ফলে প্রভাও নিজের অজান্তে গান বাজনার পরম ভক্ত হয়ে ওঠে। একদিন বঠৌলীর রাজ্যে এক যোগী মহারাজের আবেগময় কণ্ঠস্বর, ও গভীর ভাববেগ, আর সেতারের কি সুমধুর ঝঙ্কারে গান শুনে প্রভা তার প্রেমে পড়ে যায় ও তাকে ভালবেসে ফেলেন। গানটি ছিল,

"ভুলিয়েছিল সে ক্ষণিকের প্রেমরসে....
কোথায় সেই প্রেম, হারায়ে খুঁজি হায়!
কোথায় গেলো সেই মধুকুঞ্জ, মধুময়,
ভুলিয়েছিল সে ক্ষণিকের প্রেমরসে....." [৪৬]

এদিকে রাজা রাও দেবীচন্দ নৌগড়ের রাজা হরিশচন্দ্রের সঙ্গে প্রভার বিয়ে বন্দোবস্ত করে ফেলেন। এদিকে দু'জনের বিয়ে পাকাপাকি হয়েছে জানা সত্ত্বেও প্রভা ও যোগী মহারাজ একে অপরের অনেক অন্তরঙ্গ হয়ে পড়ে। রাও সাহেব বিয়ের আগে তাদের মেলামেশাটা পছন্দ করলেন না। কিন্তু তারা নাছর বান্দা ছিল। যা কেহই তাদের আটকাতে পারেনি। হঠাৎ প্রভাব মনে কড়া নড়ল, এটা ভেবে যে, আমি কি করছি। সে নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগলো,

یہ میری کیا حالت ہے؟ مجھے کیا ہو گیا ہے! میں ہندو لڑکی ہوں، ماں باپ جیسے سونپ دہیں اس کی لونڈی بن کر رہنا میرا
دھرم ہے۔ مجھے دل و جان سے اس کی خدمت کرنی چاہئے، کسی دوسرے کا خیال بھی دل میں لانا میرے لیے پاپ ہے۔ [৪৭]

---

[৪৬] সৌরেন দত্ত, *'ধোঁকা'*, *মুন্সী প্রেমচন্দ : গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড*, কামিনী প্রকাশালয়, ৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১০৩।

("এ আমার কি হল? আমি হিন্দু মেয়ে। মা-বাবা তাদের পছন্দ মত যাঁর কাছে আমাকে সঁপে দেবেন বাকি জীবন তাঁর দাসী হয়ে থাকাটাই তো আমার ধর্ম, হিন্দু শাস্ত্র তাই তো বলে! মন প্রাণ দিয়ে তাঁর সেবা করাই তো স্ত্রীর কর্তব্য। অন্য কিছু চিন্তা করা আমার জন্য পাপ হবে")

হরিশচন্দ্র ও গান বাজনা খুব পছন্দ করতো ও নিজেও ভাল গান গাইত। খুব ধুম ধাম করে প্রভার সাথে হরিশচন্দ্রের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে হয়ে যাওয়ার কয়েকমাস পরে রাজা হরিশচন্দ্র তাঁর চিত্রশালার সংগ্রহ দেখাবার জন্য প্রভাকে তার চিত্রাশালার ঘরে নিয়ে গেলেন। ছবি দেখতে দেখতে প্রভা সেই যোগী মহারাজার ছবি দেখে আতঁকে উঠে। সে না দেখার ভান করে সরে যেতে চায়। তখন হরিশচন্দ্র তাকে নানান ভাবে ঐ ছবির লোকটিকে চেনে কিনা জানতে চাইলে, প্রভা সোজা সাপ্টা চেনে না জবাব দেয়। তখন রাজা হরিশচন্দ্র নিজের থেকেই যোগী মহারাজার গাওয়া সেই গানের প্রথম কলিটা বললেন,

"ভুলিয়েছিল সে ক্ষণিকের প্রেমরসে....

গানটার হুবহু সেই রকম স্বর, সেই রকম তাল শুনে প্রভা চোখে মুখে সরষে ফুল দেখতে লাগল। রাজা বলতে লাগলেন, ঐ যোগী প্রায়ও আমার বাড়িতে আসত ও আমাকে গান শুনাত। সে তোমার কথা আমাকে বলেছে। তুমি নাকি তার গান খুব পছন্দ করতে। প্রভা বলে সব মিথ্যে কথা। হরিশচন্দ্র জবাবে বলে, তুমি যদি চাও তাহলে আমি তাকে তোমার সামনে ডেকে তার গান শুনাতে পারি। প্রভা বলল, সে দিন আমার আর নেই, তাই এখন গান শুনতে আমার আর ভাল লাগবে না। দশ মিনিট পর রাজা হরিশচন্দ্র সেতারার বাজনায় ঐ গানটি গাইতে লাগল। প্রভার বুঝতে আর বাকি রইলনা যে, সেই যোগীমহারাজ হল রাজা হরিশচন্দ্র। প্রেমপূর্ণ, অশ্রু স্বজল চোখে সে তার ভালবাসায় ভরা হৃদয়ের পাত্রখানি উজাড় করে দিতে চাইল তার স্বামীর চরণতলে। পলক পতনহীন চোখে স্বামীর অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি দেখতে দেখতে রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল– "প্রিয়, প্রিয়তম আমার! আমিতো তোমার এই রূপ দেখে অনেক আগেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু কেন তোমার এই ছলনা ?" জবাবে হরিশচন্দ্র বলল, আমি ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীত প্রেমী। আর বিয়ের আগে তোমাকে দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। তাই আমার এই ছদ্মবেশ ধারন। এই বলে সে তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে আলিঙ্গন করতে লাগলো। গভীর দৃষ্টি দিয়ে প্রভা তার স্বামীর দিকে তাকালো। তার দু'চোখে অনুরাগের ছোঁয়া। প্রেমে গদগদ হয়ে সে তার প্রেমাস্বরের দিকে তাকিয়ে বলল,

جوگی بن کر تم نے جو کچھ پالیا وہ راجارہ کر تم ہر گزنہ پا سکتے۔ تم میرے پتی رہتے۔ پریتم نہ ہو سکتے۔اب تم میرے پتی
بھی ہو۔اور پریتم بھی۔ مگر تم نے مجھے بڑا دھوکا دیا اور میری آتما کو گنہگار بنایا۔اس کا ذمے دار کون ہوگا؟ [৪৮]

---

[৪৭] প্রেমচাঁদ, 'ধোঁকা', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৭৩-৭৪।
[৪৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

("যোগীর ছদ্মবেশে তুমি যে জিনিসটি পেয়েছ, প্রকৃত রাজার বেশে কখনোই তা পেতে পারো না। এখন তুমি আমার শুধু স্বামীই নও, আমার প্রেমিক প্রবর তুমি, তুমি আমার প্রিয়তম। কিন্তু তুমি যে ছদ্মবেশে আমাকে ঠকিয়েছ, আমার অন্তরাত্মা কলুষিত করেছ, এর জবাব কে দেবে শুনি ?")

পতির কাছে বিশ্বস্ত ও পবিত্র থাকার মত প্রভা তার প্রেমকে বিসর্জন দিয়েছিল, যদিও সেই ছদ্মবেশি প্রেমিক পুরুষটিই তার পতি ছিল। পতি ভক্তি দেখাবার মতই প্রেমচাঁদের এই গল্পের অবতারনা।

হিন্দু সনাতন প্রথায় স্ত্রী স্বামীদেরকে তাদের ভগবান বলে মনে করে থাকে। তারা নিজেরা শত কষ্টে থাকলেও স্বামীর অমঙ্গল হবে, স্বামী বিপদগামী বা বিপদে পড়বে এমন কাজ হতে বিরত থাকতো। এমনকি এক্ষেত্রে তারা তাদের জীবনকেও উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করতো না। দিনের পরদিন নারী অত্যাচারিত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে, কিন্তু কখনো মুখ ফুটে কোন প্রতিবাদ করেনি। তা করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। হিন্দু দাম্পত্য জীবনেও বহুদিন ধরে এই চিত্রই দেখতে পাওয়া যায়, একজন প্রভু আর অন্যজন দাসী এই ছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক। সেখানে ভালবাসা, প্রীতি, স্নেহ ব্যর্থতায় মাথা ঠুকেছে শুধু। নারীকে একজন পুরুষ নিয়েই খুশি থাকতে হবে। এর কোনরূপ ব্যতিক্রম হলেই তাকে অসতী আখ্যা দেওয়া হয়। পুরুষেরা অনেক নারী সম্ভোগ কিংবা অনেক বিয়ে করলেও এ জন্য তাদের কোন জবাবদিহি করতে হয় না। কুলীনরা কুলের ভয়ে কুল অধিপতিদের সাথে মেয়েদের বিয়েই শুধু দেবে না, তাদের সারাজীবন আগলেও রাখবে। বিধবাদের কঠোর ভাবে বৈধব্য-জীবন যাপন করতে হবে। হিন্দু সমাজের এ কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলাগুলো যেন সমাজপতিরা ইচ্ছা করেই সৃষ্টি করেছিল। এইদিকে লক্ষ্য করেই প্রেমচাঁদের *জান্নাত কি দেবী* (جنّت کی دیوی) ছোটগল্পটির। সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ সালে গল্পটি প্রকাশিত হয়। বাবু ভারত দাস তাঁর মেয়ে লীলার জন্য সুযোগ্য পাত্রের সন্ধান করার কোন ত্রুটি করেননি। তবে তিনি ভাল ঘর-বাড়ি যেরকম জামাই চেয়েছিলেন ঠিক তেমনটি পেলেন না। অন্য সব পিতার মতোই তিনিও চেয়েছিলেন তার মেয়ের বিবাহিত জীবন সুখের হোক, শান্তিতে সে তার স্বামীর ঘর করুক। এছাড়াও মেয়ের জামাইয়ের বিষয় সম্পত্তির দিকেই তার নজর ছিল বেশি। আর এ যুগে শিক্ষার কিই বা দাম আছে ? তবে হ্যাঁ, বিষয়-সম্পত্তির সঙ্গে ছেলের যদি বাড়তি হিসেবে বিদ্যাও থাকে, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। ভারত দাস তার কন্যা লীলার জন্য সেরকম একটা ঘরেরই খোঁজ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তার আশানুরূপ পাত্র পেলেন না। সামান্য কিছু দেনাপাওনার মাধ্যমে একরকম বাধ্য হয়েই ভারত দাস তার কন্যা লীলার বিয়ে দিলেন লালা সন্তসরণের ছেলে সীতাসরণের সঙ্গে। পিতার একমাত্র পুত্র, ভাল শিক্ষা-দীক্ষা, স্বভাবে নম্র-ভদ্র ব্যবহার, মামলা-মোকদ্দমা বেশ ভালই বোঝে। আর বেশ সৌখিনও বটে ! ফিটফাট থাকে সব সময়। সব মানুষেরই ভাল-মন্দ দিক থাকে। সীতাসরণের ভাল দিক যেমন ছিল, তেমনি তার খারাপ দিকও ছিল। বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে জমিদার সাহেব নিত্য নতুন যে আইন চালু করে, সেখানে সে নাক গলায় না, সামাজিক প্রথায় সে কট্টরপন্থী, সে তার বাবাকে যা করতে বা বলতে শোনে নিজেও তাই করে, বিচার

ক্ষমতা তার একেবারে নেই বললেই চলে, এ হল তার খারাপ দিক। মন্দ-বুদ্ধির জন্য অনেক সময় সামাজিক অনেক ব্যাপারে তার উদারতার অভাবটা নগ্ন হয়ে প্রকাশ পেয়ে যায়।

বাল্য বয়সেই লীলা শ্বশুর বাড়িতে আসে। আসলে বাল্যবিবাহের মূলেও রয়েছে কুশিক্ষা ও কুসংস্কার। অবশ্য এর পিছনে রয়েছে অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও দারিদ্র্যতা। এই দারিদ্র্যের কারনেই পিতা-মাতা অল্প বয়সে যে কোন পাত্রের কাছে মেয়ে বিয়ে দিয়ে দায় মুক্ত হতে চাইতেন। কোন কিছু বুঝবার আগেই তাদের যেভাবে বিয়ে দেওয়া হত তাতে মনে হতো তাদের কাধেঁ করে জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। তারা জীবনের স্বাদ-আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত হত। লীলা শ্বশুর বাড়িতে ঘর আসার পর থেকেই তার ভাগ্য পরীক্ষা শুরু হয়ে গেলো। বাপের বাড়িতে লীলা তার কাজের অনেক প্রশংসা পেতা, আর যেসব কাজের জন্য সে প্রশংসা পেয়েছে শ্বশুর বাড়িতে সে সব কাজের কোন প্রশংসা নেই। বাপের বাড়িতে তাকে শেখানো হয়েছে, অহিংসা, ক্ষমা আর দয়া ঈশ্বরীয় গুণ। কিন্তু এখানে তার সেই উপলব্ধির কথা প্রকাশ করার স্বাধীনতা নেই, নিষিদ্ধ। সন্তরসরণ অত্যন্ত রাগী এবং তেজী লোক। তার কাছে ভাল-মন্দ সব কিছুই যে অসহ্য। শ্বাশুড়ী তার স্বামীর চেয়ে আরও বেশি কঠিন ও নিষ্ঠুর। তার কড়া হুকুম বাড়ির কেউ ভুলেও যেন কখনো ছাদে না ওঠে। তাই লীলা ছাদে ওঠার সাহস আর দেখায় না, যদি শুনে লীলা ছাদে উঠেছে তাহলে তার শ্বাশুড়ী বাড়িতে তুলকালাম করে ছাড়বেন। পান থেকে চুন খসলেই চলে বকাঝকা আর অশান্তি। এমনকি জানালার ধারে দাঁড়ানো চলবে না নতুন বৌকে। তার মন্তব্য এ রকম : ‘আমার মেয়ে যদি এমন নির্লজ্জ বেহায়া হতো, তাহলে গলা টিপে মেরে ফেলতাম।’কে জানে, কোন ঘর থেকে মেয়ে নিয়ে এসেছি ! গয়না পরতে জানে না, সাজগোজও করতে জানে না। এর জন্যেও লীলাকে কম গঞ্জনা শুনতে হয় না, এখন সেটা তার জীবনে দু’বেলা আহার করার মতো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন। স্ত্রীর জন্য সীতাসরণকেও মায়ের কাছ থেকে কম গঞ্জনা শুনতে হয় না। তিনি তাঁর ছেলেকে মুখ ঝামটা দিয়ে বলেন, তুইও জ্যোৎস্না রাতে সব কিছু ভুলে যাচ্ছিল ? তুই কি এমন মরদ যে, বউকে বাগে আনতে পারিস না। তুই কি অন্ধ যে, দেখতে পাস না, দিনরাত ঘরের মধ্যে মুখ গুজে বসে থাকিস! মুখে যেন কুলুপ এঁটে বসে আছে। তুই তোর বউকে বোঝাতে পারিস না ?’ছেলের কাচুমাচু বৌয়ের পক্ষে দরদ মাখা জবাবে মা আর স্থির থাকতে পারলেন না, রাগে গড়গড় করতে থাকেন, দিনে সর্বক্ষণ বকর-বকর করেন আর নিজের ভাগ্যের ওপর দোষারোপ করেন।

পাঁচ বছর হলো তাদের বিয়ে হয়েছে, লীলা এখন এক ছেলে ও এক মেয়ের জননী। ছেলে জানকীচরণ, আর মেয়ে কামিনী। বাচ্চা দুটি ঘর মাতিয়ে রাখে। মেয়ে খুব ঠাকুরদা ভক্ত, আর ছেলে জানকীচরণ তার ঠাকুর মাকেই বেশি পছন্দ করে। ঠাকুরমার মতো অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দেওয়া এবং মুখ ভেঙচানো যেন তাদের একটা বদ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। ওদিকে সারাদিন ধরে খাওয়ার যেন অন্ত নেই, আর এই অতিরিক্ত খাওয়ার জন্য তাই প্রায়ই অসুখে পড়তে হয় তাদের। সব দেখেও, সব জেনেও লীলাকে সবই সহ্য করতে হয়। বাচ্চাদের কু-অভ্যাসগুলে সহ্য

করতে পারে না সে। ছেলে মেয়ে কেউই তার কথা শোনে না, মা বলে গ্রাহ্য ও করে না। ছেলেরাই বাড়ির সব, আর সে যেন এ বাড়ির কেউ নয়! আবার তাদের কিছু বললেই হল, শ্বাশুড়ী হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসবেন এবং অযথা তাকে গালিগালাজ করবেন। এ মুহূর্তে লীলার শরীর ও মন খুবই খারাপ। প্রসবের সময় তাকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, কারণ শ্বশুর বাড়ির লোকেদের অজ্ঞানতা, মূর্খতা, আর অন্ধ বিশ্বাসই তাকে বারে বারে শাস্তি দিয়েছে। প্রসবের আগে ও পরে বেশ কয়েকদিন তাকে আলো বাতাসহীন অপরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধময় আতুড় ঘরে থাকতে হয়েছে।

গ্রীষ্ম কালে এবার প্রচুর আম ও তরমুজের বেশি ফলনের কারনে সন্তসরণের বেশ আমদানি হয়। তার বাড়ির সবাই খুব ফল খায়। বাড়ির মালিক প্রাচীন পন্থী, তাই তিনি সকালেই আম ও তরমুজ দিয়ে নাস্তা করেন। আর মালকিনও কম যান না। তিনি এতই বেশি ফল খান যে, একবেলা আহারই করেন না। ফল খেয়ে যদি বা কখনো পেট খারাপ হয়, কুছ পরোয়া নেই, সামান্য ঔষুধ খেলেই সে অসুখ নিরাময় হয়ে যায়। হঠাৎ একবার সীতাসরণের পেটে ব্যাথা উঠে। তবুও তিনি তার তোয়াক্কা না করে একটার পর একটা আম খেতে খেতে অসুস্থ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। অবশেষে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন পরলোকে। সন্ধ্যার আগেই মৃতদেহ সৎকারের জন্য শ্মশান ঘাটে নিয়ে যাওয়া হল। দাহ করে মাঝরাতে সব যাত্রীরা ফিরে এলো। প্রবাদ আছে, দুর্ভাগ্য একা আসে না, সঙ্গে তার একটা দোসরও নিয়ে আসে। বাড়ি ফিরে এসে তারা দেখল, বাড়ির গিন্নীও কলেরায় আক্রান্ত তখন। আবার ছোটাছুটি, শহর থেকে ডাক্তার ডেকে আনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও গিন্নীমাকে বাঁচানো গেলো না। দিনের সূর্যাস্তের সময় প্রথমে স্বামী এবং সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে স্ত্রীও মৃত্যুপথে যাত্রা করলেন। লীলা ও সীতাসরণ পরলৌকিক কাজে ব্যস্ত থাকার দরুণ সংসারের কাজে তেমন করে মনই দিতে পারেনি। এমনকি ছেলে মেয়ের খাবার দাবারের দিকেও নজর দেওয়ার সময় হয়নি। ক্ষিধার তারনায় দুই ভাই বোন কয়েকদিন আগের মাছি ধরা আম ও তরমুজ মনের সুখে খায়। সন্ধ্যের একটু পরেই তারাও কলেরায় আক্রান্ত হয়। এর ফলে ডাক্তার এসে পৌঁছনোর আগেই তারাও তাদের মা-বাবাকে ছেড়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। বাড়িতে গভীর শোকে ছায়া নেমে এলো। তিনদিন আগেও যে বাড়ি কোলাহলে মুখরিত ছিল,আজসেখানে ভয়ঙ্কর এক নিরবিচ্ছিন্ন নীরবতা বিরাজ করেছে। কেউ টু শব্দটা করেছ না, এমন কি কারোর চাপা কান্নার শব্দও ভেসে আসছে না। আর কেই বা কাঁদবে, কাঁদার কেই বা অবশিষ্ট আছে ? যে প্রাণী দুটি এখনো জীবিত, তাদের চোখের জল তো আগেই শুকিয়ে গেছে। এদিকে লীলার স্বাস্থ্য ক্রমশই ভেঙ্গে পড়ছিল, এখন সে এতো রোগা হয়ে গেছে যে, যেন একবারে বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে। উঠে বসার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। সারা দিন সে ঈশ্বরের কাছে কামনা করে, ‘হে ঈশ্বর আমাকে তুমি তোমার কোলে টেনে নাও, আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। অন্যদিকে সীতাসরণ দুঃখটা ধীরে ধীরে সামলে নেয়। লেখকের ভাষায়,

سیتا سرن پہلے تو بہت رویا دھویا۔ یہاں تک کہ گھر چھوڑ کر بھاگا جاتا تھا۔ لیکن جوں جوں دن گزرتے تھے۔ طبیعت سنبھلتی جاتی تھی۔ اولاد کا غم تو کچھ ماں ہی کو ہوتا ہے۔ پہلے ہی کی طرح دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق ہونے لگا۔ یاروں نے اور بھی چنگ پر چڑھایا۔ سیر سپائے ہونے لگے۔ کہاں تو لیلا کو روتے دیکھ بے قرار ہو جاتا تھا۔ کہاں اب اسے غمگیں اور اداس دیکھ کر جھنجھلا اٹھتا۔ [৪৯]

(সীতাসরনও প্রথম কয়েকদিন চোখের জলে ভেসেছে। এখন সে নিয়ম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। কোথাও যাবার না থাকলে, এমনি রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। সাধারণত সন্তান হারানের শোক বেশীর ভাগ মারই সইতে হয়। সীতাসরণ এখন আগের মতোই তার বন্ধুদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করে সময় কাটাতে চায়। সে এখন বাড়ির কর্তা, তাই যা খুশি করতে পারে, আগে লীলাকে কাঁদতে দেখে সে তার চোখের জল আর সামলাতে পারতো না। কিন্তু এখন তাকে শোকমগ্ন হয়ে থাকতে দেখলে রাগে তার মাথায় রক্ত উঠে যায়।)

সে তার স্ত্রীকে সব ভুলে আগের মতো আনন্দ উল্লাস করতে বললে, লীলাবেশ বুঝে যায়, তার স্বামী তার হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। বিষয়-সম্পত্তির প্রতি তার কোনো আগ্রহ আরনেই। স্ত্রী তার ঘর থেকে চলে যাবে এমন সিদ্ধান্ত নেয়। পরক্ষণে সে ভাবে, আমার কথা মতো সত্যি যদি আমি এখন চলে যাই, আমি বেশ বুঝতে পারছি, তাহলে এ বাড়ির সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে, লীলার অভিব্যক্তি মদন গোপালের ভাষান্তরে,

> His wife, stunned to see him in the arms of a prostitute, does not take any drastic step. She only dresses herself well, makes up and wind over the husband's heart. [৫০]

স্বার্থপর ধান্দাবাজ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে আমার স্বামী সব কিছুই নষ্ট করে ফেলবে। আবার হয়তো কোনো কুলটা, সমাজ পরিত্যক্ত মেয়ে এসে আমার স্বামীর সর্বনাশ করে দেবে। আমি আমার স্বামীকে ছেড়ে চলে গেলে অবশ্যই ওর সর্বনাশ হয়ে যাবে। না, না, জেনেশুনে আমি আমার স্বামীর সর্বনাশ হতে দিতে পারি না। হিন্দু সনাতন প্রথায় স্বামীকে বাঁচানোই স্ত্রীর ধর্ম। লীলা মনে মনে চিন্ত করে,

اگر انھیں کوئی بیماری ہو جاتی۔ تو کیا اس حالت میں انھیں چھوڑ کر میں چلی جاتی؟ کبھی نہیں۔ میں دل و جان سے ان کی خدمت کرتی۔ مانا انھیں ظاہری بیماری نہیں ہے۔ مگر دل کی بیماری تو اس سے بھی زیادہ مہلک ہوتی ہے۔ جو آدمی رونے کی جگہ ہنسے اور ہنسنے کی جگہ روئے اس کے دیوانہ ہونے میں کیا شبہ ہے؟ [৫১]

---

[৪৯] প্রেমচাঁদ, 'জান্নাত কি দেবী', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১০, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৫১৯।

[৫০] Madan Gopal, *Munshi Premchand: A Literary Biography*, Asia Publishing House, Bombay, 1964. P- 243.

('যদি তার কোন অসুখ হতো, তবে কি আমি তাকে ছেড়ে চলে যেতাম ? কখনোই নয়। আমি তাকে আমার অন্তর থেকে সেবা করতাম। আমি জানি, তার ভীতরে খারাপ কোন অসুখ নাই। আমি আমার মন-প্রাণ ঈশ্বরের নামে সঁপে দিয়ে আমার স্বামীর মানসিক রোগ মুক্ত করবো। যে মানুষ কাঁদবার সময় হাসে, আর হাসবার সময় কাঁদে, তাকে পাগল ছাড়া আর কি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে ?')

পতির ধর্মই হিন্দু রমণীর ধর্ম। পতি বিনা কোন গতি নেই। এই আদর্শের ওপর ভিত্তি করে প্রেমচাঁদ এই চরিত্রটি অংঙ্কন করেছেন। অমানুষ স্বামীকে দেবতার আসনে বসিয়ে একটি নারী কিভাবে তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয় করতে পারে তাই হল লীলা চরিত্র। সমাজ এই সতী নারীকে জেনে রেখেছে ভ্রষ্ট, কূলত্যাগিনী বলে। অথচ সতীত্বের মহিমায় এই নারী উজ্জ্বল। ওদিকে বৈঠকখানায় সীতাসরন বন্ধুদের আড্ডা ও নারী নিয়ে মত্ত থাকতে দেখে লীলার মনে জিদ চাপে। পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সীতাসরণ নেশায় বুদ হয়ে বৈঠকখানায় পড়ে রইল। লীলা দেখল এমন অবস্থা চলতে থাকলে সে সব কিছুই হারাবে। সে তখন সব ভুলে গিয়ে খুব সুন্দর করে সেজে গুজে সীতাসরণের সামনে দাঁড়ায়। সীতাসরণ লীলার এই নবরূপ দেখে কতই না মুগ্ধ, উল্লসিত, স্ত্রীর প্রতি নতুন করে প্রেমের জোয়ার এলো তার মনে, সব প্রেমোৎসাহে জেগে উঠে দু'হাত বাড়িয়ে লীলাকে জড়িয়ে ধরে মধুর হেসে সে বলে, 'তুমি কি আজ অনেক অস্ত্র শস্ত্র যোগাড় করে রেখে এসেছ আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যে ? কিন্তু পালাবে কোন পথে ? লীলা নিজের ডান হাতটা বুকে রেখে বলল, 'আমি পালাচ্ছি, নাকি তুমি ? তোমাকে আমি আর হারাতে চাই না গো। এসো, এখানে এসে বসো। তোমার আসন পাতা আমার বুকের মাঝে। তুমি বড় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছো আমার কাছ থেকে। আর নয়, এবার আমি তোমাকে বেঁধে রাখবো আমার বুকের মধ্যে। বাইরে থেকে বাগানের অনেক আনন্দ তো উপভোগ করেছো, আর নয়, এবার না হয় অন্ধকার ঘরের দিকে একটু তাকাও।' সীতাসরণ লজ্জায় মাথা নিচু করে বলল, 'না, অন্ধকার ঘর বলো না লীলা। এটা হল প্রেমের আলো দেখানোর বাতি ঘর। এ ঘর আমি এতদিন আঁধারে করে রাখার জন্য লজ্জিত, নিজেকে বড় অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও লীলা।

ঐদিকে বন্ধুরা বুঝতে পারলো সীতসরন ঘর কোনে হয়ে পড়ছে, তখন তারা তাকে বাহিরের ঐশ্বর্যের লোভ লালসা দেখায়। বন্ধুরা তাকে মনে করিয়ে দেয়। 'ঘরটা যতই সাজাও না কেন, সেটা কখনো প্রেমের উদ্যান হতে পারে না!' সীতসরণ জবাবে বলে,

سیتاسرن۔ بھئی گھر باغ تو نہیں ہو سکتا۔ مگر سورگ ہو سکتا ہے۔ مجھے اس وقت اپنی فرومائیگی پر جتنی ندامت ہو رہی ہے۔ وہ میں ہی جانتا ہوں۔ جس غم میں اس نے اپنی دلربائیوں کو لٹادیا۔ اپنی خوشیوں کو فنا کر دیا۔ اسی غم کو میرا ایک اشارہ پا کر فراموش کر دیا۔ جانتے ہو کیوں؟ اسی لیے کہ میں بہک نہ جاؤں۔ وہ جنت کی دیوی ہے اور مجھ جیسے شوریدہ سروں کی حفاظت کرنے ہی کے لیے بھیجی گئی ہے۔ [৫২]

[৫১] প্রেমচাঁদ, 'জান্নাত কি দেবী', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১০, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৫২০।

[৫২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২২।

(সীতাসরণ- ঘর কখনো প্রেমের উদ্যান হতে পারে না, কিন্তু স্বর্গ তো হতে পারে! 'আমার নীচতার জন্য, লীলার প্রতি দুর্ব্যবহার করার জন্য আমি যে কতখানি লজ্জিত, তা শুধু আমিই জানি। যে কারনে সে সব কিছু উজার করে দিয়েছে, আমার খুশির জন্যই তা করেছে। তার এই উজার করা আমাকে শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে। জানো কেন ? এই জন্য যে, আমি যেন তার জীবন থেকে চলে না যাই। সে আসলেই জান্নাতের দেবী এবং আমার মত পথভ্রষ্টকে ফিরিয়ে আনার জন্য সে এই রুপে আমার কাছে ফিরে এসেছে।)

আর আমার মতো দুর্বল প্রাণীকে রক্ষা করার জন্যই তাকে স্বর্গ থেকে এখানে পাঠানো হয়েছে। আমি তাকে যেরকম ব্যাথা দিয়ে কটু কথা বলেছি, দুঃখ দিয়েছি, সেগুলো যদি আমার সব সম্পত্তির বিনিময়ে এমন কি আমার প্রাণের বিনিময়েও ফেরত পাই তাতেও আমি রাজি। কারণ আমি বুঝেছি, সত্যি কথা বলতে কি, লীলা আমার জীবনে সত্যিকারের স্বর্গের দেবী যেন। লীলা প্রেমচাঁদের ছোটগল্পে আদর্শ নারী চরিত্রের মধ্যে সফল চরিত্র। লীলার বড় বৈশিষ্ট্য সে ত্যাগে, তিতিক্ষায়, পতিব্রত্যে, সত্যনিষ্ঠা এবং সহিষ্ণুতায় অনন্যা। প্রেমচাঁদলীলার চরিত্র রূপায়ণের মাধ্যমে অগাধ স্বামী ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন।

"প্রেমচাঁদের ছোটগল্পে এমন ভাবে ভালবাসার প্রকাশ আছে বিচিত্র রূপে। কোথাও এ প্রকাশ অবিবাহিত তরুণ-তরুণীর রোমান্টিক কাহিনীতে, কোথাও দাম্পত্য-সম্পর্কের বিচিত্র জটিল রহস্যরূপে, কোথাও বা হিন্দু বিধবার সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমে, আবার কোথাও বিবাহিতা সধবা নারীর পরকীয় প্রেমে এবং সর্বশেষে পতিতা নারীর প্রেমে। প্রেমের এমন বিচিত্র রহস্য ও গভীর সহানুভূতি প্রেমচাঁদের আগে কোন সামাজিক পারিবারিক ছোটগল্পে রূপ লাভ করেনি। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নর-নারীর বিচিত্র সম্পর্কের মধ্য দিয়ে প্রেমের যে আশ্চর্য বিকাশ সম্ভব প্রেমচাঁদ সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর এই প্রেম-রহস্য উদঘাটনে প্রেমচাঁদের গভীর সূক্ষ্ম রসদৃষ্টির পর্যালোচনা করলেই সমাজ, ব্যক্তি,যুগ ও জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ বোঝা যায়।" [৫৩]

পুরুষ জাতি কর্তৃক নারী শোষণের আরেকটি প্রতিচ্ছবি হলো প্রেমচাঁদের *শাতরঞ্জ কী বাজি (شطرنج کی بازی)* গল্পটি।

১৯২৪ সালে 'জামানা'তে এটি প্রকাশিত হয়। গল্পেদেখা যায় মীর্জা সাজ্জাদ আলী ও মীর রৌশল আলী দু'জনই সারাদিন দাবা নিয়ে মক্ত থাকত। রাতদিন এক করে ফেলতেন দাবা খেলতে খেলতে। এক গেইম খেলা শেষ না হতে হতে অপর গেইম আবার শুরু করতেন। ঘরের বউ বাচ্চার দিকও তার কোন খেয়াল থাকত না। একদিন মীর্জা সাহেবের পত্নী বেগম সাহেবার প্রচণ্ড মাথা ধরে, তিনি দাসী হীরাকে পাঠান স্বামীর কাছে, ডাক্তার ডেকে ঔষধের ব্যবস্থা করার জন্য। চাকরানি মীর্জার কাছে তার বিবি অসুস্থতার কথা জানালে তিনি খেলা মক্ত থাকা অবস্থায় বলে দেন,

[৫৩] ড. গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য*, প্র-স, কলি ১৩৮০, পৃ. ১৪০।

مرزا جی نے کہا چل ابھی آتے ہیں۔ بیگم صاحب کو اتنی تاب کہاں کہ ان کے سر میں درد ہو اور میاں شطرنج کھیلئے میں مصروف ہوں۔ چہرہ سُرخ ہو گیا اور ماما سے کہا کہ جا کر کہہ کہ ابھی چلیے ورنہ وہ خود حکیم صاحب کے یہاں چلی جائیں گی ۔ [৫৪]

("মির্জা সাহেব বললেন, যাও আমি আসতেছি। বেগম সাহেবা চটে গিয়ে চাকরানিকে আবার তার কাছে পাঠান, আর তাকে বলে দিলেন, যাও মির্জাকে বলবে, সে যদি তাকে ডাক্তার খানায় না নিয়ে যায় তাহলে সে নিজেই ডাক্তার খানায় যাবে।")

মীর্জা তখন খেলার এক চরম পর্যায়ে উপনীত ছিলেন। জোর এক কিস্তির পরই খেলা শেষ। তিনি চটে গিয়ে বললেন, মরে যাচ্ছেন কি উনি ? দু'মিনিটও দেরী সইছে না তার। প্রেমচাঁদ এখানে নারীর অবহেলিত জীবনকে বিষয়বস্তু করে এই গল্পটি লিখেছেন।

প্রেমচাঁদের অসংখ্য ছোটগল্পের মধ্যে দেখা মেলে যে, হিন্দু সমাজের বিধবা-বিবাহ অসমর্থন ও বাল্য-বিবাহ সমর্থনের মূলে আছে তার পারিবারিক সন্মান রক্ষার প্রচেষ্টা। বধূ অল্প বয়সে স্বামী গৃহে এলে নবীন পারিপার্শ্বিকতাকে আপন করে নিতে পারে। এর ফলে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়। *মোহব্বত কি হোলি* (محبّت کی ہولی) গল্পে প্রেমচাঁদ এক চৌদ্দ বছরের বিধবা নারীর চরিত্র তুলে ধরেছেন। গঙ্গী চৌদ্দ বছর বয়সে বিধবা হয়েছে। এখন তার বয়স সতের। সে জানে, সে বিধবা, সংসারের সুখের দরজা তার কাছে চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে। তর মতে সে জন্য কান্নাকাটি করেই বা কি লাভ ? অহেতুক দুঃখ কাতর হলে তো আর বৈধব্যদশা থেকে মুক্তিলাভ করা যাবে না। গঙ্গী তার বাবা মৈকুর কাছেই থাকে। গঙ্গী খায়-দায়, সবার সঙ্গে তার হৃদ্যতা আছে, হেসে হেসে কথা বলে, কেউ কখনো তাকে মুখ ভার করতে কিংবা নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করতে দেখেনি। আর পাঁচটা কুমারী এবং সধবা রমণীর মতোই সে তার জীবন নির্বাহ করতে চায়। রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতেই গঙ্গী ঘুম থেকে জেগে উঠে গোয়াল ঘর সাফ করে, গরু ও বলদগুলোকে দানা পানি দিতে শুরু করে। এভাবেই সে তার প্রতিদিনের কাজ শুরু করে। এরপর দুধ দুয়াবার জন্য সে তার দাদাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে। এই সময় কুয়ো থেকে জল তোলার কাজ শেষ করে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে। গ্রাম সম্পর্কের বৌদিরা আসে তার কাছে, গল্প করে, হাসি-ঠাট্টা করে। তবে তাদের সেই কথা-বার্তায়, হাসি-ঠাট্টায় এক বিশেষ ধরণের রসিকতার প্রসঙ্গ থাকে, যা তারা সাবধানে এড়িয়ে চলে। বিবাহিতা বান্ধবীরা শ্বশুর বাড়ি থেকে এসে তাকে তাদের প্রাণের কথা খুলে বলে, তবে তা এক বিশেষ প্রসঙ্গ সৃষ্টি করে। হোলি উৎসবের দিন তার বৌদি ও অন্যান্য মেয়েরা যখন রঙ্গীণ কাপড় পড়ে, সে তখন সমাজের রীতি-নীতিতে সাদা থান কাপড় পড়ে, সেই চিরন্তন বৈধব্যের বেশ। মায়ের মন কিন্তু মানে না, মেয়ের অমন বৈধব্যের

---

[৫৪] প্রেমচাঁদ, 'সাত রঞ্জ কি বাজী', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১০, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৩০৭।

বেশ দেখলে তার বুক ফেটে যায়, হাহাকার করে ওঠে, গঙ্গীকে সে বলে, 'গঙ্গী, যা না, তুইও কোন রঙীন শাড়ি পর।' উত্তরে গঙ্গী বলে, 'না মা, এই তো আমি বেশ আছি।' Nandini Nopany and P. Lal এই ভাবে উল্লেখ করেন,

> *Prema ki holi* from premchand's a little known story about a seventeen year old girl Gangi who has been a widow for three years. On Holi, she is fascinated by a young man's voice. Both she and he lack the courage to let the acquaintance ripen into love. He disappears. A year later, again on the day of the Holi spring festival, she waits for him; he does not arrive. She notices a fire and mistakes it for the Holi bonfire. Later it is revealed that the fire is from the funeral pyre of the young man. [৫৫]

অন্যরা যখন হলি নিয়ে ব্যস্ত, তখন গঙ্গী বাড়ীর রান্নার কাজে ব্যস্ত, এতেই তার সুখ, এতেই তার আনন্দ। সন্ধ্যায় হোলির গান গাইতে মহারাজ বুদ্ধু সিংহের পুত্র গরীব সিং গান গাইতে মৈকুর বাড়ীতে আসেন। গঙ্গী তার নিজের ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে তাদের গান শুনছে। গঙ্গী গরীব সিংহের গান শুনে মুগ্ধ, তার সারা দেহ মনে আনন্দের ঢেউ যেন বয়ে যেতে থাকল। ওদিকে তার মা বেশ কয়েকবার ডেকেছে। কিন্তু গান ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না তার। গানের মিষ্টি সুর ও ছন্দ তার হৃদয়ে যে ঝড় তুলেছে তাতে সে এক অদ্ভুত আবেগে দুলছে; গানের ভাষার তীব্র মাদকতা তাকে মাতাল করে দিয়েছে। গরীর সিং এর সুর ও তাল গঙ্গীকে উলট পালট করে দিয়েছে। তারপর কয়েক মাস অতিক্রান্ত হল। এক দিন হঠাৎ গরীব সিং গঙ্গীদের বাড়ীতে তার বাবার খোঁজে আসে। ওদিকে গরীব সিং একবার গঙ্গীর দিকে তাকায়, পরক্ষনেই সে আবার তার দৃষ্টি মাটির ওপর নিবদ্ধ করে। সে চাহনির মধ্যে কী যাদু ছিল কে জানে, গঙ্গীর সার দেহ মনকে রোমাঞ্চিত করে তুলল। তার অঙ্গে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেলো। রাতে বিছানায় শুয়ে থাকে কিন্তু চোখে কোন ঘুম ছিল না। বার বার যুবকটির কথাই তার মনে পড়ে। গরীব সিংও তাকে ভালবেসে ফেলে। বিধবার প্রেমকে লেখক এখানে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন এবং বিধবা হওয়ার পরও যে তার মনে ভালবাসার সৃষ্টি হতে পারেতা প্রেমচাঁদ সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখিয়েছেন। এ অবৈধ প্রেমকে তিনি প্রশ্রয় দিতে চাননি সমাজের কারণে। ব্যক্তির হাসি-কান্না, আবেগ-অনুভূতি সব সমাজ-শৃঙ্খলার আবর্তে তলিয়ে

---

[৫৫] Nandini Nopany and P. Lal, *Twenty Four Stories by Premchand*, Vikas Publishing House, New Delhi, 1980, P- 19-20.

গেছে। এদিকে গল্পে গরীব সিং গঙ্গীর বাবা মৈকুকে দেখার বিভিন্ন অজুহাতে গঙ্গীকে দেখতে আসত। গঙ্গীর সাথে তার দেখা হত, কিন্তু কেউ তাদের মনের কথা কাউতে বলতে পারত না। এভাবে কয়েক মাস চলে যায়। একদিন গরীব সিং গঙ্গীকে দেখার ছলে তাদের বাড়ীতে আসল। ঠাকুরকে কাছে পেয়ে গঙ্গী ও তার মা ভাল করে বাটি ধুয়ে একটু আখের গুড় ও দুধ দিয়ে শরবত তৈরী করে ঠাকুর কে দিল। ঠাকুর তৃপ্তি সহকারে তা খেয়ে মৈকুর কাছ থেকে বিদায় নিল।

“মৈকু তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘সত্যি কতোই না রোগা হয়ে গেছে বেচারা!’ গঙ্গী উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল, ‘কোনো অসুখ বিসুখ করেছে নাকি ?’

মৈকু বলে উঠল, ‘শারীরিক রোগ হলে তবু কথা ছিল, কিন্তু জানিস মা, চিন্তা রোগ বড় রোগ, এর কোনো ঔষধ নাই। ও বেচারা গৃহস্থী সামলাবে কি করে জানি না। ওর বাবা মারা যাবার পর ও একবারে একা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। পরের দিন সকালে মাকে একা পেয়ে গঙ্গী তার উদ্বেগের কথা তাকে না বলে থাকতে পারল না। ‘জানো মা, গরীব সিংকে কাল দেখলাম, খুবই রোগা হয়ে গেছে।’ মা বলে- ‘তা রোগা হবেই বা না কেন ?’ ‘সংসারের জোয়াল তার কাঁধে পাথরের মতো চেপে বসেছে। বাপ যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন তো গায়ে হাওয়া লাগিয়েই বেড়াত।’

মায়ের কথায় ঠিক সায় দিতে পারল না গঙ্গী। বাইরে এসে মৈকুকে বললেন, আচ্ছা বাবা, তুমি গরীব সিংকে তো বুঝিয়ে বলতে পারো, তার এতো চিন্তার কী আছে ? আমরা তো আছি!’ মৈকু বিস্ফোরিত চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে একটু রুক্ষ স্বরে মেজাজ দেখিয়েই যেন বলল, ‘অন্যের জন্যে তোর কিছু ভাবতে হবে না, যাতোর নিজের কাজে মন দিগে!’ গঙ্গী মনে হল, হঠাৎ তার মাথায় যেন বজ্রপাত ঘটল। এর আগে সে কখনো তার বাবার মুখ থেকে এতো কঠোর উত্তর শোনেনি কিংবা আশা ও করেনি।”

আসলে সমাজে গঙ্গীর মতো কেউ চিন্তা করে না যে, বিধবা মেয়েদের বিধবা হওয়ার সাথে সাথে তাদের ভালোবাসা ফুরিয়ে যায় না, তারা আবারো অন্য কাউকে ভালবাসতে পারে, আবারো বিয়ে করতে পারে। সময়ের পরিক্রমায় পরের বছর আবার হোলি ফিরে আসে, গরীব সিং আর গঙ্গীর বাড়ীতে গান গাইতে আসছে না। মহাজনের বাড়ী থেকে সে আসবে সেই আশায় সে অপেক্ষা করতে থাকে। গঙ্গী তার জন্য মিষ্টি ও নোনতা খাবার তৈরি করে রেখেছে। উঠোনে মাদুর পাতা হয়েছে হোলির গানের জন্য। গঙ্গী তাদের বাড়ীর ছাদে উঠে দেখল, অন্য গায়ে চ্যাঁচর হচ্ছে। সে তার বাবাকে গিয়ে তা বলল। মৈকু তা নিজ চোখে দেখে বললেন, দূর পাগলী মেয়ে, ঐটা চ্যাঁচর না, এ আগুন সে আগুন নয়, এটা চিতার আগুন! মনে হচ্ছে, কেউ বোধ হয় মারা গেছে। তাই মহাজনের বাড়ি

থেকে কেউ আসেনি। গঙ্গীর বুকটা ধক্ করে উঠল। ঠিক সেই সময় একজন মৈকুকে ডেকে বলে, ‘শুনেছো মৈকু মাহতো, গরীব সিং মারা গেছে।’

মৈকু বাইরে বেরিয়ে এলো। গঙ্গী স্তব্ধ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে যেন এখন ভয়ঙ্কর বিষণ্নতার প্রতীক। সে চিতার দিকে অবলোকন তাকিয়ে রইলো। সে যেন দেখছে, গরীব সিং সেই সুদূর চিতা থেকে উঠে এস তার দিকে তাকিয়ে আছে, সেই চোখ, সেই মুখ, চোখে অনুরাগের ছোঁয়া, গঙ্গী কি তা ভুলতে পারে কখনো ? সেদিন থেকে সে আর চ্যাঁচর দেখেনি। প্রতি বছরেই হোলি আসে, চরস ভাঙা গাঁজা তৈরী হয়, মিষ্টি-নোনতা খাবার তৈরী হয়, হোলির গানে সবাই মেতে ওঠে। ফাগ ও আবীরের রঙের বন্যা বয়ে যায়, কিন্তু গঙ্গীর জীবন থেকে হোলির উৎসব যেন চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছে।

প্রেমচাঁদ তার *রোশনী* (روشنی) গল্পে এক বিধবা নারীর জীবন সংগ্রামের ছবি তুলে ধরেছেন। গল্পে উচ্চ শিক্ষিত তরুণ যিনি সংযুক্ত প্রদেশে পাহাড়ি এলাকায় সাব-ডিভিশনার হিসেবে চাকুরী প্রাপ্ত হয়েছে। একদিন তার লঙ্গার খানার কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করতে কর্মস্থল থেকে আঠারো মাইল দূরে গজনপুর যাওয়ার প্রয়োজন হয়। পথে সে হঠাৎ করে পাহাড়ী পথে কাল বৈশাখী ঝড়ের মুখোমুখি হয়, প্রচন্ড ঝড়ের দাপটে সে বেশ কয়েকবার ঘোড়ার ফিট থেকে পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। ভয়ে আতঙ্কে তার উম্মাদ হওয়ার আবস্থা হয়। এই জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সে দূরে দেখলো কোন জমিদার উট নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাছে আসলে দেখতে পায়, সে এক নারী। নারী হয়েও তার সাহস দেখে সে ভয়কর লজ্জা অনুভব করে। যুবক তখন নারীকে গজনপুর যাওয়ার রাস্তাটা কোথায় জিজ্ঞাসা করলেন, সে বলল আমার সাথে আসেন, আমার গ্রামের পরেরটিই গজনপুর। মিনিট পনেরোর মধ্যে চারদিকের আবহাওয়া একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন আমি ঐ যুবতীকে উপদেশ দেওয়ার ছলে বললাম,

تم اس آندھی میں کہیں رک کیوں نہیں گئیں؟

چھوٹے چھوٹے بچّے گھر پر ہیں۔ کیسے رک جاتی۔ مرد تو بھگوان کے گھر چلا گیا۔ [৫৬]

(‘এই দুর্যোগের মধ্যে পথ না চলে কোথাও দাঁড়িয়ে গেলেই তো পারতে!’

‘ঘরে ছোট ছোট সব দুধের বাচ্চা রয়েছে। ক্যামনে দাড়াই বলো ? মরদটা তো কবেই ভগবানের ঘরে চলে গেছে।)

বাচ্চাদের ভাবারের জন্য ঘাস বিক্রি করতে গিয়েছিলাম। সেখানে তার জীবন সংগ্রাম দেখে যুবক মুগ্ধ হয়। সৃষ্টিকর্তার উপর অগাধ বিশ্বাস নিয়ে কিভাবে সে ঝড়কে জয় করেছে। যুবক খুশি হয়ে অসহায় বিধবা মাকে

[৫৬] প্রেম গোপাল মিত্তল, ‘রোশনী’, *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৯০৯।

বাচ্চাদের মিষ্টি খাবারের জন্য তাকে পাঁচ টাকা দেতে চাইলে মহিলা কোন ভাবেই নিল না। কারণ এটাতে তার আত্ম সম্মানে লাগে।

অর্থের অভাব প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিরাজমান, যা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নাই। তাই বলে অর্থের জন্য স্ত্রী কর্তৃক স্বামী লাঞ্ছনার ঘটনা সমাজে খুব বেশী দেখা না গেলেও প্রেমচাঁদ তাঁর *লা'নত* (لعنت) গল্পে কাওসজী ও তার স্ত্রী গুশনবানুর অর্থ লিপ্সা চরিত্রের মাধ্যমে স্বামী লাঞ্ছনার ঘটনা তুলে এনেছেন সুপরিকল্পিত ভাবে। *লা'নত* গল্পটিজুন, ১৯৩৫ সালে 'হংস' পত্রিকায় প্রথমে হিন্দিতে ছাপা হয়। পরে 'জাদেরাতে' উর্দুতে প্রকাশিত হয়।[৮৭] কাওসজী পত্রিকা সম্পাদনা করে যশ ও খ্যাতি দুটোই ভালো কামিয়ে ছিলেন। তবে অর্থের মুখ বলতে গেলে সে দেখতেই পান নাই। ওদিকে কাওসজীর জীবন শুধু অশান্তি, তিক্ততা, নৈরাশ্য এবং উদাসীনতায় ভরা। তিনি অর্থের কদর না করলেও বাস্তবতা হলো অর্থ ছাড়া কারোরই কিছুই নেই, মূলত অর্থের কাছেই সবার জীবনের সুখ-শান্তি বাঁধা পড়ে থাকে। তাই কাওসজীর বন্ধু শাপুরজীর অধিক অর্থ প্রাপ্তিতায় তার ঘর-সংসারে সুখ-শান্তি দেখে গুশনবাবুর নিজের সংসারের ওপর ভীষণ ঘৃণা জন্মেছে, যার ফলে তার সংসারে অনীহা দেখা দিয়েছে। কাওসজীর স্ত্রী গুশনবানুর মনের সংকীর্ণতা এবং ঈর্ষা দেখে সে বিরক্ত বোধ করেন। স্বামী ঘরে আসা মাত্রই গুশন তার নানান অভিযোগের ফিরিস্তি শুনিয়ে মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, 'তুমি নিজেকে যতই ভালো মানুষ বলে মনে করো না কেন, আমার কাছে তুমি কিন্তু একটা আস্ত বলদ ছাড়া আর কিছু নও। বলদের সঙ্গে তোমার উপমা দেবার কারণ কি জানো, বলদ খুব পরিশ্রমী আর শান্ত প্রকৃতির হয়, তুমিও ঠিক তাই। গুশন সুযোগ পেলেই কাওসজীকে শুনায়, তোমার যখন আয়ই নেই তখন আমায় বিয়ে করার ই বা কী প্রয়োজন ছিল তোমার ? তুমি বিয়ে না করলে আমাকে তো অর্থাভাবে এমন কষ্ট করতে হতো না। তুমি তো জানতে তোমার ঘরে দু'বেলা খাওয়া জোটে না, তখন আমাকে বিয়ে করে তোমার এই অভাবের সংসারে কেন নিয়ে এলে ? এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো ক্ষমতা কাওসজীর ছিল না। তখন তাঁর মুখের ডগায় কোনো উত্তর আসে না, না বলা কথার জন্য তাঁর খুব অনুশোচনা হয়। তবে একবার তিনি তাঁর মেজাজ ঠিক রাখতে পারেননি। রেগে গিয়ে বলেছিলেন, 'এতো অভিযোগ করার কি আছে, যা হবার হয়ে গেছে, কী আর করবে এখন! যাইহোক, আমি তো আর তোমাকে আটকে রাখিনি। তোমাকে যে পুরুষ সুখে শান্তিতে রাখবে তার কাছে গিয়েই থাকো না কেন। এর চেয়ে ভাল বিকল্প ব্যবস্থা আর কি হতে পারে বলো ? তাছাড়া আমিতো চেষ্টা করি, কিন্তু লাভ যদি না হয় কি করতে পারি বলো ? তুমি কি বলতে চাও, তোমার সুখের জন্য আমি আমার প্রাণটা বিসর্জন দিয়ে দেবো ? কাওসজীর কথা শুনে গুশনবানুর স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ মনোভাব প্রেমচাঁদ এভাবে তুলে ধরেছেন,

---

[৮৭] আব্দুল কাভী দাছনভী, *প্রেমচাঁন্দ*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ২০১১, পৃ. ২৪।

اس پر غشن نے ان کے دونوں کان پکڑ کے زور سے اینٹھے اور گالوں پر دو طمانچے لگائے اور شعلہ بار نظروں سے دیکھ کر بولی۔ ’اچھا اب زبان سنبھالو ورنہ برا ہوگا۔ ایسی شرمناک بات کہتے تمہیں شرم نہیں آتی۔ مگر غیرت ہوتی تو۔ تم نے شرم تو جیسے بھون کھائی۔‘ [৫৮]

(তার কথা শুনে গুশন তাঁর কান দুটো ধরে গালে দুটো কষে চড় মেরে বসে এবং চোখ লাল করে দাঁত খিঁচিয়ে বলেছিল, ‘মুখ সামলে কথা বলো, নইলে ভাল হবে না বলছি। এরকম কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে তোমার লজ্জা করে না ? তোমার মনে যদি এতটুকু দয়া থাকতো তাহলে এমন অলুক্ষণে কথা কখনও মুখে আনতে না। ’)

বিধবা নারীর সামাজিক অবস্থান, দু:খ, দুর্দশা ইত্যাতি তুলে ধরা হয়েছে *ধিক্কার* (دھکار) গল্পটিতে। গল্পের নায়িকা মানী পাঁচ বছর বয়সে তার বাবাকে হারায়। মা অনেক কষ্ট করে তাকে লালন-পালন করে বড় করে তুলেন। পরে ষোল বছর বয়সে পাড়া-প্রতিবেশীদের চেষ্টা বদৌলতে তার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখি মানীর কপালে সুখ বেশি দিন সইল না। বিয়ের বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বেচারি মা ও স্বামী উভয় মারা যায়। অসহায় মানীকে সংসারে আশ্রয় দেওয়ার মত বংশীধর কাকা ছাড়া আর কেউ ছিল না। কাকার সংসারে মানী ভাল অবস্থায় ছিল না, সংসারে কাকা-কাকী ও খুড়তুত বোন ললিতার গঞ্জনা, গালা-গালি, এমনকি মারপিট যন্ত্রণা সহ্য করে মাথা গোঁজার ঠাঁই এর থেকে ভাল জায়গা আর পাওয়া যাবে না, এই ভেবে সে শত কষ্টের মাঝেও সেখানে অবস্থান করতে থাকে। কিন্তু সে কাকার আশ্রয়ে দু'চার মাস কাটতে না কাটতেই মানী বেশ বুঝতে পারলো যে, তার কাছে বেশিদিন থাকা সম্ভব নয়। সংসারের যাবতীয় কাজ তাকে করতে হয়, চরকির মতে সরাদিন ঘুরতে হয়। ঘরের সবাব মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করে, চুন থেকে পান খসতে দেয় না। তা সত্ত্বেও তার কাকা ও কাকীমা রকন যে তাকে সহ্য করতে পারেন না, বুঝতে পারে না সে। এখানে রস আশ্রয় নেবার পরেই সব কাজ তার করা লাগছে। বাসন ধোয়া-মাজার জন্য এক ছোকরা চাকর ছিল, তাকে ও বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মানী এত পরিশ্রম করে এবং সব সময় সচেতন থাকে, তবু কাকা কাকীমা কেন যে তাকে দেখে কখনো মুখ ফিরিয়ে নেন, আবার কখনো বা মুখ ভার করে থাকেন, তা সে ঠিকই বুঝতে পারছিল। এ সংসারে খুড়তুত ভাই গোকুলই কেবল ব্যতিক্রম, তাকে একটু সহানুভূতির চোখে দেখে। গোকুল তার মাকে বেশ ভাল করেই জানে, তার কাছে মানীর প্রতি তার বিদ্বেষের মনোভাব অসহ্য লাগে। কিন্তু মানীর এত সব অন্যায়-অবিচার দেখে শুনেও চুপ করে থাকতে বাধ্য হয় এ কারনে যে, যদি সে তার মাকে তার মনোভাব বদল করার জন্য বোঝাবার চেষ্টা করে, কিংবা প্রকাশ্যে মানীর পক্ষ অবলম্বন করে, তাহলে মানীর এ সংসারে থাকাটাই একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়বে। আর এ কারনেই মানীকে মৌখিক সহানুভূতি আর সান্তনা দেওয়া ছাড়া আর কিই বা করতে পারে সে! মানীকে সে বলে বোন, কিছু ভাবিস না, একটা চাকরি পেলেই আমি তোর সব

---

[৫৮] মুন্সী প্রেমচান্দ, ‘লা'নত’, *মাজমুয়াহ মুন্সী প্রেমচাঁন্দ: আফছানে*, ছংগে মিল পাবলিকেশন, লাহোর, ২০০২, পৃ. ৭০০।

দুঃখ কষ্ট দূর করে দেবো। তখোন দেখবো, কে তোকে দিনরাত অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করে, তোর ওপর দৈহিক অত্যাচার করে। চাকরি যতদিন না পাই, ততদিন পর্যন্ত দুঃখ-কষ্ট একটু সহ্য করতেই হবে তোকে। ভায়ের এমন স্নেহ-মমতায় ভরা আশ্বাস শুনে অতো দুঃখের মাঝেও মানীর আনন্দের সীমা থাকে না, আশায় বুক বাঁধে সে,আর ছোটভাইকে তার অন্তরভারা আশীর্বাদ জানায়।

মানীর কাকাতো বোন লালিতার আজ বিয়ে। অনুষ্ঠানে আত্মীয় স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবাই আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছে। গহনার ঝঙ্কারে আর তাদের কথাবার্তায় সারা বাড়ি মুখরিত। সবাই খুশির আনন্দে মেতে উঠেছে, মানীও নিমন্ত্রিতদের দেখে খুব খুঁশি। অন্যদের মতো তার কোন পোশাক আশাক ও অঙ্গে গহনার লেশ মাত্রও নেই। তবুও তার মনেআজ খুশিতে ভরপুর। হলুদে কনেকে সাজানো হচ্ছে, তার খুব ইচ্ছে হলো, কনে সাজানো দেখার। সিদ্ধান্ত মত কনের ঘরে ঢুকা মাত্রই তার কাকীমা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠে মানীকে বলতে লাগলেন,

تجھے یہاں کس نے بلایا تھا، نکل جا یہاں سے ! [৫৯]

(তুকে এখানে কে ডেকেছে, এখনি বেরিয়ে যা এখান থেকে !)

মানী এর আগেও এমন অনেক লাঞ্চনা, গঞ্জনা সহ্য করেছে, কিন্তু আজ এই দিন কাকিমার এই কথাগুলো তার মনে অনেক আঘাত করেছে। সে নিজেকে নিজে অনেক ধীক্কার দিল। সে মনে মনে ভাবতে লাগল আজ তার বাবা-মা নাই বলে তাকে বিধবা হওয়ার কারনে এতো আঘাত তাকে পেতে হচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে সে তার ঘরের দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় গোকুলের সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। সে কাকীমা যখন মানীকে বকাবকি করছিল তা সে শুনতে পেয়েছিল। মানী তার রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে লাগল ও সিলিং ফ্যানের রড থেকে একটা দড়ি ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল। এমন সময় ইন্দ্রনাথ ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঢুকে তার গলা থেকে দড়ি সরিয়ে ফেলল। ইন্দ্রনাথ বলল, মানী তুমি কী সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলে ? জানো, এ অপরাধের কী শাস্তি হতে পারে ? মানী মাথা নিচু করে নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'যে শাস্তি আমি এ সংসারে পাচ্ছি, এর থেকেও কি কোনো কঠোর শাস্তি থাকতে পারের ? যাকে কেউ সহ্য করতে পারে না, কেবলি দুর্ব্যবহার করে, যার মুখ দেখলে লোকে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে যদি তার সব জ্বালা-যন্ত্রণা ঘোচাতে মৃত্যর পথ বেছে নেয়, তার জন্য যদি তার কঠোর শাস্তি পেতে হয়, তাহলে আমি বলবো, ঈশ্বরের দরবারে ন্যায় বিচার বলে কিছু নেই।' এমন সময় গোকুল ঘরে ঢুকে ইন্দ্রনাথ ও মানীকে এক সাথে দেখে তার মনে সন্দেহ হয়। সে বন্ধুকে খারাপ ভাবতে থাকে। পরে ইন্দ্রনাথ তার বন্ধু গোকুলকে মানীর সাথে তার মার কুকুরের মত ব্যাবহারের কথা তুলে ধরে। ইন্দ্রনাথ গোকুলকে

---

[৫৯] প্রেমচাঁদ, 'ধিক্কার', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৪৩০।

নিঃসংকোচে মানীকে জীবন সঙ্গিনী করার প্রস্তাব দেয়। ইন্দ্রনাথ বন্ধুকে বলল, আমি মানীর সঙ্গে যতটুকু মিশেছি, তাতে আমি বুঝেছি, তার আত্মসম্মানবোধ বড্ড বেশি, আর সত্যি কথা বলতে কি আমি তার এমন মনোমুগ্ধকর স্বভাবে মুগ্ধ হয়েছি। এই রকম আত্মসম্মানের মেয়েরা অপমান, অত্যাচার বেশিদিন সহ্য করতে পারে না, সুযোগ মত তারা নিজেরাই তাদের জীবনের ইতি টেনে দেয় অর্থাৎ আত্মহত্যা করে বসে। যেমন একটু আগে করতে যাচ্ছিল মানী। আমি ঠিক সময় মত না এল এতক্ষণে ওর লাশটাই আমারা দেখতে পেতাম। তাই দ্বিতীয়বারের সুযোগ আমি তাকে দিতে চাই না, তার আগেই আমি মানীকে নিজের করে নিতে চাই।

গোকুল লজ্জ্বায় লাল হয়ে গিয়ে, গভীর শ্রদ্ধায় নমানীয় হয়ে বন্ধুকে বলল, কিন্তু বন্ধু তুমি তো জান যে, মানী বিধবা। ইন্দ্রনাথের মুখে হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল। সে বলল, আমি জানি যে, মানী কেবল বিধবাই নয়, অপবিত্রও বটে, এমন কি আরো অনেক কিছুই হতে পারে। কিন্তু যাইহোক না কেন, তবুও আমার কাছে সে অনন্যা, এক অপূর্ব নারী।' ইন্দ্রয়ের কথায় খুঁশি হয়ে সে মানীকে এই বিবাহে রাজি করালো। কিন্তু বাড়ীর লোকেরা কোন কিছুর টের পেল না। কয়েকদিন পর বাড়ীর সবাইকে মিথ্যা বলে গোকুল মানী কে নিয়ে ইন্দ্রনাথের বাড়ীতে গিয়ে তার সাথে মানীর বিয়ে করিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরল। ঘরে ফিরলে মা মানীর কথা বললে সে সব কথা পরিবারের সকলকেবলে। মা রাগে গর্জে উঠে ছেলেকে তিরস্কার করতে গিয়ে বললেন, 'তুই একটা বংশের কলংক, কুলাঙ্গার, শয়তান,' আরো অনেক কিছু বলে তার রাগ উজার করে দিলেন। গোকুল আর চুপ থাকতে পারল না, বাধা দিয়ে মাকে বলল, 'মা, তুমি চুপ করবে ? এতক্ষণ পর্যন্ত গালমন্দ শুনেছি। কিন্তু আর নয়। তাই আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তুমি আর বাবা মানীর জীবনকে অসহনীয় করে তুলে ছিলে। তুমি তার সঙ্গে যে ব্যবহার করতে তা কেউ শত্রুর সঙ্গেও করে না। তার সঙ্গে তুমি এরকম দুর্ব্যবহার করতে পেরেছো কারণ সে তোমার আশ্রিতা ও তার স্বামী নেই বলেই তো, সে এখন বিবাহিতা, তার স্বামী হয়েছে, এখন সে আর তোমার গালি গালাজ শুনতে আসবে না। যেদিন বাড়িতে তোমার মেয়ের বিয়ের উৎসবে তোমরা মেতে উঠেছিলে, ললিতার কনে সাজার দৃশ্য দেখতে ঘরে গিয়েছিল মানী, তুমি তাকে দুর দুর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। সেই অপমানে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে মানী আত্মহত্যা করতে যায়। সেই সময় ইন্দ্রনাথ উপরে তার ঘরে গিয়ে হাজির না হলে, আজ আমাদের সবাইকে জেল খাটতে হতো।" ছেলের এসব কথা শুনে মা আরো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন, তিনি আরও অকট্য ভাষায় গোকুলকে বকাবকি করলেন। রাগে দুঃখে গোকুল সেদিন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

এক সপ্তাহ কেটে গেলে বাবা বংশীধর গোকুলকে খুঁজ করতে বের হয়, কিন্তু কোথাও তাকে আর পাওয়া গেল না। এখন মা ও পরিবারের সকলের চিন্তা হচ্ছে, ছেলেটা গেল কই ? ওই অলুক্ষণে মেয়েটার জন্যই আজ আমার ঘরে এমন সর্বনাশটা হলো। জানি না, কোন অশুভক্ষণে সে এসে আমার ঘরটা লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেলে! যদি সে না আসতো, তাহলে এমন অবস্থায় কি আমাদের পড়তে হতো ? ছেলে আমার কতোই না শক্ত, সামর্থবান ও বুদ্ধিমান

ছিল! জানি না, আজ সে কোথায় কী করছে ? অনেক চিন্তিত থাকার মাধ্যে এক বৃদ্ধ তার কাছে এসে বলল, ‘বাবুমশাই, আপনার একখানা চিঠি নিয়ে এসেছি, দেখুন! বংশীধরের চিঠি দেখে প্রথমে মনে করেছিলেন গোকুল পাঠিয়েছে, পরে বুঝতে পারেন মানী পঠিয়েছে। সে লিখেছে,

“পূজনীয় কাকাবাবু,

এই অভাগিনী মানীর প্রণাম গ্রহণ করুন। গোকুল ভাই ঘর ছেড়ে কোথায় চলে গেছে শুনে আমি দুঃখিত ও মর্মাহত হলাম। তার সন্ধান নিশ্চিয়ই করতে পারেননি। তার এই চলে যাওয়ার জন্য হয়তো আমিই দায়ী, তাই নিজেকে বড় অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। সে কলঙ্ক আমার প্রাপ্য। আর আমার জন্যেই আপনার এতো দুঃখ কষ্ট। বিশ্বাস করুণ, তার জন্য আমিও কম দুঃখিত নই। আশা করি ভাই নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। আমি আজ রাত ন’টায় গাড়িতে বোম্বাই চলে যাচ্ছি। আমি আপনার কাছে যে অপরাধ করেছি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনি ও কাকীমা আমার প্রণাম নেবেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কারছি, গোকুল ভাই যেন খুব শীগ্গীর সুস্থভাবে ফিরে আসে। ঈশ্বরের ইচ্ছে হলে ভাইয়ের বিয়েতে গিয়ে আপনাদের চরণ স্পর্শ করে সামনা-সামনি ক্ষমা চেয়ে নেবো।’

চিঠিটা পড়ে বংশীধরের অনুশোচনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার বদলে সে রাগে দুঃখে জামা পড়ে স্টেশনের দিকে রওনা হল। ট্রেন ছাড়তে তখন মিনিট কয়েক বাকি ছিল। তখন মানী ও তার শ্বাশুড়ী একটা মহিলা কামরায় বসেছিলেন। অশ্রুঝরা চোখে জানালার দিকে তাকিয়ে এতদিনের বসবাসরত স্থান ছেড়ে চলে যাচ্ছে ও পুরোনো স্মৃতিগুলো মনে করতে লাগল। এমন সময় সে দেখল তার কাকাবাবু তাদের কামরার দিকে এগিয়ে আসছেন। মানী তাড়াতাড়ি কামরা থেকে নেমে কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে যায়। তারপর ভক্তিকরে প্রণাম করতে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে রক্ত চক্ষু করে খিঁচিয়ে উঠে বললেন,

مجھے مت چھو، دور رہ ابھاگنی کہیں کی۔ منہ پہ کالک لگا مجھے پتر لکھتی ہے۔ تجھے موت بھی نہیں آئی! تو نے میرے گل کا سروناش کر دیا۔ آج تک گوکل کا پتہ نہیں ہے۔ تیرے ہی کارن وہ گھر سے نکلا اور تو ابھی تک میری چھاتی پر مونگ دلنے کو بیٹھی ہے۔ تیرے لیے کیا گنگا میں پانی نہیں ہے؟ میں تجھے ایسی گٹا، ایسی پر جائی سمجھتا، تو پہلے دن ہی تیرا گلا گھونٹ دیتا۔ اب مجھے اپنی بھکتی دکھلانے چلی ہے۔ تجھ جیسی پاپشٹھاؤں (گناہ گاروں) کا مرنا اچھا ہے، پرتھوی کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ پلیٹ

فارم پر سیکڑوں آدمیوں کی بھیڑ لگ گئی تھی، اور بنشی دھر نرلّلج بھاؤ(بے شرمی) سے گالیوں کی بوچھار کر رہے تھے۔ کسی

کی سمجھ نہ آتا تھا، کیا ماجرا ہے، پر من میں سب لالہ کو دھکّار رہے تھے۔ [৬০]

("আমাকে ছুঁবি না, দূর হয়ে যা কলঙ্কিনী, কুলক্ষণা মেয়ে! মুখে কালিমা লেপে আমাকে তুই চিঠি লিখলি ? তোর মরণ কেন হয় নারে! আমার বংশের মান-সম্মান সব নষ্ট করে দিলি। আজ পর্যন্ত গকুর কোনো খোঁজই পেলাম না। তোর জন্যেই সে আজ বাড়ি ছাড়া, আমার অকাল মৃত্যু দেখার জন্যে কি তুই এখনো বেঁচে আছিস ? তোর জন্য কি গঙ্গার জলও শুকিয়ে গেছে ? আগে যদি জানতাম, তুই একটা কুলটা, পাজি, বদমাস, তাহলে বিধবা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গলা টিপে তোকে মেরে ফেলতাম। পাপ করে ভক্তি দেখাতে এসেছিস। তোর মতো পাপিষ্টা মেয়ের বেঁচে থাকা উচিত নয়, মরাই ভাল। তুই মরলে পৃথিবী একটু হাল্কা হবে।' প্লাটফর্মে হাজার হাজার যাত্রীদের মধ্যে বংশীধর অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকলেন মানীকে। ব্যাপারটা কেউ বুঝতে না পারলেও মনে মনে তাঁকেই ধিক্কার দিতে লাগলো সবাই।")

মানী চুপ করে দাঁড়িয়ে সব মুখ বুঝে সইলো। তার মনের ভিতরের এত কষ্ট মানী আগে জানতো না। কাকাবাবু তাকে সবার সামনে কলঙ্কিনী আখ্যা দিলেন, সে কুলটা, সবাই তা জেনে গেলো। কিন্তু তারা তো তার আসল ও বর্তমান পরিচয় জানতে পারলো না। শ্বাশুড়ী ও পর্যন্ত বংশীধরের এই দূর ব্যবহারে মনঃক্ষুন্ন। ট্রেন চলতে শুরু করলো, চারিদিকে নিশ্চুপ, শ্বাশুড়ীও ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু মানীর চোখে ঘুম নেই। কাকাবাবুর কটু কথাগুলো বারবার মনে পড়ছে এবং নিজের অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করে আপন মনেই বলতে লাগলো ছিঃ ছিঃ, আমি এতই নীচ ? আমি কুলটা কলঙ্কিনী! আমি মরে গেলে পৃথিবী হাল্কা হবে ? আবার কাকাবাবু বলে গেলো।' তুই যদি তোর মা-বাবার সত্যিকারের মেয়ে হোস তো ওই পোড়া মুখ কাউকে দেখাস না।' না, সত্যি দেখাবো না। লোকে যে মুখে আমার কালিমা লেপে দিয়েছে, সে মুখ আর কাউকে দেখাবো না। ট্রেনটা তীব্র গতিতে অন্ধকারে চলতে লাগল, এমন সময় শ্বাশুড়ী ট্রেনের দরজা খুলার শব্দে ঘুম থেকে উঠে গেলেন। মানীকে ট্রেনে না দেখতে পেয়ে তার আর বুঝতে বাকি রইলনা যে, ট্রেন থেকে মানী ঝাপ দিয়েছে। এদিকে ইন্দ্রনাথ তার বাড়ীতে স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করছিল, এমন সময় একজন ডাকপিওন এসে ইন্দ্রনাথের হাতে একটা তারবার্তার খাম দিয়ে গেলো। তার বার্তায় তার মার লিখাছিল,

> She jumps out of it and puts an end to her life lest she should bring bad luck to the husband who had been so generous to marry her. [৬১]

---

[৬০] প্রেমচাঁদ, 'ধিক্কার', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৪৩০।

[৬১] Madan Gopal, *Munshi Premchand: A Literary Biography*, Asia Publishing House, Bombay, 1964. P- 240.

মানী ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়েছে। তার লাশ লালপুর থেকে মাইল তিনেক দূরে পাওয়া গেছে। আমি লালপুরে আছি। তারাতারি চলে এসো। ইন্দ্রনাথ চিঠিটি পড়ে মুষড়ে পড়ে। সে লালপুরে গিয়ে তার স্ত্রীকে দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। মানীর শেষ কাজ সমাপ্ত করে সপ্তাখানেক পর বংশীধরকে এ খবর জানায় ইন্দ্রনাথ। সে জানায় গোকুল তার বাড়ীতে আছে এবং ভাল আছে। ইন্দ্রনাথ কাকীমাকে মানীর একটা চিঠি দেয়। কাকীমা সেটা পড়ে বুঝতে পারে বংশীধরের কথার আঘাতে ও তাদের ব্যবহারে আজ সে চিরবিদায় নিয়েছে। এখন অনুশোচনায় তাদের উভয়ের মাথা হেঁট হয়ে গেল।

সংস্কার প্রেমচাঁদের রচনার মধ্যেও ছিল। তিনি তাঁর গল্পে ভারতীয় আদর্শ সতী নারীর চরিত্র নির্মাণ এবং তাদের প্রতি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। *সতী* (ستی) গল্পটি ১৯৩৪ সালে *'মাজমুয়াহ আখেরী তুহফা'তে* প্রকাশিত হয়। কয়েকটি ছোটগল্পের সাথে *সতী* গল্পটিও লেখা হয়েছিল। *সতী* গল্পে মুলিয়ার চরিত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যার পতি পরায়নতা পুরাণ কাহিনীকেও হার মানায়। তার প্রতি প্রেমচাঁদের শ্রদ্ধাবোধের প্রমাণ পাওয়া যায়, গল্পের নামকরণ থেকেই। এ গল্পে প্রেমচাঁদ ভারতীয় সতী নারীর আদর্শ নির্মাণ করেছেন। মুলিয়ার কুরূপ স্বামী কালুয়াই তার একমাত্র পুরুষ, অন্য পুরুষের দিকে দৃষ্টি দেয়া তার নিকট পাপ। স্বামীকে না জানিয়ে দেবর রাজুর দেওয়া চান্দুরী গ্রহণ করাকে সে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে। স্বামীর নিকট এ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

কালুয়া মুলিয়াকে সন্দেহ করতে শুরু করে। স্ত্রীর প্রতি জিদ করে সে তাড়িখানা ও বেশ্যালয়ে যেতে থাকে। এর ফলে একসময় সে যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। মুলিয়া স্বামীর এ পরিণতির জন্য ও তার মৃত্যুর জন্য নিজেকেই দায়ী করে। স্বামীর মৃত্যুর পর তার স্মৃতি নিয়েই মুলিয়া বৈধব্যে ও বৈরাগ্যে কাটিয়ে দেয় সারা জীবন।

তৎকালীন যৌতুক প্রথা প্রেমচাঁদের হৃদয়কে বিচলিত করেছিল। তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার আর্তনাত। তিনি প্রস্তাব করেন, যৌতুক প্রথা বন্ধ হতে পারে মেয়েদের শিক্ষিত করে নিজের জীবন নিজেকেই গড়বার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে। প্রেমচাঁদের মতে পিতা-মাতার কোন অধিকার নেই কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কুল রক্ষার্থে তাকে যেকারও গলগ্রহ করে দেওয়া। প্রেমচাঁদ বিশ্বাস করতেন, আইন করে যৌতুক প্রথা বন্ধ করা যাবে না। তার মতে, যতক্ষণ পর্যন্ত লেনদেনকে বা যৌতুককে সমাজে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা না হবে আর জনমত একে জঘন্য না মনে করবে ততদিন এই অবস্থাই থাকবে। কাজেই এই ব্যাধি একমাত্র সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও সামাজিক ঐক্যের মাধ্যমেই দূর করা সম্ভব। প্রেমচাঁদের অসংখ্য গল্পে বেশ গুরুত্বের সাথে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে *সুভাগী* এবং *কুসুম* গল্পটি উল্লেখযোগ্য।

কুসুম (کسم) গল্পটি ১৯৩২ সালে 'ইসমত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পটি পণ প্রথার বিরুদ্ধে লেখা প্রতিবাদী গল্প। নবীনবাবু তাঁর মেয়ে কুসুমকে বিয়ে দিয়েছেন, তবে এহেল কোমল স্বভাবের মেয়ের ভাগ্য কত নিষ্ঠু যে তার স্বামী তার প্রতি নির্মম আবর্ণনীয় আচরণ করে। তার সঙ্গে কথা বলে না, বেদনাদীর্ণ চিঠির কোনও উত্তর দেয় না। লেখক ঘটনাটি জানার জন্য কুসুমের স্বামীর কাছে গিয়ে তাকে নৃশংস ও অপ্রকাশ্য আচরনের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন,

میں نے پوچھا، "تو تم حضرت شاطر سے کس قسم کی مرد چاہتے ہو۔ داد و دہش میں تو انھوں نے شکایت کا موقع نہ کیا۔"

نوجوان نے سر جھکا کر کہا۔ "اس داد و دہش ے میرا ذفتی فائدہ کیا ہوا، طرفین کے دس بارہ ہزار روپے خاک میں مل گئے اور انھیں کے ساتھ میری آرزوئیں بھی خاک میں مل گئیں۔ والد صاحب تو مقروض ہو گئے ہیں اور اب میری تعلیم کے بار کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں بیگار کے طور پر ایل، ایک، بی کلاس میں شریک ہو گیا ہوں۔ کیا سسر صاحب مجھے اگینڈ نہ بھیج سکتے تھے۔ ان کے لیے دس پانچ ہزار روپے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔" [৬২]

(আমি জিজ্ঞাসা করলাম- তুমি মহাশয়ের কাছ থেকে আসলে কী চাইছ ? লেনদেনের ব্যাপারে তো তিনি কিছু বলার সুযোগ দেননি। তোমাকে বিলাতে পাঠাবার খরচ বহন করা সম্ভবত তাঁর ক্ষমতার বাইরে।

যুবক মাথা নীচু করে বলর- এটা তো প্রথমেই আমাকে তাঁর বলে দেওয়া উচিত ছিল। তাহলে কী বিয়েই করতাম ? উনি যাই খরচ করে থাকুন না কেন তাতে আমার কী উপকার হল ? দুই তরফেরই কমপক্ষে বারো হাজার টাকা এমনিতেই চলে গেছে আর সেই সঙ্গে আমার সাধও ধুলোয় মিশে গেছে। বাবার তো কয়েক হাজর টাকা ঋণই হয়ে গেছে। তিনি এখন আমাকে ইংল্যাণ্ড পাঠাতে পারবেন না। শ্বশুর সাহেব চাইলে কী আর আমাকে ইংল্যাণ্ড পাঠাতে পারেন না ? তাঁর কাছে পাঁচ-দশ হাজার রুপি কোনো ব্যাপারই নয়।)

লেখক গিয়ে নবীনবাবুকে সব জানালে নবীনবাবু তা জানতে পেরে জামাইকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার উদ্যোগ নিতে গেলে কুসুমের ব্যক্তিত্ব তার বাবাকে বাধা দিল। 'তার মধ্যে স্বাবলম্বনের এমন দৃঢ়তা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। আগে তার অনুজ্জ্বল মুখে ছিল রক্তহীন হতাশা আর বেদনা, এখন সেখানে আভাসিত হচ্ছে আত্মবিশ্বাস আর স্বাধীনতার লালিমা।

বিত্তবানদের ভিতর পণ প্রথার আকাংক্ষা আরো বেশি ছিল। তারা সমাজে ভাল মানুষসেজে মেয়ের বাবার কাছ থেকে পণ জোর করে আদায় করত। এইরূপ একটি সামাজিক সত্য ঘটনা রচনা করতে গিয়ে প্রেমচাঁদ *এক আঁচ কি কসর*

---

[৬২] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'কুসুম', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৬৮৪।

(ایک انچ کی کسر) লিখেছেন। যা আগস্ট ১৯২৫ সালে চান্দ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ হয়। গল্পের নায়ক যশোদানন্দন দুই পুত্রের জনক ছিলেন। বড় ছেলের বিয়ের জন্য এলাকার সকল গণ্য-মান্যকে দাওয়াত করলেন। এলাকার সকলের নিকট যশোদানন্দন সমাজ সেবক যশ ও সুখ্যাতির প্রশংসা ছিল। সকলেই বলতে লাগলো যশোদান ইচ্ছা করলে তার ছেলের বিয়েতে ২০ হাজার টাকা পণ নিতে পারতেন। অনুষ্ঠানে অতিথিরা পণ নেওয়ার ব্যাপারে বিভিন্নজন বিভিন্ন মতামত দিতে থাকে। যশোদানন্দ সবার কথা শুনে জবাবে বললেন– আমি সব সময় আমার আদর্শে অটুট থাকতে চাই। পণ না নেওয়ার ব্যাপারে আমি অবচিল ও মরণ পণ প্রতিজ্ঞায় থাকবো। পুরহিত মশায়ের মন্ত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী দয়াল বরকে আর্শীবাদ করলেন। আর্শীবাদের পর্ব শেষে যশোদানন্দ একটি চৌকির উপর দাড়িঁয়ে সবার উদ্দেশ্যে বললেন- যতদূর মনে পড়ে বাদশাহী আমলেই সমাজের বিষ বৃক্ষের মত এই কুপ্রথার সুত্রপাত হয়। আপনারাও আমার মত পণ না নিয়ে যদি সমাজটাকে সুষ্ঠু ভাবে চালাতে চান আর নিজেরা সুষ্ঠু ভাবে বেঁচে থাকতে চান, তাহলে অবিলম্বে এই কুপ্রথা দূর করতে এগিয়ে আসুন। তার কথায় অতিথিরা অভিভূত হয়। যশোদানন্দ অন্যান্য অতিথিদের সময় দিতে তার ছোট ছেলে পরমানন্দকে পণ কুপ্রথার বিরুদ্ধে কথা বলতে চৌকির উপর দাঁড় করিয়ে দেন। পরমনন্দক পড়তে শুরু করে,

پر یہ بندھور،

نمسکار!

آپ کے پُتر سے ودت ہوتا ہے کہ آپ کو مجھ پر وشواس نہیں۔ میں ایشور کو ساکشی کر کے نیویدن کرتا ہوں کہ نردشٹھ دھن آپ کی سوا میں اتنی گپت ریتی سے پہنچے گا کہ کسی کو لیش ماتر بھی سندیہ نہ ہوگا۔ ہاں، کیول ایک چگیاسا کرنے کی دھرشٹتا کرتا ہوں۔ اس ویاپار کو گُپت رکھنے سے آپ کو جو سّمان اور پرتشٹھا لابھ ہوگا اور میرے نکٹ ورتی میں میری جو نندا کی جائے گی، اس کے اُپلکشیہ میں میرے ساتھ کیا رعایت ہوگی؟ میرا دنیت انرودھ ہے کہ 25 میں سے 5 نکال کر میرے ساتھ نیائے کیا جائے۔---------- [৬৩]

(প্রিয়বন্ধু,

নমস্কার !

আপনার পত্রখানি যথাসময়েই পেয়েছি। সেটা পড়ে অবগত হলাম, আপনি আমার উপর ঠিক আস্থা রাখতে পারছেন না। ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে আমি বলছি, আপনার দাবি মতো অর্থ আপনার কাছে নির্দিষ্ট সময়ে গোপনেই পৌঁছে যাবে, এ খবর ঘুনাক্ষরেও কেউ জানতে পারবে না। এ ব্যাপারে কারোর সন্দেহ করার অবকাশও থাকবে না। তবে একটা প্রশ্ন না করে পারছি না, তার জন্য আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করে দেবেন, এই বিতর্কমূলক বিষয়টা গোপন রাখার ফলে আপনি যে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করবেন, নতুন করে যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাবেন, তা হবে অতুলনীয়। কিন্তু অন্য দিকে সমাজে আমি যে নিন্দিত হব, এ ব্যাপারে কিছু কি ভেবে দেখেছেন ? তাই আমি আপনার কাছে একটা ছোট আবেদন করছি এই বলে যে, আপনার দাবির মতো ২৫ হাজারের ৫ সংখ্যাটি যদি বাদ দেন, আমি আপনার কাছে..................)

---

[৬৩] প্রেমচাঁদ, 'এক আঁচ কি কসর', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৪০৯।

বড় ছেলের শ্বশুরের চিঠি পরমনন্দন পড়ে সমাজের সবাইকে পড়ে শুনিয়ে বাবার মুখোশ খুলে দেয়। আসল ঘটনা ছিল,

> The son by mistake takes out the letter that his father has written demanding dowry and bargaining for it and reads it. Therein is the exposure of the hypocrite and his consequent annoyance and disgust. [৬৪]

ছোট ছেলে ভুলে বাবার লেখা চিঠিটা টেবিলের উপর থেকে না নিয়ে টেবিলের ড্রয়ার থেকে বড় ছেলের শ্বশুরের চিঠিটা পড়ে ফেলে। পরে যা হবার তাই হল। যশোনানন্দন লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন। সব অতিথিরা ছি: ছি: দিতে থাকে আর বলে, তিনি নিজের আখের গুচ্ছা গুটিয়ে সমাজে সবার সামনে সভ্য-ভদ্র সাজতে মিথ্যে অভিনয় করে।

পণপ্রথার সামাজিক অবস্থা তুলে ধরতে প্রেমচাঁদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প হল *উদ্ধার* (اُدّھار) । লেখক হিন্দু সমাজের বিয়েতে প্রচলিত পণপ্রথার ভয়ংকর চিত্র দেখে দিশেহারা। অবস্থা এতটা খারাপ যে, সাত সাতটা ছেলের পর একটা মেয়ে হলেও বাবা মা খুশি হন না বরং দেখা যায়, মৃত কন্যা প্রসব করলে কিংবা মেয়ে মারা গেলে তারা হাফ ছেড়ে বাঁচেন। দ্রব্য মূল্যের দাম বাড়ার সাথে সাথে পণ প্রথার পরিমানও বাড়ছে। মদন গোপালের ভাষান্তে,

> ابھی بہت دن نہیں گزرے کہ ایک یا دو ہزار روپے دہیز کیول بڑے گھروں کی بات تھی۔ چھوٹی چھوٹی شادیاں پانش
> سو سے ایک ہزار تک طے ہو جاتی تھیں۔ پر اب معمولی سے معمولی وواہ بھی تین چار ہزار کے نیچے نہیں طئے ہوتے۔
> خرچ کا تو یہ حال ہے اور شکشت (پڑھا لکھا) سماج کی نردھنتا غریبی اور سردرتا (مفلسی) دنوں دن بڑھی جاتی ہے۔ اس
> کانت (خاتمہ) کیا ہوگا ایشور ہی جانے۔ [৬৫]

(খুব বেশি দিনের কথা নয়। যখন উচ্চবিত্ত ঘরের পণ দিতে দু'এক হাজার খরচ ধরা হত তখন সাধারণ গৃহস্থের বিয়ে শাদীর ব্যাপারে শ'পাঁচেক থেকে হাজার টাকাই যথেষ্ট বলে মনে হত। কিন্তু এখন মেয়ের বিয়ে মানেই হাজার হাজার টাকা খরচের ব্যাপার! সাধারণ পরিবারের বিয়েতেও কম করেও তিন-চার হাজার টাকার কমে বিয়ের কথাবার্তা শুরুটাও করা যায় না। এ ধরনের আকাশ ছোঁয়া খরচের ধাক্কায় বর্তমানে মধ্যবিত্ত সমাজের ধন ভাণ্ডারের শূণ্যতা এবং দারিদ্র্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জানি না এর শেষ কোথায়! কি আছে শেষে, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।)

---

[৬৪] David Rubin, *Widows, wives, and other Heroines*: twelve short stories, New York: Oxford University Press, Delhi, 1998, P- 242.

[৬৫] প্রেমচাঁদ, 'উদ্ধার', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৩৬০।

এছাড়া সমাজের ছেলেদের চারিত্রিক কলংকের সমস্যা, কোন সমস্যাই না। কিন্তু মেয়ের পরিবার এই সমস্যায় পরলে এক ঘরে করে রাখা হয়। এই সব দিক দিয়ে বলা যায়, মেয়ের বিয়ে মানেই বাবা মার কাছে পাহাড় সমান বোঝা। অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে ঝড় ঝঞ্ঝা সহ্য করে বিয়ে নামক পাহাড় অতিক্রম করতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় উপযুক্ত পাত্র না পেয়ে পিতা এক বৃদ্ধের সাথে নিজের মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দায় সেরে যান। মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তারও অবকাশ নাই পণপ্রথার চাপে।

লেখক এমনি এক কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার কথা বলেছেন, যার নাম মুন্সী গুলজারীলাল। উকিল মানুষ, সাংসারিক অবস্থা ভাল। কিন্তু আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবদের মান মর্যাদা রাখতে গিয়ে তেমন অর্থ সঞ্চয় করতে পারেননি। কিন্তু সন্তানদের মানুষ করার ব্যাপারে কোন প্রকার কার্পণ্য করেননি। বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন ধুমধাম করে। এখন সমস্যা হয়েছে মেঝো মেয়েকে নিয়ে। বংশ মর্যাদা রক্ষা করে ভাল পাত্র চায়, আবার বিয়ের জন্য কমপক্ষে হাজার পাঁচেক অর্থ প্রয়োজন হয়। যাই হোক অনেক ঘটক আর লোক লাগিয়ে তিনি মেয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র খুজে বিয়ে করাণ। খবরটা তিনি তার স্ত্রীর সাথে শেয়ার করেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ছেলে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না, এমন কি না করার কারণ ও বলছে না। গুলজারীলালের স্ত্রী তখন তাকে নিজে ডেকে কথা বলতে বলেন। গুলজারীলাল তার স্ত্রীকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। আজকাল কার ছেলেরা বিলেতের সাহেবদের মত চিরকুমার থাকাটা পছন্দ করে। তাদের কাছে অবিবাহিত জীবন অনেক বেশি খোলামেলা, নির্ঝঞ্জাট সুখ-শান্তির প্রতিশ্রুতি। সাত পাকে ঘোরা মানেই সাত রকম অশান্তি আর বাধ্য বাধকতার মধ্যে জড়িয়ে পড়া। গুলজারীলাল এটাও বলেন যে, কলেজে পড়ার সময় তিনিও এমন চিন্তা করতেন। মাসখানেক পরেই উৎসবের একদিনে গুলজারীলাল পাত্রের কাছ থেকে একটা চিঠি পান। যেখানে পাত্র জানায়,

> On a day of festivities, she is told of present from her father-in-law's, she is moved by the thought of one who laid down this life so that she may not suffer. [৬৬]

সে বিয়ে করতে রাজি না হওয়ায় তার বাবা-মা তার উপর অসন্তুষ্ট। কিন্তু সে সত্যটা গুলজারীলালকে জানাতে চায়। সে সত্যিকার অর্থে দুরারোগ্য ক্ষয় রোগে আক্রান্ত। তার আয়ু বড় জোর দু'বছর। তাই তার জীবনের এই অবস্থা বিয়ে করে একজন মেয়ের জীবনে বৈধব্য দশা ডেকে আমি মহাপাপ মনে করছে। কিন্তু চিঠি পড়ে গুলজরীলাল এবং তার স্ত্রী মনে হয় পাত্র বিয়ে না করার অজুহাতে এই চিঠি লিখেছে। ফলে তারা ঠাকুরের নাম নিয়ে শুভ কাজে ঝাপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এমতাবস্থায় হাজারীলাল উভয় সংকটে পড়ে। জোর জবরদস্তি করে তার উপর বিয়ে চাপিয়ে

---

[৬৬] Madan Gopal, *Munshi Premchand: A Literary Biography*, Asia Publishing House, Bombay, 1964. P- 242.

দেওয়া হচ্ছে। ভাবী শ্বশুরকে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি। বাবা-মা'কে রোগের কথা বলারও কোন সাহস পাচ্ছে না। এদিকে বিয়ের উৎসব শুরু হয়ে গেছে। অতিথিরা আসতে শুরু করেছে। কিন্তু হাজারীলালের মনে শান্তি নেই। শেষ পর্যন্ত সে তার বাবার সামনে হাজির হয়ে এবং তার রোগের কথা বলে। কিন্তু তার বাবা অনেক কষ্ট পাওয়া সত্বেও বিয়ে বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেন। কেননা হাজারিলালের কিছু হয়ে গেলেও বিয়ে করলে তার বংশ তৈরি হবে। যা তার বাবা-মা'র বৃদ্ধ বয়সে আশ্রয় হবে। আর ঈশ্বরের কৃপায় সে ভালও হয়ে যেতে পারে।

বিয়ের সময় ঘনিয়ে আসে। বাড়িতে সবার সাজ সাজ রব পড়ে যায়। কিন্তু হাজারীলাল বাগিচার একটা গাছের নীচে উদাস হয়ে বসে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। তার মা-বাবার অদূরদর্শিতার কথা চিন্তা করে। নিজেদের সুখের চিন্তার কাছে একটা মেয়ের জীবনের কোন দাম নাই। আর মেয়ের বাবা মা'ও একবারে অনন্দিত হয়ে গেছে। হঠাৎ হজারিলাল বিদ্রোহী হয়ে উঠে, সে মনে মনে বলে উঠে,

یہ تو لڑکی کو کنویں میں ڈالنا ہے، بھاڑ میں جھونکنا ہے، کند چھرے سے ریتنا ہے۔ کوئی آتما اتنی دسسھہ (گستاخ) اتنی پردئے

ودارک (بے دردانہ) نہیں ہو سکتی جتنی ویدھوے بیوگی اور کہ لوگ جان بوجھ کر اپنی پتری کو ویدھوے کے اگنی کنڈ میں

ڈال دیتے ہیں۔ [৬৭]

(এ বিয়ে হতে পারে না, কখনোই নয়। এ বিয়ে একটি অসহায়া মেয়ের জীবন উপক্ষাকরে হাত পা বেঁধে কূপে নিক্ষেপ করা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এ এক ভয়ংকর জীবন যন্ত্রণা, যার কাছে অন্য সব যন্ত্রণা অতি নগণ্য, অতি তুচ্ছ। বৈধব্য নারী জীবনে এ যেন এক চরম অভিশাপ!)

উচ্চবিত্তের যৌতুক লালসার দুরন্তপনার প্রমাণ মিলে প্রেমচাঁদের *কদম বুছি* (*قدم بوسی*) ছোটগল্পতে। গল্পটি ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। কায়স্তদের বিয়ে। বরের বাবা আমার পুরানো বন্ধু। বরযাত্রী যেতে হবে। তার নিমন্ত্রণ পেয়ে মনে মনে মহা খুশী। বহুদিন গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়া হয়নি। এই সুযোগে দু-তিন দিন বেড়িয়ে আসা যাবে। যথা সময়ে বর যাত্রীবেশে বেরিয়ে কন্যার বাড়ীতে পৌছালাম। ওখানে পৌছে বরযাত্রীদের মগজের কলকব্জা যেন বিগড়ে গিয়েছিল। আশ্চর্য, কথায় কথায় ঝগড়া, তর্কাতর্কি। কোমর বেঁধে, গলার শির ফুলিয়ে, হাত নাচিয়ে কন্যাপক্ষের সঙ্গে তারা ঝগড়া করতে উঠে পড়ে লেগে গেছে। এটা আসে কেন ? ওটা পাঠায়নি কেন ? এরা কি জঙ্গলে বাস করে ? বরফ ছাড়া জল, কখনও চলবে না। জানোয়ারগুলো কাণ্ড দেখ, মাত্র দশ সের বরফ পাঠিয়েছে। আরে মশাই, দশ সের বরফ নিয়ে আমরা কী করব ? চোখে লাগাব, না দেবতার পা ধোয়াব। এক বিধিকিচ্ছিরি

[৬৭] প্রেমচাঁদ, 'উদ্ধার', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৩৬৭।

পরিস্থিতি। কেউ কারো কথা শুনতে পাচ্ছে না। চিৎকার আর চেঁচামেচি। তাকিয়ে দেখি বরের বাবা ধপাস করে বসে পড়ে কপাল চাপড়াচ্ছে আর আক্ষেপ করে বলছে- হায়, হায়, মান সম্মান কিছু রইল না। আমার যে দুর্গতি হল, তা সারা জীবনে ভোলার নয়। মেয়ে পক্ষ এমন গেঁয়ো ভূত জানলে ছেলে বিয়ে এখানে দিতাম না। পাশ থেকে কে একজন ফোড়ন দিয়ে বলল- আরে রাখুন মশাই, ওসব অনেক কিছু দেখার আছে। গেঁয়ে ফেঁয়ো কিছু নয়। সব হল ধান্দাবাজ। অথচ দেখুন, ঈশ্বরের আর্শীবাদে পয়সা কড়ি ভালোই আছে, অশিক্ষিত নয়। বরং সভ্য ও ভদ্র। কিন্তু মনটা করে রেখেছে তিলের সমান। তা না হলে দশ সের বরফ পাঠায়। এক কৌটাও সিগারেট নেই।

বরপক্ষ বলতে লাগল, আমরা তো মেয়ে বিয়ে দিতে আসিনি। আমরা হলাম পাত্র পক্ষ। ছেলে নিয়ে এসেছি। আমাদের ঠাঁটবাট তো থাকবেই। আমাদের চাহিদা কনে পক্ষকে যেমন ভাবেই হোক মেটাতে হবে। ভেবেছেন, আমি ঠাট্টা করছি। এদের উচিৎ শিক্ষা দিতে হবে। বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসে এত বড়ো অপমান। আমাদের ইজ্জত নেই ? যাঁরা এসেছেন আমার সঙ্গে, তারা সকলেই হোমরা চোমরা, চামার মুচি নয়। এমন অপমান আমি হজম করবো ভেবেছেন। দরকার হলে বর তুলে নিয়ে চলে যাব। বিয়ের লগ্ন এল। বরপক্ষ বীর বিক্রমে ঘোষণা করল, এক ডজন হুইসকি এখুনি দিতে হবে। নতুবা বিবাহ অনুষ্ঠান শুরু হবে না। ওদের আচরণ দেখে আমার হাড় পিত্তি জ্বলে গেল। বুঝলাম এরা পশুরও অধম। এখানে এক মুহূর্তও আর থাকা যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ব্যাগ কাঁধে চাপিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করলাম।

অন্য এক মঙ্গলবার আমার দিন অত্যন্ত কাছের বন্ধু সুরেশবাবু তার ছেলের বিয়েতে আমাকে যখন নিমন্ত্রণ করলেন, মনে পড়ে গেল বিয়ে বাড়ির পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা। বুকে বল এনে আমি বলেছিলাম, কিছু মনে করবেন না। এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মাফ করবেন। বন্ধুর জোরাজুরি করা সাপেক্ষে তখন আমি তাকে বললাম, ওখানে গিয়ে সিগারেট, বরফ, মদ, তেল এর জন্য কন্যা পক্ষকে নাজেহাল করবেন না তো ? এমনকি ওখানে বদমাইস লোকদের পাল্লায় পড়ে আপনি সব আদর্শকে বিসর্জন দিবেন নাতো ? সে বলল, আপনার মনোভাব আমি বুঝতে পারছি। এমন কোন কিছুই হবে না। আর আপনি থাকবেন আমার প্রতিনিধি হয়ে। আপনার কথাকে কেউ অগ্রাহ্য করবে না। দেনাপাওনা কোন কিছুই তাদের চাওয়া নেই জানতে পেরে আমি বরযাত্রীতে যেতে রাজি হলাম। শুক্রবারে এক্সপ্রেস ট্রেনে রওনা দিয়ে পঞ্চাশ মাইল ট্রেনের রাস্তা পারি দিয়ে সন্ধ্যেবেলায় কনের বাড়িতে এসে আমরা পৌছালাম।

এর আগে অনেক বিয়েতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছি। কিন্তু বিয়ের পর্ব কখনও দেখার সুযোগ হয়নি। সাধারণ বরের আত্মীয় স্বজনরাই সেখানে উপস্থিত থাকেন। বরযাত্রীদের মধ্যে যারা বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতরা থাকেন, তাহলে ‘জনবাসা’ অর্থাৎ বরযাত্রীদের থাকার জায়গাতে বসে সময় কাটালাম। কেউ ঘুমোয়, কেউ কেউ গল্প করে, নাচ দেখে অথবা গান শোনে। নতুবা কয়েকজন মিলে তাস খেলে। আর নিজের বিয়ের কথা তো ভুলেই গেছি। একজন

কন্যাদায়গ্রস্থ বৃদ্ধ পিতা একজন যুবকের চরণপূজো করার দৃশ্যটি দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। হৃদয়ে আঘাত পেলাম। এই কি হিন্দু বিবাহের আদর্শ, না পরিহাস ? মেয়ের স্বামী অর্থাৎ জামাই হল পুত্রসম। আমার তো মনেহয় জামাইয়ের উচিত পান-ফুল নিয়ে ধর্ম পিতার পদযুগল বন্দনা করা। তা না হয়ে এর বিপরীতটি এখানে ঘটছে। এখান থেকে হারিয়ে গেছে ধর্ম, শিষ্টতা হয়েছে নিরুদ্দেশ, মর্যাদা মুখ লুকিয়েছে অমর্যাদার গহ্বরে। এসব কাণ্ড কারখানা কখনই বরদাস্ত করা যায় না। আমি নিজেকে আর সহ্য করতে পারলাম না। প্রতিবাদী কণ্ঠে বললাম। ভাইসব, আপনারা কি ভাবে সহ্য করছেন এই কনের বাবার অপমান। আপনারা কি বিবেককে বিসর্জন দিয়েছেন ? মুহূর্তের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান স্তব্ধ হয়ে গেল। সবাই আমার দিকে তাকিয়ে বলল,

> "সুরেশবাবু কার অপমানের কথা আপনি বলছেন ?
> বরের পদযুগল কনের বাবা বন্দনা করবেন, এটাকে কি আপনি অপমান বলবেন না ?
> দাদা, এ হল প্রাচীন প্রথা। অপমান নয়।" [৬৮]

কনের বাবা বললেন- মহাশয়, এ আমার অপমান নয়। এই শুভক্ষণে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি। এ দেখেই আপনি ঘাবড়ে যাবেন না। এখনও অন্তত একশো জন প্রতীক্ষায় রয়েছে বরের চরণ বন্দনা করবেন বলে। এই বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে বসে থাকা অনেক বাবা ভাবছেন, হায় যদি আমার একটা মেয়ে থাকত, তাহলে জামাইয়ের চরণ বন্দনা করে জীবন সার্থক করতাম। আমি নীরব চোখে কনের বাবার জামাইয়ের চরন বন্দনা দেখলাম। এরপর শুরু হল অন্যাদের বন্দনা করার পালা। বরের পায়ের ওপর তখন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে অনেকে। ফুল, চাল দিয়ে পদবন্দনা করছে। যার যা সাধ্য, তাই চরনে রেখে যাচ্ছে। মানুষের উৎসাহের আর শেষ সেই। কিন্তু আমি তখন ভাবছি সমাজে মেয়েদের এত দুর্গতি হবে না তো কাদের হবে। যে সমাজ সম্মান-অসম্মানের তফাত বোঝে না, উচিত-অনুচিত জ্ঞানটুকুও যারা হারিয়ে ফেলেছে, সেই সমাজের মেয়েরা নিজেদেরকে পুরুষের পায়ের জুতো বলেই মনে করবে। তাদের আত্মসম্মান বলে কোনো বস্তু অবশিষ্ট থাকার কথা। একসময় বিবাহপর্ব শেষ হল। বরবধূ বেরিয়ে এল মণ্ডপ থেকে। আমি কেন জানি না, অর্ধচেতন অবস্থায় থালা থেকে কিছু ফুল তুলে নিয়ে নববধূর চরনে রাখলাম। তার পর সেখান থেকে বিদায় নিলাম।

প্রেমচাঁদের চিন্তা চেতনা থেকে বুঝা যায়, হিন্দুসমাজের বিবাহ প্রথার নাম শুনলে সবার গায়ে যেন জ্বর এসে যায়। এই প্রথা অত্যন্ত দূষিত, যা মানুষকে ভাবায় এবং এর ভয়ঙ্কর রূপ দেখে আমি কেন, সকলেই তো দিশেহারা। দেখা যায়, সাত-সাতটা ছেলে পর একটি মেয়ে জন্মালেও খুব কম বাবা-মা আছেন যাঁরা তাকে খুশি মনে স্বাগত জানায়। কারণ মেয়ে জন্মের সাথে সাথে তার ভবিষ্যতের বিয়ের ভাবনা মাথায় বোঝা স্বরূপ এসে যায়। এসব অশুভ চিন্তার

---

[৬৮] মদন গোপাল, 'কদম বুছি', *প্রেমচন্দ ঃ গল্পসংগ্রহ*, কলকাতা, জানুয়ারী ২০১৮, পৃ. ৬৪৬।

মূলে রয়েছে একমাত্র পণপ্রথা। আর মেয়ের বিয়ে মানেই হাজার হাজার টাকা খরচের ব্যাপার। সাধারণ পরিবারের বিয়েতেও কম করে তিন-চার হাজার টাকার কমে বিয়ের কথাবার্তা শুরুই করা যাবে না। এ ধরনের আকাশ-ছুঁয়া খরচের ধাক্কায় বর্তমানে মধ্যবিত্ত সমাজের ধন-ভাণ্ডারের শূন্যতা এবং দারিদ্র্যতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মার্চ, ১৯১৬ সালে 'স্বরস্বতী'তে প্রকাশিত প্রেমচাঁদের *নেকি কি সাজা* (نیکی کی سزا) গল্পে দেখা যায়, শাহজহাঁপুরের ডিস্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার সর্দার শিব সিং একজন সৎ, ন্যায় পরায়ন ও দয়াবান হিসেবে তার চাকুরীক্ষেত্রে ও এলাকাতে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি তার কর্মে কোন সময় ফাঁকি বা দু'চার টাকা এদিক থেকে ওদিক সরাতেন না। যদিও তাকে ঘুষ দেওয়ার জন্য তার নিম্নপদস্ত লোকের অভাব ছিল না। তথাপি তিনি এসব থেকে দূরে থাকতেন। তার স্ত্রী রমা অবশ্য তার ভালো মানসিকতার জন্য তাকে অনেক বকা ঝকা করতেন। এদিকে সর্দারজীর একমাত্র মেয়ে বিয়ের বয়স পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। হিন্দু সামাজে ঊনবিংশ শতকে কনের পিতারা কোন রকমে কন্যাকে পাত্রস্থ করে কন্যাদায় থেকে মুক্তি পাওয়াকেই বড় লাভ মনে করতেন, কেননা বয়স্কা অনুঢ়া কন্যাকে ঘরে রাখলে সমাজের অপমান হয়। এই কারনে একই দিনে বহু পাত্রীর (চার বা ততোধিক) সঙ্গে একই কুলীন পাত্রের বিবাহের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এমন ঘটনার কথাও জানা যায় যে কোন গৃহকর্তা পাত্রের অভাবে তার সকল অবিবাহিতা ভগ্নী ও মেয়েকে একই কুলীন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। চারিদিকে ঘটক লাগালেন সর্দার সিং। অবশেষে মিরাটের এক উকিলের ছেলে সঙ্গে তা বিয়ের কথাবর্তা চলছিল। ছেলেটি সুপুরুষ, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা ও সৎ বংশের। পড়ালেখা ও বিলেত থেকে করা। তৎসময়ের সবাই উচ্চ ডিগ্রী অর্জন করতে পারতো না। কারণ লেখাপড়ার জন্য যেমন খরচ পাতি লাগত, তেমনি সে সময় কালে উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের জন্য এগিয়ে এসেছিল। এখানে মনে রাখা দরকার, উচ্চবর্ণের তিন শ্রেণীর হিন্দু ভদ্র লোকরাই (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য) প্রাচুর্য ও সামাজিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁরাই ছিলেন জমিদার ও ভূসম্পত্তির মালিক। ইংরেজ অধিকারে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং রাজকর্মে তাঁরাই লভবান হন সব চেয়ে বেশি। এরাই 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজেদের সন্তান সন্তদিদের ইংরেজি শিক্ষাদানের জন্য, সেখানে অহিন্দু ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রবেশাধিকার ছিল না। খ্রিস্টান মিশনারিগণ কর্তৃক বাংলার বিভিন্ন স্থানে স্কুল-কলেজ এবং সরকার কর্তৃক প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলেও দেশের বৃহত্তর কৃষক সমাজ ও নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার খুব ধীর গতিতে হয়েছে। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে "The Hindu Patriot" পত্রিকা, এ্যাংলো উণ্ডিয়ান পত্রিকা, 'The Friend of India' পত্রিকায় মন্তব্য করে যে ঃ কেবলমাত্র জমিদারের ছেলেরাই স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করে। [৬৯]

এ মন্তব্য পুরোপুরি ঠিক না হলেও আংশিক ভাবে সত্য। গ্রামের সাধারণ চাষী পরিবারের পক্ষে ছেলেদের স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করানো সহজ ছিলনা। প্রধানত উচ্চতর তিনবর্ণের (ব্রাক্ষ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য) বাঙালি হিন্দু ভদ্র

---

[৬৯] শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়, *সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি*, স্বদেশ ও সাহিত্য রচণাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৩।

লোকদের মধ্যেই ইংরেজি শিক্ষা ছিল সীমাবদ্ধ। সাধারণত জমিদার তালুকদার এবং উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, পুরোহিত, মুহুরি, কেরানি ইত্যাদি পেশাজীবী শ্রেণীর সমবায়ে এ ভদ্রলোক সমাজগঠিত ছিল। গ্রামাঞ্চলে এদের প্রত্যেকের কমবেশি ভূসম্পত্তি ছিল। উচ্চশিক্ষা লাভের পর চাকুরি কিংবা আইন ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়ে পারিবারিক সম্পদ বৃদ্ধি করবে, এই আশায় ছেলেদের তারা ইংরেজি বিদ্যালয়ে পাঠাতেন। যৌথ পরিবার প্রথার কল্যানে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত কম সঙ্গতিপূর্ন পরিবারের ছেলেদের পক্ষেও বিদ্যালয়ে লেখাপড়া চালানো তেমন কঠিন ব্যাপার ছিলনা। অনেকে আবার মহকুমা কিংবা জেলা শহরে ধনী আত্মীয়ের বাড়িতে অবস্থান করে স্কুল কলেজে পড়তেন।[৭০]

গল্পে দেখা যায়, প্রথমে ছেলের বাবা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরিতে রাজি ছিল না। যাই হোক, অনেক কথাবার্তা চালাচালির পর সর্দারজী এই বিয়েতে ছেলের অভিভাবককে রাজি করালেন। বিয়ের সব কথাবার্তাই পাকা হয়ে গিয়েছিল, কেবল দাবিদাওয়া তথা পনের ব্যাপারে কথা বলা বাকি ছিল। তা মিরাটের উকিল মশাই সর্দারজীকে একটি চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন এভাবে,

سردار صاحب نے آشنکیت (اندیشہ ناک) ہاتھوں سے خط کھولا، پانچ ہزار روپے سے کم پر شادی نہیں ہو سکتی۔ [৭১]

('সর্দারজী সাহেব আসংকিত হয়ে চিঠিটি খুললেন, (তাতে লিখা ছিল) পাঁচ হাজার রুপির কম হলে এই বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।')

একথা তিনি খোলাখুলি ভাবেই জানিয়ে দিতে ভুলেননি। তিনি আগের মতোই বিনয়ের অবতরণ করে লিখেছেন, তাঁর পরিবারের আভিজাত্য, বংশমর্যাদা, ঐতিহ্য, মর্যাদা, এসব রক্ষা করার জন্য এই সামান্য পনের টাকা একান্তই প্রয়োজন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই নিচ্ছেন না তিনি।

চিঠির আগাগোড়া পড়ার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সর্দারজী। কি চেয়েছিলেন তিনিআর কিই বা পেলেন তিনি। কিছুক্ষণ চিঠিটা হাতে নিয়ে রমাকে জানাতে রান্না ঘরের দিকে গিয়ে আবার ফিরে আসলেন। একথা তাকে জানাতে পারলেন না। তিনি এত বড় আঘাত কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। তার মনটা দুঃখ আর গ্লানিতে ভরে গেল। নিজের মনে তিনি ভাবেন, 'আমি কি এমন পাপ করেছি যে, আমাকে এত বড় একটা শাস্তি পেতে হল? একটা বছর ছোটাছুটি করে সম্পর্কটা পাকা পাকি করে ফেলেছিলাম, এই একটা চিঠির কয়েকটা লাইন তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল ? এই পণের দাবী মেটানো আমার সামর্থের বাইরে। আমার পক্ষে এত টাকা জোগাড় করা একেবারে অসম্ভব।

[৭০] শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়, *সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি*, স্বদেশ ও সাহিত্য রচণাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৩-৫৪৪।

[৭১] প্রেমচাঁদ, 'নেকি কি সাজা', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ২৪।

আমার সামনে ঘন আঁধার ছাড়া আর কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছি না। আজ এমন অসময়ে আমার পাশে কেই নেই। আমাকে সহানুভূতি জানাবার মতোও কেউই নেই। এইসব কথা ভাবতে গিয়ে তিনি তার চোখের জল আর সামলাতে পারলেন না। প্রেমচাঁদ পণের কারনে মেয়েকে বিয়ে দিতে না পেরে বাবার আর্তনাদের চিত্র এই ভাবে মেলে ধরেছেন।

প্রেমচাঁদ নারী-পুরুষ সমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচার দেখে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। গরিব পত্নীর কোন প্রকার সমুচিত জীবন যাপনের ব্যবস্থা ছাড়া তিনি তালাকের বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে, ভালো, এমনকি খুব ভালো বিয়েও এক রকমের বোঝাপড়া এবং আত্মসমর্পন। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে তালাক অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তবে তা এক প্রকার অসুস্থ ব্যক্তিদের জীবনেরই অনিবার্য পরিণাম। তিনি জানতেন, সমান অধিকারের ভিত্তিতে সমাজে নারীর কোনও প্রকৃত স্থান নেই। অতীতের রক্ষণশীল বিধি-ব্যবস্থার প্রতি তাঁর কোনও আস্তা বা রুচি ছিল না। সময় যেহেতু গতিশীল, তাই অন্যান্য পরিবর্তনের মতোই সামাজিক বিধানেও পরিবর্তন অনিবার্য। নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে সে পরিবর্তনই স্বাভাবিক। জীবনের সায়াহ্নে এসে তিনি এই জাতীয় অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয়েছিলেন যা তাঁর কঠোর ও গভীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিণাম বলা চলে।

নারীর কারনে ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা সমাজে অহরহ ঘটে থাকে, প্রেমচাঁদ তাঁর ছোটগল্পের ভিতরে তা উপস্থাপন করেছেন জীবন্ত প্রতিচ্ছবি রূপে। তেমনি একটি ছোটগল্প *দু'ভাই* (دو بھائی) , যা 'জামানা' পত্রিকায় জানুয়ারি, ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। গল্পে শিবদত্ত ও কলাবতীর দুই ছেলে কৃষান বড় ছেলে, ও বলরাম ছোট ছেলে। দু'জনের মধ্যেই খুব ভাব, ঠিক বন্ধুর মতো। কেদার বুদ্ধিমান আর মাধব সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। দু'জন খায় এক সঙ্গে, আবার দু'জনের মিলে খেলাধুলা করে এক সঙ্গে। যথাসময়ে দু'জনের বিয়েও হয়ে গেলো। কৃষানের বউ রাধা বড় মুখরা ও চঞ্চলা। আর বলরামের বউ শ্যামার গায়ের রঙ শ্যাম বর্ণের হলেও রূপসী ও সুন্দরী। তার আরেকটা বাড়তি গুণ হলো সে মৃদু ভাষিণী এবং শান্ত স্বভাবের মেয়ে। কৃষানের বউ রাধা মুখরা হলেও ভালবাসে তাকে। অথচ বলরামের বউ শ্যামা রূপসী, শান্ত সুশীলা হলেও স্বামী তার প্রতি খুবই বিরক্ত। বউদের সঙ্গে কলাবতীর কোনো বনিবনা হত না। অবশ্য ছেলেদের সঙ্গে তার সম্পর্ক আগের মতোই মধুর, ছেলের বিয়ের পরও মাতৃস্নেহে এতটুকু ঘাটতি হয়নি তার। রাধা চতুর মেয়ে, নানান উছিলায় সাংসারিক কাজকর্ম শ্যামার ওপরেই চাপানো হয়। শ্যামার চার ছেলে ও চার মেয়ে কিন্তু রাধার এখনো পর্যন্ত কোনো সন্তান তার গর্ভে ধারণ করতে পারেনি, তাই মা হওয়া অধরাই থেকে গেলো। বলরামযখন অর্থের কাঙাল, কৃষান তখন অন্তত একটি সন্তানের পিতা হওয়ার জন্য তার ভাগ্যের কাছে মাথা খুঁড়ছে। এতদিন অন্তত বিয়ের আগে পর্যন্ত দুই ভায়ের মধ্যে সদভাব ও ভালোবাসার কোনো ঘাটতি ছিল না কিন্তু এখন ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে, সংসারের স্বাভাবিক নিয়মে হিংসা এবং বিদ্বেষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকল তাদের মধ্যে। শ্যামা দিন-রাত সংসারের কাজ-কর্ম সেরে সন্তান লালন-

পালনে ব্যাস্ত, তাই তার অবসর নেই। ওদিকে ছেলেপুলে না হওয়ার জন্য রাধা মনের জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে মরে। এর ফলে রাধার কাছে শ্যামা যেন অসহ্য। শ্যামা সব বোঝে, কিন্তু সবকিছু মুখ বুঝে সহ্য করে যায় সে। আর শ্যামার এই নীরবতা রাধাকে আরও বেশি ক্রুদ্ধ করে তুলে। একদিন পরিস্থিতি চরমে উঠল। দুই ভায়ের বউদের ঠাণ্ডা লড়াই শিকড়টা ছিন্নকারী বিভাজন শিকারীর ফাঁদে ধরা পড়ে গেলো। এর ফলে একই বাড়িতে হাঁড়ি ভাগ হয়ে দুটো উনুন জ্বলতে শুরু করল। ওদিকে দুই ভাইও পিছিয়ে রইলনা, তাদের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ। তাদের এই অবস্থা দেখে মা নীরবে চোখের জল ফেলেন। লেখকের ভাষায়,

کئی سال گزر گئے۔ دونوں بھائی جو کسی زمانہ میں ایک ہی زانو پر بیٹھے تھے، ایک ہی تھالی میں کھاتے تھے اور ایک ہی چھاتی سے دودھ پیتے تھے۔ انھیں اب ایک گھر میں۔ ایک گاؤں میں رہنا شاق تھا۔ مگر خاندان کی ساکھ قائم رہے اس رشک اور عناد کی دہکتی ہوئی آگ کو راکھ کے نیچے چھپانے کی کوشش ہوتی تھی۔ ان کے درمیان اب برادرانہ محبت اور خلوص کا کوئی رشتہ نہ تھا۔ صرف بھائی کے نام کی عزّت تھی جو انھیں اپنی دامن میں سمیٹے ہوئے تھی۔ بھائیوں کے ارتباط اور یگانگت کا معیا ہماری نگاہوں میں کتنا اونچا ہے۔ [৭২]

(এরপর এভাবেই কয়েকটা বছর কেটে গেল। এমন দিনও গেছে যখন তারা দুই ভাই পাশাপাশি ছাড়া অন্য কোথাও বসতো না, একই থালায় দুই ভাই খেতো। একই সঙ্গে মায়ের দুধ পান করতো। অথচ আজ সেই দুই ভাই একই বাড়িতে বাস করা দূরে থাক একই গ্রামে থাকাটাই তাদের কাছে অসম্ভব হয়ে উঠল। তারা তখন এমন নিচে নেমে এলা যে, তারা মান-ইজ্জত, বংশ মর্যাদার কথা চিন্তা না করেই হিংসা ও বিদ্বেষের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হতে লাগলো। তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ আর রইল না। নষ্ট হল ভ্রাতৃস্নেহ। একে অপরের নাম সহ্য করতে পারে না। এ ওর ছায়া পর্যন্ত এড়িয়ে চলে।)

বলরামের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। আয়ের চেয়ে ব্যয়ই বেশি। তার ওপর কুল মর্যাদা তো আছেই। বড় মেয়ের বিয়েতে দু'বিঘে জমি দিতে হয়েছে পাত্রকে। তাতেও বর যাত্রীরা নাকি খেতে পায়নি। পরের মেয়েটির বিয়ে দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে সে। বছরখানেক পর তৃতীয় মেয়ের বিয়েতে শেষ কানা কড়িটাও খরচ হয়ে গেছে। অর্থ ভাণ্ডার শূন্য হোক, তাতে কি, মনের ভাণ্ডার তো ফুরোয়নি, তা তো অফুরন্ত। তৃতীয় কন্যার দ্বিরাগমন তখনো হয়নি, এর মধ্যে কৃষানের নামে দু'বছরের বন্ধকী ওয়ারেন্ট এসে গেলো। মেয়ের গহনাগুলো বন্ধক রাখতে হয়েছিল বিয়ের অন্য সব আনুষঙ্গিক খরচ মেটানোর জন্য, নগদ টাকার প্রয়োজন ছিল। সর্বনাশা রাধা এই অশুভ সংবাদের সুযোগটাই খুঁজছিল। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে নতুন আত্মীয়দের খবরটা জানাবার জন্য ছুটে গেলো। সে তাদের বলল, 'আপনারা এখানে আপনাদের নববধূর দ্বিরাগমনের অপেক্ষায় মশগুল হয়ে আছেন ? আপনারা কি কিছুই জনেন না, ওদিকে আপনাদের নতুন বউয়ের গহনাগুলো যে আপনাদের হাতছাড়া হয়ে গেলো সে খবর কি জানেন ? পরের দিনই বরের বাড়ি থেকে এক নাপিত এবং দুজন ব্রাক্ষ্মণ বলরামের ঘরে এসে হাজির হল। তাদের দেখে বলরাম

---

[৭২] মানিক টাল, *প্রেমচাঁন্দ : কুচ নয়ি মোবাহেছ*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, আক্টোবর- ১৯৮৮, পৃ. ১১৯।

প্রমদ গুনতে লাগলো। তার সামনে এখন ভীষণ বিপদ। টাকা কোথায় পাবে ভেবে পাচ্ছে না। কারণ জমি-জমা নেই, বাগান নেই, পুকুর নেই, সম্পত্তি বলতে দুটো ছোট ছোট কুঠুরী, যেখানে পরিবারদের নিয়ে কোনো রকমে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছে। তবু যদি এ দুটো কুঠুরিও শেষ পর্যন্ত বিক্রিই করতে হয় তার জন্য খদ্দেরই বা পাবে কোথায় ? দেরি হলে নাক কাটা যাবে। তাই অগত্যা বিপদে পড়ে কৃষানের কাছে এসে জলভরা চোখে বলল, 'দাদাভাই, আমি যে বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি একটু সাহায্য পাবার আশায়। আশাকরি তুমি আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেবে না।' 'শ' খানেক টাকার গহনা বন্ধক রেখেছিলাম, যা আসলের সঙ্গে সুদ মিলিয় প্রায় সোয়াশো টাকা হয়েছে। দয়া করে আমার একশত টাকা ধার দেও। জবাবে কৃষাণ বললো,

"بلو! آج کل میں بھی سخت تنگ ہو رہا ہوں۔ تم سے سچ کہتا ہو۔"

رادھانے مالکانہ انداز سے مداخلت کی۔ "ارے تو کیا اب ان کے لیے بھی تنگ ہو رہے ہیں۔ الگ کھانا کھانے سے کیا عزّت الگ ہو جائی گی۔"

کرشن نے بیوی کی طرف خفیف نگاہوں سے دیکھ کر کہا۔ "نہیں یہ مطلب نہیں تھا۔ ہاتھ تنگ ہے تو کیا۔ کوئی نہ کوئی فکر کرنا ہی پڑے گی۔"

بلرام نے جواب دیا۔ "ہاں سود ملا کر کوئی سوا سو روپے ہوتے ہیں۔" [৭৩]

(বালু! আজকাল আমার অবস্থাও খুব একটা ভাল যাচ্ছে না, বিশ্বাস কর আমি নিজেই অসহায়।'
রাধা আবার ফোড়ন কাটল, 'ওগো, তোমার যে এতো অভাব তা তো জানতাম না। ভিন্ন হয়ে গেছ বলে কি তুমি আমাদের পর হয়ে গেছো নাকি ?'
কৃষান চমকে স্ত্রীর দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলল, 'না, না ও কথা হচ্ছে না। আমার হাত শূন্য হলে কি হবে একটা কিছু ব্যবস্থা তো করতেই হবে।'
রাখা বালরামকে জিজ্ঞেস করল,
উত্তরে বলরাম বলল, 'হ্যাঁ, আসলের সঙ্গে সুদ মিলিয়ে প্রায় সোয়াশো টাকা হবে।')

বরঞ্চ তারা বলরামের ছোট ছোট দুটো কুঠরি মহাজনের কাছ থেকে আশি টাকা দামে বিক্রি করে দিতে পারে। আর তা লোকপাড়া করে দিতে হবে বলে প্রস্তাব করে। বলরাম বলে এ টাকা দিয়ে তো আমার সোয়াশো টাকা হবে না। তখন বাকি টাকা সে নিজের সম্পদ বেঁচে ভাইকে দিবে এই প্রতিশ্রুতি দেয়। উপায়ন্ত না দেখে বলরাম ভিটা-মাটি বিক্রি করার মনোস্থির করলো।

সকাল বেলা কৃষানের বাড়িতে গ্রামের মোড়ল, মোক্তার এবং গোমস্তা সবাই এসে হাজির হলো।

মোড়ল বললেন, 'ভাইয়ের ব্যাপারটা বড়ই জটিল। সেটা এমনি একটা বস্তু যে, সে বন্ধুও হয় না, আবার শত্রুও হয় না। কৃষান কিন্তু একটু ব্যতিক্রম। সে তার ছোট ভায়ের প্রতি খুবই সদয়।

[৭৩] প্রেমচাঁদ, 'দু'ভাই', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ১৫-১৬।

মোড়লের কথায় সায় দিয়ে গোমস্তা বলল, আপনি যথার্থই বলেছেন, প্রকৃত ভাল ভাই হবে হয় তো, এরকমই হওয়া উচিৎ। আদর্শ ভাই বটে।'

মোক্তার বলে, 'ভাই ভায়ের মতো যোগ্য কাজই করে।'

দাতাদয়াল জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার কাজের কথায় আসা যাক। বন্ধক যে রাখছে তার নাম কী ?'

দাতা কৃষান জবাবে বলে, ' বলরাম, পিতা শিবদত্ত।'

'আর গ্রহীতার নাম?'

'কৃষান, পিতা শিবদত্ত।'

বলরাম চকিতে একবার দাদার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলো। তার চোখ দুটো জলে ভরে গেল। বলরামের অবস্থা কৃষানের চোখে পড়েনি। মোড়ল, মোক্তার আর গোমস্তা এরা তিনজন কৃষানের কাথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। তারা ভাবেন, কৃষান কি নিজেই টাকা দিচ্ছে ? কিন্তু আমরা শুনেছিলাম, টাকাটা মাহাজন দেবে। ব্যাপারটা যখন ঘরোয়া, তখন বন্ধকী ব্যবস্থা করার কী দরকার ছিল। তবে কি ধরে নিতে হবে, ভাইয়ে ভাইয়ে এতো অবিশ্বাস ? ছিঃ ছিঃ, বলরামও কেমন লোক, নিজের চেষ্টায় আশি টাকাও কোথাও যোগাড় করতে পারলো না ? আর ধরা যাক, যদি বলরাম টাকাটা শোধই করতে না পারে তাহেল কৃষানের টাকাটা কি জলে যাবে ? এদিকে শ্যামা দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। এতদিন সে কৃষানকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে এসেছে, তাকে যোগ্য সম্মান দিয়ে এসেছে। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে সে ভাসুরের ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হল, মুখ ফসকে কি যেন বলতে গিয়েও চেপে গেলো এই কারনে যে, সে তার ভাসুর, গুরুজন, তাই তার এমন কিছু বলা উচিত নয় যাতে তার সম্মান নষ্ট হয়। বৃদ্ধ মা কাছেই বসেছিলেন। তিনি হতাশ, ব্যর্থতার জ্বালা বুকে নিয়ে নিরুপায় হয়ে তিনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হতে একবার করোজোরে আকাশ পানে তাকিয়ে তাকে প্রণাম জানালেন। তারপর সেই হাত দুটো দিয়েই তিনি তার কপালটা চাপড়ালেন। দু'ছেলের অতীতের স্নেহের কথা ভেবেছেন, সেই সব সুখের দিন আজ অতীত। বর্তমান বড় বেদনাময়। আর ভবিষ্যৎ অন্ধকার! সেদিনের সেই সন্তানদের আজ দেখলে বড় লজ্জা হয়। সেই সঙ্গে দুঃখ হয় আবার ঘেন্নাও হয়। এক বুক হাহাকার নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন,

"نارائن! کیا ایسے لڑکوں کو میری ہی کوکھ سے جنم لینا تھا۔" [৭৪]

('হে ঈশ্বর, বড় জানতে ইচ্ছে করছে, ছেলেদুটো কি আমার গর্ভে জন্ম নিয়েছিল ? ওরা কি সত্যিই আমার ছেলে!!!)

---

[৭৪] প্রেমচাঁদ, 'দু'ভাই', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ১৯।

লোভ, হিংসায় বসবতী হয়ে স্ত্রীর কারনে আপন ভাই ভাইকেও পর করে দেয়, প্রেমচাঁদ এই গল্পের মাধ্যমে বর্তমান সমাজের জীবন্ত চিত্র পাঠক সমাজে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রেমচাঁদ গ্রাম বাংলার মানুষ। তাই সমাজ সম্পর্কে তার তীব্র সচেতনতা ছিল। তার অধিকাংশ ছোটগল্পের পটভূমি তৎকালীন সমাজ। এই সমাজকে তিনি ভাল করে দেখেছেন ও চিনেছেন। সমাজের নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষ হল তার ছোটগল্পের বিষয়বস্তু। বহু চরিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন- যাদের সমাজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আছে। সমাজের বিধি ব্যবস্থা ও রীতি-নীতির নামে কতিপয় ব্যক্তি যা করেছে তা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচার। এখানে দূর্বল ব্যক্তির ওপর বলিষ্ঠ ব্যক্তির জোর জুলুম। এতদিন যা দেখেছি বা শুনেছি তা উচ্চবর্ণের দ্বারা নিম্নবর্ণের ওপর সমাজের দোহাই দিয়ে অত্যাচার। কিন্তু গরীব ভাইয়ের উপর ধনী ভাইয়ের বৈষম্য বা অত্যাচারের আরেক নমুনা *জাদেরাহ (زادراہ)* ছোটগল্পটি। ১৯৩৬ সালে গল্পটি প্রকাশিত হয়। গল্পে দেখা যায়- শেঠ রামনাথের পয়সা কড়ির অভাব ছিল না কিন্তু হঠাৎ রোগে পড়ে শয্যায় শায়িত হন। তার মরণাপন্ন অবস্থা। চিকিৎসায় সকল টাকা-পয়সা খরচ হয়ে যায়। ডাক্তার ও জবাব দিয়ে দিয়েছে, সে আর বেশীদিন বাঁচবে না। তার এগারো বছর বয়সী মেয়ে রেবতী ও আট বছর বয়সী ছেলে মোহনকে সে খুব ভালবাসেন। আদর করে ছেলেকে রাজা ও মেয়েকে রানী বলে ডাকেন। তাদের কাছ থেকে সে বিদায় নিয়ে নিয়েছে। অশ্রু ঝরা স্ত্রী সুশীলার কাঁধে সব চাপিয়ে দিয়ে বললেন, একদিন সবাইকে তো মরতে হবে। আমি মরে গেলে তোমাকেই এই সংসারের হাল ধরতে হবে। এই ঘটনার তিনদিন পরে রামনাথবাবু মারা গেলেন। রামনাথবাবুর মৃত্যুর খবর পেয়ে ব্রাক্ষণ-পণ্ডিতরা খুব খুঁশি হয়। পুরোহিতরাও খুঁশি। কেননা এবার তাদের স্বার্থসিদ্ধি হবে। জ্ঞতিভাইরা উল্লাসিত। তারা ভাবল, ভালোই হয়েছে। আমাদের সঙ্গে সমান সমানে টক্কর দেওয়ার মতো একজন লোক কমে গেল। বুকের একটা কাঁটা খসে পড়ল। অন্যদিকে জমির অংশীদাররা তো আছেনই। পুরোনো ঝগড়া ঝালিয়ে নেবার সময় এসেছে এখন। তারাও পাওনা-গণ্ডা সব বুঝে নেবে। গায়ের জ্বালা মেটাবার মতো অমূল্য সুযোগ অনেকদিন পরে হাতে এসেছে। রমানাথ মারা যাওয়ায় আমদেরই লাভই হলো। তার বিধবা বউকে ঠকিয়ে জমিটাকে হাতিয়ে নেওয়া যাবে।

রামনাথ বাবুর দেহ ত্যাগের পাঁচদিন কেটে গেল। সুশীলা চিন্তায় পড়ে গেল, সব টাকা ও স্বামীর চিকিৎসা বাবদ খরচ হয়ে গেছে। যা বাকী ছিল তা তার দাহকার্যে লেগে গেছে। এখনো আরো অনেক কাজ বাকি। এমন সময় পঞ্চায়েত প্রধান জ্ঞাতিভাই ধনীরাম শেঠ তাদের বাড়িতে এসে সবাইকে ডাক দিল। রাজা রানী ও বিধবা ভাবী মহাখুশি, তাদের এমন বিপদের সময় আপন জনরাইতো ও তাদের খোঁজ খবর নিবে এটাইতো স্বাভাবিক। ধণীরাম শেঠ ভাবীকে শান্তনা দিল রামনাথ ভাইয়ের অকাল বিয়োগে আমরা সত্যিই দুঃখিত। এখন আপনাদের ভবিষ্যৎ দিনগুলি কীভাবে কাটবে তার উপায় খুঁজে বের করা আমাদের আশু কর্তব্য। তাই যাতে পরিবারের সম্মান অক্ষুন্ন থাকে সেভাবেই এগোতে হবে। আর সেইসব কাজকর্ম এমন ভাবে করতে হবে যাতে ভাইয়ের আত্মা সন্তুষ্ট হয়। ধনীরামের

সঙ্গে কুবের দাসও এসেছিলেন। তিনিও বললেন, পরিবারের সম্মান অক্ষুন্ন রাখা ও কুলমর্যাদা রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। তবে সাধ্যাতীত খরচ করা যাবে না। রামনাথের আত্মার শান্তির জন্য ব্রাক্ষণদের আমন্ত্রণ জানাতে দশ হাজার টাকা লাগবে। বউঠান তোমার কাছে কত টাকা পয়সা আছে ? সুশীলা বলল- তার চিকিৎসা ও শ্মশান ঘাটেই সব টাকা খরচ হয়ে গেছে। হাতে কোন টাকা নেই। ধনীরাম তখন বলল, তাহলেতোতোমার কোন উপায়ই নাই, আর এই অনুষ্ঠানও তো করা লাগবে। না হলে তো লোকে আমাদের মন্দ বলবে। তখন ধনীরাম বলল,

دھنی رام نے کبیر داس کی طرف دیکھ کر کہا۔"تب تو یہ مکان بیچنا پڑے گا۔"

"اس کے سوااور کیاہو سکتاہے۔ناک کٹانا تو اچھا نہیں ہے۔رام ناتھ کا کتنا نام تھا، براوری کے ستون تھے۔یہی اس وقت ایک علاج ہے۔ بیس ہزار میرے نکلتے ہیں، سود بٹہ لگا کر پچیس ہزار ہوں گے۔باقی روٹی میں خرچ ہو جا ئیں گے۔اگر کچھ بچ رہا تو بال بچوں کے کام آجائے گا۔" [৭৫]

(ধনীরাম কুবের দাসের দিকে তাকিয়ে বলল: তাহলে তো বাড়ি বিক্রি করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নাই।
এই প্রশ্নের জবাব আর কিইবা হতে পারে। মান মর্যাদা খর্ব করা চলবে না। রামনাথের কত খ্যাতি ছিল। জ্ঞাতি ভাইরা সবাই তাকে মানত। সে এতদিন একটা এটাই একমাত্র উপায়। আমিই তো পাব রামনাথের কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা। হিসেব করলে দেখা যাবে সুদে আসলে সেটা এসেছে পঁচিশ হাজারে। আর যে টাকাটা অবশিষ্ট থাকবে তা দিয়ে শ্রদ্ধাশান্তি ও লোক খাওয়ানো যাবে। আর তার থেকেও যদি কিছু থাকে তা ছেলে মেয়ের ভবিষ্যতের জন্য না হয় বউঠান তুলে রাখবেন।)

সুশীলার ছোটভাই সন্তলাল সাথে সুহৃদয়বান ব্যক্তি দুর্বলদাস ও ভীমচন্দ্র বিধবার পক্ষে কথা বললে ধনীরাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে কথা বলতে তাদের ধমক দেয়। দুর্বলদাস বৌঠানকে তার অলংকারগুলো আনতে বললে তা দেখে ধনীরাম বলে এই অলংকার বাবদ তিন হাজার হবে, দুর্বলদাস অলংকার গুলো ওজন করার ভঙ্গীতে বলল, আমি এটা সাড়ে তিন হাজার টাকায় বিক্রি করে দিতে পারব। ভীমচন্দ্র বলে আমি চার হাজার দিতে পারব। কুবের দাস হঠাৎ বলে উঠলেন, এগুলো দিয়ে কিছুই হবে না। কুটুমদের খাওয়াতে দশহাজার টাকা লাগবে। বাড়ী বিক্রি ছাড়া কোন উপায় নাই। পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুশীলের বাড়িটি ত্রিশ হাজার টাকায় কুবেরের নিকট বিক্রি করা হয়। কুবেরদাস সব টাকা কেটে পাঁচ হাজার টাকা ও গয়না বাবদ চার হাজার টাকা সহ মোট নয় হাজার টাকা সুশীলাকে দিয়ে ধুম ধামের সহিত দশদিনের দিন গ্রামের সকলকে খাওয়ানো হল। একমাস কেটে গেল সুশীলার হাতে কোন টাকা পয়সা নেই, সন্তলাল কাজ করে যা টাকা পায়, তা থেকে সে কিছু টাকা সুশীলার সংসারে ও বাকী টাকা নিজের সংসারে খরচ করে। এমন সময় কুবেরদাস তার ঘর ছাড়ার জন্য দুইজন লোক সুশীলার বাড়িতে

[৭৫] মুন্সি প্রেমচাঁন্দ, 'জাদেরাহ', *মাজমুয়াহ মুন্সি প্রেমচাঁন্দ ঃ আফছানে*, ছংগে মিল পাবলিকেশন, লাহোর, ২০০২, পৃ. ৭৩৫।

পাঠায়। সুশীলা রাগ হয়ে যখন তখন সবকিছু নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে দশ টাকা ভাড়ায় ঝাবর মলের বাড়িতে উঠে।

প্রতিবেশী ও জ্ঞাতিভাইদের নিন্দার কারনে বাড়ির ঝিয়ের কাজ, সেলাইয়ের কাজ সে করতে পারছে না। সমাজের এই চক্রবৃত্ত থেকে কোন মতে বেরিয়ে আসা সুশীলার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ সমাজ তাকে দুঃখ কষ্ট, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, অপমান ছাড়া আর কিছুই দেয়নি। শেষ পর্যন্ত মেয়ের অলংকার দিয়ে সংসার চালাতে শুরু করেন। তিন মাস পর ঘর ভাড়া বাবদ ত্রিশ টাকা হলে ঝাবর মল সুশীলের সাথে খারাপ ব্যাবহার করে ঘর থেকে বের করতে চায় অথবা তার মেয়ে রেবতীকে বিয়ে করতে চাইলে সুশীলা পঞ্চাশ বছরের বুড়োর সাথে তার মেয়ে বিয়ে দিবে না বলে দেয়। পাশেই আরেক বৃদ্ধ বিধবা আনাজ বিক্রেতা সুশীলার করুণ পরিণতি দেখে তার বাড়ীতে আশ্রয় দেয়। কয়েক দিন পর ঐ বৃদ্ধার বাড়ীতে প্রচন্ড জ্বরের কারনে সুশীলার মৃত্যু হয়।

সেই বৃদ্ধ বিধবার কাছে রেবতী ও মোহনের তিন বছর কাটে। রেবতী মাঝে মধ্যে বৃদ্ধাকে সহযোগিতার আশায় আনাজ বিক্রি করে সাহায্য করত। এটা জ্ঞাতী ভাই কুবেরতা দেখে রেবতীকে ডেকে অনেক বকাবকি করে। সেও তার স্ত্রী দুইজনই মিলে রেবতীকে ঝাবর মলকে বিয়ে করতে বলে। না মানলে আদালতে তার বিচার হবে। নচেৎ গ্রাম ছাড়তে হবে। ওরা তাকে বিশ টাকা দিয়ে বিয়ের প্রস্তুতি ও কেনাকাটা করতে বলে,

ریوتی نے نوٹ اٹھا کر وہیں پرزے کر ڈالا اور تمتماتے ہوئے منہ سے بولی۔ ”برادری نے اس وقت ہماری بات پوچھی جب ہم روٹیوں کو محتاج تھے۔ میری بدنصیب ماں مر گئی، برادری کا کوئی آدمی جھانکنے تک نہ گیا۔ میرا بھائی بیمار ہوا کسی نے خبر تک نہ لی۔ ایسے برادری کی مجھے پروا نہیں۔ [৭৬]

(রেবতী সেই নোটটি তুলে নিল। তারপর নোটটি ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলে দিল। সে বলে ওঠে- যখন আমাদের দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জুটতো না, তখন কেউ আমাদের দরজার ফাঁক দিয়েও দেখেনি। আমার দুঃভাগ্য যে, আমার মা যখন মারা যায়, তখন কেউ সেখানে উপস্থিত থেকে আমার মাকে দাহ করতে সাহায্য করেননি। আমার ভাই যখন অসুস্ত ছিল, তখন তোমরা কেহই তার খোঁজ খবর নেওনি। তাই আপনাদের মত জ্ঞাতিদের আমি তোয়াক্কা করি না।)

রেবতী বুঝতে পারে, তারা জোর করে বিয়ে দিয়ে দিবে। আইনী কোন সহযোগীতাও সে পাবে না। সে পরের দিন গঙ্গা জলে ডুবে আত্মহত্যা করে। কুবেরদাস এই সংবাদ পেয়ে খুব খুশী। তিনি বললেন,

”چلو جھگڑا پاک ہوا، برادری کی بدنامی تو نہ ہوگی“۔ [৭৭]

---

[৭৬] মুন্সি প্রেমচাঁন্দ, 'জাদেরাহ', *মাজমুয়াহ মুন্সি প্রেমচাঁন্দ ঃ আফছানে*, ছংগে মিল পাবলিকেশন, লাহোর, ২০০২, পৃ. ৭৪৬।
[৭৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৭।

(“ঠিক হয়েছে, ভালোই হল। জ্ঞাতিদের তো কেউ বদনাম করবে না। নিজে মরে বেঁচেছে আমাদেরও বাঁচিয়েছে।)

প্রেমচাঁদের ছোটগল্পে রয়েছে সামাজিক ভাবে উপেক্ষিত পতিতার জীবন দুর্দশার চিত্র এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনাবস্থা। আসলে নারী দেহ-ব্যবসা করে বড় যন্ত্রণায়। বিবাহিত জীবনেও নারীকে দেহ দান করতে হয়। তবে দেহ-ব্যবসা এক কথা আর স্বামীকে ভালবেসে তাঁর সঙ্গে মিলন অন্য কথা। সেখানে সংসারের মঙ্গল কামনার্থেই নারী-পুরুষের মিলন। অথচ দেহ-ব্যবসা নিত্য পুরুষের কাছে দেহ বিক্রি। কত ধরণের পুরুষ আছে - কেউ রূঢ় মেজাজের, কেউ মাতাল, কেই খুনী। পতিতাদের বিভিন্ন খদ্দেরের মন যোগাতে হয়। এখানে ভালবাসা থাকে না, থাকে প্রয়োজন। আর প্রয়োজন মানেই দেনা পাওনা। পুরুষ আসে পয়সা দিয়ে যৌনক্ষুধা নিবৃত্ত করতে। তৃপ্তি পুরুষ পায় কিনা সে তারাই জানে। তবে মদ আর নারী এদুটিতে ক্ষুধা নিবৃত্ত হয় না, এখানে সাময়িক উত্তেজনার প্রশমন হয় মাত্র। তারই আকর্ষণে পুরুষ আসে নারীর কাছে। আর নারী চায় অর্থ, তার বাঁচার তাগিদে। তাই অনন্যোপায় হয়ে সে দেহকে অবলম্বন করে। অর্থ সে পায়, অর্থ বাঁচার পথ হয়তো দেয়, কিন্তু তাতে সুখ নেই। সব নারীই চায় ঘর বাঁধতে। স্বামী-সংসারে সুখে সংসার করতে। অথচ তাকে মনের বিরুদ্ধে সারা জীবন মানুষের মনোরঞ্জন করতে হয়। এযে কি বেদনার তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তেমনি একটি গল্প হল *খুদী* (خودی) । এ গল্পে প্রেমচাঁদ পতিতার জীবনের অপ্রাপ্তি ও যন্ত্রণা এবং এই জীবন থেকে মুক্তির আকাংক্ষার চিত্র অংকন করেছেন। গল্পের নায়িকা মুন্নি সুন্দরী। তার সৌন্দর্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে চায় বহুজন। কিন্তু কেউই তাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চায় না। খদ্দেরদের উপহৃত দ্রব্যরাজি ও অর্থের মধ্যে সে হৃদয়ের উষ্ণতা অনুভব করে না। মুন্নীর মন হৃদয়ের অনুসন্ধানে আকুল। সে ঐশ্বর্য চায় না, চায় না প্রাচুর্য, কেবল চায় একজনের হয়ে তার সঙ্গে কুঁড়ে ঘরে দারিদ্রের মধ্যে কাটিয়ে দিতে সমস্ত জীবন, যে তাকে সত্যি ভালোবাসে হৃদয় দিয়ে। অবশেষে সে পেয়েছিল একজনকে। তাকে ভালোবেসে তার সঙ্গে ঘর বেঁধেছে। যেদিন থেকে সে একজনের হয়ে গেছে, সেদিন থেকে তার চেহারায় এমন দীপ্তি ফুটে উঠেছে। যার দিকে তাকালে বাসনার চোখ অন্ধ হয়ে যায়। *খুদী* সম্পর্কে গবেষক মদন গোপালের মন্তব্য হল,

> *Khudi* is the Delineation of a young orphan girl of unknown parentage, who grows in the village and obliges everyone by running on errands for them. She spurns all offers from the youth of the village, but falls for a traveler who lives with her for three days only and then disappears. He does not come back, but she hopes that one day he must and she lives on this hope. [৮]

---

[৮] Madan Gopal, *Munshi Premchand: A Literary Biography*, Asia Publishing House, Bombay, 1964. P- 250.

গল্পকার পতিতা মুন্নির যন্ত্রণা ও আকাংক্ষার ছবি আঁকতে গিয়ে সকল পতিতার আকাংক্ষার কথা বলেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে (হয়ত বা নিজের অজান্তেই) ভারতীয় নারীর সনাতন আদর্শ নির্মাণ করেছেন মুন্নির চরিত্রের মাধ্যমে। যার ঘরে সে গিয়েছিল, সেই পুরুষ দু'দিন পরই পালিয়ে যায় তাকে ফেলে। অথচ মুন্নী জীবনের সত্তর বছর কাটিয়ে দিয়েছে ঐ কুঁড়ে ঘরে প্রেমিকের ফিরে আসবার আশায়। কোনো প্রলোভন তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। মুন্নির আদর্শ, অধ্যবসায়, প্রেমব্রতের প্রতি প্রেমচাঁদের শ্রদ্ধা ও সমর্থন গোপন থাকে না। প্রেমচাঁদ পরিত্যক্তা ও পতিতা নারীদের মধ্যে 'একনিষ্ট প্রেম' ও 'মনুষ্যত্বের' সন্ধান পেয়ে তাদের জয়গান করতে আদৌ ইতস্তত: করেননি। তিনি দেখিয়েছেন যে, সামান্য একটা পদস্থল নই তাদের জীবনের সব নয়। এটুকু বাদ দিলে ও তাদের স্নেহ, মায়া মমতা, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি গুনগুলিও উপেক্ষার নয়। গল্পের শেষ অংশে লেখকের বর্ণনায় মুন্নির দারিদ্র্য ও যন্ত্রণার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তার আদর্শের গৌরব।

পরিত্যক্তা ও পতিতা নারীদের প্রতি সাধারন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রেমচাঁদ *খাওয়াহেশ* (*خواہش*) গল্পটি চয়ণ করেন। গান্ধী পার্কে অপরূপ এ যুবতী এলোমেলো হয়ে শুয়ে থাকে। এদিকে সকালে বসন্ত ও হাশিম বেনিয়ান খালি পায়ে প্রতিঃভ্রমণে এসে দৌড়াচ্ছিল। বড়দিনের ছুটিতে অলিম্পিকের দৌড় প্রস্তুতির জন্য পার্কে এসে যুবতীকে দেখে থমকে দাড়ায়। তাদের ভাবনা David Rubin এর ভাষায়,

> *Manovritti* shows the different points of view of two young men two old men and a young woman and an old woman on seeing a pretty girl fast asleep on a bench in a public park. “Is she a prostitute?” or “is she one of the forward types?” Those who are commenting upon her are none other than her would be husband and father-in-law! [৭৯]

হাশিম বলে, ও কোন বেশ্যা মেয়ে, আর বেশ্যা বলেই সে এইভাবে নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে। অপর দিকে বসন্ত যুক্তি দেখায় যুবতীটি কূলবধু। যে কিনা ঘরের স্বামীর চোখের সামনেই সবকিছু করে। অপর দিকে দু'জন বৃদ্ধ বন্ধু, একজন ডাঃ শ্যামনাথ ও অপরজন উকিল। তারাও মেয়েটিকে দেখে বেশ্যা বলে ঠাট্টা করতে থাকে। ডাঃ সাহেব বলেন- আমি বৃদ্ধ হয়েছি বলে কি হয়েছে, যুবকের চেয়েও আমার শক্তি কম কিসের। দরকার হলে চন্দ্রোদয় ও মঙ্কি গ্লেন্ড খেয়ে যুবক হয়ে যাবো। সে উকিলকে বলে, তুমি সুন্দরী যুবতীর সাথে পাকা কথা বলে আমার সাথে বিয়ে করিয়ে দেও। আর তার যদি প্রেমিক ও থাকে আমি তার সাথে কোমর বেঁধে লড়বো। উকিল বলে ঠিক আছে, আমি

---

[৭৯] David Rubin, *Widows, wives, and other Heroines: twelve short stories,* New York: Oxford University Press, Delhi, 1998, P- 378.

তোমার জন্য তাই করবো, কিন্তু এর জন্য আমাকে তোমার ভাগ দিতে হবে। কখনো কখনো আমি তোমার ঘরে গিয়ে হাজির হয়ে নিজের চোখে ওকে দেখে চক্ষু সার্থক করবো। ডাঃ হাসতে হাসতে অনুমতি সাপেক্ষে রাজি হয়ে গেল। দুই বন্ধুর মধ্যে কথাবার্তা এভাবে চলতে থাকে, আর তারা এভাবেই চলে এলো সেখান থেকে। এমন সময় একজন বৃদ্ধা মহিলা ও একজন নব যৌবনা মিনা পার্কে হাটাহাটির সময় যুবতীকে দেখে তারা থমকে দাড়ায়। বৃদ্ধা মেয়েটিকে দেখে বলে উঠলো, মেয়েটি বড়ো বেশরম বলে বকাবকি করেন। অপরদিকে মিনা ওকে বেশ্যা বলে। তার মতে সে বেশ্যা হোক আর যাই হোক, দেখতে হবে কে তাকে বেশ্যায় রূপান্তরিত করলো? যেই করুক নাকেন, ওকে বেশ্যা করাটা স্ত্রী সমাজের কাছে প্রচণ্ড একটা লজ্জাকর ব্যাপার, এভাবে মেয়েদের লজ্জায় ফেলার অধিকার কে তাকে দিল ? প্রেমচাঁদ তার *খাওয়াহেশ* গল্পে এভাবে অবহেলিত পতিতার জীবনের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি এতে উপস্থিত করেণ পতিতার স্বাভাবিক জীবনাবস্থা। পতিতাবৃত্তের জন্য নিদিষ্ট নারীর বিলাস-লালসাকে দায়ী করলেও তিনি অন্য সর্বত্রই অর্থনীতিকে দায়ী করেছেন।

শুদ্ধি (*شدّھی*) জুন, ১৯২৮ সালে 'খুয়াব ওয়া খেয়াল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৮০] গল্পে প্রেমনাথ নিজের সবকিছু খুইয়ে সর্বশান্ত হয়ে অবশেষে উপলব্ধি করলেন, পতিতালয়ে কর্তব্যপরায়ণতা, প্রতিজ্ঞা, ন্যায়নিষ্ঠা এই সব জিনিসের বড়ই অভাব। অতি দুষ্প্রাপ্য যা সংসার বা স্ত্রীর কাছ থেকেই অনেক সময় সহজেই মিলে যায়। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে তনি একসময় সংযমী বলেই খ্যাতি ছিলেন। তার এই সংযমের অপব্যাখ্যা করতে গিয়ে বন্ধুদের মতে তারা কখনো নাকি উদারতার চিহ্ন খুজে পায়নি। যাহাই বন্ধুদের মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহে তিনি একবার মাহফিলে শরিক হন আর সেখানে গিয়েই এক অসমান্য সুন্দরী রূপসীর রুপের মায়াজালে হৃদয় লুটিয়েদেন। আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে পাঁচ বছরে প্রেমনাথ নিজের ধন-দৌলত, মান-সম্মান সবকিছু সেই মোহনী রূপসীকে নজরানা দেন। প্রেমচাঁদ লিখেন,

مگرایک دن دوستوں کے اصرار سے ایک محفل میں شریک ہوئے اوربی حسنہ کے حسن زاہد فریب نے وہیں مجمع عام میں ان کا
دل لوٹ لیا۔رنگین مزاجوں کے لیے حسن اورادا مشغل تفریح ہے۔زاہدوں کے لیے پیغام شہادت۔ان پانچ برسوں میں
پریم ناتھ نے دولت،عزت،دین،ایمان سب کچھ بی حسنہ کی نزر کر دیا۔ [৮১]

(কিন্তু তিনি একদিন বন্ধুদের মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহে এক মাহফিলে শরিক হলেন। এখানকার মেয়েদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী, অনাগ্রহী। কিন্তুসেই মাহফিলে গিয়ে এক অদ্ভুত পরিবর্তন এলো তাঁর মধ্যে। যিনি ছিলেন এতদিনের একজন সংযমী পুরুষ, তিনিও মাহফিলে এক অসমান্য নুন্দরী রূপসীর রূপের মায়াজালে প্রলুব্ধ হয়ে তার জাদুমন্ত্র বলে লুটিয়ে দিলেন তার হৃদয় তার চরণতলে। তাঁর চোখে তখন রঙীন স্বপ্নের নেশা। আত্মসংযমকে জলাঞ্জলি দেবার পক্ষে এই খবরটুকু যথেষ্ট। একটানা পাঁচ বছরের মধ্যে প্রেমনাথ তাঁর ধন-দৌলত, মান-সম্মান সব কিছুই সেই মোহিনী রূপসীকে নজরানা দিলেন।)

---

[৮০] প্রেমচাঁন্দ, *আব্দুল কাভী দাছনভী*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান, নয়া দিল্লী, ২০১১, পৃ. ১৯।

[৮১] প্রেমচাঁদ, 'শুদ্ধি', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ১৬২।

তারপর ঘোরতর অন্যায় মেনে নেওয়া যায় না। ফলে অবস্থা এমন হয় যে, বাড়িতে তার লোক সমাগম কমে যায়। কদাচিৎ রাস্তা ঘাটে দেখা হলেও পরিচিতরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার মা তার বেলেল্লাপনা বন্ধ করতে না পেরে তীর্থযাত্রার পথ ধরলেন। স্ত্রী বাবা বাড়ি চলে গেলেন। মদন গোপাল *শুদ্ধি* গল্পটি সম্পর্কে এ ভাবে বলেন,

> Shuddhi attempts to explain the real meaning of conversion. The hero of the story a rich man gets into bad company, leaves his wife and mother and embraces Islam. he runs through all his savings and falls on evil days. Informed of his straits, his wife his savings and falls on evil days. Informed of his straits his wife comes to “reclaim” him. It is necessary to reconvert him to Hinduism. He has his own views on the matter, but agrees. [৮২]

পতিতালয়ে গা ভাসানোর ফলে প্রেমনাথের জীবন থেকে অনেকগুলো সময় ঝরে যায় ও পরিবার পরিজন থেকেও তিনি ছন্ন ছাড়া হয়ে যান। একজন তরুণ সম্পদশালী যুবকের পতিতালয়ে পা বারানোর ফলে তার জীবনে ঘটে যাওয়া কুফলগুলো লেখক উপরুক্ত গল্পে বর্ণনা করেছেন।

পতিতাভিত্তি মূলক আরেকটি গল্প *রামলীলা* (رام لیلا) । গল্পটি প্রথমে মাহেনামা মাধুরীতে অক্টোবর, ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। পরে ‘প্রেম চল্লিছি’র (প্রথম খণ্ডে) ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়। [৮৩] রামচন্দ্র রামলীলা দেখতে জমিদার ও এলাকার লোকদের কাছ থেকে চাঁদা উঠাতে গিয়ে তার বাবার কাছে যায়। তার বাবা পুলিশের কর্মকর্তা হওয়ায় পয়সা ছাড়া অর্ঘ্য দেওয়ায় তার আত্মসম্মানে বাঁধে এবং তার কাছে যে দুই পয়সা ছিল তা অর্ঘ্য দেয়। রামচন্দ্র তার বাবার আচরনে অনেক রাগান্বিত হয়। পূজার/আরতির থালায় চার পাঁচশো টাকা আদায় হওয়ায় জমিদার চিন্তিত হয় এবং সেবা রবনিতাদের নেত্রী আবাদিজান যিনি কিনা অপরুপ সুন্দরী রুপসী যুবতী ছিলেন। তার সাথে চুক্তি করেন যে সে, যেনো রসিকজনের সাথে এমন ভাবভঙ্গি করেন যাতে কিছু টাকা বেশী উঠে। আবাদিজানের জমিদারের মতলব বুঝতে দেরী হলো না। সে জমিদারকে বললো আমার ১০০ টাকা আগে মিটিয়ে দাও পরে যা উঠবে সমান সমান। আবাদিজান জানতেন কোন পুরুষের কোন দুর্বলতা, সেই ভাবেই সে তার রঙ্গ-রসিকতার মাধ্যমে ঘায়েল করলো। হঠাৎ দেখেন আবাদিজান তার বাবার পাশে। সে ভেবেছিল তার বাবা রাগী পুলিশ কর্মকর্তা আবদিজানকে

---

[৮২] Madan Gopal, *Munshi Premchand : A Literary Biography*, Asia Publishing House, Bombay, 1964. P- 249.
[৮৩] জি. কে. মানিক টালা, ‘শুদ্ধি’, *প্রেমচান্দ ঃ খায়াত-ই-নূর*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ১৯৯৩, পৃ. ৩১।

ধমক দিয়ে দূর করবে কিন্তু ব্যাপারটা উল্টো ঘটলো। তার বাবা ঐ নর্তকীর স্পর্শে বেশ মজা পেলো। তার পাশাপাশি শেঠজি বাবাকে উঁশকিয়ে দিলে রামচন্দ্র বলল,

رہا تھا تو بنیا، مجھے سمجھتا کیا ہے؟ یہاں ایسے مواقع پر جان تک نثار کرنے کو تیار ہیں! روپے کی تو حقیقت ہی کیا ہے؟ تیرا جی

چاہے، آزمالے! تجھ سے دگنی رقم نہ دے ڈالوں تو منہ نہ دکھلاوں۔ [৮৪]

(তুই বেনে, কী ভেবেছিস আমাকে ? প্রয়োজনে এই মর্ম প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে আর টাকা তো তুচ্ছ। তোর মন চায় যদি যাচাই করে দেখ। তোর দু'গুণ যদি না দেই তো মুখ দেখাব না।)

তারপর তার বাবা পকেট থেকে একটা আশরাফিয়া বের করে আবাদিজানকে সঁপে দিল। যা দেখে লজ্জায় আমার মনের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। যে বাবার আরতির থালায় একটা টাকা দিল না অথচ এই কুৎসিত, ঘৃনিত ওনিন্দনীয় ব্যাপারে তাঁর গর্ব ও আনন্দের সীমা নেই। তার মায়ের কথা ভেবে বাবার এই কুকীর্তি বেমালুম চেপে গেল। এখানে প্রেমচাঁদ এক পতিতার জন্য ছেলের সামনে বাবার নষ্টামির ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।

অস্পৃশ্যতার সমস্যা প্রেমচাঁদকে ভাবিয়েছে, একথা বোঝা যায় তাঁর গল্পসমূহ পাঠ করলেই। সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত শ্রেণী হল অচ্ছুৎ বা হরিজন, যাদের স্পর্শ করলে অভিজাত শ্রেণীর জাত যায়। প্রেমচাঁদের অনেক গল্পে সমাজের এইসব অবহেলিত অস্পর্শদের বেদনাদায়ক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে সুচারু ভাবে। তেমনি একটি জনপ্রিয় গল্প হল *দুধ কি কিমত* (دودھ کی قیمت), যা জুলাই, ১৯৩৪ সালে 'মাধুরী'তে প্রকাশিত হয়। যার বিষয়বস্তুই হচ্ছে অচ্ছুৎ সমস্যা। জমিদার মহেশনাথের তিন কন্যা ছিল। পুত্র সন্তানের আশায় তার স্ত্রী চতুর্থ ছেলে সন্তান প্রসব করে। মহেশনাথের স্ত্রীর দুধ না আসার কারণে গ্রামের মেথর গুদড়ের স্ত্রী ভুঙ্গিঁ জমিদার ছেলে সুরেশকে এক বৎসর দুধ পান করায়। বিনিময়ে যাবার সময় ভুঙ্গিঁর চাহিদা মত দুইটি হাতের চুরি ও প্রচুর দ্রব্য সামগ্রী উপহার দেন। ভুঙ্গিঁ জমিদার ছেলেকে দুধ খাওয়ান আর নিজের ছেলে মঙ্গঁলকে তুলা দুধ খাইয়ে অসুস্থ করে ফেলে। এদিকে গ্রাম্য ব্রাহ্মণ সমাজপতিরা বাদ সাধল। তারা চায়না জমিদার বাড়ির সন্তান মেথরানির দুধ খেয়ে বড়হোক। গ্রামের মোটেরাম শাস্ত্রী পন্ডিতের আদেশে ভুঙ্গিঁ দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে দিল। জমিদার মেথর ভুঙ্গিঁর পাশে দাড়ালেও সমাজপতীদের কাছে হার মানেন।

[৮৪] মুন্সি প্রেমচাঁন্দ, 'রামলীলা', *মাজমুয়াহ মুন্সি প্রেমচাঁন্দ ঃ আফছানে*, ছংগে মিল পাবলিকেশন, লাহোর, ২০০২, পৃ. ৪৭৩।

মঙ্গঁলের পাঁচ বৎসর বয়সে প্লেগের প্রাদুর্ভাবে গুদড়ের ও চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে তার মা ভুঙ্গিঁ মারা গেলে সে অনাথ হয়ে যায়। গ্রামের ছেলেরা সে মেথরের ছেলে বলে তার সাথে খেলাধুলা ও কথা বলত না। গ্রামের ছেলেরা তাকে অস্পৃশ্য বলে অপমান করত। জমিদার বাড়ির লোকেরা তাকে তাদের খাবারের পর যা ঝুঠা খাবার থাকত তা দেওয়ার সময় মেথরের হাত তাদের হাতে লাগবে বলে তাকে খাবার ছুড়ে দিত। তার জায়গা হয় জমিদার বাড়ীর অদূরে নিম গাছের নীচে। গ্রামের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা জমিদার বাড়ীর কয়েক হাত সামনে মঙ্গঁল থাকবে এটাও তাদের চক্ষুশূল হয়ে দাড়ায়, তাদের কথা হল অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছাদের রক্ষা করবেন ভগবান। আর সমাজের মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। একদিন সুরেশের অনুরোধে মঙ্গঁল তার সাথে খেলাধুলা করার পর সুরেশ মঙ্গঁলকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কাঁদতে কাঁদতে মার কাছে বিচার দেয় যে, মঙ্গঁল তার গায়ে হাত দিয়েছে। কথা শুনে তিনি মঙ্গঁলকে অনেক বকা ঝকা করেন, মারতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভাবলেন, তাকে মারলে স্নান করতে হবে। তাই বাড়ী থেকে তাকে বের হয়ে যেতে বলেন। *দুধ কী কিমত* গল্পে প্রেমচাঁদ মঙ্গলের প্রতি সুরেশের মার আচরণ এভাবে তুলে ধরেছেন,

" دیوی دانت پیس کر رہ گئیں۔ ماریں تو اسی وقت اشنان کرنا پڑتا قمیچی تو ہاتھ میں لینا ہی پڑتی اور چھوت کی برقی رو قمچی کے

راستہ ان کے جسم میں سرایت کر جاتی اس لیے جہاں تک گالیاں دے سکیں دکا کہ اسی وقت یہاں سے نگل جا۔ پھر جو

تیری صورت نظر آئی تو خون ہی پی جاؤں گی۔ مفت کی روٹیاں کھا کھا کر شرارت ہو جھتی ہے۔ [৮৫]

("ওকে মারলে তখনই স্নান করতে হবে। ওকে লাঠি দিয়ে মারলেও লাঠিবাহিত হয়ে অস্পৃশ্যতার তাঁর শরীরকে স্পর্শ করত। তাই তিনি মঙ্গলকে মারার ইচ্ছেটা মনে পুষে রেখে গাল মন্দ করতে লাগলেন এবং ওখান থেকে দূর হয়ে যাবার আদেশ দিলেন। আর কোন দিন তার চেহারা যদি দেখি তাহলে তোর রক্ত চুষে খাবো। মুফতে রুটি খেয়ে বদমাইসির চূড়ান্ত হয়ে যাচ্ছিস।")

মঙ্গঁলের একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিলপোষা কুকুর টমি। মঙ্গল আর কুকুর টমি একই পাত্রে খায়, একই শয্যায় শয়ন করে। তাদের দুজনের মেজাজও একই রকম, দুজনে দুজনের স্বভাব জেনে গেছে। তারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে না। তাদের দু'জনের আপন মনোভাবে উক্ত গল্পে দারুণ ভাবে ফুটে উঠে,

منگل نے ایک ہاتھ سے ٹامی کا سر سہلا کر کہا۔ "دیکھا پیٹ کی آگ ایسی ہوتی ہے لات کی ماری ہوئی روٹیاں بھی نہ

ملتیں تو کیا کرتے؟ ٹامی نے دم ہلائی۔ سریش کو امان ہی نے پالا سے ٹامی"۔

[৮৫] প্রেম গোপাল মুত্তাল, 'দুধ কি কিমত', *প্রেমচাঁন্দ কে ছু আফছানে ঃ তারিখি তারতিমছে*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৭৫৬।

ٹامی نے پھر دم ہلا کی۔لوگ کہتے ہیں دودھ کادام کوئی نہیں چکا سکتا۔ٹامی نے پھر دم ہلادی۔" اور مجھے دودھ

کا یہ دام مل رہا ہے"۔ٹامی نے پھر دم ہلادی۔ [৮৬]

(মঙ্গল এক হাতে টমির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল- দেখলে, একেই বলে পেটের আগুন! এই লাথি মারা রুটিও যদি না জুটত তাহলে কী করবে ? টমি ল্যাজ নাড়ল। সুরেশকে আমার মা দুধ দিয়ে বড়ো করেছিল। টমি আবার ল্যাজ নাড়ল। লোকে বলে, দুধের দাম কেউ শোধ করতে পারে না। সেই দুধের এই দাম আমি পাচ্ছি। টমি আবার ল্যাজ নাড়ল এবং আমার কপালে এই ভাবে দুধের দাম মিলল। টমি আবার ল্যাজ নাড়ল।)

কুকুরের প্রসঙ্গ গল্পটিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। প্রেমচাঁদ বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত রূপেই এই গল্পে কুকুরকে এনেছেন। অচ্ছুৎদের ঘৃণিত, অবহেলিত জীবন যেন কেবলমাত্র কুকুরের সঙ্গেই তুলনীয় – একথা বলাই গল্পকারের উদ্দেশ্য। গল্পের শেষ অংশে কুকুরের সঙ্গে কথা বলার মধ্যে দিয়ে তা আরও স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয়।

সামাজে হরিজনদের দুঃখ, দুর্দশা সমাজের গ্লানি নিয়ে আলোচিত আরেকটি ছোটগল্প হল মন্ত্র (منتر)। যা ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ সালে 'জামানা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মন্ত্র গল্পটি সম্পর্কে ইংরেজী লেখক David Rubin এর মন্তব্য হল,

> Mantra is built round the life of one of the preachers who go out to "save" the people, particularly the Harijans, from embracing Islam. The leader of the Hindu preachers is jeered at by the Harijans who find his arguments hollow and divorced from realities. When, however, the Muslim proselytizers assault the leader and leave him for "Dead," it is the same Harijans who attend on him and bring him back to life. There is subsequently a plague in the village and most of the inhabitants leave. The preacher who is obliged to the Harijans, stays on and gets the Harijans and some others medicine etc. and saves them. Instead of preaching to them. He finds that he has learnt a lesson. [৮৭]

---

[৮৬] প্রেম গোপাল মুত্তাল, 'দুধ কি কিমত', *প্রেমচাঁন্দ কে ছু আফছানে ঃ তারিখি তারতিমছে*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৭৫৭।

[৮৭] *The World of Premchand: Selected Short Stories*,David Rubin, The David Rubin Collection, New Delhi, 21 October 2017, P- 248-249.

প্রেমচাঁদ তার ছোটগল্পে উত্তর ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় উচ্চহারে সুদ ও ঘুষের প্রচলনের কথা যথার্থভাবে তুলে ধরেছেন। অক্টোবর, ১৯২৫ সালে *সাজা* (سزا) গল্পটি প্রথমে হিন্দিতে প্রকাশিত হয়, পরে তা 'প্রেম চল্লিছি'র (দ্বিতীয় খণ্ডে) ছাপা হয়। [৮৮] প্রেমচাঁদ দেখিয়েছেন গ্রামের এক গরিব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জগৎ পান্ডে তার পাঁচহাজার টাকার মূল্যের দশ বিঘে জমি মামলায় জিতার আশায় জজসাহেব মিস্টার জি. সিনহাকে তার শেষ সম্বল পঞ্চাশ টাকার একটি পুটলি জজসাহবের পায়ের উপর রেখে দেন। জজসাহেব মৃদু হেসে বলেন, 'কিন্তু এত কমে কি হয় ? আরো লাগবে। এক বিন্দু শিশিরে কি তৃষ্ণা মেটে ? ভালো চাও তো যা দিয়েছো তার দশ গুন নিয়ে এসো।' জগৎ করুণ মিনতি জানায়, 'হুজুর আমি বড় গরীব, শুনেছি আপনি গরীবের বন্ধু।' জজসাহেব হাসলেন আর বিদ্রুপ করে বললেন, মিথ্যে কথা বলনা আমার কাছে। দেখো দেখো ট্যাঁকে হাত দিয়ে দেখো। উপায়ন্ত না দেখে জগৎ নিঃশব্দে নিজের ট্যাঁক থেকে আরো একশো টাকা বের করে জজসাহেবর পায়ের সামনে রাখার সময় দুঃখে তার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। কারণ ওই টকাটাই তার সারা বছরের আয়। সারা বছর পেটকে ফাঁকি দিয়ে শরীরকে কষ্ট দিয়ে মনকে বুজিয়ে-সুজিয়ে, মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে ওই টাকাগুলো সঞ্চয় করেছে। সেই টাকা জজসহেবের হাতে তুলে দিতে রক্ষা কবচ কুণ্ডল দেবার মতোই দুঃখদায়ক। তা দেখে জগৎ জজসাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিল। রাত প্রায় নয়টার দিকে জজসহাবের বাংলোর সামনে একটা টাঙা এসে থামল। সেই টাঙা থেকে পণ্ডিত সত্যদেব নেমে এলেন, উনি শিবপুরের মোক্তার। জজসাহেব তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালো। শিবপুরের মোক্তার সত্যদেব জজসাহেবকে এই মামলায় তাকে জিতিয়ে দেওয়ার জন্য কয়েক হাজার টাকা ঘুষ দিতে গিয়ে বলেন,

ستیہ دیو۔ حضور کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ کہہ کر گنّیوں کی ایک گڈی نکال کر میز پر رکھ دی۔ مسٹر سنہا نے گڈی کو آنکھوں سے شمار کر کے فرمیا۔انھیں میری طرف سے راجا صاحب کی نذر کر دیجئے گا۔آخر آپ کوئی وکیل تو کریں گے ہی۔اسے کیا دیجیے گا؟

ستیہ دیو۔ یہ تو حضور کے اکتیار میں ہے۔ جتنی ہی پیشیاں ہوں گی۔اتنا ہی صرفہ بڑھے گا۔

سنہا۔ میں چاہوں تو مہنیوں لٹکا سکتا ہوں۔

ستیہ دیو۔ بیشک ! اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔

سنہا۔ پانچ پیشیاں بھی ہوئیں تو آپ کے کم سے کم ایک پوار تو اڑ ہی جائیں گے۔ آپ یہاں اس کا آدھا ہی پورا کر دیجیے۔ تو ایک ہی پیشی میں فیصلہ ہو جائے گا۔ آدھی رقم بچ جائے گی۔

---

[৮৮] *প্রেমচান্দ, আব্দুল কাভী দাছনভী*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু যবান, নয়া দিল্লী, ২০১১, পৃ. ১৮।

ستیہ دیو نے دس گنیاں اور نکال کر میز پر رکھ دیں اور فخر کے ساتھ بولے۔ حکم ہو تو راجا صاحب سے کہہ دوں۔۔۔۔۔۔آپ اطمینان رکھیں۔

صاحب کی نظر عنایت ہو گئی ہے۔ [৮৯]

(সত্যাদেবী- 'হুজুর আপনার হাতেই তো সব কিছু।' এ কথা বলে (সত্যদেব) টাকার একটা বড় থলি তার ঝোলা থেকে বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন। মিস্টার সিনহা থলিটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার তরফ থেকে কোনো ক্রটি হবে না। কিন্তু একজন উকিলও তো লাগবে। তাকে কী দেবেন?'

সত্যাদেবী- 'সে তো হুজুর আপনার হাতেই রয়েছে,' সত্যদেব বলল, 'মামলার দিন যদি বেশি পড়ে তাহলে খরচও বেশি পড়বে।'

সিন্‌হা বলেন, 'আমি ইচ্ছে করলে এ মামলা মাস খানেক টেনে নিয়ে যেতে পারি।'

সত্যাদেবী- 'বেশ তো, তাতে কোনো অসুবিধা হবে না।'

সিনহা- 'পাঁচটা দিন ফেললে কম করেও হাজারখানেক টাকা খরচ হতে পার, 'আপনি যদি এখন তার অর্ধেকটা দিয়ে দেন তাহলে একটা দিনেই রায় দিয়ে দেব। তাতে আপনার অর্ধেক খরচ বেঁচে যাবে।'

সত্যদেব আরো হাজারখানেক টাকা টেবিলের উপর রেখে গর্ব করে বললেন, 'এরপর তাহলে জমিদারবাবুকে বলে দিতে পারি------, আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। সাহেবের কৃপাদৃষ্টি পড়েছে আপনার উপর।')

পরের দিন জজসাহেব পান্ডের দাবি খারিজ করে দেন। রাগে দুঃখে বৃদ্ধ ব্রাক্ষ্মণ জগৎ পান্ডে বলে, আমার সঙ্গে ছলনা ? জজসাহবের বিরুদ্ধে যদি এ বদলা না নিতে পারি তাহলে ধরে নেব আমি ব্রাক্ষ্মণই নই। কিন্তু কি ভাবেই বা বদলা নেব ? দাঁড়াও, তোমার লোভ আমি ছুটিয়ে দেব। গাদাগাদা টাকা ঘুষ নেওয়া আমি বন্ধ করে দেব। তখন তোমার কোন মক্কেল তোমাকে বাঁচাতে আসে দেখব। সেই দিনই সন্ধ্যায় জজসাহেবের বাংলোর সামনে একটা বট গাছের তলায় চট পেতে অনশন শুরু করে ও গাদাগাদা টাকা ঘুষ নেওয়ার কারনে জজসাহেবের নামে খিস্তি করে, মনের সুখে গালাগালি দিতে থাকে। তার কথা সবাই বিশ্বাস করে। খাওয়া-দাওয়া নেই, চোখে ঘুম নেই, পাগলে মতো অনর্গল প্রলাপ বকে যায় সে। আর যারা তার কথা শুনে বিশ্বাস করে তারা সবাই জজসাহেবের বাংলোর সামনে গিয়ে দু'চার কথা শুনিয়ে তাকে পিশাচ বলে গালাগাল দিতেও ছাড়ে না।

এভাবে চারটে দিন পেরিয়ে যায়। আর ওদিকে জজসাহেবের কানেও সেই সব কথা পৌঁছে যায়। আর পাঁচটা ঘুষখোর জজসাহেবকে মতো তিনিও উগ্র স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি তার চাকরদের ব্যবস্থা নিতে বললেন। চাকরের ফিরে এসে জজসাহেব বলে, 'জানেন হুজুর, বৃদ্ধ লোকটা বলে কি জানেন, ও নাকি মরে ভূত হয়েও লড়ে যাবে। তার দাবি না মেটা পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়বে না। আবার সে কি শাসায় জানেন, যেদিন তার মৃত্যু হবে, সেদিনই তার মতো শত শত জগৎ পাণ্ডে জন্মাবে।' জজসাহেব পুরাপুরি নাস্তিক হলেও চাকরের কথা শুনে ভয় না পেয়ে থাকতে পারলেন না। তার স্ত্রী আবার সব কথা শুনে রীতিমতো কাঁপতে শুরু করলেন। ছয়দিন কাটার পর জগৎ পাণ্ডে খুবই দুর্বল হয়ে পড়ল, শরীর তার ভেঙে পড়ার উপক্রম হল। নড়াচড়ার ক্ষমতাও সে হারিয়ে ফেলেছে।

---

[৮৯] প্রেমচাঁদ, 'সাজা', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১,পৃ. ৫৩৩-৫৩৪।

নীরবে আকাশ পানে সে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। যখনই তাকে দেখা যায় মনে হয় আজ রাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে সে, যাকে বলে একেবারে শেষ অবস্থা। প্রায় মাঝরাত্রি, জজসাহেব ও তার স্ত্রী ভয় পেয়ে তার দেড়শো টাকা দিতে যায়। কিন্তু জগৎ ঐ টাকা নিবে না, তার পাঁচ হাজার টাকাই চাই। সমাজে তাকে এই রকম হেয় করার কারনে সে জজসাহেবের শেষ পরিনতি সে দেখে ছাড়বে বলে হুমকি দেয়। ঘরে ফিরে জজসাহেব ঐ টাকা দিতে অস্বীকার করলে স্ত্রী এর পীড়া পীড়িতে রাজি হন। পরের দিন উভয়েই ঐ বট গাছের কাছে ছুটল বুড়োর দাবি আদায়ের জন্য। জজসাহেবের মুখ গম্ভীর, থমথমে। হ্যারিকেন হাতে তিনি তার স্ত্রীর পিছন পিছন চলেছেন আর মনে মনে ভাবছেন, নগদ পাঁচ হাজার টাকা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, এ টাকা কী করেই বা আবার উসুল হবে, কে জানে! তিনি আবার এ কথা ভাবছেন, এর চেয়ে ওই শয়তানটা মরে গেলেই ভালো হত। হয়তো তার একটু বদনাম হত। তা হোক, একসঙ্গে এতগুলো টাকা তো আর খরচ হত না। তিনি মনে মনে কামনা করলেন, আর কামনাও ফলপ্রসু হল। গিয়ে দেখেন, বুড়োটা ইহকাল ত্যাগ করে চলে গেছে।

اسی دن سے مسٹر سنہا اور ہندو سماج میں کشمکش شروع ہو گئی۔ دھوبی نے کپڑے دھونا بند کر دیئے۔ گوالے نے دودھ لانے

میں پہلو تہی کی۔ حجّام نے حجامت بنانا چھوڑا۔ [৯০]

(সেদিন থেকেই বিচারপতি মিস্টার সিন্‌হা এবং হিন্দু সমাজের মধ্যে টানাপোড়া চলতে থাকে। তিনি এবং তার পরিবারের লোকজন কার্যত সমাজচ্যুত। ধোপা কাপড় কাচা বন্ধ করে দিয়েছে, গোয়ালা আর দুধ দেয় না, নাপিত চুল ছাটা বন্ধ করে দিয়েছে।)

এমন বিপর্যয়ের মুখে পড়ে জজসাহেবের স্ত্রী তো সারাটা দিন চোখের জল ফেলেই কাটান। এদিকে ষোল বছর বয়সী জজসাহেবের মেয়ে ত্রিবেনীকে বিয়ে করতে কেহই রাজি হচ্ছিল না। সমাজচ্যুত হয়েছে এমন ঘরে ছেলেকে বিয়ে দিতে কেউ রাজি হয়নি। জাজসাহেব তখন পাত্রের বাবাকে টাকার লোভ দেখান, জমিজমা দিতেও রাজি, এমনকি পাত্রকে বিলেতে পাঠবার টোপও ফেলেন। কিন্তু তার সমস্ত প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে জবাব আসে, না, হবে না। একবছর পর যশোদানন্দন যাকে জজসাহেব এক সময় চাকরী ও বিয়ে দিয়েছিলেন, সেও চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয় জজসাহেবের মেয়ের সাথে তার ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিবে না।

প্রতিবেশীদের সাথে শত্রুতা করা আর জলের মধ্যে থেকে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া করা একই ব্যাপার। মানুষ হচ্ছে সামাজিক জীব, মনুষ্য সমাজে কখনো কখনো এমন সময় আসে যখন কাউকে না কাউকে প্রতিবেশীর কাছে মাথা নত হতে হয়। আজ জজসাহেবের অবস্থা অনেকটা সেই রকমই। এভাবে গল্পের ইতি ঘটে। প্রেমচাঁদ এভাবেই গল্পের ছলে ঘুষের কুফল এবং তার পরিণতি সমাজের সামনে তুলে ধরেন।

---

[৯০] প্রেমচাঁদ, 'সাজা', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৫৪১।

মুদ্রার যেমন এপিঠ ওপিঠ বিরাজমান। তেমনি মানুষের মাঝে ভাল ও খারাপ উভয় দিকও বিরাজমান। প্রেমচাঁদ সমাজের অনেক উচ্চ শিক্ষিত লোকদের ঘুষখোর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, তেমনি উচ্চ শিক্ষিত লোকদের ঘুষ না নেওয়ার প্রবনতাও কলমের তুলিতে উপস্থাপন করেছেন। তার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ *নেকি কি সাজা* (نیکی کی سزا) ছোটগল্পটি। যা মার্চ ১৯১৬ সালে 'স্বরস্বতী'তে প্রকাশিত হয়। যেখানে গল্পের নায়ক শাহজহাঁপুর ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার সর্দার শিব সিং একটি এলাকার ইঞ্জিনিয়ার হয়েও তার ভিতরে কোন লোভ ছিল না। তিনি ইচ্ছে করলে তার এলাকা হতে হাজার হাজার টাকা আয় করতে পারতেন। দামি মোটরগাড়ি তার থাকার কথা, কিন্তু সে একটা ফিটন গাড়ির চালক পর্যন্ত তিনি নন। অল্পেই সন্তুষ্ট তিনি। নিজে ঘুষ নিতেন না, এমকি অন্যকেই নিতে দিত না। এদিকে মার্চ মাস প্রায় শেষ হতে চলেছে। কয়েকদিন পরেই চীফ ইঞ্জিনিয়ার কাজে অগ্রগতি দেখেতে আসবেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো কাজে অগ্রগতি হয়নি। বাড়িগুলো অর্ধ সমাপ্ত। রাস্তাঘাট আগের মতোই খারাপ হয়ে রয়েছে। ঠিকাদাররা রাস্তা তৈরি সরঞ্জাম এখনো পর্যন্ত আনেনি। তবে সর্দারজি চুপ করে বসে নেই। প্রায় প্রতিদিনই ঠিকাদারদের কাজের কথা মনে করিয়ে দেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় না, তাদের মধ্যে কোনো আগ্রহ দেখা যায় না। ঠিকাদারদের বকা ঝকা করে ইঞ্জিনিয়ার বিদায় নিলে তারা নিজেদের মধ্যে নিজেরা কথা বলতে শুরু করে।

ঠিকাদার শাহবাজ খাঁ তার মরণ কামনা করেন, শেঠ চুনীলাল বলে, ব্যাটা নিজেও ঘুষ নেয় না আমাদের ও নিতে দেয় না। কাজ কি ভাবে আগে বাড়ায় দেখে নিব। আজ সততার যুগ শেষ। সরলতার শুধুই অবিশ্বাস। তাই আমার প্রশ্ন হল, সততা ও সরলতায় কি কোনো মূল্য আছে ? আমার মনে হয়, আজকাল এ যুগে যেখানে চোর-জোচ্চরদের প্রাধান্যই বেশি, সেখানে সর্দারজির মত সৎ মানুষের স্থান নেই। বিএ পাশ গোপাল দাস বলে, আমরা এমন একটা লোককে চাই যিনি নিজে খেতে ভালবাসেন এবং অপরকে খাওয়াতেও ভালবাসেন। নিজে মণ্ডা-মিঠাই খান তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের দু চারটে পোড়া রুটি অন্তত দিন। যেই এই গদিতে আসুক, যদি তাকে একটা পয়সা দিতে হয়, আমরা পাঁচ পয়সার কাজ ঠিক উসুল করে নেব। এই আমি বলে রাখলাম। সব শেষে বলে রাখি, ওঁর সম্পর্কে আপনারা যে যতই প্রশংসা করুন না কেন, আমার পক্ষে ওঁর সঙ্গে কাজ কারবার করা সম্ভব নয়। গোপাল দাসের কথায় জের টেনে তার কথারই পুনরাবৃত্তি করে শাহবাজ খাঁ বলে উঠল,

ہاں، نیک اور پاک صاف رہنا ضرور اچھی چیز ہے، مگر ایسی نیکی ہی سے کیا جو دسروں کی جان لے لے۔ [৯১]

('হ্যা, সৎ ও সরল ভালো মানুষ হওয়া ভালো, কিন্তু ভাল মানুষী দেখাতে গিয়ে সততার ধ্বজা উড়িয়ে অপরের ক্ষতি করা কোনো মানে হয় না।')

---

[৯১] প্রেমচাঁদ, 'নেকি কি সাজা', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১০, ডিসেম্বর, ২০০১,, পৃ. ২৪।

সর্দারজী নিজের মেয়ের বিয়েতে বরের বাবার চাওয়া পাঁচ হাজার টাকা পণ না দিতে পারায় বিয়ে ভেঙ্গে যায়। যদি ও তিনি ইচ্ছে করলে সাথে সাথে সে টাকার ব্যবস্থা করতে পারতেন। তবুও তিনি নিজের নীতিতে অটল ছিলেন। কথা মতো ঠিক সময়েই চীফ ইঞ্জিনিয়ার এসে হাজির হলেন শাহজঁহাপুরে। এসে কাজ তদারকি করে দেখেন, কোন কাজই সমাপ্ত হয়নি। ইঞ্জিনিয়ার বিরক্ত হয়ে এই পরিস্থিতি কেন জানতে চাইলে খানসামারা জানালো,

'হুজুর কাজ কি করে শেষ হবে বলুন ? ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে, তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি। সর্দারজীর অস্বাভাবিক ব্যবহারের জন্যই আজ জেলার কাজ কর্মের এমন অচলাবস্থা। সর্দারজী সমস্ত ঠিকাদারদের কেবলই হয়রান করে ছাড়েন। হেড ক্লার্কের পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ভুলে ভরা সব হিসাবপত্র। আশ্চর্যের ব্যাপার হলকি জানেন হুজুর, সাধারণ সৌজন্য বোধের খাতিরে একদিনের জন্যেও সর্দারজী তাকে নেমন্তন্ন করে কিছু খাওয়াননি। সে রকম কিছু করলে ব্যাপারটা খোলাসা হয়ে যেতে পারত। হেড ক্লার্ক তো তার আত্মীয় বা বন্ধু নয় যে, তাঁর ভুল দেখাতে সংকোচ বোধ করবেন।'

সরজমিনে সব কিছু দেখে যাওয়ার পর চীফ ইঞ্জিনিয়ার তার দপ্তরে ফিরে গিয়ে উপর ওয়ালার কাছে রিপোর্ট পাঠালেন এই ভাবে ঃ "সর্দার শিব সিং একজন অত্যন্ত সৎ, সরল এবং অতি সজ্জন ব্যক্তি। কলঙ্কের কালিমা তার চরিত্রে একটুও স্পর্শ করেনি। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলব, এত বড় জেলার কার্যভার নিয়ন্ত্রণ করার মতো সামর্থ তাঁর নেই। সেই রিপোর্টের প্রত্যাশিত ফলই ফলতে দেখা গেল। সর্দারজীকে অপেক্ষাকৃত একটা ছোট জেলায় বদলি করে দেওয়া হল। রাগে রমা সর্দারজীকে বলে, আমি কি বলি জানো, এ তোমার অপরাধের শাস্তি নয়, এতো তোমার সততার শাস্তি।

১৯১৫ সালে 'প্রেম পচ্চিছি'র প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয় *নমক কা দারোগা* (نمک کا داروغہ) গল্পটি। গল্পে প্রেমচাঁদ একজন সৎ পুলিশ অফিসারকে ঘুষ প্রস্তাবে ও চাকরি হতে ইস্তফা দিয়ে সামাজিক ভাবে হেয় প্রতিপন্যের চিত্র তুলে ধরেছেন। নিমক নামক স্থানে একটি দপ্তর খোলা হলে অনেকেই এর দারোগা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতে লাগলো। বংশীধর নামক একজন নিমোকের দারোগা হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে গেলেন। ছ'মাসের মধ্যেই তিনি তার উত্তম আচরণ ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে অফিসারদের মোহিত করে ফেলেন। একদিন বংশীধর নিমকের দপ্তর থেকে মাইল খানেক পূর্বে যমুনা নদীতে পন্ডিত অলোপীদীন নামক এলাকার সবচেয়ে নামী জমিদারের অবৈধ ব্যবসা জব্দ করেন। উল্লেখ্য অলোপীদীনের কাছে ছোট বড় প্রায় অনেকেই ঋণী। এ অঞ্চলে তার লাখ লাখ টাকার লেনদেন। বংশীধর অলোপীদীনকে অবৈধ মালামালসহ আটক করলে সে নিজের সম্মান রক্ষার জন্য বংশীধরকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করে বলে,

"بابو صاحب ایشور کے لیے مجھ پر رحم کیجیے، میں پچیس ہزار پر معاملہ کرنے کو تیار ہوں۔"

"غیر ممکن۔"

"تین ہزار۔"

"غیر ممکن۔"

"کیا چالس ہزار بھی ممکن نہیں؟۔"

"چلس ہزار نہین چالیس لاکھ بھی غیر ممکن۔ بدلو سنگ اس شخص کو فورًا احراست میں لے لو میں اب ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتا۔" [৯২]

(বাবুসাহেব, ঈশ্বরের দোহাই, দয়া করুন, পঁচিশ হাজারে রফা করতে আমি রাজি আছি।
সে অসম্ভব।
তিরিশ হাজারে?
কোনো মতেই সম্ভব নয়।
চল্লিশ হাজারেও কি নয়?
চল্লিশ হাজার কেন, চল্লিশ লাখেও অসম্ভব। বদলু সিংহ, এই লোকটাকে এক্ষুনি গ্রেপ্তার কর। আমি আর একটা কথাও শুনতে চাই না।)

অনেক ভাবে আলোপীদীন বংশীধরকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু বংশীধর ছিলেন সৎ ও নিষ্ঠাবান। ঘুষ নেওয়ার প্রতি তার কোন সদিচ্ছা বা জোর ছিল না। দেশের আইন কানুনের প্রতি তার শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল অপরিসীম। নিজে ঘুষ নিবে না এবং অন্যকে অন্যায় কাজের সুযোগ দিবে না। এ সম্পর্কে মদন গোপাল লিখেন,

> "This judgement is according to the moral law, not just according to law." [৯৩]

বংশীধর তা প্রত্যাখ্যান করে তাকে আদালতে স্বোপর্দ করে। অর্থশালী হওয়ার কারনে অলোপীদীন নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সক্ষম হন। এদিকে ন্যায়নিষ্ঠার পুরস্কার স্বরুপ বংশীধরের চাকুরি চলে যায় এবং সে বাড়ি ফিরে আসে। আসলে,

بنسی دھر نے ثروت اور سوخ سے بیر مول لیا تھا۔ اس کی قیمت دینی واجبی تھی۔ مشکل سے ایک ہفتہ گزرا ہو گا کہ معطلی کا

پردانہ آپہنچا۔ فرض شناسی کی سزا ملی۔ بیچارے دل شکستہ اور پریشان حال اپنے وطن کو روانہ ہوئے۔ [৯৪]

---

[৯২] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'নমক কা দারোগাহ', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ১৬২।
[৯৩] Madan Gopal, *Munshi Premchand: A Literary Biography*, Asia Publishing House, Bombay, 1964. P- 122.

(বংশীধর অর্থের সঙ্গে শত্রুতা বেছে নিয়েছেন। তার মূল্য তাকে পরিশোধ করতেই হবে। বড়োজোর একটি সপ্তাহ কেটেছে কী কাটেনি, সাময়িক বরখাস্তের পরোয়ানা এসে পৌছোয়। কর্তব্য পরায়নতার দণ্ড মেলে। বেচারা ভগ্নহৃদয়ে, শোকে দুঃখে ব্যাথিত মনে বাড়ি ফিরে যান।)

বংশীধরের বাবা মুনশীজী এসকল কথা শুনে বংশীধরকে কড়া কাথা শোনায়। কেননা তিনি অতিমাত্রায় লোভী ছিলেন। গল্পের পরিশেষে দেখা যায় জমিদার অলোপীদীন বংশীধরের কর্তব্যপারয়নতা ও ন্যায় নিষ্ঠায় আকৃষ্ট হয়ে মাসিক ছয় হাজার টাকা বেতনে তাকে তার সম্পত্তির ম্যানেজার নিযুক্ত করেন।

ঘুষের প্রলোভনে সমাজ নির্ধারকরা যদি সমাজ হত্যাকর্তা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষগুলোর অবস্থা কি হবে, তা সকলেরই বোধগম্য। এই বিষয়ের উপর প্রেমচাঁদের আরেকটি গল্প হলো *সত্যাগ্রহ* (ستیا گرہ) । গল্পটি ডিসেম্বর, ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। গল্পে মহামান্য বড়োলাট বাহদুরের আগমনকে কেন্দ্র করে বেনারসের সর্বত্রই আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসীরা ঐ দিন বেনারসে হরতাল পালনের কর্মসূচি দেয়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কোন ভাবেই দোকানিদের হরতাল পালনের প্রতিজ্ঞা থেকে সরিয়ে আনতে পারে না তারা কংগ্রেসীদের আতঙ্কে হরতাল পালনকেই ভালো মনে করতে লাগলো। রায়সাহেব হরনন্দন, রাজা লালচাঁদ ও খান বাহদুর মৌলবি মাহমুদ আলি এসকল কর্মচারিরাও কোন সমাধান দিতে ব্যর্থ। শেষ পর্যন্ত রাজা সাহেব এমন এক বুদ্ধি বের করলেন যে, "কংগ্রেসিরা যেমন ধর্ম ও নীতির কথা বলে হৈ চৈ বাঁধায়। আমরাও যদি ওদের অনুকরণ করি তাহলে ওদের অস্ত্রেই ওদের ঘায়েল করা সম্ভব। এমন কাউকে দিয়ে করতে হবে যে ধর্মের নামে প্রতিজ্ঞা করে বলবে, দোকান না খুললে প্রাণত্যাগ করবো। ঐ ব্যক্তিকে অবশ্যই ব্রাহ্মণ হতে হবে। তার এই প্রস্তাবে সকলেই একমত পোষণ করলো এবং রায় সাহেবের প্রস্তাবে পন্ডিত মোটেরাম শাস্ত্রীকে নির্ধারণ করা হল। পন্ডিতজির কাছে রাজাসাহেব বর্তমান সমস্যাটি উপস্থাপন করলেন এবং পণ্ডিত রাজার দেওয়া টাকার লোভে এই কাজ করতে রাজি হয়ে যায়,

موٹے رام۔ صاحب میں چھپے دھن کا پتا لگا سکتا ہو۔ پتروں (آباؤ اجداد) کو بلا سکتا ہوں صرف گن کا گاہک چاہیے۔ سنسار میں گنوانوں کی کمی نہیں ہے۔ گن کے پارکھیوں کی کمی ہے۔ "گن نا ہرانو گن گاہک ہرانو ہے۔"

راجا۔ بھلا اس انوشٹھان کے لیے آپ کو کیا بھینٹ کرنا ہوگا۔

موٹے رام۔ جو آپ کی مرضی ہو۔

راجا۔ کچھ بتلا سکتے ہیں کہ یہ کوں سا انوشٹھان ہوگا۔

موٹے رام۔ بلا بھوجن کے برت کے ساتھ منتروں کا جاپ ہوگا۔ سارے شہر میں ہلچل نہ مچادوں تو موٹے رام نام نہیں۔

---

[৯৪] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'নমক কা দারোগাহ্', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ১৬৪।

راجا۔ تو پھر کب سے۔

موٹے رام۔ آج ہی ہو سکتا ہے۔ہاں پہلے دیوتاؤں کے "آواہن" (بلانے) کے لیے کچھ روپے دلا دیجیے۔ [৯৫]

(মোটেরাম- সাহেব, আমি গুপ্তধনের সন্ধান দিতে পারি, পূর্ব পুরুষদের এনে হাজির করতে পারি। চাই কেবল সমজদার। সংসারে গুণী লোকের অভাব নেই, অভাব গুণগ্রাহীর গুন হারায় না, হারায় গুণের সমজদার।

রাজা- আচ্ছা, এই ব্রতের জন্যে আপনাকে দক্ষিণা কত দিতে হবে ?

মোটেরাম- ভক্তি করে যা দেবেন।

রাজা- কিন্তু বলা যাবে কি ব্রতটি কী রকম হবে ?

মোটেরাম- অনশন ব্রত চলবে, সেই সঙ্গে চলবে মন্ত্র জপ। সারা শহরে যদি হইচই না ফেলতে পারি, তবে আমার নাম মোটেরাম নয়।

রাজা- তাহলে কখন থেকে ?

মোটেরাম- আজ থেকেই হতে পারে। হ্যাঁ, প্রথমেই দেবতাদের আহ্বানের নিমিত্তি কিছু টাকা দিয়ে দেবেন।)

স্ত্রীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বৃদ্ধ পন্ডিত এই কাজ করতে প্রলুব্ধ হলেন এবং ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জানিয়ে দিলেন সন্ধ্যায় পন্ডিত মোটেরামা টাউন হল ময়দানে দেশের রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে ভাষণ দিবেন। আর সেই ভাষনের সময় মোটেরাম সকলকে আন্দোলন থেকে সরে যার যার কাজে মনোনিবেশ করতে বলেন। যার ফলে তার ও পন্ডিতের মনের ইচ্ছা সামান্য কয়েকটি উপঢৌকনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হলো।

লোভ লালসাকে উপজিব্য করে এক শিক্ষণীয় পারিবারিক গল্প হলো *লটারী* (لاٹری)। যা অক্টোবর, ১৯২৫ সালে 'হংস' পত্রিকায় প্রথমে হিন্দিতে এই ছোটগল্পটি প্রকাশিত হয়, পরে 'জাদেরাতে' উর্দুতে প্রকাশ করা হয়। গল্পে দেখা যায়- গল্পের প্রধান চরিত্র বিক্রমের পরিবারের সবাই লটারি টিকেট কিনে। লটারির পুরস্কার নিয়ে প্রত্যেকের মাঝেই অনেক জল্পনা কল্পনা চলতে থাকে। লেখক ও তার বন্ধু বিক্রম মিলে দশ টাকায় একটি লটারির টিকেট কিনে। লটারির অর্থপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় বিক্রমের বাবা বড় ঠাকুর, কাকা ছোট ঠাকুর ধর্মীয় কাজকর্মে অধিক মনযোগের সহিত করতে লাগলো। বিক্রমের বড়দা প্রকাশের সাধু সন্নাসীদের উপর আস্থা থাকায় সে বক্কর বাবা নামক এক সন্নাসীর কাছে যায় এবং তার আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়। লটারির অর্থলাভের আশায় সে সকল আঘাত সহ্য করে। অপরদিকে বিক্রমের বোন কুন্তি এবং মা ঠাকুরের নামে পূজা অর্চনা বেশি করে করতে লাগলো। তাদের অবস্থা লেখক তার গল্পে তুলে ধরেছেন এভাবে,

بکرم کے والد ٹھاکر کہلاتے تھے، چچا چھوٹے ٹھاکر، دونوں ہی ملحد تھے، پکے ناستک دیوتاؤں کے دشمن، پوجا پاٹ کا نداق اڑانے والے، گنگا کو پانی کی دھارا اور تیر تھوں کو سیر کے مقامات سمجھنے والے۔ مگر آج کل دونوں ہی معتقد ہو گئے تھے۔ بڑے ٹھاکر صاحب علی الصبح ننگے پاؤں اشنان کرنے جاتے،

---

[৯৫] প্রেমচাঁদ, 'সত্যাগ্রহ', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ২১৯-২২০।

اور ادھر سے شہر کے دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہوئے کوئی گیارہ بجے گھر لوٹتے تھے۔ چھوٹے ٹھاکر گھر ہی میں بیٹھے ہوئے روز ایک لاکھ رام نام لاکھ رام نام لکھ کر تب جل پان کرتے۔ دونوں صاحب شام ہوتے ہی ٹھاکر دوارے میں جا بیٹھتے اور بارہ بجے رات تک بھاگوت کی کتھا سنا کرتے تھے۔ بکرم کے بھائی صاحب کام تھا پرکاش، انہیں سادھو سنتوں سے عقیدت ہو گئے تھی انہیں کی خدمت میں دوڑتے رہتے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ جہاں کسی مہاتما نے آشیر واد دیا اور ان کا نام آیا۔ رہیں بکرم کی اماں جی ان میں ایسا کوئی خاص تغیّر تو نہ تھا۔ ہاں آج کل حرات زیادہ کرتی تھیں اور برت بھی زیادہ رکھتی تھیں۔ [৯৬]

(বিক্রমের বাবা বড়োঠাকুর মশাই আর কাকা ছোটোঠাকুর মশাই দুজনেই ছিলেন স্থিতাবস্থায় বিশ্বাসী। যে মানুষ দুটি পূজা পার্বণের নামে হাসিঠাট্টা করতেন, নিজেদের পুরোদস্তুর নাস্তিক বলতেন তাঁরা ইদানিং দুজনেই বড়ো নিষ্ঠাবান আর ঈশ্বর ভক্ত হয়ে পড়েছেন। বড়োঠাকুর মশাই প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করতে যান, আর মন্দিরে মন্দিরে ঘুরতেন সারা দেহ চন্দন চর্চিত করে দুপুরবেলা বাড়ি ফেরেন। ছোটোঠাকুর মশাই বাড়িতেই গরম জলে স্নান করেন, তারপর গাঁটে গাঁটে বাত থাকা সত্ত্বেও রামনাম লিখতে শুরু করে দেন। রোদ্দুর উঠলে পার্কের দিকে বেরিয়ে পড়েন, পিঁপড়াকে আটা খাওয়ান। সন্ধ্যে হলেই দু-ভাই মন্দিরের দরজার কাছে গিয়ে বসেন, অর্ধেক রাত্রির পর্যন্ত ভগবৎয়ের কথা শোনেন তন্ময় হয়ে। বিক্রমের বড়দা প্রকাশের সাধু সন্ন্যাসীদের উপরই আস্থা বেশি। সে মঠ মন্দির আর সাধুদের আখড়ায় ও আশ্রমেই বেশির ভাগ সময় কাটায়। মা তো ভোর থেকে অর্ধেক রাত্রির পর্যন্ত স্নান-পূজো-ব্রত ছাড়া আর কিছুই করেন না। এ বয়সেও তার সাজ পোশাকের শখ কম ছিল না, কিন্তু আজকাল একেবারে তপস্বিনী হয়ে গেছেন।)

মানুষ অযথাই লোভকে খারাপ মনে করে। আমার তো মনে হয়, আমাদের এই যে ভক্তি নিষ্ঠা আর ধর্মের প্রতি আসক্তি, সেটা শুধু আমাদের লোভ, আমাদের লালসার জন্যে! আমাদের ধর্ম আমাদের স্বার্থের উপরেই টিকে আছে। লালসা যে মানুষের মন ও বুদ্ধির এমন সংস্কারসাধন করতে পারে, আমার কাছে সে এক সম্পূর্ণ নতুন উপলব্ধি। লোভে পরেও যে মানুষ ধার্মিক হতে পারে বিক্রমের পরিবার তার উদাহরণ। বিক্রম ডাকঘর থেকে খবর নিয়ে আসে যে লটারির টাকা আমেরিকার এক হাবসী পেয়েছে। তখন প্রত্যেকেই ঠাকুরের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং প্রকাশ বক্কর বাবাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য চলে যায়। মা ঠাকুরকে বেইমান হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বড় ঠাকুর মন্দির থেকে পুরোহিতকে বরখাস্ত পর্যন্ত করে দেন। এবং বলেন,

بڑے ٹھاکر صاحب نے پجاری جی پر غصّہ اتارا اور انہین برخاست کر دیا اسی لیے تمہیں اتنے دنوں سے پال رکھا ہے حرام کا مال کھاتے ہو اور چین کرتے ہو۔ [৯৭]

(বড়োঠাকুর রেগে মেগে মন্দিরে গিয়ে পুরোহিতকে বরখাস্ত করে দিয়ে বললেন- এইজনে তোমায় এতদিন ধরে পুষছি! হারামের মাল খাচ্ছ আর ফুর্তি করছ!)

লটারিকে কেন্দ্র করে পর্বতের মতো উঁচু আশা মুহূর্তেই সরষের রূপ নিলে নিজেদের বোকামির কথা মনে করে বিক্রম এবং লেখক মজা পেলেন।

---

[৯৬] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'লটারী', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৩৭৭।
[৯৭] জি. কে. মানিক টালা, 'লটারী', *প্রেমচান্দ ঃ খায়াত-ই-নূর*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ১৯৯৩, পৃ. ১৭৭।

লোভ মানুষকে পরিবার পরিজন ও আপজনদের থেকে কে দূরে ফেলে দিতে দ্বিধাবোধ করেনা। অর্থে লিপ্সা সবারই কম বেশ থাকে। তা গুরুজন, বন্ধু বা সন্তান যেই হোক না কেন। অর্থের লিপ্সার কারণে বাবাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য জেলে কাটাতে হয়। আর নিজেকে পরিবার থেকে অনেক দূরে থাকতে হয়। আসলে অর্থই সকল অনর্থের মূল। তবে মানুষের জীবনে সমান্য কিছু অর্থ বা ইচ্ছা থাকলে যে অনেক দূরের পথ পারি দেওয়া যাওয়া সম্ভব তারই উজ্জ্বল একটি সৃষ্টি হলে প্রেমচাঁদের *কাপ্তান* (کپتان) গল্পটি। গল্পটি সেপ্টেম্বর ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়। স্কুলের নাম শুনলেই জগৎ সিং এর গায়ে জ্বালা আসত। সে ছিল অন্যান্য বাচ্চাদের থেকে আলাদা। তার জন্য বাবা মা ঘরে কোন পয়সা-কড়ি রাখতে পারত না। সুযোগ পেলেই ঘর থেকে টাকা-পয়সা চুরি করতে তার কোনো দ্বিধা হতো না। নগদ পয়সা কড়ি না পেলে থালা-বাসন, ঘটি-বাটি, জামা-কাপড় তুলে নিয়ে যেতেও তার কোনো রকম সংকোচ ছিল না। তার বাবা ঠাকুর ভক্ত সিং ছিলেন স্থানীয় ডাকঘরের কেরানী। তিনি খুব উদার মনের মানুষ ছিলেন। কার ও মনে ব্যথা বা আঘাত দিতে পারতেন না। জগৎ সিং এর বোম্বে যাওয়ার খুব শখ ছিল। একদিন তার ভাগ্য ফিরলো। দুপুরে ভক্ত সিং যখন ডাকঘর থেকে বাড়িতে খেতে এলেন তখন তার পকেটে একটা জরুরী রেজিস্ট্রিকৃত খাম ছিল। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খামটা তিনি বাড়িতে নিয়ে এলেন। কিন্তু বাড়তে এসে জামার পকেট থেকে সেটা বার করে একটা নিরাপদ জায়গায় রাখতে ভুলে গেলেন। ফলাফলে উগ্র ছেলের যা করার তাই করলো, প্রেমচাঁদের ভাষায়,

اس پر کئی آنے کے ٹکٹ تھے۔ ٹکٹوں کے لالچ میں اس نے لفافہ اڑالیا۔ کئی بار وہ ٹکٹ چرا کر آدھے واموں پر بیچ دیتا۔ جب لفافے پر سے ٹکٹ آسانی سے نہ ابھر سکے تو اس نے لفافہ پھاڑ ڈالا۔ اس میں سے ایک سو روپے کا نوٹ نکل پڑا۔ جگت سنگھ کی باچھیں کھل گئیں۔ بمبئی کی سیر کی اسے بہت خواہش تھی۔ اسی دن چپکے سے بمبئی چل دیا۔ گھر پر کسی سے کچھ نہ کہا۔ دوسرے دن منشی بھگت سنگھ پر سرقہ اور غبن کا مقدمہ دائر ہو گیا۔ [৯৮]

(খামের ওপর বেশ কিছু দামি ডাকটিকিট লাগানো ছিল। টিকেটের লোভে সে চিঠিগুলো নিয়ে নেল, এর আগে জগৎ বেশ কয়েকবার এরকম ছাপ না মারা টিকিট খুলে নিয়ে অর্ধেক দামে বিক্রি করে দিত। এবার কিন্তু তা না করে খামটাই ছিড়ে ফেললো সে, তার সঙ্গে সঙ্গে খামের ভেতর থেকে একটি একশ রুপির নোট বেরিয়ে এলো। সে তাদেখে অবাক হয়। বোম্বে যাওয়ার ইচ্ছা তার অনেক আগে থেকেই ছিল। সেই দিনই সে বোম্বে চলে গেল। ঘরের কাউকেই সে কিছু বলেনি। আর পরদিন তহবিল তছরূপের দায়ে মুন্সী ভক্ত সিংকে পুলিশ গ্রেফতার করে স্থানীয় থানায় চালান করে দিলো।)

বোম্বে গিয়ে জগৎ সিং এর প্যারেড মাঠে ফৌজদের প্যারেড দেখে ভাল লাগল। এক সেনা নায়েককে তার ফৌজী কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি তাকে ফৌজীতে ভর্তি করে দিল। তিন মাস কাজ করার পর তার মন বাড়ীর

---

[৯৮] প্রেমচাঁদ, 'কাপ্তান', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ১৮০।

দিকে ছুটলে বড় অপারেশন আছে বলে সেনা নায়েক জগৎকে না যাওয়ার অনুমতি দেয়। অপারেশন জগৎ কৃর্তিত্বের সাথে পালন করার কারণে তাকে ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত করা হয়। চার বছরের উপর সময় কেটে যাওয়ার পর বাবার কথা তার মনে পড়লো। তার চুরির কারনে বাবার কি অবস্থা তা মনে করে তাঁর অশ্রু ঝরালো। এইদিকে ভক্ত সিং এরও হাজত বাস অবসান ঘটল। কিন্তু সে মনে মনে ভাবে তার তো কেউ নেই। কে তাকে বরণ করে নিয়ে যাবে ? এক সময় রাত্রির অবসান হয়ে ভোর হলো, প্রথম সূর্যের আলো ফুটে উঠল। জেলার সাহেব এলেন। ওদিকে কয়েদিরা সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জেলার সাহবে যাদের মেয়াদ শেষ হয়েছে তাদের নাম ডেকে চলেছেন এক এক করে। অবশেষে ভক্ত সিং এর নাম ডাকা হল। সব কয়েদিকে তার সন্তানেরা তাদের দেখা মাত্রই জড়িয়ে ধরে ও তাদের মিষ্টি মুখ করিয়ে বরণ করে নিচ্ছে। কিন্তু ভক্ত সিং এর কেউ নেই তাই সে মাথা নিচু করে জেল থেকে বের হয়ে দেখল,

بھگت سنگھ نے اسے غور سے دیکھا اور تب چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے ارے جگت سنگھ ! بھگت سنگھ ایک لمحے تک خاموش کھڑے رہے۔ جذبات حواس پر غالب آ گئے۔ یکایک ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چہرہ پر سرخی کی جھلک نظر آئی۔ وہ جھکے اور بیٹے کو اٹھا کر چھاتی سے لگ لیا اور تب ایک پر غرور نگاہ سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف تاکتے ہوئے بولے۔ نارائن ! تم نے مجھ پر بڑی دیا کی۔ [৯৯]

(বৃদ্ধ ভক্ত সিং ভাল করে তাকিয়ে দেখতে গিয়েই চমকে উঠলেন, তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন ? ঘটনার আকস্মিকতায় কোনো রকমে কাটিয়ে উঠে তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'জগৎ, তুই এখানে?'
জগৎ সিং নীরবে দাড়িয়ে রয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরল। তার দু'চোখ বেয়ে তখন অশ্রুর বাদল নামলো। চেহারায় তার আন্দধারা দেখা গেল। সে তখন জগৎকে তার বুকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর সে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত অপলক ভাবে দেখতে লাগলো এবং দু'হাত আকাশের পানে তুলে বলতে লাগলো। নারায়ন! তুমি আমার প্রতি শেষ পর্যন্ত দয়া করলে।)

প্রেমচাঁদের আরেকটি সামাজিক শ্রেষ্ঠ গল্প হল *পঞ্চায়েত* (پنچایت)। গল্পটি প্রথমে মে-জুন, ১৯১৬ সালে 'জামানায়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পরে 'প্রেম বত্তিছি' জামানা প্রেস থেকে আগস্ট, ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়। হিন্দিতে 'পঞ্চ পরমেশ্বর'তে মাসিক স্বরস্বতি পত্রিকায় জুন, ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়।[১০০] এই গল্পে দেখানো হয়েছে, মানুষের বিবেক কিভাবে পার্থিব লালসা, কুসংস্কার ও রাগের উপর স্থান পায়। তাছাড়া ভারতীয় সমাজ কাঠামোতে পঞ্চায়েতের স্থান কত উঁচুতে তাও নির্ধারিত হয়েছে এই গল্পে। পঞ্চায়েতকে গ্রামের পাঁচজনের একটি সালিশী বোর্ড বলা যায়। সেখানে গ্রাম্য সমস্যা ও বিবাদ মিটানো হয়। আলাগো চৌধুরী আর জুম্মন শেখ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু

---

[৯৯] প্রেমচাঁদ, 'কাপ্তান', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ১৮৪-১৮৫।
[১০০] মানিক টাল, *প্রেমচাঁন্দ : কুচ নয়ি মোবাহেছ*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, আক্টোবর- ১৯৮৮, পৃ. ১৩৬।

পঞ্চায়েতে এক বুড়ির সালিশীতে আলাগো চৌধুরী বন্ধুর পক্ষে না গিয়ে বুড়ির পক্ষে রায় দেয়, কারণ বুড়ির বিষয় সম্পত্তি জুম্মন লিখিয়ে নিয়েছে। জুম্মনকে জমি লিখে দেওয়ার আগ পর্যন্ত বুড়ির প্রতি বেশ নজর দেয়া হতো, কিন্তু জমিজমা লিখে দেয়ার পর তার প্রতি নজর দেয়া হয় না। তার প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়। তখন বুড়ি রেগে গিয়ে পঞ্চায়েতে নালিশ করার সিদ্ধান্ত নিলে জুম্মনের দৃষ্টিভঙ্গী প্রেমচাঁদ এই ভাবে উপস্থাপন করেন,

جامہ سے باہر ہو کر پنچایت کی دھمکی دی۔ جمن ہنسے۔ وہ فاتحانہ ہنسی جو شکاری کے لبوں پر ہرن کو جال کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نظر آتی ہے۔ کہاہاں۔ ضرور پنچایت کرو فیصلہ ہو جائے مجھے بھی رات دن کا وبال پسند نہیں۔ [১০১]

(মাসি চটে যায়। পঞ্চায়েত করার হুমকি দেয়। জুম্মন হাসে, হরিণকে জালের দিকে এগোতে দেখলে শিকারি যে ভাবে হাসে। বলে- হ্যাঁ, পঞ্চায়েত করবে বইকি। ফয়সালা হয়ে যাক। আমারও রাতদিনের এই খিটিমিটি ভালো লাগে না।)

বুড়ি পঞ্চায়েতে এ বিষয়ে নালিশ করলে আলাগো চৌধুরী বুড়িকে মাসিক খোরপোষ দেয়ার নির্দেশ দেয়; অন্যথায় বুড়ির জায়গা-জমি যা জুম্মন নিজের নামে লিখে নিয়েছিল তা বাতিল বলে গণ্য হবে। জুম্মন বন্ধুর রায়ে হতভম্ব হয়ে যায়। তার বিশ্বস্ত বন্ধু তার বিরুদ্ধে রায় দিল। সবই 'কলিযুগ'। জুম্মন সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এক বছর আগে আলাগো চৌধুরী এক জোড়া বলদ কিনেছিল। হঠাৎ একটি বলদ মারা যাওয়ার ফলে তার হালের বলদের জোড়া ভেঙে যায়। পরে বলদটি মুদির দোকানদার সমজু শাহের কাছে বিক্রি করে দেয়। সমজু গরুর গাড়ি চালানোর জন্যই এই বলদ কিনেছিল। বলদের দাম দেড়শ টাকা ধার্য হয়। এক মাসের মধ্যে সে টাকা পরিশোধ করবে। সমজু গরুর গাড়ি নিয়ে দৈনিক তিনবার শহরে আসা-যাওয়া করতো আর দোকানের মালামাল আনতো। ফলে বলদটি অতিরিক্ত খাটুনি কারনে একদিন পথেই বলদটি মারা যায়। সমজু মনে মনে আলাগোকে তিরস্কার করতে লাগলো। তার ধারণা, আলাগো তার কাছে রোগা বলদ বিক্রি করেছে। সমজু ও তার স্ত্রী আলাগোকে বলদের দেড়শ টাকা দিতে অস্বীকার করে, উল্টে আরও বকাবকি করে। অবশেষে তাদের ঝগড়া পঞ্চায়েত পর্যন্ত গড়ায়। পঞ্চায়েতে জুম্মনকে বিচার করতে দেয়া হয়। পঞ্চায়েতের সদস্যদের সর্বসম্মত অভিমত হলো, সমজুকে নির্ধারিত বলদের দাম আলাগোকে দিতে হবে। তদুপরি জীবের প্রতি নির্দয় ব্যবহারের জন্য জরিমানা হওয়া উচিত।

জুম্মন দুই পক্ষের বক্তব্য শুনে রায় ঘোষণা করে। সমজু যখন আলাগো চৌধুরীর কাছ থেকে বলদ কিনেছিল, তখন বলদটি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। কিন্তু যেহেতু বলদকে যথারীতি আহার দেয়া হয়নি এবং মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে

[১০১] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'পঞ্চায়েত', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ২০৩।

বলদটি মারা গেছে, অতএব সমজুকে বলদের পুরো মূল্য আলাগো চৌধুরীকে দিতে হবে। আলাগো উত্তেজিত হয়ে "পঞ্চ পরমেশ্বর" জিন্দাবাদ ধ্বনি তোলে। পরে জুম্মনকে বুকে জড়িয়ে ধরে। জুম্মন আলাগোকে বলল,

"بھیا! جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے، میں دل سے تمھارا جانی دشمن تھا۔ مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ
پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے نہ دشمن، انصاف کے سوا اور اسے کچھ نہیں سوجھتا۔
یہ بھی خدا کی شان ہے۔ مجھے یقیں آگیا کہ پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہے۔" [১০২]

("ভাই, যখন থেকে তুমি আমার পঞ্চায়েত শুরু করলে, আমি তোমাকে এতদিন আমার শত্রু মনে করতাম। আসলে পঞ্চায়েতের বিচারের আসনে বসলে কেউ কারও বন্ধু বা শত্রু থাকতে পারে না। কারণ তখন সুবিচারই সবার উর্ধে স্থান পায়। এটা খোদারও রায়। আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, পঞ্চায়েত হুকুম আল্লাহর হুজুম।")

এরপর আলাগোর চোখে অশ্রু দেখা দেয়। দুজনার বন্ধুত্ব পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে উঠে যা এতকাল শুকিয়ে গিয়েছিল। প্রেমচাঁদ ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে তার কথাসাহিত্যের একটি প্রধান বিষয় করেছেন। সাম্প্রদায়িক সমস্যার নানা দিকের চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন তার ছোটগল্পে। প্রেমচাঁদ হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ, কারণ ও ফল অনুধাবন করতে পেরেছিলেন গভীরভাবে এ সমস্যা থেকে ভারতবাসীর মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করেছেন তিনি। এমন কি যে সকল গল্পে প্রেমচাঁদ সমসাময়িক মুসলমানদের গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র কিংবা ইসলামী কিংবদন্তীর চিত্র অঙ্কন করেছেন সেখানে তাঁর উদ্দেশ্যই ছিল সাম্প্রদায়িক সমস্যা থেকে মুক্তি। তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির উপর বেশ গুরুত্ব দেন। তিনি মনে করেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকলে সমাজে শান্তি বিরাজ করবে, কোনো হানাহানি বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দিবে না। প্রেমচাঁদ তাঁর গল্পের মাধ্যমে এ বিষয়টি বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। তেমনি একটি গল্পের কথা এখানে তুলে ধরা যায়, যার নাম হল *মন্দির আউর মসজিদ*।

মন্দির আউর মসজিদ (*مندر اور مسجد*) গল্পটি এপ্রিল ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়। গল্পে প্রেমচাঁদ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের অন্যের ধর্মের প্রতি সম্মানবোধের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি সকল ধর্মের উপাসনা গৃহের পবিত্রতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং সকল উপাসনা গৃহকে ঈশ্বরের ঘর বলে আখ্যায়িত করেন। এই গল্পে প্রেমচাঁদ এমন একজন আদর্শ মানুষের চরিত্র গড়ে তোলেন, নিজের ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থেকেও অন্যের প্রতি যিনি সম্মানবোধ পোষণ করেন।

---

[১০২] প্রেমচাঁদ, 'পঞ্চায়েত', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১০, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৩৮।

গল্পের নায়ক চৌধুরী ইতরত আলী প্রকৃত ধার্মিক মুসলিম ছিলেন। ধর্মীয় সংকীর্ণতা তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেনি। তিনি নিয়মিত নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, কোরআন পাঠ করেন। পাশাপাশি তিনি প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করেন, গঙ্গাজল পান করেন। তাঁর বাগানে এক পন্ডিত সারা বৎসর দুর্গাস্তব পাঠ করে। তাঁর বাড়িতে যেমন ফকির দরবেশদের তেমনি সাধু সন্ন্যাসীদের আদর সৎকার হয়। আরো দেখা যায়,

ہندو آسامیوں کی بارات میں ان کی اور سے کوئی نہ کوئی ضرور شریک ہوتا تھا۔ نیوتے کے روپے بندھے ہوئے تھے، لڑکیوں کے وواہ میں کنیادان کے روپے مقرر تھے، ان کو ہاتھی، گھوڑے، تنبو، شامیانے، پالکن نالکی، فرش جازیمیں، پنکھے جنور، چاندی کے محفلی سامان اس کے یہاں سے بنا کسی دقّت کے مل جاتے تھے، مانگنے بھر کی دیر رہتی تھے۔ اس دانی، ادار، یشوی (نیک) آدمی کے لیے پرجا بھی پرانڑ دینے کو تیار رہتی تھے۔ [১০৩]

(হিন্দুদের বিয়েতে তাঁর তরফে কেউনা কেউ অবশ্য অংশ গ্রহণ করত। বিবাহের নিমন্ত্রণে উপহারের টাকা ধরাই থাকত, মেয়েদের বিবাহে কন্যাদানের টাকা নির্দিষ্ট করা থাকত। হাতি, ঘোড়া, তাঁবু, শামিয়ানা, পালকি, শিবিকা, ফরাশ, জাজিম, পাখা, চামর, মজলিমে ব্যবহার্য রুপোর জিনিসপত্র তার ওখান থেকে চাওয়ামাত্র পেতে কোনো অসুবিধাই হত না। এমন দানী, উদার কীর্তিমান পুরুষের জন্য প্রজারা প্রাণ দিতেও তৈরি থাকত।)

চৌধুরীর চাপরাসী ভজনসিংহ হত্যা করেছে তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী জামাতাকে মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দাঙ্গা করার অপরাধে। জামাতার মৃত্যুতে বেদনাহত হলেও চৌধুরী ভজনসিংহকে রক্ষা করেছিলেন। ভজনসিংহের প্রতি তাঁর দরদ ছিল একথা সত্য, কিন্তু সে দরদের কারনে তিনি তাকে রক্ষা করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেক উপাসনা গৃহই খোদার ঘর। তাঁর মতে, মন্দির অপবিত্র করে তাঁর জামাতা যে পাপ করেছে, ভজনসিংহ তাকে সেই পাপের শাস্তি প্রদান করেছে। তাই ভজনসিংহ ছিল তাঁর নিকট নিরপরাধ। একই অপরাধ যখন ভজনসিংহ করে, মসজিদে প্রবেশ করে দাঙ্গা করে, তখন চৌধুরীর মনে প্রশ্ন জাগে,

مندر بھی خدا کا گھر ہے اور مسجد بھی۔ مسلمان کسی مندر کو ناپاک کرنے کے لیے جس سزا کے لائق ہیں، کیا ہندو مسجد کو ناپاک کرنے کے لیے اسی سزا کے لائق نہیں۔ [১০৪]

---

[১০৩] প্রেমচাঁদ, 'মন্দির আউর মসজিদ', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৪৫৬।

[১০৪] মদন গোপাল, *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁন্দ*, *ভলিয়ম* - ১১, *মন্দির আউর মসজিদ*, কউমি কান্সিল বরায়ে ফুরুগ উর্দু যবান, নয়া দিল্লী, অক্টোবর ও ডিসেম্বর ২০০১, পৃ. ৪৬৩।

(মন্দিরও খোদার ঘর এবং মসজিদও। যদি মুসলমানদের মন্দির নাপাক করার জন্য যে শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে কেন হিন্দুদের দ্বারা মসজিদ নাপাকে শাস্তি দেওয়া হবে না।)

প্রেমচাঁদ ভারতের হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর ছোটগল্পে সাম্প্রদায়িকতার নিষ্ঠুর কদর্য রূপ অঙ্কন করেছেন। তিনি জানতেন, ইংরেজ তার সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখবার জন্য হিন্দু-মুসলিম বিভেদের সৃষ্টি করেছে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ছাড়া যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি সম্ভব নয় একথাও তাঁর অজানা ছিল না। প্রেমচাঁদ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে ভারতের মুক্তির পথ অনুসন্ধান করেছেন, অন্যদের সেই পথের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধের মতো ছোটগল্পের মাধ্যমেও ভারতের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কে সাম্প্রদায়িকতার কলুষিত মনোভঙ্গি থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন।

ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে প্রেমচাঁদের আরো ছোটগল্প হল *কেহের খোদা কা* (*قہر خدا کا*)। এটি অক্টোবর, ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত দীননাথ তার স্ত্রী গৌরীকে একটি সুখবর দেন যে, তার ৫০ টাকা বেতনের একটি চাকরি হয়েছে। এই খবরটা শুনে গৌরী খুব খুশি হন আর ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাস আর ও বেড়ে যায়। এদিকে দীননাথ ধার দেনা পরিশোধ করে কিছু টাকাও সঞ্চয় করেছেন। স্ত্রীর সাথে টাকা-পয়সার খরচ নিয়ে মাঝে মাঝে ঝামেলা হলেও সে সংসার জীবনে সুখি। এই সুখ দীননাথের মধ্যে প্রবল পরিবর্তন নিয়ে আসে। সে হঠাৎ করে অনেক ধার্মিক হয়ে উঠে। নাস্তিক বন্ধুদের কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমানে তর্ক করতে ছাড়েন না। কিন্তু আস্তে আস্তে দীননাথের ভীতরে ধর্ম নিয়ে বর্তমান চিন্তার সাথে পরবর্তীতে মিল খুজে পাওয়া যায় না। প্রেমচাঁদের ভাষায়,

دیناناتھ اب پکاخدا پرست بن گیا تھا۔ ایشور کے رحم وانصاف میں اب اسے کوئی شک نہ تھا۔ روز سندھیا کرتا اور بلاناغہ گیتا پڑھتا۔ ایک دن اس کے منکر دوست نے جب ایشور کی مذمّت کی تو اس نے کہا "بھائی صاحب اس کا تو آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ایشور ہے یا نہیں۔ منکر اور موخد دونوں کے پاس فولاد کی سی دلیلیں موجود ہیں، لیکن میرے خیال میں موحد ہو کر رہنا منکر رہنے سے کہیں زیادہ مصلحت آمیز ہے۔ اگر ایشور کا وجود ہے تو منکروں کو دوزخ کو سوا اور کہیں کا ٹھکانہ نہیں۔ موخد کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں۔ ایشور ہے تب تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ اس کے لیے جنّت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایشور نہیں تب بھی اس کا کیا بگڑتا ہے؟ دو چار منٹ کا وقت ہی تو جاتا ہے منکر دوست اس کی دوزخی دلیل پر منہ بنا کر چلا گیا۔ ایسوں کے لئے اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا ۔[১০৫]

[১০৫] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'কেহের খোদা কা', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৭৬৪-৭৬৫।

(সে এখন ঘোর আস্তিক হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরের কৃপা বা ন্যায় বিচারের প্রতি তার আর কোনো আশঙ্কা নেই। প্রতিদিন নিয়ম করে সন্ধ্যা আহ্নিকসারে সে এবং গীতা পাঠও করে। একদিন তার এক নাস্তিক বন্ধু ঈশ্বরকে এবং নিন্দে করা দীননাথ বলেছিল, 'দেখো বন্ধু, আজ পর্যন্ত তুমি, আমি বা কেউই ঈশ্বরের সন্ধান পেলাম না, তাঁর অস্তিত্ব যা কিছু আমরা মনেমনেই স্বীকার করে নিই। আস্তিক ও নাস্তিক দু'পক্ষেরই যুক্তি অকাট্য, খুব বলবো, আস্তিক হওয়া অনেক ভাল এই কারণে যে, যদি ঈশ্বর কখনো কৃপা করে দেখা দেন, তাহলে সেটাই হবে আমার জীবনে পরম সৌভাগ্য। কিন্তু নাস্তিকের তো নরকেও স্থান হবে না। অস্তিকের বাড়তি সান্তনা হল এই যে, ঈশ্বর আছেন কি নেই তা তার বিচার্য নয়, তিনি আছেন ধরে নিয়ে তাঁর চিন্তায় কিছুটা সময়তো আনন্দে কেটে যায়। দীননাথের যুক্তিটা মনঃপুত না হওয়ায় নাস্তিক বন্ধু মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে চলে গেলো। ঈশ্বরের উপর তার কাছে কোন উত্তর নাই।)

যথারীতি দীননাথের চাকরির উন্নতি হয়। কিছুদিন পর দীননাথের বাচ্চার ম্যালেরিয়া হয়। সে ভাবে এটা তার পাপের ফল। কিন্তু গৌরী তার মনকে শক্ত করে ধরে রাখে। কিছুদিন পর বাচ্চার ম্যালেরিয়া ভাল হয়ে যায়। আয়ু থাকায় এ যাত্রায় সে বেঁচে যায়। সুস্থ হওয়ার পর গৌরী তাকে ৫০ জন ব্রাহ্মণ খাওয়ানোর মানতের কথা বলে। কিন্তু দীননাথ এবার ঈশ্বরকে অস্বীকার করে। তার ভাষায়- "ভুল তোমার ধারণা। আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি তোমার ভগবানের দয়ায় নয়। আসলে আমার পরমায়ু আছে বলেই এ যাত্রায় বেঁচে গেছি।" গৌরী তাকে এসব কথা বলতে নিষেধ করেলে, দীননাথের যুক্তিবাদ জেগে উঠে। তার দৃষ্টিতে ঈশ্বরের চেয়ে বড় নিষ্ঠুর এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। সে ভগবান যেমন দয়ালু। অপর দিকে সহস্রগুন নিষ্ঠুর। এমন ভগবানকে তিনি ঘৃণা করেন। উত্তর পেয়ে যান তিনি। ভজনসিংহকে তার উপযুক্ত শাস্তি দিতে, হত্যা করতে উদ্যত হন। কিন্তু তাঁর অভ্যন্তরের মানবতা তাঁর পথ আগলে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত পারেন না ভজনসিংহকে হত্যা করতে। সত্যিকার ধার্মিক যিনি, তিনি কোনো মানব সন্তানকে হত্যা করতে পারেন না- গল্পকারের এই ইঙ্গিতও পাঠকের নিকট দুর্বোধ্য থাকে না। প্রেমচাঁদ চৌধুরী ইতরত আলীর মতো আদর্শ মানুষ প্রত্যাশা করেন, যে ধার্মিক হয়েও অন্যের ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং সত্যিকার মানব প্রেমিক হয়ে উঠবে।

মুন্সি প্রেমচাঁদ উর্দু গদ্য সাহিত্যের এক বিস্ময়কর কলম জাদুকর। তিনি যে কতটা সমাজ সচেতন ছিলেন তা আলোচ্য আলোচনার দ্বারা সহজেই অনুমেয়। তিনি তার ছোটগল্পের মাধ্যমে সমাজের বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি, সমাজ সম্পর্কে ভারতবর্ষের ধারণা এবং সমাজ সচেতনা মূলক বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরবার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। যার ফলে তাঁর গল্পগুলো শতাব্দী কাল পরেও আজ পর্যন্ত অবিস্মরণীয়।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রেমচাঁদের উর্দু ছোটগল্পে সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য

প্রেমচাঁদ ছিলেন সমাজ সচেতন উচ্চমানের একজন শিল্পী ও ছোটগল্পের একজন স্বার্থক প্রবর্তক। তিনি ছিলেন কালের কষ্টি পাথরে উত্তীর্ণ এক যুগ শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার। তিনি সাহিত্যের বিষয় হিসেবে জীবনের নানামুখী বৈচিত্র্যকে স্বাচ্ছন্দ্রে গ্রহণ করেছেন। ব্যক্তির জীবন অভিজ্ঞতা ও জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে বিচিত্র ঘটনা ও সমস্যার রূপায়নের মাধ্যমে তিনি ছোটগল্পকে সত্যশ্রীয় ও বাস্তবসম্মত করে তুলেছেন। তার অধিকাংশ ছোটগল্পে পেছনে ফেলে আসা গ্রাম ও নগর জীবনের স্মৃতি কাহিনী উদ্ভাসিত হয়েছে। তার গল্পগুলোর বিশেষত্ব এই যে অস্বাভাবিক আচরণের শেষে তা সহমর্মিতায় সিক্ত হয়েছে। কিন্তু অর্থের উম্মাদ নেশার কারণে যে যৌথ পরিবার লুপ্ত হয়েছে, সেখানে তিনি নিরব। বিধবাদের প্রধান সমস্যা ভালবাসার স্বীকৃতি সমাজ দেয়নি। বিধবাদের প্রেম-ভালোবাসা সম্পর্ক স্পষ্ট হলেও ছোটগল্পে প্রণয় পরিণয়ে রূপ লাভ করেনি। জাত বাচাঁনোর অজুহাতে তাকে কঠোর সংযম ও ব্রত পালন করানো হয়েছে। জাতিভেদ নীতির নিষ্ঠুর প্রথায় পিষ্ট হয়ে নিচুজাত ভদ্র সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ও গ্রামের ত্রিসীমানায় বাস করেছে। সামাজিক ভাবে অবমূল্যায়ন করে এদের প্রতি মানবতার চরম বিপর্যয় দেখানো হয়েছে। জমিদারি শাসন ও শোষণের শিকার প্রজারা। শ্রেণী বৈষম্যের কারণে জমিদারি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা নীচু জাতিদের কাছে তাৎকালীন সমাজে সম্ভব ছিল না। ফলে কেই প্রতিবাদ জানাতে পারেনি, নির্যাতিত হয়েছে। জমিদারি মহাজনের শ্রেণী স্বার্থের কারণে নির্যাতিত কৃষকের চরম বিপর্যয়ের স্বরুপ সহমর্মিতা তার ছোটগল্পে স্থান পেয়েছে। ছোটগল্পে দাম্পত্য জীবনের মধুর সম্পর্ক নেই, আছে দ্বন্ধ কলহপূর্ণ দাম্পত্য জীবন। তিনি দাম্পত্য জীবনের কলহ ব্যতীত মধুর সম্পর্ক উপস্থাপন করেননি। তিনি নব্য পুঁজিপতি সমাজের চিত্রও ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন। এছাড়াও সুদী ব্যবসায়ী, ঘুষখোর ও অচ্ছুতবর্গ তার ছোটগল্প হতে বাদ পড়েনি। গল্পের নব্য শ্রেণীর পুঁজিপতিদের মধ্যে অমানবিক চিত্র ফুটে উঠেছে। উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত নারী-পুরুষ চরিত্রের সামাজিক মূল্য ও আবেদন রয়েছে। প্রেমচাঁদ ছোটগল্পে এদের স্থান দিয়ে মহত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তার ছোটগল্পে সমাজ জীবনের অনুভূতি আজকের জীবনেও বর্তমান।

প্রেমচাঁদের অধিকাংশ ছোটগল্পে সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যের চিত্র অংকিত হয়েছে। লেখক স্বাভাবিক ভাবেই কোন না কোন শ্রেণীর প্রতিনিধি। তার লিখনীর মাঝে শ্রেণী নিরপেক্ষ সৃষ্টি কর্ম নজরে আসে না। শ্রেণী আছে বলেই শ্রেণীর বৈষম্যও আছে। ধনীর সাথে দরিদ্রের, নারীর সাথে প্রতিবেশীর, এক ধর্মের সাথে অপর ধর্মের বৈষম্য লেগেই আছে। সাধারণ দৃষ্টিতে সেটা না পড়লেও তীক্ষ্ণদৃষ্টির অধিকারী সংবেদনশীল শিল্পীর দৃষ্টি এড়ায় না।

গ্রাম-জীবনের চিত্রণে ও কৃষকের জীবনবেদ রচনায় প্রেমচাঁদ অতুলনীয়। জমিতে যে লাঙল চালায়, সেই তো জমিদার শ্রেণীর উচ্চবিত্তের শোষণের সবচেয়ে বড়ো শিকার। লেখকের কাছেও দুটি পথ খোলা হয়, তাকে জমিদার ও পুঁজিপতিদের বিলাস বহুল জীবনকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে হবে, নয় কৃষক-মজুরদের জীবনের ছবি আঁকতে হবে। প্রেমচাঁদ দ্বিতীয় পথের পথিক। গ্রাম্য জীবনের সমস্যাবলির সূক্ষ্মতার সঙ্গে সহানুভূতি মিশিয়ে তিনি বিচার-বিশ্লেষন করেছেন। যারা জমি চাষ করে, বীজ বপন করে কিন্তু ফসলে কোনও অধিকার শ্রেণী বৈষম্যের কারনে তারা ঠিকমত পায় না, তিনি তাদের দারিদ্র ও ক্ষুধার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

প্রেমচাঁদের সমাজ ভিত্তিক ছোটগল্পের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে কৃষক শ্রেণীর উপর মহাজন শ্রেণীর লালসা, তাদের উপর অত্যাচার-অনাচার, বেচেঁ থাকার জন্য নুন্নতম অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার চিত্রগুলো তিনি বাস্তর চরিত্রের মাধ্যমে পাঠক সমাজকে স্বচক্ষে দেখিয়েছেন। তিনি কৃষকের ঐশ্বর্য ও দারিদ্রতা, গৌরব ও লজ্জা, শক্তি ও দূর্বলতা, আনন্দ ও যন্ত্রনা, প্রীতি ও ঘৃণা, দ্বন্ধ ও মিলন, আত্মগ্লানি ও আত্মসম্মানবোধ, আদর্শবাদ ও নীতিহীনতা প্রভৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করেছেন। এ কারণেই তাঁর লেখায় কৃষক ও মহাজনের শ্রেণী বৈষম্য, মহাজন বা জমিদারদের প্রতি ঘৃণা ও কৃষকদের প্রতি গভীর সমবেদনা লক্ষ্য করা যায়।

খাজনা, নজরানা, বেগার, বিভিন্ন খাত দেখিয়ে কর আদায় ইত্যকার বিষয়গুলো হলো কৃষকের উপর জমিদার শ্রেণীর শোষণের একেকটি মাধ্যম। এগুলো প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে কৃষকের উপর নেমে আসে নানা প্রকারের নির্যাতন। রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদার ও প্রশাসন কর্তৃক প্রজাপীড়নের অসংখ্য চিত্র রয়েছে প্রেঁমচাদের রচনায়। *পৌষ কী রাত* প্রেঁমচাদের তেমনি একটি গল্প। *পৌষ কী রাত* (پوس کی رات) মে, ১৯৩০ সালে 'মাধুরী'তে প্রথমে হিন্দিতে এবং পরে 'প্রেম চল্লিছি'তে উর্দুতে প্রকাশিত হয়।[১] *পৌষ কী রাত* গল্পে জমিদারের শোষণ-নিপীড়ন, কৃষকের অভাব ও দারিদ্রের অকৃত্রিম রূপ অংকিত হয়েছে। একদিকে অত্যাচারী জমিদার সামন্ত ভূ-স্বামীর সীমাহীন লোভ-লালসা, অন্যদিকে খেটে খাওয়া এবং নানা তুচ্ছ বৃত্তিজীবী মানুষের নির্জিত বিপন্ন জীবন, তাদের শোক-তাপ, দুঃখ-ক্ষুধা ও যন্ত্রনা তার গল্পের ঘটনাবৃত্ত নির্মান করেছে। গল্পে গ্রামীন শোষণ-নিপীড়ন, অভাব ও দারিদ্রের অকৃত্রিম রূপ অংকিত হয়েছে। একদিকে অত্যাচারী জমিদার সামন্ত ভূ-স্বামীর সীমাহীন লোভ-লালসা, অন্যদিকে খেটে খাওয়া এবং নানা তুচ্ছ বৃত্তিজীবী মানুষের নির্জিত বিপন্নী জীবন, তাদের শোক-তাপ, দুঃখ-ক্ষুধা ও যন্ত্রনা তার গল্পের ঘটনাবৃত্ত নির্মান করেছে। '*পৌষ কী রাত*' প্রেমচাঁদের একটি বিখ্যাত গল্প। এ গল্পেও কৃষকের দারিদ্রতার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। গল্পের নায়ক হল্কু পরিশ্রম করে জমি চাষ করে কিন্তু তা থেকে যা ফসল আসে তা দিয়ে জমির খাজনা দেওয়াও সম্ভব হয় না। তাকে মজুরি করেই খাজনা পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু এরপরও সহ্য করতে হয় জমিদারের পীড়ন, দেখতে হয় তার রক্তচক্ষু। খাজনা আদায়কারী সহনা খাজনা নিতে আসলে হল্কু তার স্ত্রী মুন্নিকে তার কম্বল

[১] আব্দুল কাভী দাছনভী, *প্রেমচাঁন্দ*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ২০১১, পৃ. ২১।

কিনার তিন টাকা তাকে দিয়ে দিতে বলে। মুন্নি প্রথমে টাকাটা দিতে চাইছিল না কিন্তু পরে সহনার গালাগালির ভয়ে মুন্নি তাকে তিন টাকা খাজনা বাবদ দিয়ে দেয়। পৌষ এসে গেছে প্রায়, কম্বল কিনার কোন টাকা নেই, হাড় কাঁপানো শীত থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যাবে ? তাইতো হল্কুর চোখে মুখে অজানা এক আতঙ্ক। প্রেমচাঁদের ভাষায়,

ہلکو تھوڑی دیر تک چپ کھڑا رہا اور اپنے دل میں سوچتا رہا پوس سر پر آگیا ہے۔ بغیر کمبل کے کھیت میں رات کو وہ کسی طرح سو نہیں سکتا۔ مگر شہنا مانے گا نہیں گھڑکیاں کے گا۔ کہ سوچتا ہوا وہ اپنا بھاری جسم لیے ہوئے۔ جو اس کے نام کو غلط ثابت کر رہا تھا۔ [২]

(হল্কু কিছুক্ষনের জন্য চুপ করে দাড়িঁয়ে রইল এবং চিন্তা করতে লাগলো পৌষ মাস মাথার উপর এসে গেছে। কম্বল ছাড়া ক্ষেতে রাত্রি যাপন করা কোন ভাবেই সম্ভব না। কিন্তু সহনা কোন ভাবেই শুনবে না, গালাগাল দেবে। কোন চিন্তা করে লাভ নেই, সে তার মোটা শরীরটা নিয়ে বউয়ের কাছে গিয়ে বলল- যা, এনে দে, ঝামেলা তো মিটুক)

গল্পের লেখক এখানে জমিদারের পাঠানো সৈনিক খাজনা আদায়কারী সহনা খাজনা নিতে আসলে অসহায়ের মতো হল্কু ও তার স্ত্রী মুন্নি তাদের শেষ সম্বল তিন টাকা যা তারা এ বছর একটি কম্বল কিনার জন্য রেখে দিয়েছিলো। জমিদারের অত্যাচারের ভয়ে টাকাটা দিতে তারা বাধ্য হয়। এ বছর কম্বল ছাড়া তাদের কেমন যাবে তা নিয়ে তাদের চিন্তা ছিল না, কারণ তারা জানতো কম্বল ছাড়া শীত হতে বাঁচা যাবে কিন্তু জমিদারের অত্যাচার থেকে কোন ভাবেই বাঁচা সম্ভব নয়। এখানে কৃষকের জমিদারের প্রতি ভয়, জমিদার ও কৃষক এর মাঝে দৌরাত্ব প্রেমচাঁদ তার লিখনীর মাঝে বাস্তবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রেমচাঁদ তাঁর কথাসাহিত্যেও জমিদার-প্রথা, জমিদার-কৃষক সম্পর্ক, জমিদারের শোষণ নির্যাতন ইত্যাদিকে বিষয়বস্তু করেছেন। আমরা তার *কুরবানী* (قربانی) গল্পটি পড়লেই বুঝতে পারবো তার কিরকম দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। কৃষক হরখু এবং তার ছেলে গিরিধারীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে *কুরবানী* গল্পটি। গল্পটি মে, ১৯১৮ সালে 'স্বরস্বতী' তে প্রথমে হিন্দীতে প্রকাশিত হয়। পরে 'প্রেম বত্তিছি'র প্রথম অধ্যায় এবং 'দিহাত কে আফছানে' উর্দুতে প্রকাশিত হয়।[৩] এ গল্পে প্রেমচাঁদ অসঙ্গত ও কৃষক স্বার্থ বিরোধী ভূমি ব্যবস্থার প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন। ইংরেজ আমলে ভূমির মালিক হয় কৃষকের পরিবর্তে জমিদার এবং এই জমি থেকে কৃষককে উচ্ছেদ করার অধিকার লাভ করে ভূস্বামীরা। এই ব্যবস্থার ফলে কৃষকের দুর্ভোগ, দারিদ্র্য এবং ভূমিহীন শ্রমিকে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া

---

[২] প্রেম গোপাল মিত্তল, *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে ঃ তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৫০৭।
[৩] আব্দুল কাভী দাছনভী, *প্রেমচাঁন্দ*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ২০১১, পৃ. ১৪।

উপস্থাপিত হয়েছে এ গল্পে। গল্পে দেখা যায় কৃষক হরখু পাঁচ বিঘা জমি, দুটি বলদ ও একটি লাঙ্গল রেখে মারা যান। ছেলে গিরিধারী বাবার মৃত্যুতে ধুমধাম করে শ্রাদ্ধশান্তি পূর্ন করে। গায়ের মতলববাজ চাষীরা ঐ জমি নেওয়ার জন্য লালা ওঙ্কারনাথকে মোটা সালামী ও কয়েক বছরের খাজনা দিতে রাজী হয়। কিন্তু গায়ের মাতবর ওঙ্কারনাথ গরীব কৃষক গিরিধারীকে সুযোগ দেওয়ার ছলে বলল,

اونکارناتھ۔"نہیں تو میں تم سے کھیت نکالنے کو تھوڑے ہی کہتا ہوں۔ہر کھو نے بیس سال تک انھیں جوتا اور کبھی ایک پیسہ باقی نہیں رکھا۔تم ان کے لڑکے ہو اور تمھارا اس زمین پر حق ہے۔لیکن تم دیکھتے ہو اب زمین کا دو کتنا بڑھ گیا ہے، تم آٹھ روپیہ بیگہ پر جوتتے تھے، مجھے دس روپے بیگہ مل رہے ہیں،اور نذرانہ کے سو روپے الگ، میں تمھارے ساتھ رعایت کر کے لگان وہی رکھتا ہوں، لیکن نذرانے کے روپے تمھیں دینے پڑیں گے۔"[৪]

(ওঙ্কারনাথ- না, চাষ তো করবিই, জমি তোর, আমি তোকে ছাড়তে বলছি না। হরখু আজ বিশ বছর ওই জমি চাষ করেছে। যার এক পয়সাও বাকি নেই। তুই তার ছেলে এবং এই জমির উপর তোর দাবি রয়েছে। তবে তুই তো দেখছিস আজকাল জমির দর কত বেড়ে গেছে। বিঘে পিছু আট টাকা খাজনায় চাষ করতিস, এখন দশ টাকা পাচ্ছি। আর সেলামির একশো টাকা। সে তো আলাদা, তোকে খাতির করে আমি আগের খাজনাই রাখছি, তবে সেলামির টাকাটা তোকে দিতেই হবে।)

কিন্তু তিনি তাদের এই সুযোগ না দিয়ে গিরিধারীকে খাজনা হিসেবে আট টাকা ও সালামি একশত টাকা এক সপ্তাহের মধ্যে দেয়ার জন্য বলেন। সে এক সপ্তাহের ভিতর না দেওয়াতে গ্রাম্য চালাক মোড়ল কালিকাদীন দশ টাকা খাজনা ও একশত টাকা সালামী দিয়ে সে ঐ জমি নিয়ে নেয়। অভাবগ্রস্ত গিরিধারী তুলসী বেনেকে পঞ্চাশ টাকা দেওয়ার জন্য মঙ্গলসিংহের কাছে আশি টাকার বলদ ষাট টাকায় বেঁচে দেয়। সেই দুঃখ সইতে না পেরে গিরিধারী তার জমির পাশের কুয়ার ধারে কাঁদতে থাকে। ঐ সময় কালিকাদীন লাঙল নিয়ে তার জমিতে চাষ করতে যায়। সে কালিকাদীনকে তার জমিতে দেখে কুয়াতে ঝাঁপ দিয়ে সে আত্মহত্যা করে। কালিকাদীন আর গ্রামের অন্য কেউ এরপর থেকে ঐ জমির পাশে কোন সময় যায় না কারণ,

کالکادین نے اب گردھاری کے کھیتوں سے استعفا دے دیا ہے کیوں کہ گردھاری کی روح ابھی تک اپنے کھیتوں کے چاروں طرف منڈلاتی رہتی ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی اپنی کھیتوں کو دیکھ کر اسے تسکین ہوتی ہے۔انکار ناتھ بہت کوشش کرتے ہیں کہ زمین اٹھ جائے۔لیکن گاؤں کے لوگ اب اس کی طرف تاکتے ہوئے ڈرتے ہیں۔[৫]

[৪] প্রেমচাঁদ, 'কুরবানী', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ, (মদন গোপাল সম্পাদিত)*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১০, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ২০০।
[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।

(কালিকাদিন গিরিধারীর জমি ছেড়ে দিয়েছে। কারণ গিরিধারী এখনও তার জমির চারপাশে ঘুরঘুর করে। সে কারো ক্ষতি করে না, শুধু তার জমিগুলোকে দেখেই সে সন্তুষ্ট থাকে। ওঙ্কারনাথ খুব চেষ্টা করে যে জমিটা কেউ কিনে নেক, কিন্তু গাঁয়ের লোকেরা এই জমির দিকে তাকাতেও ভয় পায়।)

গিরধারীর মৃত্যুর কারনের মধ্য দিয়ে প্রেমচাঁদ ভূমি ব্যবস্থার অসংগতি ও অযৌক্তিকতা এবং তার ফলে কৃষকের দুরবস্থা প্রকট আকারটা দেখাতে চেয়েছেন। গ্রাম্য চালাক মোড়ল কালিকাদীনের মত পর্যাপ্ত টাকা না থাকার কারনে ভূমিহীন কৃষক মজুর গিরিধারী কে তার শেষ সম্বলটুকু হারিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়। কারণ সমাজে তার তখন পরিচয় ছিল একজন অভাব গ্রস্থ চাষী হিসেবে যার পৈত্রিক জমি ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা মহাজন বা উচ্চবিত্ত লোকদের কাছ থেকে ছিল না। "ভূমিহীন কৃষকের মজুর হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে *'কুরবানী'* গল্পে একটি ঐতিহাসিক পট পরিবর্তন, এক নতুন যুগ পুঁজিবাদী অর্থনীতির, শিল্প বিকাশের ইঙ্গিত রয়েছে এই গল্পে। এ বিষয়ে প্রেমচাদেঁর মনোভাবের পরিচয়ও পাওয়া যায় এখানে। শিল্পের বিকাশকে প্রেমচাঁদ সহজে মেনে নিতে পারেননি। স্বাধীন কৃষকের শ্রমিক হয়ে যাওয়া তাঁর নিকট দাসত্ব ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। মজুরীর কথা ভাবতেই তার (গিরধারীর) হৃদয় ব্যাকুল হয়ে যায়। এতদিন স্বাধীনতা আর সম্মানের সুখ ভোগের পর অধম চাকরির আশ্রয় নেওয়ার চেয়ে মরে যাওয়াই তার নিকট ভাল মনে হয়। সে যতদিন কৃষক ছিল, তাকে গ্রামের সম্মানিত মানুষের মধ্যে গণনা করা হত, গ্রামের কোনো ব্যাপারে তার বলবার অধিকার ছিল। তার ঘরে অর্থ ছিল না, কিন্তু সম্মান ছিল। এখন তাকে কে ডাকবে। কে তার দুয়ারে আসবে।" কেবল গিরধারীর ভাবনায় নয়, বরং প্রেমচাঁদ সরাসরি *'কুরবানী'* গল্পের শেষে জীবনকে অপমানিত অসম্মানিত বলে উল্লেক করেছেন। ড. নাঈম আনিস সমাজে কৃষকের দুর্দশা বর্ণনা করতে গিয়ে অতীত ও বর্তমান চিত্র এভাবে তুলে ধরেণ,

"کسان زندگی بھر محنت کرتا ہے لیکن اس کی محنت کا پھل اسے نہیں ملتا۔ زمین دار بھی اس پر ظلم کرتا ہے اور پولس بھی اس کے
ساتھ زیادتی کرتی ہے۔ وہ حق پر ہوتا ہے لیکن کوئی اس کی دادرسی نہیں کرتا اور کسان کی زندگی اسی المیے پر ختم ہو جاتی ہے۔" [৬]

("কৃষক জীবন ভর পরিশ্রম করে কিন্তু তার পরিশ্রমের ফল সে পায় না। জমিনদারও তার প্রতি অত্যাচার করে আর পুলিশ ও তার সাথে খারাপ আচোরণ করে। সে সত্যের পথেই চলে কিন্তু তাকে কেহই দাম দেয় না এবং কৃষকের জীবন এই ভাবে নিঃশ্বেষ হয়ে যায়।")

গল্পের শেষান্তে প্রেমচাঁদ একজন স্বাধীন কৃষকের শ্রমিক জীবনকে অপমানের ও অসম্মানের বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায়,

گردھاری کا بڑا لڑکا اب اینٹ کے بھٹے پر کام کرتا ہے اور روزانہ دس بارہ آنے گھر لاتا ہے۔ وہ اب قمیض اور انگریزی جوتا پہنتا ہے۔ گھر میں ترکاری
دونوں وقت پکتی ہے اور جوار کی جگ گیہوں اور چاول خرچ ہوتا ہے، لیکن گاؤں میں اب اس کا کچھ وقار نہیں ہے وہ مجورا ہے۔ سبھا گی پرائے

[৬] ড. নাঈম আনিস, *প্রেমচাঁন্দ : হায়াত আউর খেদমত*, মুসলিম ইনস্টিউট পাবলিকেশন, কলকাতা, ডিসেম্বর- ২০১০, পৃ. ৪৩-৪৪।

گاؤں میں آئے ہوئے کتے کی طرح دبکی پڑی ہے۔وہ اب پنچائتوں میں نظر نہیں آتی۔اب نہ اس کا دربار لگتا ہے نہ اسے کسی دربار میں دخل ہے۔

وہ اب مجبوری کی ماں ہے۔ [৭]

(গিরিধারীর বড় ছেলেটা এখন একটা ইটের ভাটায় কাজ করে। দৈনিক দশ বার আনা ঘরে নিয়ে আসে। এখন শার্ট আর বুটজুতা পরে। বাড়ীতে দু'বেলা তরকারী রান্না হয়। যবের বদলে গম খাওয়া হয়। কিন্তু গ্রামে তার কোনও সম্মান নেই। সে এখন মজুর। সুভাগী এখন অন্য গাঁয়ে ঢুকে পড়া কুকুরের মত কুঁকড়ে থাকে। সে এখন পঞ্চায়েতে আসে না। সে এখন মুজুরের মা।)

প্রেমচাঁদের এই মন্তব্য থেকে কৃষকের প্রতি তার আবেগ ও সমবেদনা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। কৃষকের দুর্ভোগ, দারিদ্র্য এবং ভূমিহীন শ্রমিকে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া উপস্থাপিত হয়েছে এ গল্পে।

জমিদার ও চাষীর শ্রেণী বৈষম্যের আরেকটি জলন্ত চিত্র হলো *কফন* (کفن) গল্পটি। গল্পটি সর্বপ্রথম উর্দুতে মাসিক পত্রিকা 'জামানাহ'তে ডিসেম্বর ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। এপ্রিল, ১৯৩৬ সালে হিন্দিতে মাসিক 'চান্দ' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়।[৮] গল্পে কৃষক ঘীসু ও মাধবের নৈরাশ্য, কর্মবিমুখতা ও অমানবিক আচরণের কারণে কৃষকের প্রতি জমিদারের ক্ষিপ্ততা ছিল চরম আকারে। গল্পে দেখা যায়, মাধব সকালে উঠে দেখে বউ রাতে সন্তান প্রসবের যন্ত্রনা সইতে না পেরে সে ও তার সন্তান দু'জনই মারা যায়। কান্নাকাটি করতে করতে কাফনের কাপর কেনার জন্য সাহায্য পাবার আশায় তারা জমিদারের কাছে যায়। জমিদার তাদের দুই জনের উপর আগে থেকেই অনেক ক্ষ্যাপা ছিল। কারণ জমিদার কখনোই তার জরুরী কাজে ডাক দিলেও ঘীসু ও মাধবকে কাছে পাননি। *কফন* গল্পে ঘীসু ও মাধবের প্রতি জমিদারের রাগ তুলে ধরা হয় এভাবে,

زمیندار صاحب رحم دل آدمی تھے مگر گھیسو پر رحم کرنا کالے کمبل پر رنگ چڑھانا تھا۔جی میں تو آیا کہدیں چل

دور ہو یہاں سے لاش گھر میں رکھ سڑا۔یوں تو بلانے سے بھی نہیں آتا۔آج جب غرض پڑی تو آکر خوشامد کر رہا ہے۔

حرام خور کہیں کا۔بدمعاش۔ [৯]

(জমিদার সাহেব দয়ালু মনের মানুষ ছিলেন কিন্তু ঘিসুর প্রতি দয়া করার মানে তো কালো কম্বলে রং লাগানো। ইচ্ছে হল তো আসলি না - ভাগ, দূর হ সামনে থেকে। এমনি তো ডেকে পাঠালেও আসিস না। আজ গরজ পড়েছে, তাই এসে খোশামোদ করছিস। হারামখোর কোথাকার, বদমাশ!)

প্রেমচাঁদ এই গল্পে জমিদারের কৃষকের প্রতি ক্রোধ ও অসন্তুষ ঘীসু ও মাধব চরিত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গ্রামের নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে যুবক, বৃদ্ধ কৃষক যে যতই বড় হোক না কেন কেহই জমিদার পন্ডিতদের খাজনা দেওয়া ছাড়া এলাকায় বসবাস করতে পারত না। আর এই উচ্চবিত্ত শ্রেণী সব সময়ই নিম্নশ্রেণীর উপর প্রাধান্য বিস্তার

---

[৭] প্রেমচাঁদ, 'কুরবানী', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ, (মদন গোপাল সম্পাদিত)*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১০, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ২০৭-২০৮।
[৮] মানিক টাল, *প্রেমচাঁন্দ : কুচ নয়ি মোবাহেছ*, মর্ডান পাবলিশাং হাউজ, নয়া দিল্লী, আক্টোবর- ১৯৮৮, পৃ. ১৪৭।
[৯] আলিমুল্লাহ সিদ্দিকী, *মাগরিবে বাঙ্গাঁল মে উর্দু কে নাম*, কহিনূর আর্ট প্রেস লিমিটেড, কলকাতাহ, পৃ. ১৭৬।

করে চলতো। *'বেটি কা ধন'* (بیٹی کا دھن) গল্পে জমিদারের শুষণ বর্ণিত হয়েছে। গল্পটি 'জামানা' পত্রিকায় নভেম্বর, ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়। জীতন সিংহ অত্যাচারী জমিদার। তার বেগারের দৌরাত্ম্যে প্রজাগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সুক্খু চৌধুরী জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করে জমিদারের অত্যাচারের বিষয়ে। জীতন সিংহ তার প্রতিশোধ নেয়, সুক্খু চৌধুরীর বিরুদ্ধে বকেয়া খাজনা আদায়ের মামলা দায়ের করে। একদিনের ব্যবধানে মামলার তারিখ ফেলা হয়। ঘোর বর্ষার কারণে চৌধুরী আদালতে উপস্থিত হতে পারেননি। তাই আদালত তার নিকট ক্রোকের নোটিশ পাঠায়। সুক্খু চৌধুরী জমিদারকে ভালো করেই চেনে, সে জানে জীতন সিংহের নিকট অনুরোধ করে কোন ফল হবে না। অধর্ম জেনেও অবশেষে সুক্খ চৌধুরী কন্যার অলংকার বন্ধক রেখে অর্থ সংগ্রহ করে জমিদারের পাওনা অর্থ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। *'বেটি কা ধন'* গল্পে মহাজনের হৃদয় পরিবর্তনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। যে ঝগড়ু সাহু জমিদরের বিরুদ্ধে সুক্খু চৌধুরীর নালিশ করবার কথা জানিয়ে ছিল জীতন সিংহকে, যে কৃষকের সম্পত্তি হস্তগত করবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকে সেই মহাজন ঝগড়ুই কন্যার সম্পত্তি ভোগের 'অধর্ম' চৌধুরীকে রক্ষার জন্য বিনা বন্ধকে ঋণ প্রদান করে। সুক্খু চৌধুরীর চোখে সে দেবতা হয়ে যায়, আর তখন মহাজনের চরিত্র ঐতিহাসিক সত্য থেকে দূরে সরে যায়। লেখক ঝগড়ু মাহজনের মধ্যে ব্যক্তিগত অন্তদ্বন্ধ ও চরিত্র পরিবর্তনের মনস্তাত্ত্বিকতা দেখাতে চাননি বলে, উক্ত মহাজনকে তার শ্রেণীর প্রতিভূরূপেই শুধু বিচার করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

বেগার খাটানো জমিদার কর্তৃক প্রজাপীড়নের আরেকটি দিক যা *তাহরিকে খায়ের* গল্পের উপজীব্য বিষয়। *তাহরিকে খায়ের* (تحریک خیر) গল্পটি জুলাই, ১৯২১ প্রকাশিত হয়। গল্পে বেনারস জেলার বীরা গ্রামে সন্তানহীনা ভুগনি বিধাবা বৃদ্ধ বসবাস করত। তার সহায় সম্পদ বলতে বড় আকারের একটা উনুন ছাড়া কিছুই ছিল না। গ্রামের লোকেরা ছোলা ভুট্টা কিংবা ছাতু তার উনুনে ভাজত, এর ফলে তারা যা দিত তা দিয়ে তার দৈনিক আহার চলতো। গ্রামের জমিদার পণ্ডিত উদয়ভানু পান্ডের এলাকায় বুড়ির বসবাসের কারণে বুড়িকে তার শস্য দানা এছাড়া অন্যান্য কাজ বেগার ভাবে খেটে দিতে হত। হিন্দু ধর্মে চৈত্র মাসে সংক্রান্ত পর্বে গ্রামের লোকেরা বুড়ির কাছে শস্য দানা ভাজতে আসে। ব্যাস্ত বুড়ির কাছে তখন জমিদারের হুকুমে তার লোকেরা বড় বড় শস্য ভরা ঝুড়ি এনে তা তৃতীয় প্রহরের মধ্যে ভাজতে বলে। তৃতীয় প্রহরে জমিদারের চাপ রাশিরা এসে বিধবাকে জিজ্ঞাস করে,

زمیندار کے دونوں چپراسیوں نے آکر پوچھا،اناج بھن گیا؟ بھنگی نے بے خوف ہو کر کہا۔ بھن تو رہا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو۔

چپراسی۔ سارادن گزر گیااور تجھ سے اتنااناج نہ بھونا گیا۔اور تو یہ بھون رہی ہے کہ اناج کاستیاناس کر رہی ہے۔ یہ تو

بالکل سیوڑے ہیں۔ان کاستّو کیسے بنے گا۔ دیکھ تو آج ٹھاکر تیری کیادرگت کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسی رات کو بھاڑ

کھود کر پھینک دیاگیااور حرماں نصیب، آفت زدہ بڑھیا کا کوئی سہارانہ رہا۔ [১০]

(জমিদারের দুই চাপরাশি এসে কর্কশ স্বরে বলে- কীরে, ভাজা হয়েছে? ভুগনি নিঃশংকচ হয়ে উত্তর দেয়- ভাজছি তো। দেখতে পাচ্ছ না।
চাপরাশি- গোটা দিন পার গেল, আর তোর এই দানা ভাজা হল না? এ তুই কী ভাজছিস? দানার বারোটা বাজচ্ছিস। আধভাজা রেখে দিয়েছিস, এ দিয়ে ছাতু হবে কী করে? আমার সর্বনাশ করে দিয়েছিস। দেখিস, আজ জমিদারবাবু তোর কী গতি করে। পরিণামে সেই রাতে উনুন উপড়ে ফেলা হল এবং সেই অভাগিনী বিধবা অবলম্বনহীন হয়ে পড়ল।)

বুড়ি এই সময়ের মধ্যে এতগুলো শস্য ভাজতে না পারার কারণে জমিদারের পেয়াদা তার উনুন ভেঙ্গে ফেলে। পুরো মাস যাবার পর জমিদার খাজনা নিতে বুড়ির বাড়ীতে এসে দেখে বুড়ি নতুন উনুন তৈরী করতেছে, জমিদার তখন তার হুকুম ছাড়া উনুন বানানোর কারণে বুড়ির সাথে রাগারাগি করতে করতে,

بھاڑ میں زور سے ایک ٹھوکر ماری۔ مٹی گیلی تھی۔ سب کچھ لیے دیے بیٹھ گئی۔ دوسری ٹھوکر ناند پر چلائی لیکن بڑھیا سامنے آگئی۔

ٹھوکر اس کی کمر پر پڑی۔اوندھے منہ گر پڑی۔ آنکھوں کے سامنے تتلیاں اڑنے لگیں۔اب اسے غصّہ آیا۔ کمر سہلاتی ہوئی بولی۔

ٹھاکر۔ تمھیں آدمی کاڈر نہیں ہے تو دیوی دیوتا کاڈر تو ہونا چاہیے۔ مجھے اس طرح اجاڑ کر کیا پاؤ گے؟ کیااس چار انگل دھرتی میں سونا

نکل آئے گا۔ میں تمھارے ہی بھلے کو کہتی ہوں۔ گریب کی ہائے بری ہوتی ہے۔ میرا دل مت دکھاؤ۔ [১১]

(এই বলে তিনি উনুনে একটা লাথি চালান, কিন্তু বুড়ি সামনে এগিয়ে আসাতে পা-টা তার কোমরে গিয়ে পড়ে। এবার বুড়ীর বেশ রাগ হয়। কোমরে হাত বুলোতে বুলোতে সে বলে ওঠে- মহারাজ, মানুষের ভয় তোমার না থাক, কিন্তু ভগবানের ভয় থাকা উচিত। আমাকে এভাবে উচ্ছেদ করে তুমি কী পাবে? এই চার আঙুল জমি থেকে কি সোনা বেরিয়ে আসবে ? আমি তোমার ভালোর জন্য বলছি, গরিবের অভিশাপ নিয়ো না। আমাকে আর দুঃখ দিয়ো না।)

বিধবা গরীব হওয়ার কারণে বুড়ীকে আজ জমিদারের রোষানলে পড়তে হলো। প্রেমচাঁদ এই গল্পের মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন, যদি আজ সে গরীব বা বিধবা না হতো তাহলে জমিদার শ্রেণীর লোকদের দ্বারা তাকে এই বিরম্বনায়

---

[১০] প্রেমচাঁদ, 'তাহরিকে খায়ের', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ, (মদন গোপাল সম্পাদিত)*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১০, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৪৯৭।
[১১] প্রাগুপ্ত, পৃ. ৫০১-৫০২।

পড়তে হতো না। প্রেমচাঁদের বিভিন্ন গল্পের পাতায় পাতায় প্রজাদের উপর জমিদার শ্রেণীর বিভিন্ন শোষণ নিপীড়নের কাহিনী এভাবেই বর্নিত হয়েছে।

প্রেঁমচাদের এমন অনেক ছোটগল্পের ভিতরেই মহাজন, জমিদার, ব্রাহ্মণ এছাড়া নিচুজাত বা কৃষকদের শ্রেণী বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়, তেমনি আরেকটি গল্প হলো- *নছিব কে বদছুরত এছতেহজা* (نصیب کی بدصورت استہزا) জোখু পিপাসায় কাতর হয়ে ঘটিতে মুখ দিতেই পানিতে নোংরা গন্ধ পাওয়া মাত্র স্ত্রী গংঙ্গিকে জিজ্ঞাসা করলে সেও ঐ ঘটিতে নাক দিয়ে দুগন্ধ পায়। তৃষ্ণার্থ স্বামীকে পিপাসা থেকে মুক্ত করার জন্য রাত নয়টার সময় ঠাকুরদার কুয়ার দিকে রওনা দেয়। যিনি একজন ব্রাহ্মণ ঠাকুর মশাই ছিলেন। শুধুমাত্র মানুষের আর্শীবাদ নিতেন ও নিষ্ঠুর ভাবে নিচু লোকদের লাঠি পেটা করতেন। অপরদিকে সাহুজি যিনি সুধী ব্যবসা করে মানুষকে ঠকাতেন। তার কুয়া ছাড়া আর কোন কুয়া ছিল না। গ্রামের সকলেই তাদের কুয়া থেকে পানি পান করত। কিন্তু তিনি নিচুজাত গংঙ্গির মত লোকদের পানি নিতে দিবে না। গংঙ্গি কোন উপায় না পেয়ে ঘটি আর দড়ি নিয়ে পানি তুলতে ঠাকুরদার কুয়ার কাছে গেল। ঠাকুরদা তখনও বারান্দায় বসে ছিল। গংঙ্গি তাকে দেখে চাতালের পিছনে লুকিয়ে থাকল। যখন ঠাকুরদা ঘুমানোর জন্য বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকল, তখন গংঙ্গি চাতালে উঠে ইস্ট নাম জপতে জপতে ঘটিটাকে কুয়োর মধ্যে ফেলল। ঘটিটা পানি ভর্তি করে চাতালের উপর রাখতেই ঠাকুরদা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। ভয়ে গংঙ্গির হাত থেকে ঘটিটা পানিতে পড়ে বিকট আওয়াজ হল। আওয়াজ পেয়ে ঠাকুর বাবাজি কুয়োর সামনে আসেন। গঙ্গি ভয়ে পিছন দিকে না তাকিয়ে সোজা বাড়িতে এসে হাজির হল। এসে দেখে পিপাসায় কাতর স্বামী নাক বন্ধ করে দুগন্ধ পানি পান করছে। গঙ্গি কান্না শুরু করল আর বলতে লাগলো,

"ভাগ্যের নিষ্টুর পরিহাসে সে আজ সমাজ থেকে পরিত্যক্তা। আর এ কারণে স্বামীর পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত জল খেয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া আর কোন পথ নেই।" [১২]

মহাজনী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রেমচাঁদের লড়াই যা তার ছোটোগল্পেও অব্যাহত ছিল। নভেম্বর, ১৯২৪ সালে প্রকাশিত *সওয়া সের ঘেঁহু* (سواسیر گیہوں) গল্পে গরিব কর্মী কিষাণ শংকর গ্রামের মহারাজের কাছে সওয়া সের গম ধার করেছিল এবং প্রতি বছরই সুদের সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু গম দিয়ে সে ধার শোধ করে দেয়। সাত বছর পরে ঠাকুরমশায় যখন বিপ্রমহারাজ পদে উন্নীত হয়েছেন আর শংকর তার জমি হারিয়ে ক্ষেতমজুর হয়ে গেছে, তখন সেই পুরোনো সওয়া সের গম ধারের দোহাই দিয়ে মহাজন তার যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে দিনমজুরে পরিণত করল। নির্লিপ্ত উদাসীন্যে প্রেমচাঁদ লিখেছেন,

---

[১২] পৃথ্বীরাজ সেন, সৌরেন দত্ত, *মুন্সী প্রেমচন্দ: গল্পসমগ্র*, (প্রথম খণ্ড), কামিনী প্রকাশনালয়, ৫ নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলকাতা, নভেম্বর-২০০৯, পৃ. ৪৯৭।

سوا سیر گیہوں کی بدولت عمر بھر کے لیے غلامی کی بیڑیا پاوں میں ڈالنی پڑیں۔ [১৩]

('সওয়া সের গম নিয়েছিল, তাই শোধ করতে ক্রীতদাসত্বের বেড়ি পরতে হল।')

রামলীলা (رام لیلا) গল্পটি অক্টোবর, ১৯২৬ সালে 'মাধবী' পত্রিকায় প্রথমে হিন্দিতে প্রকাশিত হয়। পরে উর্দুতে 'প্রেম চল্লিছি'র প্রথম অধ্যায়ে ছাপানো হয়। [১৪] *রামলীলা* ছোটগল্পটিতে শ্রেণী বৈষম্য ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় লক্ষ্যনীয়। *রামলীলা* গল্পটি হিন্দু ধর্মের অন্যতম বড় উৎসব রথ যাত্রা বা রামলীলাকে কেন্দ্র করে লেখা। লেখক এখানে শৈশবের রথ যাত্রার উৎসবের সাথে বর্তমানের যে পার্থক্য, জমিদার শ্রেণী ও প্রজা শ্রেণীর মধ্যকার বৈষম্য ও প্রজা শ্রেণীর শোষনের চিত্র স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখক বলেছেন পূণ্য তীর্থ কাশিতে লীলা খেলার জগৎ জোড়া সুখ্যাতি কিন্তু এখন আর রামলীলা দেখতে মনে চায় না, এখানকার কলা-কুশলিদের হাফ পায়জামা পড়া লম্পঝম্প দেখতে রুচিতে বাঁধে। পূর্বে রামপাড়ের অভিনেতাদের সাজ-সজ্জা যেমন- দু'বনবাসী ভাই যে মুকুটগুলো পড়তো তা অসম্ভব কারুকার্য খঁচিত, বাঁদর-হুনুমান মুখোশগুলোও পিতলের কারুকার্য খচিত ছিল। ছোটবেলায় সব কাজ সেরে প্রিয় অভিনেতা রামচন্দ্রের অভিনয় দেখতে যাওয়া যা তার মনে এখনও ছাপ রয়েছে। রাজপাট শেষ হলে শ্রীরামচন্দ্রের শোভাযাত্রা বের হতো। পুরো অনুষ্ঠানটার ব্যবস্থা করতেন রামগতের জমিদার, তারপর সন্ধ্যায় শামিয়ানার নিচে ভালো করে সাজাতেন। বারবনি তাদের একটা দলও এসে পৌঁছায়। গল্পের শেষে দেখা যায়, পরের দিন রামচন্দ্রের বিদায় নেবার পালা। সেখানে বারবনিতাদের নিয়ে চলে যাবার জন্যও গাড়ি প্রস্তুত করা হয়েছে।

জমিদার বার বনিতাদের জন্য নগদ টাকা, গাড়ির ব্যবস্থা করলেও রামচন্দ্রের জন্য কোন ব্যবস্তা রাখা হয়নি। যারা আবিদিজানকে রাতে দশ বিশ টাকা দিয়ে খুশি করেছিল তারা কি রামচন্দ্রের জন্য দু'টাকাও রাখতে পারেনি? এই ভেবে লেখকের খুব খারাপ লাগছিল। এখানে রামচন্দ্রের মত গরীবদের ব্যবহার করেও তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক দেয় না, এই যে অবিচার তা লেখককে অনেক ব্যথিত করে। পরে লেখকের হাতে যে দু'পয়সা ছিল তা দিয়েই রামচন্দ্রকে শহরের বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন তখনই লেখকের হৃদয়টা অনাবিল আনন্দে ভরে গিয়েছিল।

ঘাহাস ওয়ালী (گھاس والی) গল্পটি ১৯২৯ সালে 'মাধুরীতে' প্রথমে হিন্দীতে প্রকাশিত হয়। পরে 'প্রেম চল্লিছি'র প্রথম অধ্যায়তে উর্দুতে প্রকাশ পায়। [১৫] এই গল্পে প্রধান তিনটি চরিত্র হল- মুলিয়ার, চৈনসিংহ এবং মহাবীর। মুলিয়া এমন একটি মেয়ে যাকে দেখলে মনে হয় যে, সেখানে একটি গোলাপ ফুল ফুটে উঠেছে। বাদামি রং, হরিণীর মতো দুটি

---

[১৩] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'সোয়া সের ঘেঁহু', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে ঃ তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৩৪১।
[১৪] আব্দুল কাভী দাছনভী, *প্রেমচাঁন্দ*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ২০১১, পৃ. ১৮।
[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

চোখ, গালে ঈষৎ লালিমা, টানাটানা চোখের পলক, চোখে অদ্ভুত সিক্ততা। মহাবীরের স্ত্রী হল মুলিয়া। সংসারের দৈন্যতার জন্য তাকে ঘাস বিক্রি করতে হয়। রোজ মাঠে ঘাস তোলার জন্য যেতে হয়। অন্যদিকে মহাবীর এমন কোনো আকর্ষনীয় পুরুষ বা সম্পদশালী ছিল না। তার মধ্যে এমন কি গুন আছে যার জন্য মুলিয়া এখনও তার কাছে টিকে আছে। এমন সব প্রশ্ন জাগে তাদের মনে যারা মুলিয়াকে না পাওয়ার বেদনায় মর্মাহত। একদিন মুলিয়া কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে আসলো, স্বামী মহাবীর কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় মুলিয়া কথা এড়িয়ে গিয়েও পুন:রায় বলল, কিছু হলে তো বলবো? কিন্তু এমন কিছু ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটে যায়, যা মনের মধ্যে সারা জীবনের জন্য দাগ ফেলে দেয়। আজ মুলিয়া ঘাস কাটতে গিয়েছিল। তখনই তার সাথে চৈনসিংহের দেখা হয়। চৈনসিংহকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় হঠাৎ চৈনসিংহ তার হাতটা চেপে ধরে কম্পিত গলাই বললো- মুলিয়া আমার উপর কি তোর একটুও দয়া হবে না। মুলিয়া রেগে বলে, হাত ছাড়ুন, না হয় চেঁচিয়ে লোক জড়ো করবো। চৈন্যসিংহ ভীষণ লজ্জা পেয়ে তার হাত ছেড়ে দিয়ে ভাবতে লাগলো,

چین سنگھ کو آج زندگی میں کہ نیا تجربہ ہوا۔ نیچی ذاتوں میں حسن کا اس کے سوا اور کام ہی کیا ہے کہ وہ اونچی ذات والوں کا کھلونا بنے۔ ایسے کتنے ہی معرکے اس کے جیتے تھے۔ پر آج ملیا کے چہرے کا وہ رنگ، وہ غصہ، وہ غرور، وہ تمکنت دیکھ کر اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ اس نے خفیف ہو کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ملیا تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ [১৬]

(চৈনসিংহের এই প্রথম জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা হলো। উঁচু জাতের মানুষের হাতের পুতুল হওয়া ছাড়া নীচু জাতের মধ্যে রূপমাধুরীর আর কাজই বা কী! অমন কতই না নিশানা সে জিতেছে, কিন্তু আজ মুলিয়ার মুখের রং, ওর ক্রোধ, ওর তেজ দেখে চৈনসিংহ একেবারে থ হয়ে গিয়েছিল। লজ্জা পেয়ে মুলিয়ার হাতটা ছেড়ে দিয়েছিল। মুলিয়া তরিৎ গতিতে চলে গিয়েছিল।)

মুলিয়া ভাবে মহাবীরকে যদি আজকের ঘটনার কথা বলি, তাহলে এই ঠাকুর সম্প্রদায়ের লোকটার উপর তার খুন চেপে যাবে। পরেরদিন মুলিয়া নিজ ইচ্ছায় ও স্বামীর আদেশের পরও ঘাস কাটতে না যাওয়ায় শ্বাশুড়ি রাগান্বিত হয়ে মুলিয়াকে বলে,

ساس نے ڈانٹ کر کہا۔ نہ تو اوروں کے ساتھ جائے گی، نہ اکیلی جائے گی، تو پھر کیسے جائے گی؟ صاف صاف کیوں نہیں کہتی کہ میں نہ جاؤں گی۔ تو یہاں میرے گھر میں رانی بن کر بناہ نہ ہو گا۔ کسی کو چام نہیں پارا ہوتا۔ کام پیارا ہوتا ہے۔ تو بڑی سندر ہے تو تیری سندرتا لیکر چاٹوں۔ اٹھا جھوا اور جا گھاس لا۔ [১৭]

---

[১৬] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'ঘাহাছ ওয়ালী', প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানেঃ তারতিব ওয়া এনতেখাব, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নিউ দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৪৯৩।

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৪।

(শ্বাশুড়ি মুখঝামটা দেয়, আর কারও সঙ্গেও যাবি না, একাও যাবি না, তাহলে তুই যাবিটা কীভাবে ? সোজাসুজি এ কথা কেন বলছিন না যে, আমি যাবনা ? আমার বাড়িতে তাহলে রানি সেজে থাকা চলবে না। শুধু রূপ দিয়ে কী হবে, কাজও চাই। জানি তুই খব রূপসি, তা আমি কি তোর রূপ ধুয়ে জল খাব ? নে ঝুড়ি নে, ঘাস তুলে আন।)

মহাবীর তখন বড়ির সামনে নিম গাছটার ছায়ায় দাঁড়িয়ে ঘোড়াটাকে দলাই মালাই করছে। রোজ বারো আনা দিয়ে ঘাস কিনতে হয়। মহাবীর বললো মুলিয়া ভালো না লাগলে ঘাস এনো না। স্বামীর মহানুভূবতায় মুলিয়া অন্য রাস্তা ধরে ঘাস কাটতে যায়। হঠৎ পিছনে তাকিয়ে দেখে চৈনসিংহ। চৈনসিংহ বললো ভয় পাস না আমার জমি থেকে রোজ তুই ঘাস কাটবি। চৈনসিংহ বলে মুলিয়া আমাকে আর তুই ভয় পাইস না। আমি আগে লুচ্চা, গুন্ডা ছিলাম। এখন আর তা নই। আমার দেহটা যদি তোর কোনো কাজে লাগাতে পারতাম তবে আমি ধন্য হয়ে যেতাম। বড়ো ভাগ্যবান তোর স্বামী দেবতা। সে তোর মত দেবীকে পেয়েছে। মুলিয়া বলে তুমি কি শাদি সুধা করেছো ? সে বলে- হ্যাঁ। শাদি তো হয়ে গেছে কবেই। কিন্তু সেটা নিছকই খেলা। মুলিয়া তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে "তাহলে আমার মরদ যদি তোমার বউয়ের সাথে এভাবে কথা বলে, তোমার কেমন লাগবে তবে ? তুমি কি ভেবেছো মহাবীরের শরীরে রক্ত নেই? লজ্জা, ইজ্জতের ভাবনা নেই ? ঘাটে কি মেয়ের অভাব ? আরো বলল,

مجھ سے دیا مانگتے ہو۔اسی لیے تو کہ میں چمارن ہوں، نیچ جات ہوں اور نیچ جات کی عورت جرا سی آرجو بنتی، یا جرا سے لالچ یا جرسی

گھڑکی دھمکی سے کابو میں آجاتی ہے۔ کتھا ستا سودا ہے ٹھاکر ہو نہ ایسا ستا سودا کیوں چھوڑنے لگے۔

چیں سنگھ پر گھڑوں پانی بھر گیا۔ بلکہ سیکڑوں جوتے پڑ گئے۔ خفت آمیز لہجہ میں بولا۔ یہ بات نہیں سے ملیا میں سچ کہتا ہوں۔اس میں

اونچ نیچ کی بات نہیں ہے۔سب آدمی برابر ہیں میں تو تیرے چرنوں پر سر رکھنے کو تیار ہوں۔ [১৮]

(আমার কাছে দয়া চাইছ, সে তো এজন্য যে, আমি চামারনি, নীচুজাত আর নীচুজাতের মেয়ে-ছেলেগুলো একটুখানি ধমক ধামক কিংবা একটুখানি লোভ দেখালেই তোমার হাতের মুঠোয় এসে যাবে। কত সস্তা সওদা! ঠাকুর যে, এত সস্তা সওদা কেন ছেড়ে দেবে ?
চৈনসিংহ লজ্জা পেয়ে বলে, মুলিয়া ব্যাপারটা তা নয়। আমি সত্যি করে বলছি, এর মধ্যে উঁচু-নীচুর ব্যাপার নেই। সব মানুষই সমান। আমি তো তোর চরনে মাথা রাখতে রাজি।)

চৈনসিংহ লজ্জায় শেষ। সামাজিক ভাবে অবক্ষয় এ সকল নীচুজাতের লোকদের প্রতি ঠাকুরদের একটু লোভ লালসা বেশীই ছিল। তারা সুযোগ সন্ধানে থাকত। আর সুযোগ পেলেই গরীবের উপর চড়ে বসত। তা তার সম্পদই হোক বা ইজ্জতই। তাদের কাছে নীচ জাতের লোকদের ক্ষতি, সম্মানহানী কোন কিছুই চোখের পড়ত না। প্রেমচাঁদ চোখে আঙ্গুল দিয়ে সমাজের নীচু বর্ণের প্রতি উচু বর্ণের লোকদের কার্যকলাপ দেখিয়ে দিয়েছেন তার লেখনীর মাধ্যমে।

---

[১৮] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'ঘাহাছ ওয়ালী', প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানেঃ তারতিব ওয়া এনতেখাব, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নিউ দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৪৯৬।

প্রেমচাঁদ তাঁর ছোটগল্পে মহাজনি শোষণের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কেন কৃষক বাধ্য হয় মহাজনের নিকট ঋণ গ্রহণ করতে আর মহাজন দরিদ্র কৃষকের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে কিভাবে তাকে সর্বস্বান্ত করে। তিনি এটিও দেখিয়েছেন, যে কৃষক একবার ঋণ গ্রহণ করে তার আর কোনোক্রমেই নিস্তার নেই, শীঘ্রই সে পরিণত হয় ভূমিহীন মজুরে। শোষণের ক্ষেত্রে সমাজ, ধর্ম কিভাবে মহাজনের সহায়ক হয়েছে তা প্রেমচাঁদের দৃষ্টি এড়ায়নি। আইনের ফাঁকে কেমন করে মহাজনেরা সরকারি নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে কৃষক শোষণ অব্যাহত রেখেছে তার চিত্রও অঙ্কন করেছেন প্রেমচাঁদ। মহাজনের শোষনের ক্ষেত্রে জমিদার, জমিদারের কর্মচারী, সরকারি কর্মচারীর সহায়তার প্রক্রিয়া চিহ্নিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পে।

ধর্ম এবং ধর্মীয় সংস্কার কেমন করে কৃষক শোষণের ক্ষেত্রে মহাজনের সহায়ক হয় তার ইঙ্গিত করেছেন প্রেমচাঁদ *সোয়া সের ঘেঁহু (سواسیر گیہوں)* গল্পে। এই গল্পটি নভেম্বর ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়। গল্পের নায়ক শঙ্কর এক অতিথি সাধুর জন্য গম ধার করেছিল । বিপ্র মহারাজ যখন শঙ্করের নিকট ধার নেয়া গমের দাম নিতে আসে তখন শঙ্কর ইচ্ছা করলে তা অস্বীকার করতে পারত। যেহেতু এই ঋণের কোনো লিখিত দলিল ছিল না। কিন্তু অশিক্ষিত কৃষক শঙ্করের মনে ধর্মভীতি ও ব্রাহ্মণভীতির কারণেই সে ঋণ শোধ করতে সম্মত হয়। ব্রাহ্মতেজ সম্পর্কে তার মনে আজীবন যে সংস্কার জমা হয়েছে এ তারই ফল। এই অশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায় কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না, এটি পূর্বজন্মের পাপের শাস্তি বলেই মেনে নেয়। প্রেমচাঁদের ভাষায়,

> سواسیر گیہوں کی بدولت عمر بھر کے لیے غلامی کی بیڑیاں پاؤں میں ڈالنی پڑیں۔اس بدنصیب کو اب اگر کسی خیال سے تسکین ہوتی تھی
> تو اسی سے کہ یہ سب میرے پچھلے جنم کا بھوگ ہے۔ [১৯]

(সোওয়া সের ঘীর কারনে জীবনভর দাসত্বের শৃংখল পায়ে পড়তে হল। এই দূর্ভাগ্য শাস্তি বয়ে আসতে পারে এমন ভাবনায় যে, এ সব কিছু সময় পূর্বে জন্মের পাপের ফসল।)

গল্পের শেষে দেখা মেলে, সে এক মুঠো গমের জন্য ঠাকুরের ক্ষেতে বিনা বেতনে বেগার কাজ শুরু করে। তার স্ত্রী কোনোদিন কায়িক পরিশ্রম করেনি অথচ এখন তাকে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়। বিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল, শংকর আর বেঁচে নেই। কিশোর থেকে যৌবনে পদার্পণকারী শংকরের ছেলেটি এখন ঠাকুরের বাড়িতে দৈনিক বেগার খাটে। একমাত্র ভগবানই জানেন, কবে ছেলেটি বাবার দায় থেকে মুক্তি পাবে ? প্রেমচাঁদ এভাবে সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাস্তব ঘটনাগুলো খুজে বের করে পাঠককে সজাগ করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তার মতে পৃথিবীতে এখনও এমন ঠাকুরের ন্যায় মহাজনের অভাব নেই।

[১৯] প্রেমচাঁদ, 'সোয়া সের ঘেঁহু', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ, (মদন গোপাল সম্পাদিত)*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- **১১**, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৩৮৭।

রাহে নাজাত (راہ نجات) গল্পটি ১৯২৪ সালে হিন্দিতে 'বিশাল ভারত' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে 'ফেরদৌসে খেয়াল' পত্রিকায় উর্দুতে ছাপানো হয়।[২০] গল্পে প্রেমচাঁদ সামাজিক বৈষম্যের চিত্রটি উপস্থাপন করতে গিয়ে লিখেন- সিপাহির গর্ব যেমন তার লাল পাগড়ি, সুন্দরীর গর্ব তার অলংকার এবং বৈদ্যের গর্ব তার বৈঠকখানায় অপেক্ষমান রোগীর ভিড়, তেমনই কৃষকের গর্ব তার ক্ষেতের লাগানো ফসল। গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র ঝিঙ্গুর তার আঁখের খেতের দিকে তাকিয়ে কেমন একটা নেশায় বুঁদ হয়ে যায়। এই ক্ষেতের মাধ্যমেই সে ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে। গ্রামের এক সচ্ছল লোক ছিল বুদ্ধু, গল্পে দেখা যায়- বুদ্ধু হিংসার বশবতী হয়ে ঝিঙ্গুরের আখের ক্ষেত পুরিয়ে ফেলে। তখন ঝিঙ্গুর মিলে বুদ্ধুকে পথের ফকিরে রুপান্তরিত করার জন্য সে চামার পাড়ার হরিহরের সাথে শলা পরামর্শ করতে থাকে। অনেক পরামর্শের পর ঝিঙ্গুর আর হরিহর একটা ছক একে ফেলে। ঝিঙুরের অনুরোধে বুদ্ধু তার বাছুরটাকে তার ভেড়া পালের সাথে রেখে দেয়। রাতে বুদ্ধুর বাড়িতে সত্য নারায়নের কথা হচ্ছিল, ব্রাহ্মনদের ভোজন চলছিল। সকালে বাছুরটাকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেলো। গোক হত্যার অপরাধে ব্রাহ্মণরা বুদ্ধুর বিরুদ্ধে রায় দেয় যে,

برہمن۔دیوتا کا بھی اس کے پرائشچت کرانے میں فائدہ تھا۔ بھلا ایسے موقع پر کب چوکنے والے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بدھو کو ہتیا لگ گئی۔ برہمن جی اس سے جل رہے تھے کسر نکالنے کا موقع ملا۔ تین ماہ تک بھیک مانگنے کی سزا دی گئی۔ پھر سات تیرتھوں کی جاترا، اس پر پانچ سو برہمنوں کا کھلانا اور پانچ گایوں کا دان۔ بدھو نے سنا تو ہوش اڑ گئے، رونے پیٹنے لگا، تو سزا گھٹا کر دو ماہ کر دیگئی۔اس کے سوا کوئی رعایت نہ ہو سکی۔ نہ کہیں اپیل، نہ کہیں فریاد۔ بے چارے کو کہ سزا قبول کرنے پڑی۔ [২১]

(ব্রাক্ষণ-দেবতার এই প্রায়শ্চিত্ত প্রদানে তাদের কল্যাণ ছিল। এমন ভালো সুযোগ কে আর হাতছাড়া করে ? ফলাফল এই হলো যে, বদ্ধুর উপর হত্যার আরোপ লাগানো হলো। ব্রাক্ষণদেরও রাগ ছিল ওর উপর। প্রতিশোধ নেবার এই মোক্ষম সুযোগ। তারা বিধান দিলেন তিনি মাসের ভিক্ষাদণ্ড, তারপর সপ্ততীর্থ দর্শন, সবশেষে পাঁচশো ব্রাক্ষণ ভোজন এবং পাঁচটি গাভী দান। সমস্ত শুনে বুদ্ধুর মাথায় হাত। সে কাঁদতে লাগল। তখন ভিক্ষাদণ্ড কমিয়ে দু-মাস বহাল করা হল এর বেশি আর রেয়াত করা গেল না। এর উপর আর কোনো আপিল আদালতে চলে না। নিরুপায় হয়ে বেচারিকে এই দন্ডই মেনে নিতে হল।)

হিংসার বশবর্তী হয়ে উচু বর্ণের লোকদের দ্বারা গ্রামের এক সহজ সরল কৃষককে সর্বশান্ত করে পথে বাসানের এক উজ্জ্বল গল্প হলো রাহে নাজাত। বুদ্ধু এত কান্না কাটির পরও উঁচু বর্ণের লোকদের একটু দয়া মায়া হয়নি। কি ভাবে তাকে ফকির করবে এই ধ্যান ধারণাতেই তারা মগ্ন ছিল। যদিও ভিক্ষাদণ্ড তিন মাসের জায়গায় এক মাস কমিয়ে দুই মাস করা হয়। তারপরও এই বিচার কৃষক বুদ্ধুকে নি:স্ব করা থেকে রেহাই দেয় নি।

---

[২০] আব্দুল কাভী দাছনভী, *প্রেমচান্দ*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ২০১১, পৃ. ১৭।

[২১] প্রেমচাঁদ, 'রাহে নাজাত', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ, (মদন গোপাল সম্পাদিত)*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ২৭১।

শ্রমিক মালিককে যতই সহযোগীতা করুক না কেন, সময় মত মালিকের কাছ থেকে সে এর যথাযথ প্রতিদান পায় না। এটাই সত্য আর এটাই বাস্তব সমাজ চিত্র। প্রেমচাঁদ তদ্রুপ চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর *ইনসান কি কিমত* (انسان کی قیمت) গল্পে। রামদাশ একটি মিলে কাজ করে বোনাস সহ সব কিছু মিলিয়ে মাসে ২০ রূপি রোজগার করেন। সংসারে স্ত্রী, সন্তান, মা সব মিলিয়ে ডজন খানেক মানুষ। শীত, বর্ষা, গরম যাই হোক না কেন তাকে প্রতিদিন মিলে যেতে হয়। দুপুরে ২/৪ মুষ্টি ডালশুট খেয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি এসে বাসি শুকনো রুটি খেত। তাতেই সে ঈশ্বরের প্রতি খুশি। একদা রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে রামদাস তার স্ত্রীর সাথে মেয়ে চাম্পার বিয়ে নিয়ে কথা বলেন। বিয়ের জন্য টাকা না থাকায় সে রায়ে নিরঞ্জন সাহেবের কাছ থেকে ধার নেওয়ার কথা চিন্তা করল। রামদাসের বাড়ির সামনেই বিশাল বাড়িতে রায় সাহেব থাকেন। যে মিলে রামদাস কাজ করে, সেই মিলের গুরুত্বপূর্ণ সে অংশীদার। রায় সাহেবের মার সাথে রামদাসের স্ত্রী এবং মেয়ের ভাল সম্পর্ক ছিল। পরদিন রামদাসের স্ত্রী রায়ে সাহেবের মার কাছে কথায় কথায় নিজের মেয়ের বিয়ের কথা তুলেন। রায় সাহেবের মা তাকে বিয়ে ঠিক করা এবং বিয়েতে সাহায্য করার কথা দিলেন। রামদাশ ও তার স্ত্রী ভাবে,

"وہ چاہیں تو ایک بیاہ کیا چار بیاہ کرا سکتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنی بات سے پھر جائیں گے۔ بڑے آدمی ہیں۔ بڑے آدمیوں کو اپنی بات کا بڑا خیال رہتا ہے۔" [২২]

(সে চায় তুমি এক বিয়ে কেন, চার বিয়ে করতে পারবে। এটা বলা যাবে না যে, সে তার কথায় চলে যাবে। কারণ সে বড়োলোক, আর বড়ো লোকেরা কথার কখনোই বর খেলাপ করে না।)

কিন্তু এতে রায় সাহেবের স্ত্রী রাগ করলে রায় সাহেবের মা তাকে বলেন- তিনি সাহায্য মানে ১০/৫ রূপি দিয়ে সাহায্য করবেন বুঝিয়েছেন। চম্পার মার কাছ থেকে রায় সাহেবের মার কথা শুনে রামদাস মেয়ের বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তার বিশ্বাস বিয়ের পুরো খরচ রায় সাহেবই দিবেন। তিনি ভাবেন- বিয়ের মাত্র বিশদিন আগে রামদাসের স্ত্রী আবার রায় সাহেবের মার কাছে যান মেয়ের বিয়ে নিয়ে কথা বলতে। তিনি আশা করেছিলেন, বিয়ের কথা শুনেই রায় সাহেবের মা টাকা দিয়ে দিবেন। কিন্তু তেমন না হওয়ায় তিনি ভাবলেন বড়লোক মানুষ আজ না হয় কাল দিবে। কিন্তু শেষে তার আশা পূরণ হল না। কারণ রামদাসের অবস্থা বুঝতে পেরে রায়ে সাহেবের স্ত্রী বলেন, সবাইকে সবার সামর্থ্য অনুযায়ী সবকিছু করতে হয়। তিনি আরো বলেন,

"بہو جی ! چمپا کا بیاہ تو تم ہی کرو گی۔ ہماری ایسی حیثیت کہاں جو بیاہ کر ہں۔ کھانے ہی کے ٹوٹے ہیں۔" [২৩]

---

[২২] মুন্সি প্রেমচাঁন্দ, 'ইনসান কি কিমত', *মাজমুয়াহ মুন্সি প্রেমচাঁন্দ ঃ আফছানে*, ছংগে মিল পাবলিকেশন, লাহোর, ২০০২, পৃ. ২৩৮।
[২৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯।

(ভুজি! চম্পার সাথে বিয়ে তো তোমাকেই করাতে হবে। আমার এমন কি অধিকার বিবাহ করানোর। খাবারের জিনিস হতো তাহলে তা ভেঙ্গে ফেলা যেত।)

এই বলে ভিতরে গিয়ে চাকরানী দিয়ে ১৫ টাকা পাঠিয়ে দেয়। চম্পার মা অনেক অবাক হয়। ১৫ টাকা নিয়ে রামদাসের সামনে রেখে দেয়। আশা পূরণ না হওয়ায় সব দোষ রামদাস স্ত্রীর উপর দেয়। অবশেষে রামদাসের মিলের মালিক শরদার কথা মনে পড়ে। শারদা প্রসাদ তেমন ধনী মানুষ না হলেও সমাজে সবার কাছে অনেক সম্মানিত মানুষ। রামদাস তার সমস্যার কথা তার কাছে বলেন। মারদা তাকে বুঝিয়ে বলেন, দারিদ্রতার কারনেই এমন দূর্বল কথা সে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু তারপর ও শারদা রামদাসকে বলে- এই বছর মিলের মুনাফা থেকে রায়ে সাহেবের ৫০-৬০ হাজার টাকা আয় হয়েছে। যা থেকে ৩/৪ শত টাকা দিয়ে অবশ্যই সাহায্য করবেন।

শারদা রামদাসকে নিয়ে রায় সাহেবের কাছে গিয়ে তাকে অনুরোধ করেন রামদাসকে সাহায্য করার জন্য কিন্তু রায় সাহেব বিরোধিতা করে বলেন, রামদাসের মতো সাধারন মুজুরের কোন দাম নেই। যে তাকে সাহায্য করা তার দায়িত্ব। তখন শারদা তাকে বলেন মানুষের সবচেয়ে বড় দাম হচ্ছে মানবতা। রুপিতে মানুষের দাম হয়না। রায় সাহেব শারদাকে বলেন- তিনি এমনিতেই রাম দাসকে সাহায্য করতেন। কিন্তু মানবতার কথায় তিনি সাহয্য করবেন না। শারদা প্রসাদের সাহয্যে কোন রকমে চম্পার বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু রায় সাহেবের মিলের শ্রমিকরা যখন মানবতা বুঝল, নিজের অধিকার বুঝল, তখন তারা হরতাল ডাকল। এক সপ্তাহ পর্যন্ত মিল বন্ধ থাকল। একদিন রায় সাহেব মোটর গাড়ী দিয়ে রাস্তায় বের হলে শ্রমিকরা তাকে আটক করে সম্মিলিত ভাবে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেয়। এমতাবস্থায় রামদাস এসে তাকে বাঁচায়। রায় সাহেব শেষ পর্যন্ত শারদা প্রসাদকে বিষয়টি মিমাংসা করে দিতে বলেন এবং রামদাসের সাথে করা ভুলের জন্য ক্ষমা চান।

কজাকী (قزاقی) গল্পটি এপ্রিল, ১৯২৬ সালে প্রথমে হিন্দিতে 'মাহেনামা মাধবীতে' প্রকাশিত হয়। পরে উর্দুতে গল্পটি 'প্রেম চাল্লিছি'র প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[২৪] গল্পে লেখক বাল্য স্মৃতিতে কজাকী এমন একজন মানুষ যাকে লেখক চল্লিশ বছর কেটে যাওয়ার পরও ভুলতে পারেননি। কজাকী লেখকের বাবার পোস্টাফিসে পাহারাদার হিসেবে কাজ করত। কজাকী ছিল হাসিখুশি, সহাসী আর প্রাণবন্ত। প্রতিদিন কজাকী মেল ব্যাগ নিয়ে আসত। সারা রাত থেকে সকালে চলে যেত। প্রতিদিন বিকাল ৪টা বাজলেই লেখক কজাকীর জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করত। কজাকী আসতেই দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে তার কাধে চড়ে বসত। কজাকী মেল ব্যাগ পোস্টাফিসে রেখেই লেখক এবং তার বন্ধুদের সাথে মাঠে গিয়ে খেলত এছাড়াও তাদের গল্প এবং গান শুনাত। একদিন কজাকীর আসতে দেরি হয়ে গেল। লেখক

---

[২৪] জি. কে. মানিক টালা, *প্রেমচান্দ ঃ খায়াত-ই-নূর*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ১৯৯৩, পৃ. ২৫।

অপেক্ষা করতে করতে কজাকীর আশা ছেড়েই দিয়েছিল। এমন সময় দেখা গেল কজাকি লেখকের জন্য একটি হরিণের বাচ্চা নিয়ে তার সামনে হাজির হল। লেখকতো মহা খুশি, সব রাগ ভুলে গিয়ে ভাবতে লাগল- 'আমার তখনকার খুশি মাপতে পারে এমন কার সাধ্য আছে। তারপর অনেক শক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। ভালো ভালো পদকও পেয়েছি। রায় বাহাদুর ও হয়েছি, কিন্তু সেদিনের সেই আনন্দ কোনদিন পাইনি।' তাদের সাথে সময় কাটানোর ফলে কজাকীর একদিন পোস্টাফিসে যেতে দেরি হয়ে যায়। যার কারণে লেখকের বাবা অনেক রেগে গিয়ে কজাকীকে বলেন,

"تھیلار کھدے اور اپنی گھر کی راہ لے۔ سور، اب ڈاک لے کے آیا ہے۔ تیرا کیا بگڑے گا؟ جہاں چاہیگا مزدوری کرے گا۔

ماتھے تو میرے جاھیگی، جواب تو مجھ سے طلب ہو گا"۔ [২৫]

("যা ঝোলা রেখে নিজের বাড়ির পথ দ্যাখ। শুয়োর কোথাকার, এখন ডাক নিয়ে এসেছে। তোর আর কী ক্ষতি হবে! যেখানে যাবি কুলি মুজুরি জুটিয়ে নিবি। মাথা তো আর কাটা যাবে না। কৈফিয়ত তো আমার কাছে থেকে তলব করা হবে।")

তার কাজের গাফলতির জন্য নাদির শাহী হুকুম জারি করা হলো, লেখক দেখলেন যে,

"" بابو جی نے بچارے کو نکال دیا چپراس، صافر، بلّم سب چھین لیے، اب بچارا کیا کرے گا، بھوکوں مر جائے گا"۔ [২৬]

("বাবুজী বেচারা কজাকীকে বের করে দিলেন। তার বল্লম, চাপরাশ আর মাথার পাগড়ি কেড়ে নেওয়া হল।")

কজাকীর চাকরি চলে যাওয়ায় লেখক অনেক কষ্ট পান। যাবার সময় কজাকী তাকে কথা দিয়ে যায় যে সে আবার আসবে। লেখক তখন তার মার কাছে গিয়ে কজাকীর সব কথা বলেন, লেখকের মা বিষয়টাকে ঠাট্টা হিসাবে নিলে লেখক তার মাকে বলনে -"ওর চাপরাশ, বল্লম, পাগড়ি সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। এখন বেচারা কী করবে বলো ? না খেতে পেয়ে মরে যাবে।" প্রেমচাঁদ এভাবে সামান্য দোষে দুষ্ট বড় সাহেব এক নিচুজাত চাপরাশির চাকরী কেড়ে নিয়ে তার অন্য আহরনে কড়াঘাতের দৃষ্টান্ত কজাকী গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

ইস্তফা (استعفٰی) গল্পে উচ্চপদস্থ বড় সাহেব নিম্নপদস্থ কর্মচারির প্রতি বিরুপ আচরণ তুলে ধরতে প্রেঁমচাদ উক্ত ছোটগল্পটি চয়ন করেন। গল্পটি ১৯২৮ সালে প্রথমে হিন্দিতে 'ভাতিনদো'তে প্রকাশিত হয়। পরে 'প্রেম চল্লিছি'র প্রথম অধ্যায়ে উর্দুতে ছাপা হয়। [২৭] অফিসে যারা কাজ করে তারা সাধারণত মুক প্রকৃতির হয়ে থাকেন। মজুর, কুলি

---

[২৫] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'ঈদগাহ', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানেঃ তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৪০০।
[২৬] প্রফেসার শাকিলুর রহমান, *প্রেমচাঁদ কা ফান*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ১৯৯৩, পৃ. ১১০।
[২৭] আব্দুল কাভী দাছনভী, *প্রেমচাঁন্দ*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ২০১১, পৃ. ২০।

বা ভিখারিও অসম্মানিত হলে তার প্রতিক্রিয়া দেখায়। কিন্তু এই চাকুরিজীবীদের যতই মেজাজ দেখানো হোক, যতই হম্বি-তম্বি বা টিটকিরি দেওয়া হোক, সব কিছুই মুখ বুঝে মেনে নেন। পৃথিবীর সব কিছুতেই পরিবর্তন আসে সময়ের আবর্তনে কিন্তু তাদের কপালে কখনো পরিবর্তন আসে না। তেমনি একজন হলেন লালা ফতেচাঁদ। মানুষ বলে নামের প্রভাব নাকি মানুষের উপরই পড়ে, কিন্তু লালা ফতেচাঁদের বেলায় তার উল্টো। তাকে হারচাঁদ বললেও অত্যুক্তি হবে না। জীবনের চারপাশে তার শুধু পরাজয় আর নিরাশা, অফিসে হার, জীবনে হার, বন্ধুরাও বিশ্বাস ঘাতক ছিল। পুত্র-সন্তান ছিল না। কন্যা ছিল তিনটি। দুই মৃত ভাইয়ের বউদেরও তিনি দেখাশোনা করতেন। স্বাস্থ্যও তেমন ভাল ছিল না, সকাল ন'টায় অফিসে যেতেন আর আসতেন সন্ধ্যা ছ'টায় জগৎ সংসার, ইহলোক পরলোক, সবই ছিল অফিস। ধর্ম বা খেলাধুলার প্রতিও কোনো আকর্ষণ ছিল না।

একবার তিনি অফিস থেকে ফিরে শুয়ে ছিলেন। এমন সময় ছোট মেয়ে এসে জানাল অফিস থেকে চাপরাশি এসেছে। লালা ফতেচাঁদ যেতে চাইলে তার স্ত্রী শারদা কিছু ডালমুট ও লাড্ডু খেয়ে যেতে বলেন। কিন্তু চাপরাশি বাব বার হাঁক দেওয়ায় অল্প কিছু খেয়েই বেড়িয়ে যান। চাঁপরাশি তাকে তাড়াতাড়ি দৌড়ে যেতে বলেন, তা না হলে বড় সাহেব দেখেই মেজাজ দেখাতে শুরু করবে। কিন্তু লালা ফতেচাঁদ হেটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। চাপরাশির সাথে তাল মিলিয়ে হাঁটতে গিয়ে কুচকিতে যন্ত্রণা শুরু হয়। সমস্ত শরীর ভিজে গিয়ে লালা ফতেচাঁদ চোখে মুখে সর্ষেফুল দেখতে শুরু করেন। ফলে তিনি চাপরাশিকে আগে যেতে বলে দেন। অন্যদিকে চাপরাশি বড় সাহেবের বাংলোতে যেতেই তার উপর দেরি করার জন্য সাহেব মেজাজ দেখাতে শুরু করেন। চাপরাশি সাহেবকে বলল, ফতেচাঁদ বাড়ি থেকে বের হতে বেশি সময় নিয়েছে। লালা ফতেচাঁদ বাংলোতে আসতেই বড় সাহেবের ক্রোধের শিকার হন। বড় সাহেব চাপরাশিকে দেবীর শাস্তি সরুপ লালা ফতেচাঁদের কান ধরতে বললে চাঁপরাশি উত্তর দেয়,

”حضور میں یہاں نوکری کرنے آیا ہوں، مار کھانے نہیں آیا ہوں۔ میں بھی عزت دار آدمی ہوں۔ حضور اپنی نوکری لے لیں۔

آپ جو حکم دیں، وہ بجالانے کو حاضر ہوں لیکن کسی کی عزت نہیں بگاڑ سکتا۔ نوکری تو چار دن کی ہے۔ چار دن کے لیے کیوں

زمانہ بھر سے بگاڑ کریں۔“ [২৮]

(হুজুর, আমি এখানে চাকরি করতে এসেছি, মার খেতে আসিনি। আমার ও মান সম্মান ইজ্জত আছে। হুজুর, আপনি আমার চাকরি খেয়ে নিন। আপনি আমাকে যা হুকুম করবেন আমি তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব, কিন্তু কারও ইজ্জত আমি নষ্ট করতে পারব না। চাকরি তো চার দিনের জন্য। এই ক'দিনের জন্য আমার সারা জীবনকে কেনই বা ক্ষতি করব।)

চাঁপরাশির এই কথা শুনে বড় সাহেব হান্টার নিয়ে তেড়ে এলে চাঁপরাশি পালিয়ে যায় কিন্তু এবার বড় সাহেব নিজেই লালা ফতেচাঁদের কান টেনে অফিস থেকে ফাইল নিয়ে আসতে বলেন। লালা ফতেচাঁদ কোন ফাইল আনবে

[২৮] মুন্সি প্রেমচাঁন্দ, 'ইস্তফা', *মাজমুয়াহ মুন্সি প্রেমচাঁন্দ ঃ আফছানে*, ছংগে মিল পাবলিকেশন, লাহোর, ২০০২, পৃ. ৪৪৮।

জানতে চাইলে বড় সাহেব তাকেও হান্টার দিয়ে দৌড়ান। লালা ফতেচাঁদ ফাইল আনতে গিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দেন, পথে অপমান বোধ তার পায়ে বেড়ির মত জড়িয়ে ধরে। তার মনে হয় শারীরিক ক্ষমতায় সাহেবের সমকক্ষ না হলেও তার পায়ে তো জুতাও ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তার আবার মনে হয়, তার কিছু হলে স্ত্রী সন্তানের কি হবে ? বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে সব বললে শারদা তাকে অপমানের জবাব দিতে উৎসাহিত করে। সে বলে,

شاردر ”جہاں ایشور کی مرضی ہوتی۔آدمی لے لیے سب سے بڑی چیز عزت ہے۔عزت گنوا کر بال بچوں کی پرورش

نہیں کی جاتی۔تم اس شیطان کو مار کر آئے ہو۔میں غرور سے پھولی نہیں سماتی۔ [২৯]

(সরদার- "ভগবানের যা ইচ্ছে তাই হত। মানুষের সবচেয়ে বড়ো জিনিস হলো তার ইজ্জত। ইজ্জত খুইয়ে ছেলে মেয়েদের মানুষ করা যায় না। তুমি যদি এই শয়তানকে বেধড়ক পিটিয়ে আসতে তাহলে আমার আনন্দের সীমা আর থাকত না।")

স্ত্রীর মুখে এমন কথা শুনে উদভ্রান্তের মতো লালা ফতেচাঁদ ঘর থেকে বের হয়ে যান, ভয়ে ভীত হয়ে নয় বরং শক্তিশালী সাহসে ভরপুর এক জোয়ানের মতো। যাওয়ার পথে এক বন্ধুর বাড়ি থেকে একটা লাঠি নিয়ে বড় সাহেবের বাংলোয় হাজির হন। লালা ফতেচাঁদকে দেখে বড় সাহেব নিজের পরিণতির কথা চিন্তা করে মিষ্টি কথায় লালা ফতেচাঁদকে ভুলানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু লালা ফতেচাঁদ বড় সাহেবকে কান ধরতে বলেন, সে যেন আর কোনদিন কাউকে অপমান না করে। না হলে লালা ফতেচাঁদ নিজেই সাহেবের কান ধরবে। কিন্তু বড় সাহেব চালাকি করে লালা ফতেচাঁদের লাঠি কেড়ে নিতে আসলে সে সাহেবের মাথায় জোরে আঘাত করে বসে। দ্বিতীয়বার আঘাত করতে গেলে সাহেব কান ধরে বলে সে আর কখনো কাউকে অপমান করবে না। এবার বড় সাহেব তাকে বরখাস্ত করার কথা বললে, লালা ফতেচাঁদ নিজেই তাহাকে ইস্তফা দেওয়ার কথা জানায়। কিন্তু বড় সাহেব তাকে কাজে বহাল থাকতে বলেন, জবাবে লালা ফতেচাঁদ বলেন,

”اب تم جیسے پاجی آدمی کی ماتحتی نہ کروں گا۔“ [৩০]

("এখন আমি তোমার মতো পাঁজি বদমাস লোকের অধীনে আর কাজ করব না"।)

প্রেমচাঁদের এমন অনেক গল্প রচনা করেছেন যাতে দেখা মেলে মহাজনী ও প্রজার মধ্যে অগনিত শ্রেণী বৈষম্যতা। সমাজের এই অধপতরে মূলে মহাজনীদের উৎপাত ও তার প্রতিবাদ প্রেমচাঁদ করেছেন তার মেধা ও কলমের তুলিতে। যা পরবর্তীতে পাঠক মনে গভীর ভাবে দাগ কাটে।

---

[২৯] মুন্সি প্রেমচাঁন্দ, 'ইস্তফা', *মাজমুয়াহ মুন্সি প্রেমচাঁন্দ ঃ আফছানে*, ছংগে মিল পাবলিকেশন, লাহোর, ২০০২, পৃ. ৪৫০।
[৩০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫২।

প্রেমচাঁদ তার ছোটগল্পে নারীকে রচনা করেছেন বিচিত্র দৃষ্টিকোন থেকে। শহুরে, গ্রামীণ, উচ্চ-মধ্যম-নিম্ন শ্রেণী, সতী-অসতী, স্বৈরিণী ও শিক্ষাদাত্রী প্রভৃতি সব রকমেরই দেখিয়েছেন। এদিকে বাংলা সাহিত্যে নারী চরিত্রের স্রষ্টা হিসেবে যার নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়, সেই শরৎচন্দ্রের চেয়েও তার নারী চরিত্র সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য অনেক বেশি। কারণ এই নারীদের তিনি সৃষ্টি করেছেন অনেকটা তাদের শ্রেণী-স্থিতির দিক লক্ষ্য রেখে। পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে নারীরা কোন না কোন শ্রেণীর দ্বারা নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত। প্রেমচাঁদের গল্পে বিভিন্ন নারী চরিত্রের মাধ্যমে তাই ফুটে উঠেছে সুস্পষ্টভাবে।

প্রেমচাঁদ হজ্জে *আকবর* (حج اکبر) ছোটগল্পটি নারীর স্বাধীনতা খর্বের প্রতিকৃতি। গল্পটি সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ সালে 'জামানা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নারীর পরাধীনতার চিত্র অংকিত হয়েছে বিধবা আব্বাসীর জীবনের মধ্য দিয়ে। নারী যে পুরুষের ইচ্ছার দাস এবং সমাজের সেচ্ছাচারের দ্বারা জর্জরিত তা এই গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়। হজ্জে আকবর গল্পে প্রেমচাঁদ কোন আদর্শ নির্মান করেননি। বরং আব্বাসীর বৈধব্য ও তার প্রতি সমাজের বৈষম্য আচরণের মধ্যে দিয়ে সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের নিষ্ঠুরতাকেই স্পষ্ট করে তুলেছেন। গল্পে দেখা যায়- ছাবের হুসাইনের আয় ছিল কম, খরচ ছিল বেশী। নিজের একমাত্র সন্তান রুদ্রমণির খেয়াল রাখার জন্য ছাবের হুসাইন আব্বাসী দাইকে রাখেন। বাচ্চা দাইকে খুব পছন্দ করতো, সবসময়ে তার কাছে থাকতে চাইতো। যদিও দাই রাখার খরচ কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না তবুও বাচ্চার কথা ভেবে তিনি তাকে রাখেন। কিন্তু স্ত্রী সুখদা দাইকে সহজে গ্রহণ করতে পারতো না, সর্বদায় সন্দেহ করতো। ঘটনাচক্রে একদিন বাজারে দুই তরকারি ওয়ালার মধ্যেকার ঝগড়া বিবাদ দেখতে গিয়ে দাইয়ের বাড়িতে ফিরতে দেরি হয়ে যায়। দাইকে ফিরতে দেখে সুখদা অগ্নিমুর্তি হয়ে গিয়ে বলেন,

> کیا بازار میں کھو گئی تھیں ؟ دایہ نے خطاوارانہ اندار سے سر جھکا لیا۔ اور بولی۔ "بیوی ایک جان پہنچان کی ماما سے ملاقات ہو جئی۔ اور
> باتیں کرنے لگی"۔ شاکدہ جواب سے اور بھی برہم ہوئی۔ یہاں دفتر جانے کو دیر ہو رہی ہے تمہیں سیر سپاٹے کی سوجھی ہے۔ مگر
> دایہ نے اس وقت دبنے میں خیریت سمجھی۔ بچہ کو گود میں لینے چلی۔ پر شاکرہ نے جھڑک کر کہا۔ "رہنے دو۔ تمہارے بغیر بے خال
> نہیں ہوا جاتا۔" [৩১]

(কী, বাজারে হারিয়ে গিয়েছিলে ? দাই বিনীত ভাবে উত্তর দিল- এক চেনা দাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আর সে কথা বলতে লাগলো। সুখদা এই জবাবে আরও রেগে গিয়ে বলল- এদিকে অফিসে যাওয়ার সময় হয়ে যাচ্ছে আর তুমি মজা করে ঘুরে বেড়াচ্ছ? দাই তখন চুপ করে যাওয়াই সমীচীন মনে করে ছেলেকে কোলে নিতে গেলে সুখদা ঝাঁঝিয়ে উঠল- "রেখে দাও। তুমি ছাড়া তার কিছুই হবে না!)

---

[৩১] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'হজ্জে আকবর', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানেঃ তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ২২০।

অবশেষে সুখদা আব্বাসীকে বাড়ি থেকে বের করে দিল। দাই চলে যাওয়ার পর রুদ্রমণি সর্বদায় আন্না আন্না করে কান্না করতো। দাইয়ের সাথে কাটানো প্রতিটি মুহুর্তের কথা রুদ্রুমণির মনে পড়তো এবং সে সব সময় কান্নাকাটি করতো। প্রত্যক্ষরূপে দাইকে সমানে না দেখে রুদ্র এখন তার কল্পনায় মগ্ন থাকে। একা একা বসে সে কাল্পনার জগতের সাথে কথা বলত। এভাবে তিন সপ্তাহ কেটে গেল। রুদ্রর কাশি ও জ্বর হল। ডাক্তারের চিকিৎসা এখন এর একমাত্র ঔষধ দাই আব্বাসী। ছাবের হুসাইন আব্বাসীকে আনার জন্য বেরিয়ে পড়ল। আব্বাসী সংসারে সে একাই। গত তিন বছর রুদ্রকে সে আঁকড়ে বেঁচে ছিল। কিন্তু এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আব্বাসী স্বাভাবিক জীবনের ছন্দপতন ঘটল। প্রথমদিকে রুদ্রের কাছে যাওয়ার জন্য সে ছটফট করতো কিন্তু সাহস করে যেতে পারতো না। দিনরাত সে রুদ্রর চিন্তাতেই মগ্ন থাকত। এরই মধ্যে তার বড় হজ্বে যাবার সুযোগ এসে গেল। দিল্লি স্টেশনে থেকে যাওয়ার মুহুর্তেও তার রুদ্রের কথা মনে হতে লাগল। ওখান থেকে ফিরে রুদ্রকে দেখতে যাবে ভেবে মনস্থির করে সে ট্রেনে বসে পড়ল। এমন সময় আব্বাসী দেখলো যে, ছাবের হুসাইন সাইকেল নিয়ে প্লাটফর্মের দিকে আসছেন। ছাবের সাহেব আব্বাসীর কাছে গিয়ে বলল, কী আব্বাসী তুমিও রওনা হলে? আব্বাসী নম্র ভাবে অথচ গর্বের সঙ্গে উত্তর দিল হ্যা, এখানে কী করব? জীবনের ঠিক ঠিকানা কী? কে জানে কবে চোখ বন্ধ হবে? রুদ্রবাবু ভালো আছে তো ? ছাবের রুদ্রর জন্য তার কাছে আর্শীবাদ চাইল এবং বলল, যে দিন থেকে তুমি চলে এসেছো, সেদিন থেকেই সে অসুস্থ। সকল ঔষধই হার মেনেছে। আব্বাসী চোখে ঝাপসা দেখতে লাগল। তৎক্ষণাত সে বড় হজ্বের চিন্তা ঝেরে ছাবের হুসাইনের সাথে রুদ্রকে দেখতে তার বাড়ি ফিরে এল। আব্বাসী ভয়ে ভয়ে ঘরে প্রবেশ করে রুদ্রকে তার কোলে নিয়ে সজল চোখে বলল, বাবা রুদ্র! চোখ খোল। রুদ্র কিছুক্ষণ দাইকে দেখল, তারপর আন্না আন্না বলে গলা জড়িয়ে ধরল। একসপ্তাহ কেটে গেল, রুদ্র এখন পুরোপুরি সুস্থ। আব্বাসি একদিন রুদ্রকে বলল,

عباسی بولی۔"کیوں بیٹا! مجھے تو تو نے کبہ V شریف نہ جانے دیا۔میرے حج کا ثواب کون دے گا؟"۔

صابر حسین نے مسکرا کر کہا۔"تمہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب ہو گیا۔اس حج کا نام حج اکبر ہے"۔ [৩২]

("আব্বাসী বলল- কেন বাবা! তুমি আমাকে কাবা শরীফ যেতে দিলেনা। আমার হজ্বের সওয়াব কে দিবে ?
ছাবের হুসাইন মুচকি হেসে বললেন- "তোমার এর থেকেও বেশী সওয়াব হয়ে গেছে। আর এই হজ্বের নাম হজ্বে আকবর।")

প্রেমচাঁদের *কাম ওয়ালী আউর ঘরওয়ালী* (کام والی اور گھر والی) ছোটগল্পে দেখা যায়, স্বামী জ্ঞানপদেশ তার স্ত্রীকে সজাগ করে দিয়েছিলো, ঘরে ঝি আর তার মধ্যে কিসের প্রভেদ। আমি জ্ঞানপদেশের আদেশে ঝির সাথে বাসন মাজতে শুরু করলাম। আমার ননদ তা দেখে মুখ বেকিয়ে চলে গেল। আর বাড়িতে হৈ চৈ আরম্ভ করলো। এখানে প্রেমচাঁদ

---

[৩২] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'হজ্বে আকবর', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে ঃ তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ২২৭।

পরিবারের ননদের আচরণের দ্বারা ঘরের স্ত্রী ও ঝির সাথে কাজ করাকে প্রভেদ সৃষ্টি করে সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যতা দেখিয়েছেন।

নারীর উপর শোষণ ও নির্যাতনের শুরু তার জন্মলগ্ন থেকেই। কোন পরিবারে কন্যা সন্তান জন্ম হওয়াকে একটা অশুভ লক্ষণ বলে মনে করা হয়। নারী জাতির এই যন্ত্রণাকে প্রেমচাঁদ অনুধাবন করেছেন হৃদয় দিয়ে। তাঁর এই জাতীয় অসংখ্য গল্পের মধ্যে *বদ কিসমতী* তেমনি একটি গল্প। গল্পের মাধ্যমে প্রেমচাঁদ সমাজে কন্যা সন্তানের তথা নারীর অবস্থান তুলে ধরেছেন স্পষ্ট ভাবে। শ্বশুর বাড়িতে বধূর প্রতি পরিবারের শ্রেণী বৈষম্যতা দেখাতে গিয়ে *নিরাশিয়াহ* (نراشیہ) গল্পটিতে প্রেমচাঁদ নারীর বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। গল্পটি জুলাই, ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়। তিনটি কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ায় নিরুপমার শ্বশুর বাড়ির অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলছিল। স্বামী ঘমন্ডীলাল বার বার কন্যা সন্তান জন্মের পিছনে স্ত্রীর কোন দোষ নেই, এতে স্বামীও দায়ী তা বুঝেও না বোঝার ভান করে তার সাথে বাক্যলাপ বন্ধ করে দেয়। কষ্টে জর্জরিত হয়ে নিরুপমা ভাবে,

> ہاں اسے دکھ اپنے پتی دیو کی اپر سنتا کا تھا جو پڑھے لکھے آدمی ہو کر بھی اسے جلی کٹی سناتے رہتے تھے۔ پیار کرنا تو دور رہا نروپما سے سیدھے منہ بات نہ کرتے تھے کئی کئی دنوں تک گھر ہی میں نہ آتے اور آتے بھی تو کچھ اس طرح کھنچے تنے ہوئے رہتے کہ نروپما تھر تھر کانپتی رہتی تھی، کہیں گرج نہ اٹھیں۔ [৩৩]

(তার দুঃখ তার স্বামীর দুর্ব্যবহারে, শিক্ষিত হয়েও তার স্বামী রুষ্ট হয়ে দিবারাত্র তাকে কটুকথা শোনাতে ছাড়ে না। দাম্পত্য জীবনে তার সুখ দেওয়া দূরে থাক, দিনান্তে একবার স্ত্রীকে ভালবাসার কথাও শোনায় না, এমনকি নিরুপমার সঙ্গে তার বাক্যলাপ পর্যন্ত প্রায় বন্ধ। এক একদিন আবার ঘরেও ফেরে না, যদিও বা ফেরে এমন রুক্ষ মেজাজ দেখায় যে, নিরুপমা ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে। এমনি বিশ্রী সম্পর্ক তার স্বামীর সঙ্গে।)

দুঃখের কথা জানিয়ে নিরুপমা বাড়িতে আসতে চায় জানিয়ে তার বৌদি সুকেশিকে চিঠি লিখে ও তাতে সবকিছু জানায়। ভাইয়ের সাথে নিরুপমা নিজ বাড়িতে গেলে বৌদি তাকে বুঝিয়ে বলে, তারা যেহেতু তোমার সাথে সব সময় খারাপ ব্যবহার করে, তাই তাদের থেকে কিছুদিন আদর ভালবাসা পাওয়ার জন্য তুমি তোমার শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে বলবে যে, আমি মহাত্মাজীর সাথে দেখা করে এসেছি। সে আমাকে কিছু নিয়ম কানুন দিয়েছে, বলেছে এগুলো অনুসরণ করলে তোমার ছেলে সন্তান হবে। নিরুপমা শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে সবাইকে বৌদির ঐ শিখানো কথাটিই বলল। মিথ্যা আশ্বাস সকলে বিশ্বাস করল। তারপর বাড়ির শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, ননদ, স্বামী সকলে তার সেবা যত্নে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এদিকে প্রসবের দিন আতুর ঘর থেকে লেডি ডাক্তার বের হয়ে বলল যে, কন্যা সন্তান

---

[৩৩] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'নিরাসিয়াহ', প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে ঃ তারতিব ওয়া এনতেখাব, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৩১৫।

হয়েছে। শ্বশুর বাড়ির সবাই তা শুনে ক্ষেপে যায়, সকলে তাকে অভাগা, পাপী, কুলক্ষণা আরো অনেক কটু কথা শুনাতে লাগলো। সুকেশি বৌদি এবার নিরুপমার বাসায় এসে শ্বশুর বাড়ির লোকজনকে বুঝাল যে, মহাত্মাজী যে নিয়ম কানুন দিয়েছিল, নিরুপমা তা ঠিক মত মানেনি, যার ফলে তার মেয়ে হয়েছে। এবার যদি তা ঠিক মত মানা হয় তাহলে চতুর্থ কন্যা শিশুর পর পুত্র সন্তান হবে। এবারও নিরুপমার আদর যত্ন আগের থেকে বেড়ে গেল। তাকে কোন কাজই করতে দেওয়া হত না। প্রসবের দিন লেডি ডাক্তার আতুর ঘর থেকে বের হয়ে বলল, আপনাদের পঞ্চম কন্যা শিশু হয়েছে। রাগে দুঃখে ঘমন্ডীলাল বলল,

جہنم میں جائے ایسی زندگی موت بھی نہیں آجاتی۔

ابھی یہ شوکدؔگار شانت نہ ہونے پایا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا ماں کا حال اچھا نہیں ہے۔ وہ اب نہیں بچ سکتی۔ اس کا دل

بند ہو گیا ہے-[৩৪]

(জাহান্নামে যাক। এমন জীবনের সাতে কি মৃতও আসতে পারতো না ?
তখনো নিরুপমার প্রতি শাপ শাপান্ত শেষ হয়নি, লেডী ডাক্তার ফিরে এসে আবার একটা দুঃসংবাদ দিলেন, প্রসূতিকে বাঁচানো গেলো না, সে এইমাত্র হার্টফেল করে মারা গেলো।)

এ গল্পটি পাঠান্তে পাঠকদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, প্রেমচাঁদ কত মর্মস্পর্শী ভাষায় নারীদের সমাজে বৈষম্যের শিকার ও তাদের অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরেছেন।

কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়া আদিকাল থেকেই সমাজের একটি ব্যাধি বলে মনে করা হত। সমাজের কাছে কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়া ছিল একটি কুলক্ষণা, আতংক, সমাজের জন্য কন্যা সন্তান একটা অতিরিক্ত যন্ত্রণা। প্রেমচাঁদ তার সময়কালে এটা ভাল ভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তিনি নিজ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখেছিলেন ভারতীয় সামাজে নারীর অবস্থান। উচু নিচু বর্ণের শ্রেণী ও পরিবারের সকলের নিকট কন্যা সন্তান জন্ম হওয়া ছিল একটা অশুভ লক্ষণ। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত প্রেমচাঁদ তার তেঁতর (تینتر) ছোটগল্পের মাধ্যমে কন্যা সন্তানের সামাজে শ্রেণী বৈষম্যের শিকারের অবস্থান তুলে ধরেছেন নিখুত ভাবে। তেঁতর গল্পে স্বামী দামোদর দত্তের স্ত্রী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে। পরিবারের ৩ ছেলের পর মেয়ে হলে কুলক্ষণা হয়, এই কুসংস্কারে বিশ্বাস করে স্বামী, স্ত্রী ও শ্বাশুড়ী কেহই মেয়ে সন্তানটিকে সহ্য করতে পারত না। সব সময় কন্যা সন্তানের মরণ কামনা করত। তারা পার্থনা

[৩৪] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'নিরাসিয়াহ', প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে ঃ তারতিব ওয়া এনতেখাব, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৩২৫।

করত, এমন তেঁতর যেন আর কারও ঘরে না হয়। দামোদারের মা বাচ্চাটি জন্য তার মুখে শাপ অভিশাপ লেগেই থাকতো, প্রেমচাঁদের ভাষায়,

ان کی وردھاماتا لگی نوجات۔(پیداہوابچہ) کنیا کو پانی پی پی کر کوئے، گمی ہے، کلمی۔نہ جانے کیا
کرنے آئی ہے یہاں۔کسی بانجھ کے گھر جاتی تو اس کے دن پھر جاتے۔ [৩৫]

(তাঁর বৃদ্ধা মা উঠতে বসতে নবজাত কন্যাকে দোষারোপ করতে লাগলেন মুখপুড়ি, মুখপুড়ি! এখানে কী করতে এল কে জানে! কোনো বাঁজা মেয়ে ছেলের ঘরে গেলে তার দিন ফিরে যেত।)

সামাজিকতা রক্ষার্থে তারা প্রতিবেশীদের গান-বাজনা ও আপ্যায়ন করালো। মায়ের অবহেলা ও বুকের দুধ না পাওয়াতে বাচ্চাটি দূর্বল হয়ে পড়ে। ৩-৪ মাস যাবার পর দামোদার বাচ্চাটিকে দেখে মায়া হয়, সে মনে করে কুসংস্কারে বিশ্বাস করে বাচ্চাটিকে কষ্ট দেওয়া পাপ, ঈশ্বর ও তাদের ক্ষমা করবে না। আর বাচ্চাটির বা দোষ কিসের ? সে তখন বাহিরে গিয়ে তার বড় ছেলে সিন্ধুকে দিয়ে বাচ্চাটিকে ছাগলের দুধ খাওয়াতে শুরু করল। এতে কয়েক মাসে বাচ্চাটি হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে গেলো। এমন হৃষ্ট-পুষ্টতা দেখে একদিন শ্বাশুরী বৌকে বলে,

لڑکی کا بڑا چھوہ کرتی ہو؟ ہاں بھائی، ماں ہو کہ نہیں، تم نہ چھوہ کروگی تو کرے گا کون؟
امّاں جی، ایشور جانتے ہیں جو میں اسے دودھ پلاتی ہوں۔ [৩৬]

(মেয়েকে খুব যত্ন আত্তি করছ না ? তা তুমি তো মা, তুমি যত্ন করবে না তো কে করবে ?
মা, ঈশ্বর জানেন, আমি ওকে দুধ পান করাই কিনা ?)

এদিকে মার ও বাচ্চাটির প্রতি আস্তে আস্তে স্নেহ মমতা বাড়তে থাকে, এই ভাবে আরো দুটো মাস কাটার পর শ্বাশুড়ী ভাবে কেন সংসারে কোন দূর্ঘটনা ও অমঙ্গল হচ্ছে না? তখন সে নিজেই বুকের ব্যাথা অসুস্থতার ভান করে মরে যাবার ভয় দেখিয়ে ছেলে ও বৌকে বুঝাতে থাকে, তার অসুস্থতার জন্য ঐ তেঁতর মেয়েটিই দায়ী। প্রতিবেশীরা বৃদ্ধাকে শেষ দেখা দেখতে এসে বলে,

---

[৩৫] প্রেমচাঁদ, 'তেতঁর', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৪০৫।
[৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১০।

ایک نے کہا۔ یہ تو کہو بڑی کشل ہوئی کہ بڑھیا کے سر گئی نہیں تو تینتر ماں باپ دو میں سے ایک کو لے کر تبھی شانت ہوتی ہے۔ دیونہ کرے کسی کے گھر تینتر کا جنم ہو۔

دوسری بولی۔ میرے تو تینتر کا نام سنتے ہی روئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھگوان بانجھ رکھے پر تینتر نہ دے۔ [৩৭]

(একজন বলল, ভাগ্যিস ব্যাপারটা বুড়ির ওপর দিয়ে যাচ্ছে। নয়তো তেঁতর তার মা বাবা কেউ একজনকে খেয়ে তাতেই শান্ত হত। ভগবান যাই করুণ কারও ঘরে যেন তেঁতরের জন্ম না হয়।
দ্বিতীয়জন বলল, আমার তো তেঁতরের নাম শুনলেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। ভগবান আমাকে বরং বাঁজা রাখুক কিন্তু তেঁতর যেন না দেন।)

ঈশ্বর যেন নারীদের বন্ধ্যা রাখে, তবুও তেঁতর মেয়ে যেন কারো ঘরে না দেয়। অনেক ভালো যে, একজন বৃদ্ধার প্রাণ যাচ্ছে, নইলে ওই সর্বনাশী তেঁতর মেয়ে তার মা-বাবা দু'জনের মধ্য থেকে একজনকে নিয়ে তবে শান্ত হত।

কন্যা সন্তানের প্রতি বাবা মার বিরুপ ধারণার আরেকটি গল্প হলো *সুভাগী* (*شوبھاگی*)। তুলসী মাহাতোরের ছেলে রামু এবং মেয়ে সুভাগী। ছেলেকে রত্ন ভেবে তার জন্মের পর পরিবার ধার কর্য করে র্অথ ব্যয় করে আনন্দ করেন কিন্তু সুভাগীর জন্মের পর হাতে অর্থ থাকা সত্বেও তার জন্য খরচ করেননি। এটা পরিবারের কর্তাদের ছেলে মেয়ের বৈষম্য দৃষ্টি করণের একটি চিরাচরিত প্রতিচ্ছবি। রামু জোয়ান হয়েও অকালকুষ্মান্ডু কিন্তু সুভাগী ঘরের কাজে যেমন পটু, চাষাবাদের কাজেও তেমনি পরিপাটি। তথাপি মা বাবার কাছে রামুর কোন দোষ চোখে পড়ত না কিন্তু গল্পে দেখা যায়, এগারো বছরেই সুভাগী কে নিয়ে পরিবারটি অনেক চিন্তিত ছিল বিধায় তারা সুভাগীকে বাল্য বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেন। কিন্তু স্বামীর সংসার তার বেশী দিন টিকেনি, স্বামী মারা যাওয়ায় অল্প বয়সেই সে বিধবা হয়ে যায়। মা লাছমীর সুভাগীকে নিয়ে আরও দুচিন্তায় পড়ে যান। এখানে লেখক কন্যা সন্তানের প্রতি পিতা মাতার অসমতা মনোভাবটি তুলে এনেছেন। সুভাগীর জীবনদ্বশায় যে এক করুণ পরিনতি ঘটে গেল তার জন্য সম্পূর্ণ দুষের ভাগিদার তার পরিবার।

প্রেমচাঁদের পারিবারিক শ্রেণী বৈষম্যের গল্পগুলো মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করা আরেকটি গল্প হলো- *বড়ে ঘর কি বেটি* (*بڑی گھر کی بیٹی*)। যা 'জামানায়' ডিসেম্বর, ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়। এটাই প্রথম ছোটগল্প যেটি প্রেমচাঁদ নামে ছাপা হয়। [৩৮] গল্পের নায়িকা আনন্দী বড় ঘরের মেয়ে। বাবা ছোটখাটো তালুকদার। ধুমধামের সাথে শ্রীকান্তের সাথে

---

[৩৭] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'নিরাসিয়াহ', প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানেঃ তারতিব ওয়া এনতেখাব, , মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৪১৩।
[৩৮] আব্দুল কাভী দাছনভী, *প্রেমচাঁন্দ*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ২০১১, পৃ. ১১।

আনন্দীর বিয়ে হলো। শ্বশুর বাড়িতে এসে নতুন পরিবেশে আনন্দী খাপ খাইয়ে নিল। শ্রীকান্তের ছোট ভাই লালবিহারী একদিন পাখি মেরে এসে ভাবীকে তা রাঁধতে দিল। পাখি রাঁধতে গিয়ে আনন্দী সব ঘি তরকারীতে ঢেলে দিল। পরে খাবার সময় খেতে বসে ডালে ঘি না দেখে লালবিহারী রেগে টং। ঘি নিয়ে লালবিহারীর সাথে আনন্দীর কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে সে আনন্দীকে লক্ষ্য করে তার খড়মটি ছুঁড়ে মারে। আনন্দী খড়ম হাতে ধরে ফেলে; ফলে তার মাথা অল্পের জন্য রক্ষা পায়।

প্রেমচাঁদ তার এই ছোটগল্পের মাঝে সামাজিক বাস্তব চিত্র যেখানে ঘরের বউদের উপর শ্বশুর-শ্বশুরী ও ননদ-দেবর দ্বারা ছোট খাটো বিষয়ে বউদের প্রতি যে অত্যাচার, অনাচার করা হয়ে থাকে তা সহজ ভাষায় বুঝাতে চেয়েছেন। তার মতে এই বৈষম্যের কারণ হলো সে এই পরিবারের রক্ত সম্পর্কের কেহ নয়। তাকে অন্য বাড়ী থেকে আনা হয়েছে ঠিকই কিন্তু অত্যাচার সহ্য করার জন্য নয়। প্রেমচাঁদ আনন্দী চরিত্রের মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন যে- এই সমাজের মহিলারা সব চাইতে বেশী অত্যাচারের স্বীকার ছিল তার পরিবার পরিজন ও নিকটতম আত্মীয় স্বজন দ্বারা। তিনি তার গল্পে পুরুষের অত্যাচারকে প্রতিহত করার জন্য মহিলাদের প্রতিবাদ চিত্র চিত্রায়িত করতে এমন বাক্য উচ্চারনও করেছেন যে,

”عورت گالیاں سہتی ہے، مار سہتی ہے، مگر میکے کی نندا اس سے نہیں سہی جاتی“۔ [৩৯]

(“মহিলারা গালি সহ্য করতে পারে, মারও সহ্য করতে পারে কিন্তু নিজের বংশ নিয়ে কথা বললে তা সহ্য করতে পারে না।”)

গল্পের পরিসমাপ্তিতে দেখা যায়, পরদিন স্বামী শ্রীকান্ত বাড়িতে আসলে তাকে আনন্দী সব খুলে বলে। শ্রীকান্ত রেগে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয় তার বাবাকে। পরে লালবিহারী ভাবীর কছে ক্ষমা চায় আর আনন্দী তার স্বামীকে বিষয়টির নিষ্পত্তি করার অনুরোধ জানায়। অবশেষে দুই ভাইয়ের কোলাকুলির মাধ্যমে সবকিছুর অবসান ঘটে। গ্রামের লোকজন জমিদার বাড়ির এই ঘটনার কথা শুনে আনন্দীর উদারতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠে। আন্দীর সম্পর্কে তাদের ভাষ্য ছিল,

گاؤں میں جس نے یہ واقعہ سنا ان الفاظ میں آنندی کی فیاضی کی داد دی۔ "بڑے گھر کی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔"۔ [৪০]

(গ্রামের যে কেহ এই ঘটনাটি শুনে, সবাই আনন্দীর সাহসীকতার প্রশংসা করে। ‘ বড় ঘরের মেয়েরা এমনি হয়।’)

---

[৩৯] ড. নাঈম আনিস, *প্রেমচাঁন্দ : হায়াত আউর খেদমত*, মুসলিম ইনস্টিউট পাবলিকেশন, কলকাতা, ডিসেম্বর- ২০১০, পৃ. ২০৬।
[৪০] ড. ওমর রাইছ, *প্রেমচাঁদ কে নমায়েন্দাহ আফছানে*, এডুকেশনাল বুক হাউজ, আলীগড়, ২০১০, পৃ. ৩৫।

নারী ও পুরুষ চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রেমচাঁদের তার অধিকাংশ ছোটগল্পতে যেমন ভাবে পুরুষ দ্বারা নারী শোষণরীতি সমাজে ফুটিয়ে তুলেছেন তেমনি ভাবে আবার নারী দ্বারাও পুরুষ শোষণরীতির চরিত লিখে গেছেন। *দফতরী* (دفتری) তেমনি একটি গল্প। অক্টোবর, ১৯১৯ সালে 'কাহকাশান' পত্রিকায় এই ছোটগল্পটি প্রকাশিত হয়। *দফতরী* গল্পে দেখা যায় ভদ্র দপ্তরী রফাকত হুসেন ১০ টাকার মাইনে বেতনে তার স্ত্রী'র সাথে ভাল ভাবেই জীবন অতিবাহিত করছিলেন। হঠাৎ করে সাপের কামড়ে স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি মুছরে পরেন। আট দিন যেতে না যেতেই তিনি মহল্লার ইজ্জত খাতির ওয়ালা বড় সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করেন। বিয়ের পরেই নববধূর স্বরূপ উম্মচন হয়। বেতন পেয়ে আজকাল সে আর মাসব্যাপী সওদা কেনে না, ঠাণ্ডা জল আর শুকনো রুটিতে আজকাল নববধূর তৃপ্তি হয় না। শখ করে রাফাকত পশু পাখি পুশত। সে গুলো দেখে একদিন নবনধূ বলল,

"تم بھی عجیب طرح کے آدمی ہو۔انسان جانور پالتا ہے۔اپنے آرام کے لیے۔نہ کہ محض دوسر کے لیے۔یہ کیا کہ گائے کا دودھ
کتے پئیں۔ بکریوں کا دودھ بلیان چٹ کر جائیں اور گھر کے آدمی ترسیں۔آج سے سب دودھ گھر میں لایا کرو۔" [৪১]

(আজব লোক তো তুমি! লোক জন্তু জানোয়ার পোষে নিজের সাশ্রয়ের জন্য, সুবিধার জন্য, নাকি ঘরের জঞ্জাল বাড়বার জন্যে ? গরুর দুধ কুকুর খাবে, ছাগলের দুধ বিড়ালে খাবে, এ আবার কী আদিখ্যেতা? আজ থেকে সমস্ত দুধ যেন ঘরে আসে।)

বর্তমানে রফাকত হুসেনের মাসের বেতনের ১০ টাকা পাওনাদের দিয়ে মাসের প্রথমেই আবার মহাজনের কাছ থেকে ধার করা লাগে। মহাজন যেদিন বুঝল তার কাছ থেকে আর নগদ উসুল করা যাবে না। তখন রফাকতের পোষা ছাগলগুলো তার বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে আসেন। পুনরায় দপ্তরী মহাজনের কাছে ঋণ চাইলে মাহজন তাক বুঝিয়ে বলে, এই ভাবে ধার দিয়ে কি চিরদিন চালানো যায়? তুমি তোমার অবস্থাটা একটু পাল্টাবার চেষ্টা কর। তখন ক্ষোভের সঙ্গে দপ্তরী তাকে উত্তর দিল,

"حضور تقدیر کی گردش ہے۔پر جو چیز مہنیے بھر کے لیے لاتا ہوں۔وہ ایک دن مین اڑ جاتی ہے۔اگر ایک دن دودھ نہ
ملے تو جناب مہنا متھ مچادے۔ صبح کو ناشتے کے لیے امرتیاں نہ لاؤں تو گھر میں قیامت برپا ہو جائے۔اگر گوشت نہ پکے
تو میرے بوٹیاں نوچ کھائے۔خاندان کا شریف ہوں۔یہ بے حرمتی نہیں برداشت ہوتی کہ کھانے پینے کے لیے بیوی

---

[৪১] প্রেমচাঁদ, 'দফতরী', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১০, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৩৩৩।

سے بم چخ کروں۔اس کی بدزابانی کے خوف سے تھر تھر کانپتا رہتا ہوں۔اس کی جو کچھ الٹی سیدھی فرمائش ہوتی ہے سر
کے بل بجالاتاہوں۔جناب ایسی تند مزاج ہے کہ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی۔بس اب خدا سے یہی دعا ہے کہ مجھے دنیا
سے اٹھالے اوراس عذاب سے نجات دے۔اس کے سوا مجھے تو کوئی اور صورت نہیں نظر آتی۔میں سب کچھ کر کے ہار
گیا۔"[৪২]

(“হুজুর এটা ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। এক মাসের জন্যে যা কিছু আনি, তা একদিনেই উড়ে যায়। আর গৃহিনীর নোলার জ্বালায় একবারে নাজেহাল হয়ে উঠেছি। একটা দিন দুধ না জুটলে কুরুক্ষেত্র করে, মিষ্টি না কিনে ঘরে ঢোকাই মুশকিল। প্রতিদিন মাংস না হলে, পারলে আমার মাংসই খায়। ভদ্রলোকের ছেলে মশাই, সামান্য খাওয়া নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে রোজ ঝঁগড়া-কোঁদল, এ বেইজ্জতি তো বরদাস্ত করা যায় না। যা করতে বলে চোখ বুজে তাই করি। এখন খোদার কাছে এটুকুই প্রার্থনা, তিনি আমাকে যেন এই শাস্তি থেকে মুক্তি দেন। এ ছাড়া আমি তো আর কোনো উপায় দেখছি না। আমি সব কিছুতেই হেরে গেছি”)

পরে মহাজন তার বীরত্ব ও উদারতা দেখে ৫ টাকা দক্ষিণা দেন। তিনি বলেন- গৃহদাহের আগুনে ঝলসে যাচ্ছে যে বীর, সে রণক্ষেত্রের বীর সৈনিকের চাইতে কোন অংশেই হীন নয়। শ্রেণী বৈষম্যের তুলনা করতে গিয়ে প্রেমচাঁদ *দফতরী* গল্পে উচ্চ পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করার মাধ্যমে ভদ্র দপ্তরী রফাকত হুসেনকে স্ত্রী কর্তৃক অত্যাচার মুখ বুঝে সহ্য করে তার সখের পোষা ছাগল ও মাসিক অর্থসহ সর্বস্ব হারিয়ে তাকে মহাজনের সাথে বিলাপ করতে দেখান।

পারিবারিক ভাবে পুরুষ শোষিত প্রেমচাঁদের আরেকটি গল্প হল *খানাহ দামাদ* (خانہ داماد) *। যা* নভেম্বর, ১৯২৯ সালে প্রথম বার ‘মাধুরী’ পত্রিকায় হিন্দি’তে প্রকাশিত হয়। পরে ‘জামানা’ পত্রিকায় উর্দুতে ছাপা হয়।[৪৩] হরিধন জৈষ্ঠ মাসের ভরা দুপুরে বাড়ি ফিরে দেখল রান্না হচ্ছে। হরিধনের দুই শালা অন্দরমহলে চলে যায়, কিন্তু সে যেতে পারে না। গত একমাস ধরেই তার সাথে এমন দুর্ব্যবহার হচ্ছে। শালাদের, শ্বাশুড়ির বিশেষ করে তার স্ত্রীর নিষ্ঠুরতা আর অমানবিক ব্যবহার তার হৃদয়কে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম তাকেই করতে হয়। কিন্তু একটু পান থেকে চুন খসলে তাকেই সবার কাছ থেকে কথা শুনতে হয়। এদিকে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করতেই তার স্ত্রী গুমানী কুয়ো থেকে জল তুলতে বলে কিন্তু তাকে খেতে বলে না। মনের দু:খে হরিধন নিজেই মনে মনে বিলাপ করতে করতে বলতে লাগলো,

---

[৪২] প্রেমচাঁদ, ‘দফতরী’, *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১০, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৩৩৮।
[৪৩] আব্দুল কাভী দাছনভী, *প্রেমচাঁন্দ*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ২০১১, পৃ. ২১।

کیا میں کسی سے کم کام کرتا ہوں، دونوں سالے میٹھی نیند سوتے رہتے ہیں اور میں بیلوں کو چارہ پانی دیتا ہوں۔ چھانئی کاٹتا ہوں۔
وہاں سب لوگ پل پل پر چلم پیتے ہیں، میں آنکھیں بند کیے اپنے کام میں لگا رہتا ہو۔ شام کو گھر والے گانے بجانے چلے جاتے ہیں،
میں بڑی رات تک گائیں بھینسیں دوہتا رہتا ہوں۔ ان سب کاموں کے لیے یہ انعام مل رہا ہے کہ کوئی مجھے کھانے کو بھی نہیں
پوچھتا، الٹی اور گالیاں ملتی ہیں۔ [88]

(আমি কারোর থেকে কি এমন কম কাজ করি। দুই শালা আরাম করে শুয়ে থাকে, আর সংসারের যাবতীয় কাজ কর্ম করি। কুয়ো থেকেও পানি তোলে চারিদিকে দেই। ঐখানের সব লোক গাঁজা ভাং খেতে থাকে, আমি তা দেখেও না দেখার ভান করে কাজ করতে থাকি। সন্ধ্যার দিকে আমার স্ত্রী গান বাজনায় মাতার জন্য চলে যেত। আমি গভীর রাত পর্যন্ত গরু, মোষের দুধ দুইতে ব্যস্ত থাকি। এত সব কাজ করার পরেও এই আমার পুরষ্কার হলো, কই কেইতো আমাকে খাবারের কথাও জিজ্ঞাসা করতো না। উল্টো তাদের গালা গালি শুনতে হয়।)

বাড়ির সবার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে হরিধনকে তার স্ত্রী খেতে ডাকতে আসে, তখন হরিধনের পর হয় দশ বছর আগের কথা, যখন তার টাকা পয়সা, জমি-জমা ছিল সবাই তার গোলাম হয়ে থাকত। কিন্তু আজ সে শূন্য বলে সবাই তাকে কুকুরের মতো অবজ্ঞা করছে। মুখে না বললেও সবাই তাকে হাবভাবে এটা বুঝিয়ে দিতে চায় যে, তার বাড়ি থেকে চলে যাওয়া উচিত। শ্বাশুড়ি এসে তাকে শুনায় যে, হরিধন কে তার বারো মাস খাওয়ানোর সময় নাই। তার কোন কিছু করার মুরদ নাই। বরং সে তার মেয়ের জীবন নষ্ট করছে। হরিধন জবাবে জানায়, যখন তার সব ছিল তাকে ছেলের চেয়ে বেশি মনে করা হত কিন্তু আজ তার কোন সম্মান নেই। খাওয়ার কথা পর্যন্ত বলে না।

দশ বছর আগে হরিধনের মায়ের মৃত্যু হয়। বাচ্চারা বাবাকে ছাড়া চলতে পারলেও মা ছাড়া সবকিছু মৃত্যুরই নামান্তর। মা'র মৃত্যুর পর তার এক পিসি এবং বাবা তার দেখাশুনা করত কিন্তু এতে তার মায়ের অভাব পুরণ হয়নি। কিছুদিন পর বাবা বিয়ে করলে সৎ মা তার দিকে ফিরেও তাকাতো না। বরং বাবার উপর রাগ করে সে শ্বশুর বাড়ি চলে আসে। কেননা মা বেঁচে থাকাবস্থায় ষোল বছর বয়সেই সে বিয়ে করেছিল।

শ্বশুর বাড়িতে এসে শ্বাশুড়ির কাছ থেকে মায়ের মায়া-মমতা ফিরে পায়। শালা-শালী, স্ত্রী তার প্রতি অসীম দয়া করত। তাই বাবার মৃত্যুর পর তার ভাগের বিষয়-সম্পত্তি এনে শ্বাশুড়ির হাতে তুলে দেয়। পরে সম্পত্তি খরচের সাথে সাথে তার সম্মানও কমতে থাকে। প্রথমে সে ছিল দেবতার সমান, তারপর শুরু ঘরের লোক, সর্বশেষে চাকর।

---

[৮৮] মুন্সি প্রেমচাঁন্দ, 'খানাহ দামাদ', *মাজমুয়াহ মুন্সি প্রেমচাঁন্দ ঃ আফছানে*, ছংগে মিল পাবলিকেশন, লাহোর, ২০০২, পৃ. ৬৬১।

হরিধন খিদের জ্বালায় ছটফট করে, অন্য দিকে তার শ্বাশুড়ি এবং শালারা পরামর্শ করে কিভাবে তাকে বাড়ি থেকে তাড়ানো যায়। তার স্ত্রী গুমানীও তাদের সাথে যুক্ত হয়। তাদের মতে দশ বছর ধরে তারা হরিধনকে লালন-পালন করছে। সে এসে যে দুই হাজার টাকা দিয়েছিল, তা কবেই শেষ হয়ে গেছে। এবার তার নিজের রাস্তা দেখা উচিত। আগের দিনে সদ্য বিবাহিতা বৌ যখন প্রথমবার শ্বশুর বাড়ি আসেন, তখন তার আদর যত্নের অভাব হত না, সবাই তার মুখ দর্শন করতে এসে সোনা-দানা, টাকা-পয়সা উপহার দিত, তাকে সংসারের কোন কাজে হাত দিতে দিত না কিন্তু বিয়ের ছ'মাস পার হতে না হতে তাকে অপবাদ দেওয়া থেকে শুরু করে দৈহিক অত্যাচার পর্যন্ত করা হত। হরিধনের অবস্থা এর চেয়ে কম খারাপ ছিল না। একদিন হরিধন বাড়ির বাইরে চার পায়ীর উপর শুয়ে ছিল, তার দুই শালা এসে তাকে ক্ষেতে কাজ করার জন্য ডেকে তুললে সে প্রতিবাদ জানায়। এতে তার শালা এবং শ্বাশুড়ির সাথে ঝাগড়া বেধে যায়। পরে শ্বশুড়ি হরিধনকে জানায়, সে এখন হরিধনকে তার ছেলে মনে করে না, আর হরিধনও শ্বাশুরিকে মায়ের মত মনে করা তার ঠিক না। শ্বাশুড়ি তাকে জানায়,

یہاں تمہارے نخرے اٹھانے کا کسی میں بل بوہ نہیں ہے۔ جو دیتے ہو وہ نہ دینا، اور کیا کروگے۔ تم کو بیٹی بیاہی ہے، کچھ تمہاری
زندگی بھر کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہے۔"

ہری دھن نے پیچ وتاب کھا کر کہا۔ "ہاں اماں میری غلطی تھی، میں ویسا ہی سمجھ رہا تھا، اب میرے پاس دھرا ہی کیا ہے کہ تم میری
زندگی کا ٹھیکہ لوگی۔ جب میرے پاس روپیہ تھا میں سب کچھ تھا۔ اب غریب ہوں تو تم کیوں بات پوچھوگی۔" [৪৫]

(এখানে তোমার সব নিজের মনে করা ঠিক না। যা তুমি দাও, তা না হয় দেবে না, এর বেশি আর কি করতে পারো তুমি। তুমাকে আমি আমার মেয়ে দিয়েছি। তার জন্য তো জীবনভর তোমার লালন পালন করার দায় তো নেই নি।
ঘরিধন শোকে দুঃখে মর্মাহত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ মা, আমারি ভুল ছিল, আমি এটাই বুঝেছি যে, এখন আমার কাছে কী আছে যে, আপনি আমার জীবনের দায় ভার নেবেন ? যখন আমার কাছে রুপিয়া ছিল, তখন আমার সব ছিল। এখন যখন আমি গরীব হয়ে গেছি, আপনি কেনই বা জিজ্ঞেস করবেন ?')

এতে করে হরিধনের মন ভেঙে যায়। সমস্ত অন্তর বিষময় হয়ে জ্বলতে থাকে। হরিধন শ্বশুর বাড়ির জলও না স্পর্শ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে কুয়ার সামনে মাটিতে চাদর বিছিয়ে শুয়ে থাকে। এবার গুমানি তাকে খেতে ডাকলে হরিধন শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলে এবং স্ত্রী তার সাথে যাবে কিনা জানতে চায়? গুমানি রাজি না হওয়ায় হরিধন একাই তার গ্রামে ফিরে যায়। সেখানে গিয়ে সে আবার নতুন জীবনের আশা দেখতে পায়। মন্দিরের এক বৃদ্ধা পূজারিনীকে দেখে তার মায়ের কথা মনে করে। আম বাগানে তার ছোট বেলার বন্ধুর মংরুর সাথে দেখা হয়।

---

[৪৫] মুন্সি প্রেমচাঁন্দ, 'খানাহ দামাদ', *মাজমুয়াহ মুন্সি প্রেমচাঁন্দ ঃ আফছানে*, ছংগে মিল পাবলিকেশন, লাহোর, ২০০২, পৃ. ৬৬২।

মংরু তাকে তার সৎ মা এবং তার ছোট দুই ভাইয়ের দায়িত্ব নিতে বলে ও নতুন ভাবে জীবন শুরু করতে উৎসাহ দেয়।

হরিধন বাড়ি ফিরতেই তার ভাইরা এবং সৎ মা আনন্দের সাথে তাকে বরণ করে নেয়। সৎ মায়ের মাঝে সে আবার তার মাকে খুঁজে পায়। হরিধন আবার সকাল না হতেই কাঁধে লাঙল তুলে মাঠে চলে যায়। কঠোর পরিশ্রম করে। আজ সে কারোর আশ্রিত নয়। নিজের বাড়ির একজন, সে ভিক্ষুক নয়, সে এখন ঘরের রক্ষক। গুমানি আবার বিয়ে করেছে শুনে হরিধন মনে করে সে অনেক বড় মুক্তি পেয়েছে। যা তার জন্য পরম সৌভাগ্য।

পুরুষ শোষিত আরেকটি ছোটগল্প হলো *সুজান ভগত* (سوجان بھگت) মানব জীবনে নিষ্ঠা এক পরম তপস্যা। গল্পটি মে, ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয়। যে বাবা সারাজীবন সংসারের ঘানি টেনে বৃদ্ধ বয়সে একটু আরাম আয়েস করার কথা ছিল কিন্তু পারিবারিক ভাবে তাকে অবজ্ঞার কারনে তার চোখে মুখে যে এক অসহাত্বের চিত্র ফুটে উঠেছিলে লেখক উক্ত গল্পে তা ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন। সুজান এমনই একজন সৎ, ধার্মিক, নিষ্ঠাবান ব্যক্তি এবং গ্রাম জুরে ছিল তার খ্যাতি। সে একজন কৃষক হলেও তার বাড়ির দরজায় এসে কেউ খালি হাতে ফিরত যেত না। প্রতিনিয়তো সে সাধু সন্ন্যাসিদের জন্য খাবারের আয়োজন করতো। কিন্তু এখন তার ভাটা পড়েছে। এর আগে তার বাড়ির আঙ্গিনায় থানার বড়বাবু, জমিদার, শিক্ষা বিভাগের অফিসার থেকে শুরু করে এমন কেউ নেই যে আসতো না। তার সংসারে সদস্য বলতে সে, তার স্ত্রী বুলাকী, বড় ছেলে ভোলা, ছোট ছেলে শংকর। তিনি ভগবানের কৃপায় অঢেল সম্পদের মালিক ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্মের দীক্ষা নেন। এখন বাড়িতে বসে থাকেন। পূর্বে সে সুদ গ্রহণ করতো কিন্তু এখন আদর্শ নীতির ধার ধারে সে। বর্তমানে তার জীবন অন্যদিকে প্রবাহিত হচ্ছে। এখন সংসারের প্রতি অনীহা তার, সে বৈরাগী হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে ছেলেরা সংসারের হাল ধরছে। একদিন এক ভিখারীনি দরজায় আসায় সুজান তাকে ভিক্ষা দেয়। ভিক্ষার পরিমান বেশি হওয়ায় তার বড় ছেলে তোলা পাত্রটি কেড়ে নিল আর বলল,

"بھیک۔ بھیک سمجھ کر دی جاتی ہے۔لٹائی نہیں جاتی۔ ہم تو ایک وقت کھا کر گزر کرتے ہیں کہ عزّت بنی رہے اور تمھیں لٹانے کی سوجھتی ہے۔ تمھیں کیا معلوم گھر میں کیا ہو رہا ہے۔"

سوجان نے اس کا کوئی جواب نہ کیا۔ باہر آکر بھکاری سے بولا۔" بابا! اس وقت جاؤ۔ گھر میں کسی کا ہاتھ خالی نہیں اور خود پیڑ تلے جا کر خیالات میں ڈوب گیا۔ اپنی ہی گھر میں اس کی یہ قدر۔ ابھی وہ اپاہج نہیں ہے۔ ہاتھ پاؤں سلامت ہیں۔ گھر کا کچھ نہ

کچھ کام کرتا ہی رہتا ہے۔اس پر یہ تو ہیں؟اس نے گھر بنایا کہ ساری رونق سی کے دم خم سے ہے لیکن اب اس گھر پر اس کا کوئی حق نہیں اب وہ دروازے کا کتا ہے گھر والے جو روکھا سو کھادیں وہی کھا کر پیٹ بھرے۔اسی زندگی پر لعنت ہے۔ سعجان ایسے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ [৪৬]

("ভিক্ষে ভিক্ষের মতোই দিতে হয়। হরি লুঠ করে দিতে হয় না। আমরা তো একবেলা খেয়েই দিন কাটাই। ঠাটবাট বজায় থাকে। আর তোমার খালি উড়িয়ে দেওয়ার মতলব। সংসারে কী ভাবে চলে সে দিকে তোমার কি কোনো খেয়াল আছে ?"
সুজান এর কোনো জবাব দিল না। বাইরে এসে ভিখারিকে বলল, বাবা, এখন যাও, কারও হাতখালি নেই। তারপর সে গাছের নীচে বসে বসে ভাবতে লাগল, নিজের ঘরেই এতটা অনাদর! এখনও সে অথর্ব হয়ে পড়েনি; হাত-পা অচল হয়নি; সংসারের কোনো না কোনো কাজ তো করছেই। তবুও তার এই হেনস্তা। নিজের হাতে গড়ে তোলা এই ঘর, এসমস্ত শ্রীটুকু তো তারই শ্রমের ফসল। তুবও তার এই বাড়িতে আর কোনো অধিকার নেই। এখন সে যেন দরজায় কুকুরের মতো পড়ে আছে, আর গৃহস্ত যা একমুঠো শুকনো কিছু দেয় তাই খেয়ে পেট ভরায়। এমন জীবনকে ধিক! সুজান এমন সংসারে থাকেত চায় না।)

পরের দিন মহজ্ঞু ফসলের ভাগ নিতে আসায় ১০ সের ধান কম হওয়ায় তাকে অপমানিত হতে হয়। আজকাল সুজান ভগতের সংসারে আর কোনো মূল্য নেই। সে নিজের সম্পদ দানও করতে পারে না। তার স্ত্রী বুলাকীও তার সাথে এখন খারাপ ব্যবহার করে, ছেলের সাথে এখন তার কথার অমিল। একদিন সব কিছু সীমা অতিক্রান্ত হলো। সুজান ভাবলো তার এভাবে বসে থাকা, কাজ না করা, এই পরিস্থিতির জন্য সে নিজেই দায়ী, এবার সে সংসারের হাল ধরবে। নিজের জায়গাটা বউ ছেলেকে বুঝিয়ে দিতে হবে, সে গাছ তলায় বসে ভাবতে লাগলো। বুলাকী খাবারের জন্য ডাকায় সে উত্তর দেয়- আমি তো বসে খাই, আমার ভাগেরটুকু তোমার ছেলেদের দাও। সে কিছুক্ষন পর তার বোধদয় হলো, লাঙ্গল নিয়ে সুজান মাঠে জমি চাষ করতে লাগল। বড় ছেলে ভোলাও কিছুক্ষণ পরে গেল কিন্তু অল্পতেই সে ক্লান্ত হয়ে গেল। সে বলে বাবা বেলা হয়েছে হাল খুলে ফেলবো? সুজান বলে না তুমি বাড়ি যাও। বুড়ো বয়সে সুজানের পরিশ্রম দেখে সে বিদ্রুপ করতে লাগলো, অন্যান্য সবাই বলতে লাগলো বৈরাগির রং ঢং কোথায় গেল ? আট মাসে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে আবার তার সংসারে আগের রুপ ফিরে আসলো। আবার সেই ভিখারীনি আসলো তার দরজায়। আজ আর তাকে খালি হাতে ফিরে যেতে হলো না। সুজনা বললো যত ইচ্ছা নিয়ে যাও, আজ সুজানের ঘর ভর্তি ফসল। এমন অবস্থা যে, রাখার জায়গাও নেই। পরে সুজান নিজেই ভিখারীনির বাড়ীতে নিজ কাধে শস্য পৌছে দিল। আজ ছেলে ভোলা, বউ বুলাকীর বলবার কিছুই নেই। কারণ সুজান আজ,

وہی تلوار جو کیلے کو بھی نہیں کاٹ سکتی۔دھار پر چڑھ کر لوہے کو بھی کاٹ دیتی ہے۔انسانی زندگی میں دھن بڑے کام کی چیز ہے۔جس میں لاگ ہے،وہ بوڑھا بھی جوان ہے جن میں لاگ نہیں۔عزّت نہیں،وہ جوان بھی ہو کر مردہ ہے۔ [৪৭]

---

[৪৬] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'সুজান ভগত', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে ঃ তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ.২৩০-২৩১।

(সেই ভোঁতা তলোয়ার যা দিয়ে কলাও কাটা যেত না, শান দেওয়ার পর তা দিয়েই আজ লোহা কাটা যাচ্ছে। মানুষের জীবনে নিষ্ঠা একটা মহৎ ব্যাপার। যার নিষ্ঠা আছে, সে বৃদ্ধ হলেও যুবকের মতো সজীব। যার মধ্যে নিষ্ঠা নেই, মর্যাদাবোধ নেই, সে যুবক হলেও মৃত প্রায়।)

বুড়হী কাকি (*بوڑھی کاکی*) 'কেহকেশান' পত্রিকায় জুলাই, ১৯২০ সালে এবং পরে আগস্ট ১৯২০ সালে লহোরে 'প্রেম বত্তিছি'তে দ্বিতীয়বারের মতো প্রকাশিত হয়।[৪৮] বৃদ্ধার প্রতি পারিবারিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরতে প্রেমচাঁদ *বুড়হী কাকী* ছোটগল্পটি চয়ন করেছেন। স্বামী ও সন্তান হারানোর পর বুড়ি কাকী ভাইপো বুদ্ধিরামের চালাকীতে তার সকল সম্পত্তি তাকে লিখে দেন। বুড়ি বুদ্ধিরামের অর্ধাঙ্গিনী শ্রীমতী রূপার কাছে খাবারের জন্য কান্নাকাটি করত, তবুও সে তাকে খাবার ঠিক মতো দিত না। কাকীর একমাত্র অনুরাগের সঙ্গী ছিল ভাইপো বুদ্ধিরামের ছোট মেয়ে লাডলীর সাথে। বুদ্ধিরামের বড় ছেলে মুখরামের আর্শীবাদের উৎসব চলছিল। ক্ষিধে সহ্য করতে না পেরে বুড়ি কাকি রূপা রান্না করার সময় তার রান্না ঘরের পাশে এসে বসলে রূপা রাগান্বিত হয়ে বলে,

"ایسے پیٹ میں آگ لگے۔پیٹ ہے یابھاڑ ؟ کوٹھڑی میں بیٹھتے ہوئے کیادم گھٹتا تھا؟ ابھی مہمانوں نے نہیں کھایا، بھگوان کو بھوک نہیں لگاتب تک صبر نہ ہوسکا، آکر چھاتی پر سوار ہوگئیں۔ جل جاتے ایسے جیبھ دن بھر کھائی نہ ہوتیں نہ جانے کس کی ہانڈی میں منہ ڈالتیں ؟ گاؤں دیکھے گاتو کہے گا کہ بڑھیا کھانے کو نہیں پاتی تب ہی تو اس طرح منہ باندھے پر رتی ہے۔ ڈائن نہ مرے نہ مانچا چھوڑے۔ نام بیچنے پر لگی ہے۔ ناک کٹوا کر دم لے گی۔ اتنا ٹھونستی ہے، نہ جانے کہا بھسم ہو جاتا ہے۔ لو بھلا چاہتی ہو تو جاکر کوٹھڑی میں بیٹھو، جب گھر کے لوگ کھانے لگیں گے تب تمہیں بھی ملے گا۔ تم کوئی دیوی نہیں ہو کہ چاہے کسی کے منہ میں پانی نہ جائے لیکن تمہاری پوجا پہلے ہو جائے۔"[৪৯]

(এভাবে পেটে আগুন লাগে? পেট না খোলা? ঘরে বসে কি দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল? এখনও অতিথিদের খাওয়া হলো না, দেবতার ভোগ হলো না, তুমি কি সে পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে পারলে না ? এসে বুকের উপর বসে গেছ। এরকম জিভ পুড়ে যায় না কেন। সারাদিন না খেয়ে থাকলে তার হাঁড়িতে গিয়ে মুখ দিতে কে জানে ? গ্রামের লোক দেখলে বলবে যে, বুড়ি ভরপেট খেতে পায় না বলেই তো এরকম ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়। ডাইনি মরেও না, আসনও ছাড়ে না। নাম ডুবিয়ে ছাড়বে। বেইজ্জতি না করে থামবে না। এত গিলছে, তবুও কে জানে সব ভস্ম হয়ে কোথায় যাচ্ছে। নাও, ভালো চাও তো কুঠুরে গিয়ে বস। যখন বাড়ির লোকের খাওয়া শুরু হবে তখন তুমিও পাবে। তুমি তো আর কোনো দেবী নও যে কারোও মুখে জলও পড়ল না অথচ তোমার পুজো হয়ে গেল!)

---

[৪৭] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'সুজান ভগত', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে ঃ তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ.২৩৫।

[৪৮] মানিক টাল, 'বুড়হি কাকি', *প্রেমচাঁন্দ : কুচ নয়ি মোবাহেছ*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, আক্টোবর- ১৯৮৮, পৃ. ১৪৩।

[৪৯] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'বুড়হি কাকি', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে ঃ তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ২৬০-২৬১।

সকল অতিথি, বাচ্চারা, নারীরা খেল কিন্তু কেউই বুড়ি কাকীর কথা মনে করলনা। বেচারা লাডলী মার ভয়ে কিছু বলতে পারছিল না। সে মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিল, সে তার ভাগের পুড়ি না খেয়ে গভীর রাতে বুড়িকে ঘুম থেকে উঠিয়ে তাকে পুড়িটি খেতে দিল। কিন্তু এতে তার ক্ষিধা মিটল না, তিনি লাডলীকে বলল,

" میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے چلو جہاں مہمانوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔"

لاڈلی ان کا منشانہ سمجھ سکی۔ اس نے کاکی کا ہاتھ پکڑا اور انھیں لاکر جھوٹے پتلں کے پاس بٹھادیا اور غریب بھوک کی ماری فاترالعقل بڑھیا پتلیں سے پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھانے لگی۔ دہی کتنا لذیذ تھا۔ سالن کتنا مزہ دار، کچوریاں کستی سلونی سموسے کتنے خستہ اور نرم؟

کاکے فتور عقل کے باوجود جانتی تھیں کہ میں وہ کر رہی ہوں جو مجھے نہ کرنا چاہیے۔ میں دوسروں کے جھوٹے پتّل چاٹ رہی ہوں، لیکن بڑھاپے کی حرص مرض کا آخری دور ہے۔ جب سارے حواس ایک ہی مرکز پر آکر جمع ہو جاتے ہیں بوڑھی کاکی میں یہ مرکز ان کا حسن ذائقہ تھا۔ [৫০]

("অতিথিরা যেখানে বসে খেয়ে গেছে আমার হাত ধরে সেখানে নিয়ে চল।"
লাডলি তার অভিপ্রায় বুঝতে পারলনা। সে কাকিকে হাত ধরে নিয়ে উচ্ছিষ্ট পাতার পাশে বসিয়ে দিল। সারাদিন ক্ষুদার্থ হতজ্ঞান বৃদ্ধ পাতা থেকে পুরির টুকরো খুঁজে খুঁজে খেতে শুরু করলেন। আহা, দই কি সুস্বাদু। কচুরি কি মুচমুচে, কী খাস্তা, কী নরম ?
বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েও কাকি এটা বুঝতে পারছিলেন যে, তিনি যা করছেন তা কদাচিত করা উচিত নয়। আমি অন্যের এটো পাতা চেটে খাচ্ছি! কিছু বার্ধক্য তো আকাংক্ষা রোগের অন্তিম অবস্থা। সমস্ত কামনা তখন এক কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে জমা হয়ে। বুড়ি কাকির সেই কেন্দ্রবিন্দু ছিল তার জিহ্বা।)

রূপা ঘুম ভেঙ্গে যখন দেখল লাডলী তার বদলে নেই, তখন তিনি বাহিরে গিয়ে দেখলেন লাডলীর পাশে বুড়ি এঠো খাচ্ছে। এতদিন পর সে বুড়ীর প্রতি তার স্বার্থপরতা, অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা তার হৃদয়ে অনুধাবন করতে পারলো। তখন সে বুড়িকে থালায় সম্পূর্ণ আহার্য সামগ্রী সাজিয়ে বুড়ির কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে খেতে দিয়ে দেখল,

بھر لے بھالے بچے کی مانند، جو مٹھائیاں پا کر مار اور دھتکار سب بھول جاتے ہیں، بوڑھی کاکی بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھیں ان کے ایک ایک روئیں سے سچی دعاہیں لنگل رہی تھیں اور روپا بیٹھی یہ روحانی نظارہ دیکھ رہی تھی۔ [৫১]

---

[৫০] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'বুড়হি কাকি', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানেঃ তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ.২৬৫।

(সরল শিশু যেমন মিষ্টি পেয়ে সব মার ও তিরস্কার ভুলে যায়, বুড়ি কাকি তেমনি সব ভুলে উঠে বসে খাবার খেতে শুরু করে দিলেন। প্রতিটি গ্রাসে তার যথার্থ সদিচ্ছা ফুটে বেরোতে লাগল আর রূপা বসে এই স্বর্গীয় দৃশ্যের আনন্দ উপভোগ করতে লাগল।)

আখেরী হিলাহ (آخری حیلہ) গল্পে লেখক নিজের সাংসারিক জীবনের প্রতি অনীহা এবং সংসার জীবনে স্থির হবার ঘটনাগুলো সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন। গল্পটি এপ্রিল, ১৯৩১ সালে প্রথমে 'হংসে' হিন্দিতে প্রকাশিত হয়। পরে আবার 'হংস'তেই উর্দুতেও ছাপা হয়।[৫২] লেখক শুরু থেকে সংসার বিমুখ ছিলেন। তার কখনো এটা মনে চাইনি যে, তার সঙ্গে তার হৃদয়শ্বরী থাকবে, তাকে নিয়ে একটু রঙ্গসন, আগ্রহ আনন্দের আতিশয্য দেখাবে। কারণ সে মনে করে তার অন্য ভাইদের মতো সুখ ও ফুর্তি যে তার ভাগ্যেই নেই। কারণ তিনি ছবির বিপরীত দিকটাও দেখতে পান। "একটা দিক যেমন মধুর ও আকর্ষনীয়, অন্য দিকটা তেমনিই হৃদয়বিদারক ও ভয়ংকর।" তিনি এমনও দেখেছেন "অফিস ফিরতি পথে একজন বাবা দু-চার পয়সার দাম বা তিলের নাড়ু কিনে দ্রুততার সহিত মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে চলেছেন। যাতে ছোটদের আক্রমনের কবলে পড়ার আগেই জিনিসটা শেষ হয়ে যায়।" এই দৃশ্যগুলোর দরুন তার মন থেকে সমস্ত রসবোধ উঠে যায়। তিনি দাম্পত্য জীবনের ফাঁদে যাতে জড়িয়ে না পড়েন, সে জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেই পড়তেই হলো আসলে,

میری ساری قوّت ایجاد، میری ساری فکر رسا اسی تاہل کے پھندوں سے بچنے میں صرف ہوتی ہے۔ دانہ تہ دام ہے۔ یہ جانتا ہوں، مگر
گران کتنا مہلک دام خوش رنگ ہے۔ [৫৩]

(আমি জানি এ ফাঁদে পড়তে হয় আর ফাঁদটি যেমন রঙিন ও আকর্ষনীয়, পরিনামটি তিমনি ক্ষতিকারক ও বিষাক্ত। এই ফাঁদে পড়া পাখিগুলোকে পাখা ঝাপটাতে দেখেও আমি আবার সেই জালে গিয়ে পড়েছি।

কয়েকদিন পর লেখকের শ্রীমতি অর্থাৎ স্ত্রী ক্রমাগত তাগিদ দিচ্ছেন তাকে যেন বাড়ি থেকে নিয়ে যান।

> *Akhiri Heela* in a lighter vein, shows how a husband, who does not wish to fetch his wife from her village to the town where he works. [৫৪]

---

[৫১] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'বুড়হি কাকি', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে ঃ তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ.২৬৬।
[৫২] আব্দুল কাভী দাছনভী, *প্রেমচাঁন্দ*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ২০১১, পৃ. ২২।
[৫৩] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'আখেরী হিলাহ', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে ঃ তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৫৩৯।
[৫৪] Madan Gopal, *Munshi Premchand: A Literary Biography*, Asia Publishing House, Bombay, 1964. P- 380.

লেখক একজন সাংবাদিক ছিলেন। বউকে যাতে না আসতে হয় সে জন্য তিনি চিঠিতে নানা ধরনের অজুহাত দিয়ে থাকেন। সমবেদনার ঝামেলার কথাটা শেষ করাই প্রথমে শুরু করেন যে, মাথার উপর খাঁড়া ঝুলছে কখন না জানি পুলিশ গ্রেফতার করে। গোয়েন্দা বিভাগের লোক পিছনে লেগেই থাকে। সম্পাদক হবার দরুন যে সব সমস্যার সম্মুক্ষিণ হন, সবকিছু বিস্তার ভাবে তাকে বলেন। সে তার স্ত্রীকে টাকা পয়সার অসচ্ছলতার কথা কখনও জানায়নি, কারণ তার ধারণা এসব বিষয়ে আলোচনা করা মর্যাদাহানিকর, এই বিষয়ে আলোচনা করে শ্রীমতির চোখে যেন করুণার পাত্র না হয়। পরবর্তীতে বাহানা দিলেন রোগের ডিপো। বললেন- এখানকার খবার-দাবার, ফলমুল বিষে ভরা। তারপরও শ্রীমতির বিশ্বাস হয় না, পরের চিঠিতেও সেই মিনতি- "তোমার চিঠি আমায় চিন্তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এবার থেকে প্রতিদিন একটা করে চিঠি লিখো। নইলে আমি কোন ওজর আপত্তি শুনবনা। সোজা গিয়ে হাজির হব।"

তারপর নতুন অজুহাত, তিনি বিশ্বাস রাখছিলেন যে, এতে কাজ হবে। কিন্তু দুর্ণামের ভয় ছিল। বিপদের তুলনায় এ দুর্নামের ভয় তার কাছে কিছুই না। তিনি লিখলেন, শহর জীবন ভদ্র ঘরের মহিলাদের জন্য নয়। এখানে ঝি চাকরানিরা এত কটু কথা বলে তুমি থাকতে পারবে না। এদের নিয়ে কোন বউ, ঝিরা থাকতে পারে না। তাদের ঝাঁক জমক ঠাটবাট ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই। অনেক জবরদস্তি করে ঘরে ঢুকে পড়ে। মোদ্দা কথা হল, বাড়ির গিন্নিদের দর কমিয়ে দেয়ার মধ্যে ওরা বেশ আমোদ পায়। এই জন্যই গৃহস্থ ঘরের বউরা শহরে কমই আসে। তিনদিন পর লেখক শ্রীমতি বুড়ো বেহারাকে নিয়ে হাজির হন। লেখক বলেন,

معلوم نہیں اس خط میں مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی، کہ تیسرے ہی دن اہلیہ محترمہ ایک بوڑھے کہار کے ساتھ میرا پتہ پوچھتی ہوئی اپنے تینوں

بچّوں کو لیے ایک بالئے بے ورمان کی طرح وارد ہو گیں۔

میں نے بد حواس ہو کر پوچھا۔ "کیوں خیریت تو ہے؟"

اہلیہ نے چادر اتارتے ہوئے کہا۔ "گھر میں کوئی چڑیل بیٹھی تو نہیں ہے۔ یہاں کسی نے قدم رکھا تو ناک ہے کاٹ لوں گی۔ ہاں جو تمہاری شہ نہ

ہو"۔

اچھا، تو اب عقدہ کھلا، میں نے سر پیٹ لیا۔ کیا جانتا تھا کہ اپنا طمانچہ اپنے ہی منہ پر بڑے گا۔ [৫৫]

(জানি না এ চিঠিতে কোথাও আমার ভুল ছিল। চিঠি লেখার তিন দিনের দিনে দেখি আমার শ্রীমতী বুড়ো বেহারাকে সঙ্গে নিয়ে আমার ঠিকানায় জিজ্ঞেস করতে করতে তিনটে বাচ্চাকাচ্চা সমেত দুরারোগ্য ব্যাধির মতো বীরাঙ্গনার ভঙ্গিতে এসে পৌছাল।

[৫৫] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'আখেরী হিলাহ', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে ঃ তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নিউ দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৫৪৩।

আমি তো নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে আছি। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার ? সব ভালো তো? শ্রীমতী গায়ে জড়ানো চাদরটা খুলতে খুলতে বলল, বাড়ির মধ্যে কোনো পেতনি ঢুকে বসে নেই তো ? এখন একটি পা ও যদি কেউ বাড়াতে আসে আমি তবে তার নাক কেঁটে নেব। অবশ্য যদি তোমার তাতে আশকারা না থাকে, তবেই।
তিনি বউ থেকে বাঁচার জন্য এমন করলেন, শেষে কিনা “নিজের চর নিজের গালে গিয়েই পড়লো।”)

বাচ্চাদের প্রতি ভালবাসা মূলক ছোটগল্প হলো *কজাকী* (قزاقی)। যা এপ্রিল, ১৯২৬ সালে হিন্দিতে প্রথমে ‘মাধুরী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে ‘প্রেম চল্লিছি’ এর প্রথম অধ্যায় উর্দুতে প্রকাশ পায়।[৫৬] গল্পে লেখক বাল্য স্মৃতিতে কজাকী এমন একজন মানুষ যাকে লেখক চল্লিশ বছর কেটে যাওয়ার পরও ভুলতে পারেন নি। কজাকী লেখকের বাবার পোস্টাফিসে পাহারাদার হিসেবে কাজ করত। কজাকী ছিল হাসিখুশি, সাহসী আর প্রাণবন্ত। প্রতিদিন কজাকী মেল ব্যাগ নিয়ে আসত। সারা রাত থেকে সকালে চলে যেত। প্রতিদিন বিকাল ৪টা বাজলেই লেখক কজাকীর জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করত। কজাকী আসতেই দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে তার কাধে চড়ে বসত। কজাকী মেল ব্যাগ পোস্টাফিসে রেখেই লেখক এবং তার বন্ধুদের সাথে মাঠে গিয়ে খেলত, গল্প এবং গান শুনাত। একদিন কজাকীর আসতে দেরি হয়ে গেল। লেখক অপেক্ষা করতে করতে কজাকীর আশা ছেড়েই দিয়েছিল। এমন সময় দেখা গেল কজাকি লেখকের জন্য একটি হরিণের বাচ্চা নিয়ে তার সামনে হাজির হল। লেখকতো মহা খুশি, সব রাগ ভুলে গিয়ে ভাবতে লাগল- আমার তখনকার খুশি মাপতে পারে এমন কার সাধ্য. তারপর অনেক শক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। ভালো ভালো পদকও পেয়েছি। রায়বাহাদুর ও হয়েছি, কিন্তু সেদিনের সেই আনন্দ কোনদিন পাইনি।

তাদের সাথে সময় কাটানোর ফলে কজাকীর একদিন পোস্টাফিসে যেতে দেরি হয়ে যায়। তার কারণে লেখকের বাবা অনেক রেগে গিয়ে তার কাজের গাফেলতির জন্য নাদির শাহী হুকুম জারি করে তার বল্লম, চাপরাশ এবং মাথার পাগড়ি কেড়ে নেন। কজাকীর চাকরি চলে যাওয়ায় লেখক অনেক কষ্ট পান। হঠাৎ লেখকের মনে হয় কজাকী হয়েতো চাকরি হারিয়ে না খেয়ে আছে তাই মাকে ফাঁকি দিয়ে ১ ঝুড়ি আটা লেখক বাড়ি থেকে চুরি করে কাজাকীর বাড়িতে নিয়ে আসেন। কিন্তু ঝুড়ি থেকে আটা পড়ে সে রেখা হয়ে যায় লেখক তা খেয়াল করেনি। সত্যি সত্যি কাজকীর সাথে লেখকের দেখা হওয়া মাত্রই সে কাজাকীকে জড়িয়ে ধরে। লেখক কজাকীকে আটা দিলে কজাকী জানতে চায় সে শুকনো রুটি কিভাবে খাবে, তেল, নুন, ঘি এইসব ছাড়া। তাই কজাকীকে খুশি করার জন্য লেখক বাবা-মায়ের দেওয়া জমানো পয়সাগুলো সে কজাকীর জন্য নিয়ে আসে। লেখক বলেন- কজাকীকে প্রতিদিন ডাকবার জন্য যদি কহিনূর হীরাও আমার কাছে থাকত। তো সেটা নজরানা দিতেও আমার দ্বিধা হত না।

---

[৫৬] আব্দুল কাভী দাছনভী, *প্রেমচাঁন্দ*, কওমী কাউন্সিল বরাই ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ২০১১, পৃ. ১৮।

লেখক আটা চুরির জন্য মার কাছে ধরা খেলে কজাকী এসে লেখকের মার কাছে আটা ফেরত দিয়ে যায়। কিন্তু লেখকের মা নিজেই কজাকীকে সব আটা দিয়ে দেন এবং অর্থ সাহায্যও করতে চান। কিন্তু কজাকী কাউকে না বলেই চলে যায়। বাচ্চারা কোন জিনিসের প্রতি প্রথম যতটা ভালবাসে পরে ততটাই নিষ্ঠুরও হয়ে পড়ে। সেই ভাবে লেখক এবং তার মা কজাকীকে যখন ভুলতে বসেছিলেন তখন হঠাৎ একদিন কজাকী তার স্ত্রীকে দিয়ে লেখকের পছন্দ পদ্ম ফুলের ডাটা দিয়ে লেখকের খোজ খবর নিতে পাঠান। কজাকীর স্ত্রীকে দেখে লেখকের বাবা কজাকীর চাকরি পুনরায় দেওয়া হয়েছে বলে তার স্ত্রীকে জানিয়ে দেন। পরেরদিন ভোরে কজাকী আমাদের বাড়িতে আসে। আমি তাকে দেখে আহলাদে আটখানা হয়ে যাই। পরে তার বাবা তাকে কাজে বহাল করেন। লেখকের ভাষায়,

علی الصباح مین اٹھاتو کیادیکھتاہوں کہ قزاقی لاٹھی ٹیکتاہواچلاآرہاہے۔وہ بہت دبلاہوگیاتھا۔معلوم ہوتاتھا،بوڑھاہوگیا ہے۔ہرابھرادرخت سوکھ کرٹھونٹھ ہوگیاتھا۔میں اس کی طرح دوڑاوراس کی کمرسے لپٹ گیا۔قزاقی نے میرے گالوں کوچومااورمجھے اٹھاکرکندھے پربٹھانے کوکوشش کرنے لگا۔مگرمیں نہ اٹھ سکا۔تب وہ چوپایونکی طرح زمین پرہاتھوں اور گنٹنوں پرکھڑاہوگیااورمیں اس کی پیٹھ پرسوارہوکرڈاکخانہ کی طرف چلا۔میں اس وقت خوشی سے بھولانہ سماتاتھا،اورشاید قزاقی مجھ سے بھی زیادہ خوش تھا:

بابوجی نے کہا۔"قزاقی،تم بحال ہوگئے،اب کبھی دیرنہ کرنا۔"

قزاقی روتاہواوالدصاحب کے قدموں پرگرپڑا۔ [৫৭]

(ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেই আমি দেখলাম কজাকী লাঠিতে ভর দিয়ে এদিকে আসছে। ও অনেক রোগা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল যেন বুড়ো হয়ে গেছে। সবুজ গাছ যেন শুকিয়ে ন্যাড়া হয়ে গেছে। আমি দৌড়ে ওর কোমর জড়িয়ে ওর গায়ে লেপটে গেলাম। কজাকি আমার গালে চুমু খেয়ে আমাকে তার কাঁধে চড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আমি উঠতে পারলাম না। তখন সে কুকুরের মতো মাটিতে দুহাত পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। আমি তার পিঠে চড়ে ডাকঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। সে সময় আমার আর আনন্দের সীমা ছিল না। আর কজাকি বোধহয় আমার থেকে ও বেশি খুশি হয়েছিল।
বাবা বললেন- "তোমায় আবার কাজে বহাল করা হল। আর কখনও দেরি করবে না।"
কজাকি কাঁদতে কাঁদতে বাবার পায়ে পড়ল।)

প্রেমচাঁদ কজাকী গল্পে উচ্চ পদস্তের দ্বারা নিম্ন পদস্তের সামাজিক বৈষম্যতা বুঝানোর সাথে সাথে উক্ত গল্পে শিশুদের প্রতি ভালবাসার প্রকটতা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। পরের দিন কজাকী আবার কাজ করতে আসে। কজাকীকে আবার ফেরত পেয়ে লেখক যত খশি হয় কজাকী তার চেয়েও বেশী খুশি হয়।

---

[৫৭] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'কজাকী', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানেঃ তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৪০৬।

প্রেমচাঁদের ছোটগল্পের মধ্যে সমাজে বিধবাদের করুণ অবস্থা তুলে ধরার মাধ্যমে তার চিন্তা চেতনার প্রসার কত দূরদর্শী তার প্রমাণ মেলে। সমাজ নারী পুরষের বৈষশ্য করে নারী জাতিকে শুধু নিমজ্জিত করেনি বরং নারী জাতিকে কলঙ্কিত করেছে। তাদের মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার অবকাশটুকু প্রাণ প্রনে কেঁড়ে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। কতক জায়গায় এ সকল নারী উঠে দাড়িয়েছে আবার কতক জায়গায় সমাজের কাছে হার মেনে মুখ থুবরে পরেছে। বিধবা নারীদের এমন ছবি তুলে ধরেছেন প্রেমচাঁদ তার কলম তুলিতে। তেমনি বিধবা নারীর ভালবাসা নিয়ে অমর এক গল্প হলো *মুহাব্বত কি হোলি* (محبّت کی ہولی) । গল্পে প্রেমচাঁদ এক চৌদ্দ বছরের বিধবা নারীর চরিত্র তুলে ধরেছেন। গঙ্গী চৌদ্দ বছর বয়সে বিধবা হয়েছে। এখন তার বয়স সতের। গঙ্গী তার বাবা মৈকুর কাছেই থাকে। হোলি উৎসবের দিন তার বৌদি ও অন্যান্য মেয়েরা যখন রঙ্গীন কাপড় পড়ে সে তখন সমাজের রীতি-নীতিতে সাদা থান কাপড় পড়ে। সন্ধ্যায় হোলির গান গাইতে মহারাজ বুদ্ধু সিংহের পুত্র গরীর সিং গান গাইতে মৈকুর বাড়ীতে আসেন। গঙ্গীকে দেখে গরীর সিংহের সুর ও তাল উলট পালট হয়ে যায়। গঙ্গীও তার গানে মুগ্ধ হয়ে দু'জন দু'জনকে ভালবেসে ফেলে। গরীর সিং গঙ্গীর বাবা মৈকুকে দেখার বিভিন্ন অজুহাতে গঙ্গীকে দেখতে আসত। গঙ্গীর সাথে তার দেখা হত, কিন্তু কেউ তাদের মনের কথা কাউতে বলতে পারত না। এভাবে কয়েক মাস চলে যায়। একদিন গরীর সিং নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। বাবা মৈকুকে তার না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে মৈকু বিস্ফোরিত চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে একটু রুক্ষ স্বরে মেজাজ দেখিয়েই বলেন,

'অন্যের জন্যে তোকে কিছু ভাবতে হবে না, তোর নিজের কাজে মন দিগে যা।'[৫৮]

সমাজে গঙ্গীর মতো কেউ চিন্তা করে না যে, বিধবা মেয়েদের বিধবা হওয়ার সাথে সাথে তাদের ভালোবাসা ফুরিয়ে যায় না, তারা আবারো অন্য কাউকে ভালবাসতে পারে, আবারো বিয়ে করতে পারে। সময়ের পরিক্রমায় পরের বছর আবার হোলি ফিরে আসে, গরীর সিং আর গঙ্গীর বাড়ীতে গান গাইতে আসবে না। তবুও তার জন্য সে অপেক্ষা করতে থাকে। এমন সময় কেউ একজন মৈকুকে ডেকে বলে, গরীর সিং মারা গেছে। প্রতি বছরই হোলি আসে, কিন্তু গঙ্গীর জীবন থেকে হোলির উৎসব যেন চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছে।

ত্যাগীর কা মুহাব্বত (تیّاگی کا محبت) গল্পে প্রেমিক ও বিধবা প্রেমিকার বৈষম্য তুলে ধরতে প্রেমচাঁদ উর্দু গল্পটি লিখেন। প্রেমিক সমাজকর্মী লালা গোপীনাথ তার জনপ্রিয়তা অক্ষুন্ন রাখবার জন্য প্রাকবিবাহ সন্তানের মাতা প্রেমিকা আনন্দীর সংস্রব ত্যাগ করে। চরম বিপদের সময়ও সে আনন্দীর কোন খোঁজ খবর নিত না। তথাপি গোপীনাথকে প্রচন্ড

[৫৮] সৌরেন দত্ত, *মুন্সী প্রেমচন্দ : গল্পসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, কামিনী প্রকাশালয়, ৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৩৪৭।

ভালবাসার কারণে আনন্দী তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেনি বরং গোপীনাথের আচরণকে যৌক্তিক বলেই ব্যাখ্যা করে, স্বয়ং অপরিসীম কষ্ট সহ্য করে গোপীনাথকে কলঙ্কমুক্ত রাখতে চায়।

লেখক এখানে বিধবা প্রেমিকার ভালবাসা, তার জন্য ত্যাগ স্বীকার বিশেষ ভাবে তুলে ধরেছেন। যে লালা গোপীনাথ আনন্দীকে মনে প্রাণে ভালবাসত কিন্তু পরোক্ষণে সে দেখলো যে, তার প্রেমিকা বিধবা ও সন্তানের মা। সে ভাবল যদি তাকে ছেড়ে না যায় তাহলে ভবিষ্যতে তার জনপ্রিয়তা, নাম, যশ, খ্যাতি সব নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ সে তখনও কুমার ছিল। আনন্দী যখন দেখল অনেকদিন যাওয়ার পরও এবং আনন্দীর চরম বিপদের সময়ও লালা গোপীনাথ তার কোন খোজ খবর নিত না ও তার সাথে একেবারে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়, তখন সে বুঝতে পারলো তার প্রেমিক এ বিধবার সাথে আর সম্পর্ক রাখতে চায় না। সে চিন্তা করে দেখলো যে, ঠিকই তো এখন তার সামনে এগিয়ে যাওয়ার পালা। সে ভালো বিয়ে করবে, কেন সে এই বিধবা কে বিয়ে করে সমাজে লোকদের নাক ছিটকানোর পাত্র হবে। তাই আনন্দী গোপীনাথের আচরণকে যৌক্তিক বলেই মনে করে নিজেকে উদারতার পরিচয় দিয়েছে।

সুভাগী (شوبھاگی) গল্পে প্রেমচাঁদ বিধবা সুভাগীর জীবনবাস তুলে ধরার পাশাপশি নারীর প্রতি বৈষম্য মূলক আচরনকে তুলে ধরেছেন। লেখকের প্রয়াণের মাত্র ছ'বছর আগে লেখক এই গল্পটি লিখেছিলেন। তুলসী মাহাতোর ছেলে রামু এবং মেয়ে সুভাগী। ছেলেকে রত্নভেবে তার জন্মের পর ধারকর্য করে অর্থ ব্যায় করে আনন্দ করেন কিন্তু সুভাগীর জন্মের পর হাতে অর্থ থাকা সত্বেও তা খরচ করেননি। রামু জোয়ান হয়েও অকাল কুষ্মান্ডু কিন্তু সুভাগী ঘরের কাজে যেমন পটু, চাষাবাদের কাজেও তেমনি নিপুন। এগারো বছরেই সুভাগী বিধবা হওয়ায় তা নিয়ে মা লাছমী তকে নিয়ে দুচিন্তা করতে থাকেন। মেয়ে যুবতী হওয়ার পর গ্রামের লোকেরা পুনরায় সুভাগীকে বিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থকালে সুভাগী তাতে অস্বীকৃতি জানায়। এতে করে ভাই রামু ও ভাবির সাথে তার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। সুভাগী ঘরের কাজের পাশাপাশি বাইরের কাজকর্মও সমান ভাবে করতে লাগলো। কিন্তু ভাই রামু ভাবে সে একাই সংসারের জন্য সব খেটে করছে তাই সে একদিন বাবা মাকে বলে সুভাগীকে নিয়ে আলাদা থাকতে। গ্রামের পাঁচজন ও গায়ের মালিক সজ্জনসিংহের হস্তক্ষেপে তারা আলাদা হয়ে যায়। সুভাগী মেয়ে হয়েও বাবা মায়ের সেবা শ্রশুষার কমতি করে না কিন্তু সেই সুখ তার বাবা মা বেশিদিন ভোগ করতে পারেনি। মাহাতো সাত আট দিনের জ্বরে মারা যায় তার ঠিক দিন পনের দিন পরে মা লাছমীরও দেহত্যাগ করে। সুভাগী সজ্জনসিংহের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে বাবা মায়ের অন্ত্যষ্টি ক্রিয়া সহ যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে এবং নিজে প্রতিমাসে মাসে সেই টাকা সজ্জনসিংহকে শোধ করে দেয়। তখন গ্রামরে লোকজন তার কর্মকাণ্ড দেখে তকে দেবী তুল্য মনে করতে লাগলো। সবাই সুভাগীর আচরণ ও তার কর্মতৎপরতায় খুশী। ঋণ যখন পুরোপুরি শোধ করে তখন সজ্জনসিংহের অনুরোধে সুভাগী তার ছেলেকে বিয়ে করে।

সুভাগী প্রচলিত ধারণার প্রতিবাদ করেছে এক অর্থে। নারীর বিবাহ এবং স্বামীর সংসারে অকর্মণ্য জীবনকে পরিত্যাগ করে সে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলে, তারপর বিবাহে সম্মত হয়েছে। অবশ্য এর জন্য প্রেমচাঁদ গল্প গড়ে তুলেছেন নিম্ন বর্ণের চরিত্র নিয়ে, সে বর্ণে নারীর প্রতি বৈষম্য মূলক আচরন কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

সামাজিক ভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়া বিধবা নারীদের পরিবারের সদস্যদের দ্বারা প্রতিনিয়ত অত্যাচারের স্বীকার হতে দেখা যায় অহরহ। প্রেমচাঁদ সামাজিক বৈষম্য এর চিত্র তুলে ধরতে বিধবা ফুলমতীর শেষ পরিনতি তুলে ধরতে *বেওয়াহ* (بیوہ) গল্পটি চয়ন করেছেন। গল্পটি ১৯২৯ সালে প্রথমে হিন্দিতে ও পরে ঐ সালেই উর্দুতে প্রকাশিত হয়।

গল্পে পন্ডিত অযোধ্যানাথ মারা যাওয়ার সময় চারজন বিবাহিত ছেলে এবং একটি মেয়ে, এছাড়া একটি পাকা বাড়ি, বাগান, কয়েক হাজার টাকার গয়না এবং কুড়ি হাজার টাকা নগদ রেখে যান। তার বিধবা স্ত্রী ফুলমতী কয়েক দিন বৈধব্যের শোকে ভুগে ছেলে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিড়ে আসেন। স্বামী বেঁচে থাকা অবস্থায় সন্তানরা তার কথার বাহিরে কোন কিছুই করত না, ছেলের বউদের মধ্যে তার সেবা যত্ন করার জন্য প্রতিযোগিতা হত। কিন্তু দেখা যায় অযোধ্যা নাথের শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে ফুলমতীর কথা অমান্য কারে সন্তানরা খরচ বাঁচানোর জন্য শাক-সবজি, তরি-তরকারি, ময়দা, ঘিয়ের টিন কম আনে। ফুলমতী ছেলেদের কম আনার কারণ জানতে চাইলে তার বলে, এত করে খরচ বাঁচানো হয়েছে, কিন্তু ফুলমতী তার হিসাব মত আবার সব কিছু আনতে বললে সন্তানরা নিজেদের সিদ্ধান্তেই অটল থাকে। এভাবে যতদিন যেতে লাগল ফুলমতী বুঝতে পারল দশ বারো দিন আগে এ বাড়িতে তার যে জায়গা ছিল, আজ আর তা নেই। বড় বউ তার সিদ্ধান্ত ছাড়াই সিন্দুক খুলে টাকা খরচ করতে শুরু করে। শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানের কারনে ফুলমতী চুপ করে থাকেন। কিন্তু শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে অনেক ঝামেলা হয়, অতিথীদের ঠিক মত বসানো না হওয়ায় উঠানে গাদাগাদি হয়ে যায়। ঠান্ডা পানির ব্যবস্থ্যা করা হয় নাই, লুচি ঠান্ডা হয়ে যায়, শেষ পর্যন্ত তরকারিতে ইদুর পাওয়া গেলে সব অতিথী উঠে চলে যায়। ফুলমতী যখন সন্তানদের বলেন,

"বংশের মান মর্যাদার জন্য যে মানুষটি নিজের জীবনটাই বরবাদ করে দিয়েছিল, তার পবিত্র আত্মাকে তোমরা কলংকিত করেছ।"[৫৯]

কিন্তু তার ছেলেরা মোটেও অনুতপ্ত হয় না বরং এটাকে সাধারণ ভুল হিসাবে দেখে। বড় ছেলে কামতানাথ বলেন- 'লজ্জার কি আছে? চুরি তো আর করিনি।' দু'মাস কেটে যাওয়ার পর চার ভাই এবং বড় বউ তাদের ছোট বোন

---

[৫৯] প্রেমচন্দ, 'বিধবা', *নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, কলকাতা, ২০ মে, ১৯৮৮, পৃ. ৩৭৪।

কুমুদের বিয়ের পরিকল্পনা করতে বসেন। বাবার পছন্দ করা মুরারি পণ্ডিতের ছেলের সাথে বিয়ে দিবেন না বলে তারা সিদ্ধান্ত নেয়। বোনের বিয়ের জন্য বাবার রেখে যাওয়া ২০ হাজার টাকা থেকে কোন ভাবেই ৫ হাজার টাকার বরপন দিয়ে বোনকে বিয়ে দিবেন না। উমানাথ এবং দায়ানাথ দু'জনই যথাক্রমে ডাক্তারখানা এবং খবরের কাগজ বের করার জন্য ৫ হাজার করে টাকার দাবি জানান। ছোট ভাই সীতানাথ কুমুদের বিয়ের জন্য নিজের ভাগের ৫ হাজার টাকা দিতে চাইলে কামতানাথ তার ভবিষ্যৎ পড়াশুনা এবং চাকরির জন্য না করেন। শেষ পর্যন্ত মায়ের গয়নার কথা উঠে। কামতানাথ বলেন এগুলো মায়ের সম্পদ, তাই তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। কিন্তু উমানাথ এবং দয়ানাথ মার কাছ থেকে তা ছলনা করে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করে। সে অনুযায়ী একদিন উমানাথ এবং দয়ানাথ ফুলমতীর কাছে গিয়ে বলল- দয়ানাথ কাগজে বড় বিপজ্জনক কিছু লিখে ফেলেছে, তাই ৫ হাজার টাকার মুচলেকা দিতে হবে, না হলে দশ বছর জেলে থাকতে হবে। ফুলমতী মা হয়ে সন্তানের এই বিপদের কথা শুনে তার সব গয়না দিয়ে দেয়। গয়না হাতিয়ে নেওয়ার পর চার ভাই মার মন যাতে সব সময় খুশি থাকে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকে এবং বউদের বলে দেন, মার অপছন্দের কিছু যাতে না করে। এদিকে ছেলেরা ফুলমতীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে জোর করে বাগান বন্দোবস্ত দিয়ে দেয়। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় কুমুদের বিয়ে নিয়ে। ফুলমতী ছেলেদের জানায় সংসারের সব কিছু তার। মায়ের কাছে সব সন্তান সমান। পরে তিনি কুমুদিনিকে বিয়ে দিতে চাইতে গিয়ে বলেন,

"কারও কাছে আমি কিছু চাইনা। নগদ কুড়ি হাজার টাকার মধ্যে ৫ হাজার কুমুদের কিন্তু উমানাথ ফুলমতীকে জানায় মুনি-ঋষিরা নিয়ম করেছে পিতার মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ সম্পত্তিতে ছেলেদের অধিকার, মা শুধু ভাত কাপড়ের অধিকারী।"[৬০]

সন্তানের মুখে এমন কথা শুনে ফুলমতীর অন্তরআত্মা উচ্চস্বরে হাহাকর করে উঠল। যে মাতৃত্ব নিয়ে সে গর্ব করত, তা আজ তাকে ধিক্কার জানাল। পেটের সন্তানরা এভাবে পর হয়ে যাবে সে ভাবে নি। পরদিন থেকে ফুলমতী কাজের লোকের মত সবার আগে বাড়ির সব কাজ করতে শুরু করল। মুরালিরালের ছেলে সাথে বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে কুমুদের বিয়ে চল্লিশ বছর বয়স্ক দীনদয়ালে সাথে দেওয়া হল। উমানাথ ডাক্তারখানা খুলল, কামতানাথের ছেলে হল, সীতা নাথ বৃত্তি নিয়ে বিলেত গেল, দয়ানাথ ভুল খবর ছেপে ৬ মাস জেলে থাকল। ফুলমতী কোন কিছুতেই কিছু বলল না। সারাদিন সে নির্বোধের মতো খাটে ও দু'বেলা দু'মুঠো খায়। এভাবেই একদিন কামতানাথের জন্য গঙ্গার জল আনতে যান। কামতানাথ যেতে না করলেও উমানাথ মার প্রতি দয়া করেনি। পানি তুলতে গিয়ে ফুলমতী পিছলে গঙ্গার জলে পড়ে যায়। তীব্র স্রোতে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। দু'চারজন মানুষ ছুটে আসে, তাদের একজন বলে,

"বুড়ির কপালে অশেষ কষ্ট ছিল, তাই পেয়ে গেছে।"[৬১]

---

[৬০] প্রেমচন্দ, 'বিধবা', *নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, কলকাতা, ২০ মে, ১৯৮৮, পৃ. ৩৮১

সমাজের উচ্চপদস্ত মানুষ গুলোর দৃষ্টিভঙ্গি বুঝাতেই প্রেমচাঁদ এই গল্পটি লিখেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, পতিতারা সমাজের বাহিরের মানুষ। তাদেরকে সমাজের মানুষ ঘৃনার চোখে দেখে। তাদের ব্যাপারে মানুষ যা খুশি তাই বলতে পারে। যেমন ভাবে খাহেশ গল্পে নিজের বৌ সম্পর্কে শ্বশুর ও স্বামীর এছাড়া স্বামীর বন্ধুদেরও মন্তব্য করতে কোন দ্বিধাবোধ হয়নি।

শুদ্ধি (*شدّھی*) জুন, ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। প্রেমনাথ নিজের সবকিছু খুইয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে অবশেষে উপলব্ধি করলেন, পতিতালয়ে কর্তব্যপরায়ণতা, ন্যায়নিষ্ঠা এই সব জিনিসের বড়ই অভাব। অতি দুষ্প্রাপ্য যা সংসার বা স্ত্রীর কাছ থেকে অনেক সময় সহজেই মিলে যায়। বন্ধুবান্ধবদের কাছে তিনি এক সময় সংযমী বলেই খ্যাতি ছিলেন। তার এই সংযমের অপব্যাখ্যা করতে গিয়ে বন্ধুদের মতে তারা কখনো নাকি উদারতার চিহ্ন খুজে পায়নি। যাইহোক বন্ধুদের আগ্রহে তিনি একবার মাহফিলে যান, প্রেমচাঁদ বলেন,

ایک دن دوستوں کے اصرار سے ایک محفل میں شریک ہوئے اور بی حسنہ کے حسن زاہد قریب نے وہیں مجمع عام میں ان کا دل لوٹ لیا۔ رنگین مزاجوں کے لیے حسن اور ادا مشغل تفریح ہے۔ زاہدوں کے لیے پیغام شہادت۔ ان پانچ برسوں میں پریم ناتھ نے دولت، عزت، دین، ایمان سب کچھ بی حسنہ کی نزر کر دیا۔[৬২]

(একদিন বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে এক মাহফিলে শরিক হন এবং সেখানকার সুন্দরী রূপসীর রূপের মায়াজালে প্রলুব্ধ হয়ে তার হৃদয় লুটিয়ে দিলেন। তাঁর চোখে তখন রঙিন স্বপ্নের নেশা, সেই স্বপ্নের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে বিলাস ব্যসনের স্রোতে দেহ মন ভাসিয়ে দিলেন। আত্মসংযমকে জলাঞ্জলি দেবার পক্ষে এই খবরটুকু যথেষ্ট। একটানা পাঁচ বছরের মধ্যে প্রেমনাথ তাঁর ধন-দৌলত, মান-সম্মান সব কিছুই সেই মোহিনী রূপসীকে নজরানা দিলেন।)

রামলীলা (*رام لیلا*) শ্রেণী বৈষম্য ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়। ছোটগল্পটি ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। শ্রেণী শোষণ মূলক রামলীলা গল্পটি হিন্দু ধর্মের অন্যতম বড় উৎসব রথ যাত্রা বা রামলীলাকে কেন্দ্র করে লেখা। লেখক এখানে শৈশবের রথ যাত্রার উৎসবের সাথে বর্তমানের যে পার্থক্য, জমিদার শ্রেণী ও প্রজা শ্রেণীর মধ্যকার বৈষম্য ও প্রজা শ্রেণীর শোষণের চিত্র স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখক বলেছেন পূর্ণাতীর্থ কাশী লীলাখেলা জগৎ জোড়া সুখ্যাতি কিন্তু এখন আর রামলীলা দেখতে মন চায় না, এখনকার কলা-কুশিলবদের হাফ-পায়জামা পড়া লম্পঝম্প দেখতে রুচিতে বাধে। পূর্বে রামপাড়ের অভিনেতাদের সাজ-সজ্জা যেমন দু'বনবাসী ভাই যে মুকুটগুলো পড়তো অসম্ভব

---

[৬১] প্রেমচন্দ, 'বিধবা', *নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, কলকাতা, ২০ মে, ১৯৮৮, পৃ. ৩৮৪।

[৬২] প্রেমচাঁদ, 'খাওয়াহেশ', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ১৬২।

কারুকার্য খচিত, বাঁদর হুনুমান মুখোশগুলোও পিতলেন কারুকার্য খচিত ছিল। যখন রথ বাড়ি বাড়ি যেতো সবাই মারতি বন্দনা করতেন এবং সবাই পাঁচ পয়সা করে দিতেন। কিন্তু তার বাবা পুলিশের কর্মকর্তা হওয়ায় পয়সা ছাড়া অর্ঘ্য দেওয়ায় তার আত্ম সম্মানে বাধে। পরে তার কাছে থাকা যে দুই পয়সা ছিল তা সে অর্ঘ্য দিয়ে দেয়। তার বাবা তার আচরণে অনেক রাগান্বিত হয়। রামলিমা মঞ্চায়নের দিন বাবা সেখানে উপস্থিত হন এবং পতিতা আবিদজার নৃত্যতে মুগ্ধ হন। আর আবিদজান জানতেন কোন পুরুষের কোন দুর্বলতা, সেই ভাবেই সে তার রঙ্গ-রসিকতার মাধ্যমে পুলিশকে ঘায়েল করলো। লেখক হঠাৎ দেখেন আবিদজান তার বাবার পাশে। সে ভেবেছিল তার বাবা রাগী পুলিশ কর্মকর্তা আবিদজানকে ধমক দিয়ে দূর করবে কিন্তু তার উল্টা ঘটনা ঘটলো। তার বাবা তার স্পর্শে বেশ মজায় আছে। তার পাশাপাশি শেঠজি বাবাকে উঁশকিয়ে দিলে বাবা জবাবে বললো,

رہا تھا تو بنیا، مجھے سمجھتا کیا ہے؟ یہاں ایسے مواقع پر جان تک نثار کرنے کو تیار ہیں! روپے کی تو حقیقت ہی کیا ہے؟ تیرا جی
چاہے، آزمالے! تجھ سے دگنی رقم نہ دے ڈالوں تو منہ نہ دکھلاوں۔ [৬৩]

(তুই বেনে, কী ভেবেছিস আমাকে? প্রয়োজনে এই শর্ম প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে টাকা তো তুচ্ছ। তোর মন চায় যদি যাচাই করে দেখ। তোর দুগুণ যদি না দেই তো মুখ দেখাব না।)

তারপর তার বাবা পকেট থেকে টাকা বের করে আবিদজানের পদতলে সঁপে দিল। যা দেখে লজ্জায় লেখকের মন খারাপ হয়ে গেল। যে বাবার আরতির থালায় একটা টাকা দিল না অথচ এই কুৎসিত, ঘৃনিত ও নিন্দনীয় ব্যাপারে সবার সামনে তিনি যে বাবাকে নিয়ে তার গর্ভ ও আনন্দের সীমা ছিল না আজ তার মায়ের কথা ভেবে বাবার এই কুকির্তী বেমালুম চেপে গেল। এখানে প্রেমচাঁদ এক সামাজিক বৈষম্যের স্বীকার পতিতার কারনে ছেলের সামনে বাবার নষ্টামির ছবির ফুটিয়ে তুলেছেন।

ইংরেজী কবি David Rubin তার *Widows, wives, and other heroines*: twelve short stories বইতে এই ঘটনাটি সংক্ষেপে এভাবে তুলে ধরেন,

> In *Ramleela* he described children's amusement at the ludicrous masks, human and animal, put on by the characters in Ramleela and

---

[৬৩] মুন্সি প্রেমচাঁন্দ, 'রামলিলা', *মাজমুয়াহ মুন্সি প্রেমচাঁন্দ ঃ আফছানে, রামলিলা*, ছংগে মিল পাবলিকেশন, লাহোর, ২০০২, পৃ. ৪৭৩।

> also the hypocrisy of the rich who would cheat the poor artistes who played the leading roles and would allow themselves to be blackmailed by prostitutes who danced to help raise money for the Ramleela.[৬৪]

তৎকালীন হিন্দু মেয়েদের বিয়ে দিতে গেলে স্বামীকে অবশ্যই পণ দিতেই হত, তাই মেয়ের বাবা মায়ের কাছে কন্যা সন্তানের বিবাহের নাম শুনলেই তাদের গায়ে যেন জ্বর এসে যেত। সাত সাতটা ছেলের পর একটি মেয়ে জন্মালেও খুব কম বাবা মা আছেন যারা তাকে খুশি মনে স্বাগত জানান। এসব অশুভ চিন্তার মূলে রয়েছে একমাত্র পণপ্রথা। বিয়ের পর পণ প্রথাকে কেন্দ্র করে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বৈষম্য মূলক আচরণের কথা বলতে গিয়ে প্রেমচাঁদ কুসুম (کسم) গল্পটি লিখেন। গল্পটি ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়। যা ছিল পণপ্রথার বিরুদ্ধে লেখা প্রতিবাদী গল্প। নবীন বাবু লেখকের ছোটবেলার বন্ধু। তিনি লখনৌ শহরে বাস করেন। কুসুম নবীন বাবুর পালিতা মেয়ে। তাদের নিজেদের কোনো সন্তান ছিল না। একদিন লেখকের সাথে নবীন বাবুর দেখা হয়। দুশ্চিন্তাগ্রস্থ নবীন বাবু কুসুমের বিয়ের সম্পর্কে লেখককে বলেন। কারণ বছর খানেক আগে কুসুমের বিয়ে হয়েছিল। এক সপ্তাহ সংসার করেছে মাত্র কিন্তু তার স্বামী তার সাথে কথা পর্যন্ত বলেনি। কুসুম প্রায় পঞ্চাশটা চিঠি পাঠিয়েছে কিন্তু কোনোটার উত্তর দেওয়াতো দূরে থাক চিঠিগুলো সে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। কুসুমের চিঠিগুলোতে দয়া, লজ্জা, তিরস্কার সবই আছে। লেখক ভাবলো কুসুমের স্বামীর সাথে সরাসরি কথা বলবে। সে সন্ধ্যা বেলায় কুসুমের শ্বশুর বাড়ি মোদাবাদ হাজির হলো। কুসুমের স্বামী লেখককে এসে প্রণাম করলেন তার বিনয়ী ভাব দেখে লেখক মনমুগ্ধ হয়ে গেলেন পরে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

> "توتم حضرت شاطر سے کس قسم کی مرد چاہتے ہو۔ دادودہش میں توانھوں نے شکایت کا موقع نہ کیا۔"
>
> نوجوان نے سر جھکا کر کہا۔ "اس دادودہش سے میرا ذفتی فائدہ کیا ہوا، طرفین کے دس بارہ ہزار روپے خاک میں مل گئے
> اور انھیں کے ساتھ میری آرزوئیں بھی خاک میں مل گئیں۔ والد صاحب تو مقروض ہو گئے ہیں اور اب میری تعلیم کے
> بار کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں بیگار کے طور پر ایل، ایک، بی کلاس میں شریک ہو گیا ہوں۔ کیا سسر صاحب مجھے
> اگینڈ نہ بھیج سکتے تھے۔ ان کے لیے دس پانچ ہزار روپے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔" [৬৫]

---

[৬৪] David Rubin, *Widows, wives, and other heroines*: twelve short stories, New York: Oxford University Press, Delhi, 1998, P- 245.

[৬৫] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'কুসুম', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে ঃ তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৬৮৪।

("তুমি হযরতের কাছ থেকে আসলে কী চাইছ ? লেনদেনের ব্যাপারে তো তিনি কিছু বলার সুযোগ দেননি।
যুবক মাথা নীচু করে বলল- এটা তো প্রথমেই আমাকে তাঁর বলে দেওয়া উচিত ছিল। তাহলে কী বিয়েই করতাম ? উনি যাই খরচ করে থাকুন না কেন তাতে আমার কী উপকার হল? দুই তরফেরই দশ বারো হাজার টাকা এমনিতেই চলে গেছে আর সেই সঙ্গে আমার সাধও ধুলোয় মিশে গেছে। বাবার তো কয়েক হাজর টাকা ঋণই হয়ে গেছে। তিনি এখন আমাকে ইংল্যাণ্ড পাঠাতে পারবেন না। শ্বশুর সাহেব চাইলে কী আর আমাকে ইংল্যাণ্ড পাঠাতে পারেন না ? তাঁর কাছে পাঁচ-দশ হাজার কোনো ব্যাপারই নয়।)

সেই ক্ষোভে যুবক পণ করেছে যে, সে কুসুমের সাথে কথা বলবে না। এটাই তাদের জন্য শাস্তি। উনি আমার স্বপ্ন পূরণ না করলে ওনার মেয়েকে ত্যাগ করতেও দ্বিধাবোধ করবে না। একমাত্র পণের কারনে স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে এই শ্রেণী বৈষম্যতা ঘটেছে।

প্রেমচাঁদের গল্পে বিভিন্ন পেশাজীবি শ্রেণীর কথাও উঠে এসেছে। পদ ও পদবির দাপটে এ সমস্ড় লোকেরা নিরীহ সাধারণ মানুষের উপর চালাতো বহুমূখী শোষণ। এভাবে তারা সম্পদের পাহাড় গড়ে সমাজে শ্রেণী বৈষম্যকে আরো উসকে দিতো। তাদের কারনে কালক্রমে চলে আসছে সুদ ও ঘুষের কারবার। যার ফলোশ্রুতিতে পদদলিত হয়ে পিষ্ঠ হচ্ছে সমাজের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষগুলো। বিভক্ত হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীতে। সুদও ঘুষ আদান-প্রদানের মাধ্যমে মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ভাঙ্গছে আর সৃষ্টি হচ্ছে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও বৈষম্য। প্রেমচাঁদের ছোটগল্পে বিভিন্ন পেশাজীবি শ্রেণীর শোষণকে নিখুতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে *সাজা* গল্পটির কথা বলা যেতে পারে। অক্টোবর, ১৯২৫ সালে প্রকাশিত *সাজা* (*سزا*) গল্পে প্রেমচাঁদ দেখিয়েছেন গ্রামের এক গরীব বৃদ্ধ ব্রাক্ষণ জগৎ পাণ্ডে তার পাঁচ হাজার টাকার মূল্যের দশ বিঘে জমি মামলায় পাবার আশায় জজসাহেব মিস্টার জি. সিনহাকে তার শেষ সম্বল একশত পঞ্চাশ টাকা দেন। ওদিকে শিবপুরের মোত্তার সত্যদেব জজসাহেবকে এই মামলায় তাকে জিতিয়ে দেওয়ার জন্য বলে। সত্যদেব ও জজসাহবেরে মধ্যে কথোপোকথন তুলে ধরেছেন এইভাবে,

> *ستیہ دیو۔ حضور کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ کہہ کر گنّیوں کی ایک گڈی نکال کر میز پر رکھ دی۔ مسٹر سنہا نے گڈی کو آنکھوں سے شمار کر کے فرمیا۔ انھیں میری طرف سے راجا صاحب کی نذر کر دیجئے گا۔ آخر آپ کوئی وکیل تو کریں گے ہی۔ اسے کیا دیجیے گا؟*
>
> *ستیہ دیو۔ یہ تو حضور کے اکتیار میں ہے۔ جتنی ہی پیشیاں ہوں گی۔ اتنا ہی صرفہ بڑھے گا۔*
>
> *سنہا۔ میں چاہوں تو مہنیوں لٹکا سکتا ہوں۔*
>
> *ستیہ دیو۔ بیشک ! اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔*

سنہا۔ پانچ پیشیاں بھی ہوئیں تو آپ کے کم سے کم ایک پوار توا ڑہی جائیں گے۔ آپ یہاں اس کا آدھا ہی پورا کر دیجیے۔ تو ایک ہی پیشی میں فیصلہ ہو جائے گا۔ آدھی رقم بچ جائے گی۔

ستیہ دیو نے دس گنیاں اور نکال کر میز پر رکھ دیں اور فخر کے ساتھ بولے۔ حکم ہو تو راجا صاحب سے کہہ دوں۔۔۔۔۔۔ آپ اطمینان رکھیں۔ صاحب کی نظر عنایت ہو گئی ہے۔ [৬৬]

(সত্যদেব- হুজুর আপনার হাতেই তো সব কিছু।' এ কথা বলে সত্যদেব টাকার একটা বড় থলি তার ঝোলা থেকে বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন। জজসাহেব থলিটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার তরফ থেকে কোনো ক্রটি হবে না। কিন্তু একজন উকিলও তো লাগবে। তাকে কী দেবেন?'
সত্যদের- 'সে তো হুজুর আপনার হাতেই রয়েছে,'
'মামলার দিন যদি বেশি পড়ে তাহলে খরচও বেশি পড়বে।'
সিন্‌হা- 'আমি ইচ্ছে করলে এ মামলা মাস খানেক টেনে নিয়ে যেতে পারি।'
সত্যদের- 'বেশ তো, তাতে কোনো অসুবিধা হবে না।'
সিন্‌হা- 'পাঁচটা দিন ফেললে কম করেও হাজারখানেক টাকা খরচ হতে পার, জজসাহেব বলেন, 'আপনি যদি এখন তার অর্ধেকটা দিয়ে দেন তাহলে এক দিনেই রায় দিয়ে দেব। তাতে আপনার অর্ধেক খরচ বেঁচে যাবে।'
সত্যদেব আরো হাজারখানেক টাকা টেবিলের উপর রেখে গর্ব করে বললেন, 'তাহলে আমি জমিদারবাবুকে বলে দিতে পারি, আপনি এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সাহেবের কৃপাদৃষ্টি পড়েছে আপনার উপর।')

পরের দিন জজসাহেব পান্ডের দাবি খারিজ করে দেয়। রাগে দুঃখে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জগৎ পান্ডে জজসাহেবের বাংলোর সামনে একটা বট গাছের তলায় চট পেতে অনশন শুরু করে ও গাদাগাদা টাকা ঘুষ নেওয়ার কারণে জজ সাহেবকে গালাগালি করতে থাকে। লেখক এখানে জর্জসাহেবের স্বেচ্ছাচারিতা ও লোভ লালসাকে তুলে ধরেছেন। তিনি উভয়ের কাছ থেকেই ঘোষ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জগৎ পান্ডে গরীব ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে ধনী শিবপুরের মোত্তার সত্যদেব যিনি একটু বেশী টাকা ঘোষ দিয়েছিলেন বলে এই মামলায় তাকে জিতিয়ে দেন। এখানে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের শ্রেণী বৈষম্যটা সম্পূর্ণ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

উচ্চবিত্ত সমাজের মহাজনরাই সুদের ব্যবসা চালু করে নিম্নবিত্তের জন্য। নিম্নবিত্তের শেষ সম্বলটুকু ছিনিয়ে নেওয়ার সুযোগটা তারা উচ্চহারে সুদ গ্রহণের মাধ্যমে কাজে লাগাত। যা উভয়ের শ্রেণী বৈষম্যই এর মূল কারণ। লেখকের *মুক্তিধন* (*مکتی دھن*) গল্পে দেখা যায়- লাল দাউদয়াল শতকরা ২৫-৩০ টাকা নিম্ন শ্রেণীর লোকদের প্রায়ই শতকরা হারে সুদে টাকা দিত। গরীব মুসলমান কৃষক রহমানের বৃদ্ধ মা হজ্বে যেতে চাইলে রহমান লালা দাউদয়াল এর

[৬৬] প্রেমচাঁদ, 'সোয়া সের ঘেঁহু', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৫৩৩-৫৩৪।

কাছ থেকে ২ বৎসরের জন্য সুদে ২০০ টাকা নিয়ে আসে। ২ বৎসর পর তা দিতে না পেরে সে ১ বৎসর বাড়িয়ে ৩০০ টাকা সুদে আসলে দিবে বলে সময় নেয়। লাল দাউদয়াল এও বলে,

داؤدیال نے کہا۔32روپے سیکڑے بیاش ہو جائے گا۔

ارمن نے جاواب دیا۔ جیسے حضور کی مرضی۔ [৬৭]

(দাউদয়াল বললেন, 'সুদের হারটা যে বেড়ে শতকরা বত্রিশ টাকা হয়ে যাবে?'
রহমান নির্বিকার ভাবে বলল, 'কি আর করা যাবে, হুজুরের যা মর্জি তাই হবে।')

হঠাৎ রহমানের মা মারা যাওয়ার কারণে তার কবর বাধানো জ্ঞাতিদের খাওয়ানো, গরীবদের খৈরাত করা ও কোরান পাঠের জন্য রহমান লালা দাউদয়াল এর কাছে আরো ২০০ টাকা যা ২ বৎসর পর সুদে আসলে ৭০০ টাকা দাড়াবে এই শর্তে টাকা নেয় এবং বলে যান,

رحمن۔ غریب پرور۔اللہ دے تودوبیکہ ادکھ میں پانچ سوآسکتے ہیں۔اللہ نے چاہاتو میاد کے اندر آپ کی کوڑی کوڑی ادا
کرودوں گا۔ [৬৮]

(রহমান- গরীবের মা বাপ খোদা যদি দয়া করেন, তাহলে দু'বিঘে জমি থেকে আখের যে ফলন হবে তা বিক্রি করে পাঁচশত টাকা পাবো। খোদার করুণা হলে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই আশাকরি আপনার দেনা ঠিক মিটিয়ে দিতে পারবো।)

কৃষকের সামাজিক ভাবে বেঁচে থাকার জন্য, তার পরিবারের ভরণ-পোষণ, চাষাবাদের খরচ, ঋণশোধ ইত্যাদি উৎস হল জমির ফসল। কিন্তু সেই জমিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেও কৃষককে খেয়ালী প্রকৃতির ওপর নির্ভর করতে হয়। ভূস্বামী কৃষকের নিকট থেকে খাজনা এবং অন্যান্য পাওনাদি আদায় করেন বটে কিন্তু কৃষির ফসলের উন্নতি কিংবা সেচের কোনো ব্যবস্থার কথা ভাবেনও না। রহমান ও তার স্ত্রী, সন্তানেরা জমিতে দিনরাত খেটে তার আখের ফসল এ বছরে পোয়া বারোতে পরিণত করে। খুশীতে তার মন ভরে যায়, সে ভাবে এ বছর গুড়ের টাকা যা আসে তা দিয়ে লালা দাউদয়ালের টাকা পরিশোধ করবে। তবে এখনই খুশি হলে চলবে না। প্রেমচাঁদ ফসলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

---

[৬৭] প্রেমচাঁদ, 'মুক্তিধন', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১,পৃ. ২৭৮।
[৬৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০।

کھیتی کی حالت اناتھ بالک کی سی ہے۔ جل اور وایوں انوکول ہوئے تو اناج کے ڈھیر لگ گئے ان کی کرپانہ ہوئی، تہ لہلہاتے ہوئے
کھیت کپٹی متر کی بھانتی دغادے گئے اولہ اور پال، سوکھا اور باڑھ ،ٹڈّی اور لاہی، دیپک اور آندھی سے پر ان بچے تو فصل کھلیان میں
آئی اور کھلیان سے آگ اور بجلی دونوں ہی کا بیر ہے۔ اتنے دشمنوں سے بچی تو فصل، نہیں تو فیصلہ۔ [৬৯]

(ক্ষেতের অবস্থা ঠিক অনাথ বালকের মতো। জল আর হাওয়া বাতাস চাষের অনুকূল হলে তবেই প্রচুর ফসল ফলতে দেখা যায়, আর তা না হলে বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর মতো বুকে ব্যথা দিয়ে যায়। শিলা বৃষ্টি, খরা ও বন্যা, পোকা ও পঙ্গপাল, উইপোকা এবং ঝড়ের হাত থেকে বাঁচলে তবেই তা কৃষকের মুখে হাসি ফুটে উঠবে, রাশি রাশি ফসল খামারে আসবে। তবে সর্বনাশের আশঙ্কা এখানেই শেষ নয়। সেই সর্বনাশের উৎস হচ্ছে আগুন। তাই খামারের ফসল আগুনের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। এটা সব শত্রু তথা সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচলে তবেই তো ফসল রক্ষ করা যাবে, তা না হলে সবই তো ফসকে যাবে।)

দুই বৎসর পার হলে লালা দাউদয়ালের চাপরাশি কাঁধে লাঠি নিয়ে রহমানের হাত ধরে দীর্ঘ পাঁচ ক্রোশ অতিক্রম করে লালা দাউদয়ালের বাড়ী নিয়ে যায়। সে লালা দাউয়ালের পা দুটো জড়িয়ে ধরে আরো এক বৎসরের সময় চায়। লালা দাউয়াল তখন রহমানকে বলে,

داؤدیال۔ اب کیا صلاح ہے؟ دیتے ہو یا نالش کردوں؟ [৭০]

(দাউদয়াল- এখন কি উপায়? 'ভালোয় ভালোয় আমার টাকা পেরত দেবে, নাকি আমাকে নালিশ করতে হবে ?")

আলোচ্য গল্পে রহমানের এই দারিদ্রতার কারণে সে তার স্ত্রী, সন্তানদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ভালো কিছুর আকাঙ্খায় বার বার মহাজনের কাছ থেকে সুদে টাকা নিতে হয়, আর মহাজনও অধিক লাভের আশায় বার বার তাকে সুদের টাকা দিয়ে শেষ পরিণতিতে তার পা জড়িয়ে ধরতে বাধ্য করেন। সমাজে তাদের এই শ্রেণী বৈষম্য পরিণতি করতে এই দু'শ্রেণী লোকের আজ দু'রকম অবস্থান।

Munshi Premchand : A Literary Biography বইতে মদন গোপাল কৃষকের দৈন্যতাকে এ ভাবে তুলে ধরেণ,

> The responsibility is naturally that of the shepherd's and he is asked by the village community to atone for it. In the process he too is

---

[৬৯] প্রেমচাঁদ, 'মুক্তিধন', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১,পৃ. ২৮০-২৮১।
[৭০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩।

> ruined. The shepherd also becomes a laborer. The two now confess their own guilt to each other. [৭১]

যদি ও গল্পের শেষে দেখা যায়, রহমানের সততা ও নিষ্ঠা দেখে পরে লালা দাউদয়াল তার পুরো ঋণ মওকুফ করে দেয় ও তাকে চিরদিনের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। এটা দাউদয়ালের উচ্চ মন মানসিকতার প্রভাব কিন্তু সব জায়গাতে কৃষকের এমন প্রতিদান মেলে না। কৃষককে হার স্বীকার করে চরম সুদের রোসানলে পড়তেই হয়।

মুয়াম্মাহ (معمہ) গল্পটি মার্চ, ১৯২১ সালে 'জামানাহ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অফিসের বড় কর্তা কর্তৃক নিচু শ্রেণীর কর্মচারীর উপর মানসিক নিপিড়ন ও এর ফলে সৎ থেকে অসৎ হয়ে যাওয়াই এ গল্পের উপজীব্য বিষয়। গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিল গরীব চাপরাশিকে নিয়ে। যিনি লেখকের দফতরের একজন চাপরাশি ছিলেন। গরিব খুবই সরল, অনুগত, কর্মপটু, ভৎসনা খেয়েও নিরুত্তর, যথা নাম গুণ সম্পন্ন ছিলেন। দফতরে কোনদিনও অনুপস্থিত থাকেন না এমনই একজন চাপরাশি ছিলেন। তাছাড়া দফতরে আর ও তিনজন কাজ করতো। তারা বেশ দম্ভের সাথে কাজ করতো। তারা কুঁড়ে এবং ফাঁকিবাজও ছিলেন। এতোসব বদগুন থাকা সত্বেও তাদের অবস্থার উন্নতি হতো কিন্তু গরিবের হতো না। দফতরের সমস্ত কর্মচারী, দফতরি থেকে শুরু করে বড়োবাবুও তার উপর বিরক্ত থাকতো। পদোন্নতির সুযোগ আসলেও গরিবকে পাত্তা দেওয়া হতো না।

লেখক অনেকদিন গরিবের পক্ষ নিয়ে অন্য তিন জন চাপরাশির সাথে ঝগড়াও করেছেন। একদিন বড়োবাবুর রুম থেকে বকাবকির শব্দ আসছিল। লেখক ভিতরে গিয়ে দেখেন সামান্য একটু দোয়াতের কালি টেবিলে পড়েছে বলে বড়োবাবু গরিবকে যা নয় তাই বলছেন। আর বেচারা গরিব পাষাণের মতো শুনছে। লেখক বড়োবাবুকে ইংরেজিতে বলে- বড়োবাবু আপনি অন্যায় করছেন। সেতো জেনে শুনে ফেলেনি। এতো কঠিন সাজা দেওয়া সত্যিই অমানবিক।

বড়োবাবু বলেন- আপনি একে জানেন না, সে মহা বদমাইশ ও পাজিও বটে। বাড়িতে একজোড়া লাউয়ের চাষ, হাজার টাকার লেনদেন, অনেক দুধলা মেষ আছে তাই ওর দেমাগ বেশি। বাড়ির অবস্থা এমন হলে চাপরাশিগিরি করবে কিভাবে ? আর একজন সহকর্মী বলে, বাড়িতে এতো কিছু হয় কই ? একদিন দফতরের মানুষদের ভাগও তো দেয় না। লেখক গরিবকে জিজ্ঞাসা করায় গরিব বলে, এগুলো আমার বাড়িতে হয় ঠিকই কিন্তু আপনাদের দেবার মত এতসব হয় না। লেখক বলেন ভালো কথা, একদিন তো নিয়ে আসো, আনলেই তারপর দেখা যাবে।

---

[৭১] Madan Gopal, *Munshi Premchand: A Literary Biography*, Asia Publishing House, Bombay, 1964. P- 246.

পরদিন গরিব তিনজন হৃষ্টপুষ্ট যুবককে সাথে নিয়ে দফতরে আসে। তাদের মাথার উপর ঝুড়িতে মটকা, আখের রস। দফতরে ঝুড়ি নামানোর সাথে সাথে লুটপাট শুরু হয়ে যায়। বড়োবাবু উচ্চস্বরে বলেন– এখানে এত ভিড় কিসের? যাও নিজের কাজে যাও। লেখক বড়বাবুর কানে কিছু একটা বলার পর সে সব বুঝতে পেরে কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলেন, গরিব তুমি এসব জিনিস এখানে নিয়ে এসেছো কেন? আমি সাহেবকে বলে দেবো নিয়ে যাও এগুলো। অনেক বলার পর বড়োবাবু রাজি হন। পরে দেখা যায়,

سب چیزوں میں سے نصف گھر بھیجواہیں۔ باقی تصف دوسروں کے حصّے میں آئیں۔اس طرح یہ ناٹک ختم ہوا۔اب دفتر میں

غریب کی عزت ہونے لگی۔ [৭২]

(প্রতিটি জিনিসের অর্ধেক নিজের বাসায় পাঠান। বাকি অর্ধেক অন্য সকলকে ভাগ করে দেন। এভাবে এই অভিনয় শেষ হয়। এরপর থেকে দফতরে গরিবের সম্মান হতে থাকে।)

The World of Premchand: Selected Short Stories বইতে লেখক ডেভিড রবিন এ পসঙ্গে লিখেন,

> Poses the same question as to which way is better- the way of the magistrate who accepts bribes to release a culprit on bail but sentences his own poor mali, who is caught red-handed stealing fodder for his starving bullocks at the dead of night to a hard sentence. The magistrate does this because he is keen to create an impression that he in honest and impartial! [৭৩]

এরপর থেকে দফতরে গরিবের সম্মান বাড়তে থাকে। গরিব থেকে গরিবদাস হয়ে যান। এখন আর সহকর্মীদের কটুবাক্য সহ্য করতে হয় না। বর্তমানে তার ভিতরে দীনতার জায়গায় আত্মগৌরবতা দেখা দিয়েছে। পাঁচ দশদিন পর পর বড়োবাবুকে ভেট দেয়। সে দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে শিখেছে। সরলতার পরিবর্তে চালাকি এসেছে। এখন সে বড়োবাবুর কাছ থেকেও পয়সা মারতে শিখেছে। ঠেলা ওয়ালাকে আট আনা দিয়ে বারো আনার রশিদে সই করিয়ে নেয়। প্রেমচাঁদের ভাষায়,

---

[৭২] প্রেমচাঁদ, 'ময়াম্মাহ', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১০, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৪৪৮।

[৭৩] David Rubin, *The World of Premchand: Selected Short Stories*, The David Rubin Collection, New Delhi, 21 October 2017, P- 246.

اپنی دوستوری مانگنے لگا۔ ٹھیلے والے راضی نہ ہوئے۔اس پر غریب نے سب پیسے جیب میں رکھ لیے اور تند لہجے میں بولا "اب ایک پیسہ بھی نہ دوں گا۔ جاؤ جہاں چاہو فریاد کرو۔ دیکھیں کیا بنا لیتے ہو۔" قلیوں کو جب یقین ہو گیا کہ اب بغیر دستوری دیے ایک پیسہ بھی ہاتھ نہ لگے گا۔ جمع ہی غائب ہو جائے گی تو مجبوراً چار پیسے دینے پر راضی ہو گئے۔ غریب نے آٹھ آنہ ان کے حوالے کیا اور بارہ آنہ کی رسید پر انگوٹھے کا نسان بنوالیا۔ رسید دفرت میں داخل ہو گئی۔ [৭৪]

(নিজের দস্তুরি চাইতে ঠেলাওয়ালা দিতে রাজি হয় না। গরিব রেগে গিয়ে সমস্ত পয়সা পকেটেপুরে ওকে ধমক দেয়- একটা ফুটো পয়সাও তুই আর পাবি না। যেখানে পারিস নালিশ করগে। দেখি তুই আমার কী করতে পারিস। ঠেলাওয়ালা যখন দেখল, ভ্যাট না দিলে সব পাওনাই গায়েব হয়ে যাচ্ছে, তখন কেঁদে কেটে চার আনা পয়সা দিতে রাজি হয়। গরিব ওকে আট আনা দেয়, আর বারো আনার রসিদ লিখে ওর বুড়ো আঙুলের ছাপ নেয়, তারপর দফতরে জমা দিয়ে দেয়।)

এসব দেখে লেখক হতবাক হয়ে যান। কয়েক মাস আগেও গরিব সারল্য ও নম্রতার প্রতিমূর্তি ছিল। তার সরলতার সুযোগে অন্যারা যখন তাকে হেয় করতো, লেখক তখন তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে মাথা উচু করে লড়াই করার পথ দেখান। বাস্তবে সেটাই ছিল পতনের পথ। এখানে গরিব বাহ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তার আত্ম প্রতিষ্ঠাকে বলি দিয়েছে। প্রেমচাঁদ তার অন্য গল্পের মতই উক্ত গল্পটিতে এই বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন।

সৎ অফিসারের ঘুষ গ্রহণ না করার কারণে সমাজপতিদের দ্বারা শাস্তি ভোগ করার চিত্র তুলে ধরতে উভয়ের শ্রেণী বৈষম্যের রুপায়ন করেছেন কবির অনবদ্য ছোটগল্প ১৯১৫ সালে প্রকাশিত *নিমক কা দারোগাহ* (نمک کا داروغہ) মাধ্যমে। নিমক নামক স্থানে একটি দপ্তর খোলা হলে অনেকেই এর দারোগা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতে থাকে। অবশেষে বংশীধর নামাক একজন সৎ দারোগা হিসেবে সেখানে নিয়োগ পান। ছ'মাসের মধ্যেই তিনি তার উত্তম আচরণ ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে অন্যান্য অফিসারদের মোহিত করে ফেলেন। একদিন বংশীধর নিমককের দপ্তর থেকে মাইল খানেক পূর্বে যমুনা নদীতে পন্ডিত অলোপিধীন নামক এলাকার সবচেয়ে নামী জমিদারের অবৈধ ব্যবসা জব্দ করেন। উল্লেখ্য অলোপিধীনের কাছে ছোট বড় প্রায় অনেকেই ঋণী। এ অঞ্চলে তার লাখ লাখ টাকার লেনদেন। বংশীধর অলোপিদীনকে অবৈধ মালামালসহ আটক করলে সে নিজের সম্মান রক্ষার জন্য বংশীধরকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বংশীধর তা প্রত্যাখ্যান কারে তাকে আদালতে স্বোপর্দ করে। অর্থশালী হওয়ার দ্বরুণ নিজেকে অলোপিদীন বিনা সাজায় এবং নির্দোষ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। এদিকে ন্যায়নিষ্ঠার পুরস্কারের কথা বলতে গিয়ে প্রেমচাঁদ লিখেন,

[৭৪] প্রেমচাঁদ, 'ময়াম্মাহ', *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১০, ডিসেম্বর, ২০০১, পৃ. ৪৪৮-৪৪৯।

لیکن بنسی دھر نے ثروت اور سوخ سے بیر مول لیا تھا۔ اس کی قیمت دینی واجبی تھی۔ مشکل سے ایک ہفتہ گزرا ہوگا کہ معطلی کا

پروانہ آپہنچا۔ فرض شناسی کی سزا ملی۔ بیچارے دل شکستہ اور پریشان حال اپنے وطن کو روانہ ہوئے۔ [৭৫]

(বংশীধর অর্থের সঙ্গে শত্রুতা মেনে নিয়েছেন। তার মূল্য তাকে পরিশোধ করতেই হবে। বড়জোর একটি সপ্তাহ কেটেছে কী কাটেনি, সাময়িক বরখাস্তের পরোয়ানা এসে পৌছোয়। কর্তব্য পরায়ণতার দণ্ড মেলে। বেচারা ভগ্নহৃদয়ে, শোকে দুঃখে ব্যথিত মনে বাড়ি ফিরে যান।)

এভাবেই বিত্তশালী সমাজপতিরা অসহায় সৎ অফিসারদের অত্যচার ও নিপিড়ন করে থাকেন। উক্তগল্পে অর্থশালী সমাজপতি ও একজন সৎ অফিসারের মধ্যকার বাস্তবভিত্তিক সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যতা সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

সমাজে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যে ব্যাপক শ্রেণী বৈষম্যের তুলনা বুঝাতে প্রেমচাঁদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প হল *নেশা* (*نشہ*) । গল্পতে ঈশ্বরী মোরাদাবাদের জমিদারের ছেলে আর লেখক অতি নগণ্য কেরাণীর ছেলে। এলাহাবাদে পড়াশুনার কারণে আমরা এক সাথে থাকতাম। আমার কাছে টাকা পয়সা আর গাড়ী ভাড়া না থাকার কারনে পূজায় বাড়ী যাওয়া হয়নি। জমিদারের ছেলে ঈশ্বরী আমাকে তার সাথে বাড়ী যাওয়ার জন্য আহ্বান করলে আমি তাতে রাজি হয়ে যাই। ট্রেনস্টেশনে এসে রাতের খাবারের উদ্দেশ্যে হোটেলে বসে দেখলাম, খানসামার ঈশ্বরীর হাতের ঈশারায় তার সামনে সবাই ছুটে আসে অথচ আমি সাধারণ পোষাকে থাকায় কিছু একটা চাইলে তেমন উৎসাহ তাদের ভীতর দেখতে পেলাম না। খানসামাদের আমার প্রতি এই বৈষম্যমূলক ব্যবহারের দরুণ খাবারে তেমন স্বাদ পাই নাই।

মোরাদাবাদের স্টেশনে পৌছা মাত্রই দেখলাম, পাঁচ জন চাকর ও দুই জন ভদ্রলোক তাদের মধ্যে একজন মুসলমান রিয়াসাত আলী ও অন্যজন ব্রাক্ষণ রামহরণ আমাদের স্বাগত জানাবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তারা আমাকে ধূতির বেশভূষায় সাধারণ মানের দেখে অবাক চোখে তাকিয়ে হেসে ঈশ্বরীকে বলল, তোমার সাথে কাকে এনেছো ? ঈশ্বরী তাদের মিথ্যা সম্ভাষণ দিয়ে জানালো- উনি মাহাত্মা গান্ধীর শিষ্য ও রাজার ছেলে। একথা শুনে তারা আমাকে ভয় পেয়ে গেলো, বাড়িতে যাওয়া মাত্রই তারা আমাকে সমীহ করতে থাকে, আমার পা জল দিয়ে ধুয়ে দেয়, বিশ্রাম নেওয়ার সময় অমনি দুজন লোক পাখা টানার জন্য এক পায়ে খাড়া হয়ে থাকে। টেবিলে আলো জ্বালিয়ে দেয়, শোবার বিছানা গুছিয়ে দেয়।

---

[৭৫] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'নিমক কা দারোগাহ', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে ঃ তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ১৬৪।

প্রেমচাঁদ এখানে লেখকের জামা-কাপড় সাধরণ হওয়ার দরুণ উচ্চবিত্ত সামাজের লোকেরা তাকে চাকর বাকর ভেবে তাচ্ছিল্ল করার দরুণ তার বন্ধু ঈশ্বরী তা বুঝে পেরে তাদের কাছে লেখককে উচ্চবিত্ত ঘরের লোক বলে তার পরিবারের লেকজনকে পরিচয় করিয়ে দেন। এতে দেখো যায় লেখকের কদর তাদের কাছে বেরে যায়। প্রেমচাঁদ উভয় শ্রেণীর ভিতর সামাজিক বৈষম্যতা বুঝাতে গল্পটি বিস্তরভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।

অচ্ছুৎবর্গ যেমন সামাজিকভাবে নিস্পিষ্ট ও অবহেলিত তেমনি তারা সমাজে সবচেয়ে বেশি শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। যুগ-যুগান্তর ব্যাপী শোষণ, বঞ্চনা অচ্ছুৎবর্গকেও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, হীন, দুর্বল ও প্রতিবাদহীন করে তুলেছে। দারিদ্র এবং বঞ্চনাকেই তারা স্বাভাবিক মনে করে। সে সঙ্গে মিশে থাকে ধর্মের ভয়, যা প্রচার করেছে ব্রাক্ষণবর্গ তাদের নিজেদেরই স্বার্থে। অচ্ছুৎবর্গ প্রতিবাদকে, এমনকি মানসিক প্রতিবাদকেও ধর্মহানি বা পাপ বলে মনে করে। তাদের ধারণা, এই জীবন, এই দৈন্য, এই লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা পূর্বজন্মের পাপের ফল, এই জীবন ব্রাক্ষণের সেবার জন্যই সৃষ্ট। প্রেমচাঁদ এই শোষণের সংক্ষিপ্ত ও অনবদ্য চিত্রটি অক্টোবর, ১৯৩১ সালে *নাজাত* (*نجات*) 'বিশাল ভারত' এর মাধ্যমে প্রকাশ করেন এবং পরে 'আখেরী তুহফা'তে প্রকাশ হয়।[৭৬] মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে পন্ডিত ঘাসিরামের সাথে কথা বলতে ঝরিয়া তার স্বামী চামার দুঃখীকে পন্ডিতের বাসায় পাঠায়। পন্ডিত মশাই ছিলেন ঈশ্বরের একান্ত অনুগত ও পরম ভক্ত। দুঃখী পণ্ডিত মশাইকে তার বাড়িতে যাবার কথা বললে পন্ডিত বলে তুই আগে আমার দরজাটা ঝাড়ু দে, বৈঠকখানা গোবর দিয়ে লেপ দে, কাঠের খন্ডটা চিরে দে, গোয়াল বাড়ির উঠানের ভূসিগুলো তুলে গোয়াল ঘরে রেখে দে। তাহলে আমি সন্ধ্যা নাগাত তোর বাসায় যাব। ক্ষুধার্থ দুঃখী পণ্ডিতের উঠানে ঝাড়ু ও ঘর লেপে, তারপর কাঠ চিরতে গেলে ক্ষুধার জ্বালায় তা চিরতে পারে না। পরে দুঃখী গোন্ডের বাড়ীতে গিয়ে তামাক ও কল্কে নিয়ে আসে। দুখী তামাক ধরাতে আগুন না থাকায় পণ্ডিতের ঘরে ঢুকে পণ্ডিতের স্ত্রীকে আগুন দিতে বলে। পণ্ডিতের স্ত্রী তখন ক্ষেপে গিয়ে চামার ঘরে ঢুকাতে ঘর অপবিত্র হয়ে গেছে বলে দুঃখীকে গালাগালি করে। পরে পণ্ডিত বাড়িতে এসে সব শুনে তার সুপারিশে দুঃখীকে আগুন দেন। দুখী ভাবে ব্রাক্ষণের ঘরে চামার কিভাবে ঢোকে ? তারা পবিত্র মানুষ, আর এই জন্য সমাজে তাদের এত আদর, কদর ও সম্মান। জাতে চামার বলে পন্ডিতের স্ত্রী দুঃখীর সাথে যাচ্ছে তাই ব্যবহার করে পণ্ডিতের কাছে এভাবে নালিশ করলে পণ্ডিতজী বলেন,

پنڈت جی نے انہیں سمجھا کر کہا۔ "اندر آ گیا تو کیا ہوا۔ تمہاری کوئی چیز تو نہیں چھوئی، زمین پاک ہے۔ ذرا سی
آگ کیوں نہیں دے دیتیں۔ کام تو ہمارا ہی کر رہا ہے۔ کوئی لکڑ ہارا یہی لکڑی پھاڑتا تو کم از کم چار آنے لیتا"

[৭৬] আব্দুল কাভী দাছনভী, *প্রেমচাঁন্দ*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়ী দিল্লী, ২০১১, পৃ. ২২।

پنڈتانی نے گرج کر کہا۔ "وہ گھر میں آیا ہی کیوں؟"

پنڈت نے ہر کر کہا۔ "اسے کی بد قسمتی تھی۔" [৭৭]

(পণ্ডিতজী তাঁর স্ত্রীকে একটু বুঝাবার চেষ্টা করে বলেন, "ভেতরে এসেছে তা কি হয়েছে, ও তোমার ঘরের কোনো জিনিস ছুঁয়ে দেয়নি তো আর। শাস্ত্রে আছে মাটি অতি পবিত্র। একটু আগুন কেন দিলে না ওকে ? আমাদের কাজই তো করে দিচ্ছে। আজকের দিনে কোনো কাঠ চেরার লোককে দিয়ে লাকড়ি বার করতে বললে কম করেও চার আনা তো নিতোই।
পণ্ডিত পত্নী কথায় অটল থেকে বলেন, 'ও একেবারে ঘরে মধ্যে উঠে এলো কেন ?
এবার পণ্ডিতজী হার স্বীকার করে বললেন, 'তার কপাল মন্দ তাই')

এত পরিশ্রম করার কারণে দুঃখী ক্ষুধার্থ হয়ে পণ্ডিতজীর কাছে খাবার চাইলে পণ্ডিতজী তার স্ত্রীকে বলেন,

پنڈت جی نے اب تیر بن کر کہا۔ "کچھ بھوسی چوکر ہو تو آٹے میں ملا کر موٹی موٹی روٹیاں توے پر ڈال دو۔ سالے کا پیٹ بھر جائے گا۔ پتلی روٹیوں سے ان کمینوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ انہیں تو جوار کا لکڑ چاہیے۔"

پنڈتانی نے کہا۔ "اب جانے بھی دو، دھوپ میں مرے۔" [৭৮]

(পণ্ডিতজী এবার নিজের উপর বিশ্বাস রেখে বললেন, 'বাড়িতে কিছু ভূসি-টুসি থাকে তো অল্পবিস্তর আটার সঙ্গে মিশিয়ে দলা পাকানো যা হোক কিছু একটা বানিয়ে ওকে দাও। তাতেই শালার পেট ঠিক ভরে যাবে। আমাদের মতো পাতলা পাতলা রুটিত এই সব নীচু জাতের লোকের আবার পেট ভরবে না। তাই এদের জন্য জোয়ারের রুটিই উপযুক্ত।
পণ্ডিত গিন্নী এবার (মুখ ঝামটা দিয়ে) বলে উঠলেন, 'এবার যেতে দাও, রোদে মরুকগে সে)

বেলা চারটা বাজে কিন্তু দুঃখী কাঠের টুকরাটি ভাঙ্গতে পারছিল না। পরে তাকে পন্ডিত মশাই হুমকি দেয়,

"پھر ساعت بھی ویسی ہی نکلے گی۔ مجھے دوش مت دینا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں جہاں پنچ کے گھر کھانے کو ہوا اس کی آنکھ بدل جاتی ہے۔" دکھی نے پھر کہاڑی اٹھائی۔ جو باتیں اس نے پہلے سوچ رکھی تھیں، وہ سب بھول گیا۔ [৭৯]

---

[৭৭] মুন্সি প্রেমচাঁন্দ, 'নেসা', *মাজমুয়াহ মুন্সি প্রেমচাঁন্দ ঃ আফছানে*, ছংগে মিল পাবলিকেশন, লাহোর, ২০০২, পৃ. ৩৭৬।
[৭৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৬।
[৭৯] মুন্সি প্রেমচাঁন্দ, 'নেসা', *মাজমুয়াহ মুন্সি প্রেমচাঁন্দ ঃ আফছানে*, ছংগে মিল পাবলিকেশন, লাহোর, ২০০২, পৃ. ৩৭৭।

('তাহলে মনে রাখিস, তোর মেয়ের বিয়ের দিনও সেরকমই হবে, আমাকে তখন কোন দোষ দিতে পারবি না। তোদের এই মনোভাব দেখলে এই জন্যেই সবাই বলে থাকে, ছোটলোকের ঘরে খাওয়া থাকলে তাদের চালচলনই বদলে যায়।' দুখি ভয়ে ভয়ে আবার তার হাতের কুড়ালটা তুলে নিলো। যেসব কথা সে আগে ভেবে রেখেছিল তা নিমিষেই ভুলে গেল।)

ভয়ে দুঃখী তা আবার কাটতে শুরু করলে পরিশ্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সে চামার হওয়ার কারণে মৃত দেহটি একদিন পড়ে থাকার পরও ব্রাহ্মণ সমাজপতিরা তা সরায়নি। ইতোমধ্যে মৃত দেহ থেকে দুর্গন্ধ বের হতে শুরু করে। অবশেষে পণ্ডিতজি নিরুপায় হয়ে যা করলেন তা একজন মানুষ হিসেবে অন্য মানুষকে করতে পারে না, এটি অমানবিক, অসামঞ্জস্য, অনৈতিক। গল্পে দেখা যায় পণ্ডিতজি,

پنڈت جی نے ایک رسی نکالی۔ اس کا پھندا بنا کر مردے کے پیر میں ڈالا اور پھندے کو کھینچ کر کس دیا۔ بھی کچھ
اندھیرا تھا۔ پنڈت جی نے رسی پکڑ کر لاش کو گھسیٹنا شروع کیا اور گھسیٹ کر گاؤں سے باہر لے گئے۔
وہاں سے آکر فوراً نہائے۔ درگا پاٹھ پڑھا اور سر میں گنگا جل چھڑکا۔
ادھر دکھی کی لاش کو کھیت میں گیڈر، گدھ اور کوے نوچ رہے تھے۔ یہی اس کی تمام زندگی کی بھگتی،
خدمت اور اعتقاد کا انعام تھا۔ [৮০]

(এবার পণ্ডিতজী একটা দড়ি বের করল। তাতে একটা ফাঁস লাগিয়ে মৃত্যদেহের পায়ে গলিয়ে দিলেন। তারপর ফাঁসটা টেনে আরও পাকাপোক্ত করে তুললেন। জায়গাটা তখনও কিছু কিছু কুয়াশার আবরণে ঢাকা পড়েছিল। পণ্ডিতজী চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে দড়িটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে নিয়ে (দুঃখির) মৃতদেহটা হিড়হিড় করে টানতে টানতে গ্রামের একেবারে বাইরে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে জলদি স্নান পর্ব শেষ করে দুর্গা মন্ত্র জপ করে বাড়ির চারদিকে গঙ্গা জল ছিটিয়ে দিলেন।
ওদিকে গ্রামের বাইরে ফেলে আসা দুখির লাশটা শেয়াল কুকুর আর শকুন কাক আশ মিটিয়ে মিলে ছিঁড়ে খেতে লাগল। এটাই তার সারা জীবনের ভক্তি, সেবা এবং নিষ্ঠার পুরষ্কার ছিল।)

ভাগ্যের কি অদ্ভুত নিষ্ঠুর পরিহাস, দুঃখী সারা জীবন ব্রাহ্মণ তথা উচ্চ বর্ণের মানুষদের কাজ করে তাদের কাজগুলো সহজ করে দিয়েছে। তাদের সম্মানে কোন ঘাটতি দেয়নি। তাদেরকে ভগবানের আসনে বসিয়ে পূজো দিত। আজ তার পুরষ্কার নিষ্ঠুর মৃত্যু পেল। প্রেমচাঁদ দুঃখীর করুণ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অচ্ছুৎ সমস্যাকে আরও প্রকট করে তোলেন, শোষণ-বঞ্চনাকে জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী করে তোলেন। ব্রাহ্মণ ঘাসীরাম কর্তৃক অচ্ছুৎ দুঃখীর শব বহন সুদৃঢ় প্রতিবাদে প্রতীক হয়ে ওঠে।

---

[৮০] মুন্সি প্রেমচাঁন্দ, 'নেসা', *মাজমুয়াহ মুন্সি প্রেমচাঁন্দ ঃ আফছানে*, ছংগে মিল পাবলিকেশন, লাহোর, ২০০২, পৃ. ৩৭৯।

প্রেঁমচাদের এমন আরেকটি গল্প হলো *নছিব কে বদছুরত এছতেহজা* (نصیب کی بدصورت استہزا) মেথর জোখু পিপাসায় কাতর হয়ে ঘটিতে মুখ দিতেই পানিতে নোংরা গন্ধ পাওয়া মাত্র স্ত্রী গংঙ্গিকে জিজ্ঞাসা করলে সেও ঐ ঘটিতে নাক দিয়ে দুগন্ধ পায়। তৃষ্ণার্থ স্বামীকে পিপাসা থেকে মুক্ত করার জন্য রাত নয়টার সময় ঠাকুরদার কুয়ার দিকে রওনা দেয়। যিনি একজন ব্রাক্ষণ ঠাকুর মশাই ছিলেন। শুধুমাত্র মানুষের আর্শীবাদ নিতেন ও নিষ্ঠুর ভাবে নিচু লোকদের লাঠি পেটা করতেন। অপরদিকে সাহুজি যিনি সুধী ব্যবসা করে মানুষকে ঠকাতেন। তার কুয়া ছাড়া আর কোন কুয়া ছিল না। গ্রামের সকলেই তাদের কুয়া থেকে পানি পান করত। কিন্তু তিনি নিচুজাত গংঙ্গির মত লোকদের পানি নিতে দিবে না। গংঙ্গি কোন উপায় না পেয়ে ঘটি আর দড়ি নিয়ে পানি তুলতে ঠাকুরদার কুয়ার কাছে গেল। ঠাকুরদা তখনও বারান্দায় বসে ছিল। গংঙ্গি তাকে দেখে চাতালের পিছনে লুকিয়ে থাকল। যখন ঠাকুরদা ঘুমানোর জন্য বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকল, তখন গংঙ্গি চাতালে উঠে ইস্ট নাম জপতে জপতে ঘটিটাকে কুয়োর মধ্যে ফেলল। ঘটিটা পানি ভর্তি করে চাতালের উপর রাখতেই ঠাকুরদা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। ভয়ে গংঙ্গির হাত থেকে ঘটিটা পানিতে পড়ে বিকট আওয়াজ হল। আওয়াজ পেয়ে ঠাকুর বাবাজি কুয়োর সামনে আসেন। গঙ্গি ভয়ে পিছন দিকে না তাকিয়ে সোজা বাড়িতে এসে হাজির হল। এসে দেখে পিপাসায় কাতর স্বামী নাক বন্ধ করে দুগন্ধ পানি পান করছে। গঙ্গি কান্না শুরু করল আর বলতে লাগলো,

"ভাগ্যের নিষ্টুর পরিহাসে সে আজ সমাজ থেকে পরিত্যক্তা। আর এ কারণে স্বামীর পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত জল খেয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া আর কোন পথ নেই।"[৮১]

প্রেমচাঁদের আরো অনেক গল্পে সমাজের এইসব অবহেলিত অস্পর্শদের শোষনের বেদনাদায়ক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে সুচারু ভাবে। জুলাই, ১৯৩৪ প্রকাশিত তেমনি একটি জনপ্রিয় গল্প হল *দুধ কি কিমত* (دودھ کی قیمت) যার বিষয়বস্তুই হচ্ছে জমিদার ও অচ্ছুৎ শ্রেণী বৈষম্য। সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত শ্রেণী হল হরিজন, যাদের স্পর্শ করলে অভিজাত শ্রেণীর জাত যায়। প্রেমচাঁদের ছোটগল্পের অনেক জায়গায় হরিজাতদের পশুর সাথে সহবস্থান এমনকি এক সাথে খাবারের করুণ চিত্র প্রষ্ফুটিত হয়েছে। এইসব অবহেলিত অস্পৃশ্যদের কুকুরের মত প্রাণীর সাথে একাকার হতে হয়। জমিদার মহেশনাথের তিন কন্যা ছিল। পুত্র সন্তানের আশায় তার স্ত্রী চতুর্থ ছেলে সন্তান প্রসব করে। মহেশনাথের স্ত্রীর দুধ না আসার কারণে গ্রামের মেথর গুদড়ের স্ত্রী ভুঙ্গিঁ জমিদার ছেলে সুরেশকে এক বৎসর দুধ পান করান। সমাজের মানুষগুলো কানাঘোষা করতে থাকে যে, জমিদারের ছেলেকে এক মেথর দুধ পান করায় এটা একটা অশুভ লক্ষণ। জমিদারের বাড়িতে এই বিষয় নিয়ে কথা উঠলে ভুঙ্গিঁ উত্তর দেয়,

---

[৮১] পৃথ্বীরাজ সেন, সৌরেন দত্ত, *মুন্সী প্রেমচন্দ: গল্পসমগ্র*, (প্রথম খণ্ড), কামিনী প্রকাশনালয়, ৫ নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলকাতা, নভেম্বর-২০০৯, পৃ. ৪৯৭।

"مالک بھنگی تو بڑے بڑوں کو آدمی بناتے ہیں انھیں کون۔ کوئی آدمی بنائے گا۔

یہ گستاخی کر کے کسی دوسرے موقع پر بھلا بھنگن سلامت رہتی۔ سر کے بال اکھاڑ لیے جاتے لیکن آج بابو صاحب

ہنسے اور قہقہہ مار کر بولے۔

" بھنگی بات بڑے پتے کی کہتی ہے۔" [৮২]

("মালিক, মেথরদের হাতে তো কত বড়ো বড়ো মানুষ গড়ে উঠে। কে আবার তাদের মানুষ বানাবে!
অন্য কোন সময় হলে এরকম ঔদ্ধত্যপুর্ণ জবাবের পর ভুঙ্গির মাথার চুল কি একটাও থাকত! বাবু সাহেব কিন্তু সেদিন হা হা করে হেসে বললেন-ভুঙ্গি লাখ কথার এক কথা বলে।)

এক বৎসর পূর্ণ হলে যাবার সময় বিনিময়ে ভুঙ্গিঁর চাহিদা মত দুইটি হাতের চুরি ও প্রচুর দ্রব্য সামগ্রী জমিদার বাবু উপহার দেন। ভুঙ্গিঁ জমিদার ছেলেকে দুধ খাওয়ান আর নিজের ছেলে মঙ্গঁলকে তুলা দুধ খাইয়ে অসুস্থ করে ফেলেন। এদিকে গ্রাম্য ব্রাহ্মণ সমাজপতিরা বাদ সাধল। তারা চায় না জমিদার বাড়ির সন্তান মেথরানির দুধ খেয়ে বড় হোক। গ্রামের মোটেরাম শাস্ত্রী পন্ডিতের আদেশে ভুঙ্গিঁ দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে দিল। জমিদার মেথরানি ভুঙ্গিঁর পাশে দাড়ালেও সমাজপতীদের কাছে হার মানেন। জমিদারের বাচ্চাকে বাঁচানোটা যে কোন উপায়ে জরুরি ছিল কিন্তু উক্ত গল্পে সমাজ মেথরকে কোন ভাবে স্বীকৃত দেওয়া হচ্ছিল না। সমাজে ব্রাহ্মণ সমাজপতিরা চচ্ছিলনা নিচুগোষ্ঠী মেথরের দুধ খেয়ে জমিদারের ছেলে বড় হোক। যদিও তাতে বাচ্চাটির ক্ষতি হোক না কেন। প্রেমচাঁদ বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ভাবে মেথরানি ভুঙ্গিকে ব্রাহ্মণ সমাজে পার্থক্য নির্ণয়ে তুলে ধরেছেন। তেমনি জমিদারের ছেলে আর মেথরের ছেলের মধ্যে বৈষম্যের আরেকটি চিত্র হল, যখন জমিদারের ছেলে ও মেথরের ছেলে একজন অপরজনের উপর ঘোড়া সাওয়ার খেলায় মক্ত ছিল, তখন মঙ্গল খেলাবস্থায় জমিদার ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললো,

"میں ہمیشہ گھوڑا ہی رہوں گا یا کبھی سواری بھی کروں گا" [৮৩]

("আমি সব সময় ঘোড়াই হয়ে থাকব, কখনো কি আরোহী হতে পারবনা")

উক্ত গল্পের মাধ্যমে সমাজের উচুঁ শ্রেণীর বসবাসরত লোকদের দ্বারা অপর নিচু শ্রেণী মেথর জাতির উপর যে ভিন্ন দৃষ্টিতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল এবং সমাজে তা অহরহ হচ্ছে। প্রেমচাঁদ কলমের তুলী দ্বারা পাঠক সমাজে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

---

[৮২] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'দুধ কি কিমত', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে ঃ তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৭৫১।
[৮৩] ড. নাঈম আনিস, *প্রেমচাঁন্দ : হায়াত আউর খেদমত*, মুসলিম ইনস্টিউট পাবলিকেশন, কলকাতা, ডিসেম্বর- ২০১০, পৃ. ১৫৩।

গল্পটিতে অচ্ছতবর্গের প্রতি অমানকিক পদক্ষেপের চিত্রের আরো অনেক চিত্রের দেখা মেলে, প্রেমচাঁদরে উক্ত ছোটগল্পটিতে দেখো যায়, মঙ্গঁলের পাঁচ বৎসর বয়সে প্লেগের প্রাদুর্ভাবে তার বাবা গুদড়ের ও চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে তার মা ভুঙ্গিঁ মারা গেলে সে অনাথ হয়ে যায়। গ্রামের ছেলেরা সে মেথরের ছেলে বলে তার সাথে খেলা-ধূলা ও কথা বলত না। গ্রামের ছেলেরা তাকে অস্পৃশ্য বলে অপমান করত। জমিদার বাড়ির লোকেরা তাকে তাদের খাবারের পর যা ঝুঠা খাবার থাকত তা দেওয়ার সময় মেথরের হাত তাদের হাতে লাগবে বলে তাকে খাবার ছুড়ে দিত। তার জায়গা হয় জমিদার বাড়ীর অদূরে নিমগাছের নীচে। গ্রামের ধর্মপ্রান ব্যক্তিরা জমিদার বাড়ীর কয়েক হাত সামনে মঙ্গঁল থাকবে এটাও তাদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ায়, তাদের কথা হল অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছাদের রক্ষা করবেন ভগবান। আর সমাজের মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। মঙ্গলের একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিল পোষা টমি কুকুর। সে যা বলত টমি তাই করত। সুখ-দু:খ, আনন্দ-উল্লাস সব মঙ্গল এই বিশ্বস্ত বন্ধুর সাথে করত। মঙ্গল আর কুকুর টমি একই পাত্রে খেত, জমিদার লোকেরা তাদের খাবারের শেষে যা উচ্ছিষ্ট খাবার তাদের দিত তা তারা দু'জন মিলে ভাগাভাগি করে খেত। একই শয্যায় শয়ন করে। তাদের দুজনের মেজাজও একই রকম, দুজনে দুজনের স্বভাব জেনে গেছে। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে না তারা। লেখকের ভাষায়,

منگل نے ایک ہاتھ سے ٹامی کا سر سہلا کر کہا۔ "دیکھا پیٹ کی آگ ایسی ہوتی ہے لات کی ماری ہوئی روٹیاں بھی نہ ملتیں تو کیا کرتے؟

ٹامی نے دم ہلائی۔ سریش کو اماں ہی نے پالا سے ٹامی"۔

ٹامی نے پھر دم ہلا کی۔ لوگ کہتے ہیں دودھ کا دام کوئی نہیں چکا سکتا۔ ٹامی نے پھر دم ہلا دی۔" اور مجھے دودھ کا یہ دام مل رہا ہے"۔ ٹامی نے پھر دم ہلا دی۔ [৮৪]

(মঙ্গল এক হাতে টমির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল- "দেখলে, একেই বলে পেটের আগুন! এই লাথি মারা রুটিও যদি না জুটত তাহলে কী করতে ? টমি ল্যাজ নাড়ল। সুরেশকে আমার মা দুধ দিয়ে বড়ো করেছিল।
টমি আবার ল্যাজ নাড়ল। লোকে বলে, দুধের দাম কেউ শোধ করতে পারে না। "এবং সেই দুধের এই দাম আমি পাচ্ছি।" টমি আবার ল্যাজ নাড়ল।)

কুকুরের প্রসঙ্গ গল্পটিতে নতুন মাত্রা যোগ করে। প্রেমচাঁদ বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত রূপেই এই গল্পে কুকুরকে এনেছেন। অচ্ছুৎদের ঘৃণিত, অবহেলিত জীবন যেন কেবলমাত্র কুকুরের সঙ্গেই তুলনীয় – একথা বলাই গল্পকারের উদ্দেশ্য। গল্পের শেষ অংশে কুকুরের সঙ্গে কথা বলার মধ্যে দিয়ে তা আরও স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয়। গল্পের

[৮৪] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'দুধ কি কিমত', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে ঃ তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ৭৫৭।

রূপকার এখানে বুদ্ধিমত্তার সহিত ভারতবর্ষে সেই সময় সমাজে পশু ও মানুষের শ্রেণী বৈষম্যের তুলনা এই ভাবে তুলে ধরেছেন।

সমাজের বসবাসরত নাক ছিটকানো মানুষেরা মনে করেন মেথররা সব সময়ই সমাজের বাহিরের মানুষ। যতই তাদের আদর করে ঘরে আনা হোক না কেন শেষ পরিণতি তার রাস্তাতেই। তেমনি প্রেমচাঁদ মেথরের সামাজিক বৈষম্য তুলে ধরতে *নেক ভখতি কে তাজিইয়ানে* (*نیک بختی کے تازیانے*) গল্পটি পাঠক সমাজে তুলে ধরেছেন। গল্পটি জুন, ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়। জ্ঞান হওয়ার আগেই নথুয়ার মা-বাবার মৃত্যু হলে অনাথ শিশুর দেখাশুনার দায়িত্ব রায় ভোলানাথ নেন। তিনি নথুয়াকে এক খৃষ্টানের কাছ থেকে উদ্ধার করেন। তিনি মনে করলেন, নথুয়া খৃষ্টান মিশনে গেলে তাদের পড়াশুনা, খাবার-দাবার খেয়ে আর খাটি হিন্দু হতে পারবে না, তার চেয়ে তার বাড়িতে খেটে খাওয়া অন্যান্য চাকরের সাথে মেথরের কাজ করা অনেক সম্মানের। নথুয়াও মনে করলো,

نتھوا کو بس رائے صاحب کے بنگلہ میں جھاڑو لگادینے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ کھانا کھا کر کھیلتا پھرتا تھا۔ کام کے موافق اس کی ذات بھی قائم ہو گئی۔ گھر کے نوکر چاکر اسے بھنگی کہتے تھے اور نتھوا کو اس میں کوئی اعتراض نہ ہوتا تھا۔ نام کا حیثیت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس کی اس غریب کو کچھ خبر نہ تھی۔[৮৫]

(নথুয়া শুধু রায় সাহেবের বাংলোতে ঝাড়ু দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না। তারপর খাওয়া দাওয়া আর খেলাধূলা করে দিন কাটিয়ে দেওয়া। কাজের মাধ্যমেই তার জাত বুঝা যায়। ঘরের চাকর বাকররা তাকে মেথর বলেই ডাকতো এবং নথুয়ার এতে কোন কিছু মনে করতো না। এই নামে ডাকলে তার কি আসে আর যায়। তার এই গরীব অবস্থানে এত কিছুর খোঁজ খবর ছিল না।)

একদিন ভোলানাথের কন্যা রত্না মেহসাহেবের কাছে ইংরেজী পড়া কালীন নথুয়া রত্নার ঘর ঝাট দিতে আসে। প্রচন্ড ক্লান্ত থাকার কারণে সে রত্নার আরামদায়ক বিছানা পেয়ে শুয়ে পড়ে। রায় সাহেব তা দেখে ফেললে তাকে বকা ঝকা ও চাবুক পেটা করেন। পরে রত্নার সুপারিশে বাবা তাকে চাবুক মারা বন্ধ করে দিয়ে বাড়ী থেকে বের করে দেন। প্রেমচাঁদের ভাষায়,

رائے صاحب۔ کیا کہتی ہو رتنا، ایسے قصوروار کہیں معاف کیے جاتے ہیں۔ خیر تمھارے کہنے سے چھوڑے دیتا ہوں۔ ورنہ آج جان ہی لے کر چھوڑتا۔ سنا ہے نتھوا، اپنا بھلا چاہتا ہے تو پھر یہاں نہ آنا۔ اسی دم نکل جا، سور، نالایق! نتھوا جان لے کر بھاگا۔ پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھا۔[৮৬]

---

[৮৫] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'নেক ভখতি কে তাজিইয়ানে', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানেঃ তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮, পৃ. ২৯৪।

(রায় সাহেব- এই তুই কি বলছিস রত্না, রায় সাহেব অবাক দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, এরকম অপরাধের কি ক্ষমা থাকতে পারে? ঠিক আছে, তুই যখন বলছিস তোর কথাতেই ওকে ছেড়ে দিলাম, তা না হলে আজ ওকে খতম করে ছাড়তাম'। তারপর তিনি নথুয়ার দিকে ফিরে বললেন, শোন হারামজাদা, নিজের ভালো চাস তো এরকম অন্যায় আর কোনদিন করবি না। বেরিয়ে যা এ ঘর থেকে পাজি ছুঁচো, শুয়োর কোথাকার।')

লেখক এখানে রায় সাহেব ও মেথর নথুয়ার কর্ম তৎপরতার দ্বারা সমাজে শ্রেণী বৈষম্যতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

সমাজে মেথরের অবস্থান তুলে ধরতে গিয়ে প্রেমচাঁদ *জারমানা* (جرمانہ) গল্পটি লিখেন। হেড জমাদার মুহাম্মদ খৈয়াত আলী খার অধীনে শত শত মেথরানী কাজ করে। মেথর আলারখীর বেতন ছয় টাকা হওয়ার পর হতে খাঁ সাহেব সব সময় তার ভূল ধরে বেতনের কিছু টাকা কেটে রাখতেন। সেদিন প্রচুর কাজ করে একটু বিশ্রাম নেওয়ার সময় ও অন্যদিন কাজ করতে করতে ক্ষিদে লাগার কারণে দোকানে খাবার খাওয়ার সময় খাঁ সাহেব তা দেখে ফেলেন ও কাজের ফাকির অভিযোগে নোটবুকে নোট করে রাখেন। পরের মাসে তার এই অপরাধের কারণে অর্ধেক টাকা জরিমানা করে বাকী টাকা তাকে দেওয়া হয়। একবার আলারখীর তার পুরো বেতন নিতে গেলে খাঁ সাহেবের বৈষিক আচরণ ও আলারখীরের আর্তনাদ প্রেমচাঁদ এই ভাবে তুলে ধরেণ,

”یہ تو پورے روپئے ہیں۔“ خزانچی پوچھتا ہے۔

”تو کیا چاہتی ہے۔ کم ملے ہیں۔“ تو وہ اسی بے ساختگے اور

معصومیت سے کہتے ہے۔”کچھ جریمانہ نہیں ہے؟“ [৮৭]

("এই তো আমার সম্পূর্ণ বেতন"। খাজানাদার জিজ্ঞাসা করলেন।
"তা তুমি কি চাও? কম হয়েছে কি?" এত ফাঁকি দেওয়ার পরও এবং
আলারখির নিষ্পাপের মত বললো- "কোন জরিমানা হয় নাই?")

Nandini Nopany and P. Lal তার Twenty Four Stories by Premchand বইতে জরিমানা গল্পটি এভাবে তুলে ধরেন,

---

[৮৬] প্রেম গোপাল মিত্তল, 'নেক ভখতি কে তাজিইয়ানে', *প্রেমচাঁদ কি ছ আফছানে ঃ তারতিব ওয়া এনতেখাব*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮,পৃ. ২৯৬।
[৮৭] ড. নাঈম আনিস, *প্রেমচাঁন্দ : হায়াত আউর খেদমত*, মুসলিম ইনস্টিউট পাবলিকেশন, কলকাতা, ডিসেম্বর- ২০১০, পৃ. ১৫৪।

> *Juramana* is about an inspector of Sanitation, Khairat Ali Khan, who is notorious for imposing fines an errant sweeper women. One of them is Alarakhi and she expects a heavy fine to be imposed on her because she has spoken harshly about Ali Khan behind his back, not knowing he was within earshot. Strangely, he does not fine her and Alarakhi's opinion of the Inspector changes favorably. David Rubin has an interesting interpretation which does not, however, seem to be borne out by the test: "The story hinges on a point that may be obscure the fact that the Inspector is persecuting Alarakhi because she has rejected his advances. The Inspector's return to decency is a favorite theme of Premchand's and in view of what we know of the character not so surprising as it may at first appear." Professor Rubin's ingenious explanation notwithstanding, it is still quite surprising.[৮৮]

প্রেমচাঁদ দেখিয়েছেন, সমাজে মেথর হওয়ার কারণে অকারণে তার প্রতি সমাজপতিদের উদ্ধত্ব আচার ও ব্যবহার। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, আজ তারা নিচুজাতী দেখে তাদের সামান্য কাজগুলো বড় অভিযোগ করে দেখা হয়। আজ যদি সমাজপতিরা এই কাজগুলো করত, তাহলে কি তারা তা করতে পারতো ? এটার জন্য দায়ী একমাত্র উচু-নিচু ভেদাভেদ। যা মেথর হওয়ার কারণে আলাকখীরকে বেতনের দেওয়ার সময় তাকে বৈষম্যের স্বীকার হতে হয়েছে।

মে, ১৯২৭ সালে 'চাঁদ' পত্রিকায় *মন্দির* (*مندر*) গল্পটি প্রথম হিন্দিতে প্রকাশিত হয় পরে 'প্রেম চাল্লিছি' (প্রথম অধ্যায়) উর্দুতে ছাপা হয়।[৮৯] অস্পৃশ্যতার অন্তরালে লুকিয়ে রয়েছে এক শ্রেণীর অধিপতিদের যে অমানবিকতা, নিষ্ঠুরতা, মূর্খতা ও স্বার্থপরতা তাই *মন্দির* গল্পের বিষয়বস্তু। লেখক একজন চামার বিধবা হতভাগিনী মায়ের ও তার সন্তানের জীবনে করুণ পরিনতি মন্দির গল্পের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। বিধবা সমস্ত বাধা বিপত্তি এবং বৈষম্যকে উপেক্ষা করে এবং ধর্মীয় গোঁড়ামিকে আঘাত করে সন্তানকে বাঁচানোর যে অনবদ্য প্রচেষ্টা সত্যিই তা আমাদের সমাজ সংস্কারকে ভাবিয়ে তুলেছে। মন্দির গল্পের প্রধান তিন চরিত্র সুখিয়া, লাল/জিয়াবন এবং পুরোহিত। সুখিয়া

---

[৮৮] Nandini Nopany and P. Lal, *Twenty Four Stories by Premchand*, Vikas Publishing House, New Delhi, 1980, P- 19.

[৮৯] আব্দুল কাভী দাছনভী, *প্রেমচাঁন্দ*, কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ২০১১, পৃ. ১৯।

এমন একজন হতবাগিনী যার জন্ম লগ্ন থেকে তার দুঃখ দুর্দশার শেষ নেই। বিয়ের পর বিধবা হলো। আপন বলতে একমাত্র সন্তান ছিল সেও বিছানায় কাতরাচ্ছে। অথচ কয়দিন পূর্বে তার আদরের ধন তার সাথে ঘাস কাটতো। সে ঘাস বিক্রিই ছিল সুখিয়ার একমাত্র জীবিকা। তার সন্তান তাকে বলে মা তোমার মত আমার একটা খুরপি কিনে দিবে আমি তাহলে বেশি ঘাস কাটতে পারবো আর তুমি মাচায় বসে থাকবে। তোমার জন্য লাল শাড়ি কিনে আনবো। হঠাৎ প্রচন্ড অসুস্ত হওয়ায় সুখিয়া ধারণা হয় কারও নজর তার সন্তানের উপর পড়েছে। রাতের তৃতীয় ভাগ তখন অতিক্রান্ত। সে স্বপ্নে দেখে তার স্বর্গীয় দেবতা তাকে বলছে, কাঁদিসনে সুখিয়া, কাল ঠাকুরের পুজো দিয়ে আয় তাই শুনে তার মনটা আশায় ভরে গেল, সে ঈশ্বরকে স্মরণ করে বললো- “ঈশ্বর তুমিই আমার একমাত্র ভরসা সব কিছুর অগ্রগতি, তুমি আমার ছেলেকে রোগমুক্ত করো। ছেলে সেরে উঠলেই তোমার পুজা দেবো। মিনতি করছি অনাথ বিধবার প্রতি দয়া করো। আমি বড়ই অসহায়। আমার ছেলেকে বাঁচাও। সেই মুহূর্তে জিয়াবন সুস্থ হয়ে উঠল, জল চাইলে সুখিয় ছেলেকে জল দিল। ছেলেকে বললো কেমন আছো বাছা? সে উত্তরে বললো ভালো মা। খুব ভালো হয়ে গেছি আমি। সারাদিনে ভালোই কাটলো জিয়াবনের। সে ভাবলো ছেলের অসুখ বুঝি ভালো হয়ে যাবে। দু'দিনের মধ্যে হাতে পয়সা আসলে পুজো দেবো। জমিদার বাড়ির বাগান থেকে ফুল পারল, হাতের বালা দুটো গচ্ছিত রেখেই কিছু পয়সারও ব্যবস্থা করলো। সুখিয়া মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। মন্দিরে অনেক ভক্ত সত্বক পাঠ করছে। সে পন্ডিতজীকে বললো- ঠাকুরের কাছে পূজো দিতে এসেছি। পুরোহিত সারাদিন জমিদারের প্রজাদের পূজা করে। কিন্তু সুখিয়াকে মন্দিরের ভেতরে যেতে দেওয়া হলো না। পুরাহিত অপবিত্র থাকলেও সে পবিত্র, তার কোনো দোষ থাকে না কিন্তু সুখিয়া নীচু জাতের বলে মন্দিরে যেতে দিল না। তাকে চামারনি বলে আখ্যায়িত করা হলো। মেরে মন্দির থেকে তাড়িয়ে দিতে বলা হলো, প্রেমচাঁদের ভাষায়,

> بجاری۔ "ارے تو چمارن ہے کہ نہیں رے؟"
>
> سکھیا۔ "تو بھگوان نے چماروں کو نہیں پیدا کیا ہے؟ چماروں کا بھگوان کوئی اور ہے؟ اس بچہ کی منوتی ہے سرکار!"
>
> اس پروہی بھگت.جی جواب استت ختم کر چکے تھے، ڈپٹ کر بولے۔ "مار کر بھگا دو چڑیلکو، بھرشٹ کرنے آئی ہے۔
>
> پھینک دو تھالی والی۔ سنسار میں تو آپ ہی آگ لگی ہوئی ہے۔ چمار بھی ٹھاکر.جی کو پوجا کرنے لگیں گے تو دھرتی رہے گی
>
> کہ پاتال کو چلی جائے گی۔" [৯০]

---

[৯০] মুন্সি প্রেমচাঁন্দ, 'মন্দির', *মাজমুয়াহ মুন্সি প্রেমচাঁন্দ ঃ আফছানে*, ছংগে মিল পাবলিকেশন, লাহোর, ২০০২, পৃ. ৪৬৬।

(পুরোহিত- ওরে, তুই চামারনি কি না, বল ?

সুখিয়া- তাহলে ভগবান কি চামারদের সৃষ্টি করেননি ? চামারদের ভগবান কি আলাদা ? এই ছেলের জন্যেই মানত হুজুর!

তখন পাঠ শেষ হয়েছে। ভক্ত মহোদয়রা ধমক দিয়ে বলল- পেতনিটাকে মেরে তাড়াও। অপবিত্র করতে এসেছে সব। ছুঁড়ে ফেলে দাও থালা টালা। সংসারে এমনিতেই আগুন জ্বলছে, চামারও যদি ঠাকুরের পুজো করতে শুরু করে, তাহলে পৃথিবীটা থাকবে না সব রসতলে যাবে?)

আরেকজন বললো- এখন দেখছি আমাদের মন্দিরের দেবতাকেও চামারের হাতে ভোজ নিতে হবে। এইযে শ্রেণী বৈষম্য যা সুখিয়ার মনে অনেক বড় আঘাত আনলো। সে ভাবলো সবাই চলে গেলে সে পূজা দেবে। অন্ধকারে ছেলেকে নিয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকলো। কিছুক্ষণ পর জিয়াবনের অবস্থা আর খারাপ হয়ে গেল। সে ছেলেকে কম্বলে জড়িয়ে নিল আর চাতাল থেকে একটা ইট তুলে মন্দিরের তালা ভাঙ্গলো। মন্দিরের দরজা হঠাৎ খোলা দেখে পুরোহিত চোর বলে চিৎকার করে উঠলো। সুখিয়াকে দেখে পুরোহিত বললো- "সর্বনাশ হয়ে গেছে। সুখিয়া আমাদের পবিত্র মন্দিরে ঢুকে পড়েছে" তাই বলেই সুখিয়াকে পুরোহিত ধাক্কা দিল। জিয়াবন মায়ের হাতের বাধন ছিন্ন হয়ে পড়ে গেলো। যখনি সুখিয়া তা ছেলের দিকে তাকালো তখনই যেন জলের মধ্যে প্রতিবিম্ব দেখতে পেলো, তার ছেলে আর বেঁচে নেই। সে চিৎকার করে বলে উঠলো,

ہائے تمہیں دیا چھو بھی نہیں گئی۔ تم اتنے کٹھور (سنگدل) ہو! بال بچے والے ہو کر بھی تمہیں ایک ابھاگن ماں پر دیا نہ آتی! اس پر دھرم کے ٹھیکیدار بنتے ہو! تم سب کے سب ہتھیارے ہو، پورے ہتھیارے ہو! ڈرو مت میں تھانہ پولیس میں نہیں جاؤں گی۔ میرا نیائے بھگوان کریں گے۔ اب انہیں کے دربار میں پھریاد (فریاد) کروں گی۔"[৯১]

(হায়! তোমাদের প্রানে এতটুকু দয়ামায়া নেই। তোমরা এমনি নিষ্ঠুর! ছেলেমেয়ে নিয়ে তোমরা তো ঘর সংসার কর, তবুও এক অভাগী মায়ের উপর তোমাদের একটু দয়া হল না? তোমরা আবার ধর্মের ঠিকেদার সেজেছ! সব কসাই তোমরা, একেবারে কসাই। ভয় নেই, আমি থানা পুলিশ করতে যাব না, আমার বিচার ভগবান করবেন, এখন তাঁরই দরবারে নালিশ জানাব আমি।)

আরো বলল- "শয়তান পাপিষ্ঠ খুনীর দল, আমার ছেলে প্রাণ নিয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছিস ? শুনেছি পরশ পাথরের স্পর্শে লোহা সোনা হয়ে যায় কিন্তু পরশ পাথর কখনো লোহা হয় না। আর আমার ছোঁয়ায় দেবতা অপবিত্র হয়ে যাবে? আর পন্ডিতজীর গায়ের যা শক্তি তাতে তাকে দাড়োয়ান বললেই ঠিক হবে। তোমাদের স্ত্রী ছেলে মেয়েও তো আছে। কিন্তু এই অভাগীর উপর কারও দয়া হলো না। কেউ সুখিয়ার কথায় পা বাড়ালোনা। শেষ শব্দ তার মুখ থেকে বের হয়েছে, হায়! আমার বাছারে। তারপরেই সব স্তব্ধ, জ্ঞান হারিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিল সুখিয়া। ধন্য করলো

---

[৯১] মুন্সি প্রেমচাঁন্দ, 'মন্দির', *মাজমুয়াহ মুন্সি প্রেমচাঁন্দ ঃ আফছানে*, ছংগে মিল পাবলিকেশন, লাহোর, ২০০২, পৃ. ৪৬৯।

মা জাতিকে এবং মাতৃত্বকে। যে নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস আর ভক্তির স্বরুপ দেখিয়েছেন সুখিয়া, তা দেবগণের কাছেও তা অতি দুর্লভ।

ভাইয়ে ভাইয়ে পারিবারিক বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরতে প্রেঁমচাদ *আখেরি আলফাজ* (آخری الفاظ) গল্পটি লিখেছেন। গল্পে লালবাদুরী একজন সম্পদশালী ধনী মানুষ। তার দুই ছেলে জাঙ্গিকদাস এবং বুলাকি দাস। আজকাল উনি অনেক কঠিন রোগে আক্রান্ত। জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে তিনি ছেলেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক চিন্তিত। তাই ছোট ছেলেকে ডেকে তার মনের কথা বলেন। তিনি চান বর্তমানে সব কিছু যেমন আছে তার মৃত্যুর পরও তেমন যেনো সবকিছু থাকে। ছোট ছেলে জঙ্গিকদাস বাপকে সন্তুষ্ট করেন কিন্তু বড় ছেলে বাবাকে সন্তুষ্ট করার মত কোন কথাই দেয় না। শেষ পর্যন্ত লালবাদুরী তাকে বলেন,

"ایشور کو جو منظور ہو گا، وہی ہو گا۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا، کہہ چکا۔ اب تم جانو، تمہارا کام۔ اس آخری وقت میں شانتی سے مرنا میری تقدیر میں لکھا نہیں ہے۔ خیر! کبھی کبھی اپنے قریب المرگ باپ کے آخری الفاظ یاد کر لینا۔" [৯২]

("ঈশ্বরের যা ঠিক মনে হয়, তাই হবে। আমার যা কিছু বলার ছিল, তা বলে দিছি। আর তুমি জানো, তোমার কি কাজ। আর এই শেষটুকু সময় আমাকে শান্তিতে মরার ভাগ্যো আমার কপালে লেখা নেই। ইস! মাঝে মাঝে আমার বাবার শেষ কাথা গুলো মনে পরে।")

লালবাদুরীর মৃত্যুর ১৫ দিন পরই বুলাকি দাস জাঙ্গিদাসকে সম্পদ ভাগ করতে বলেন। জাঙ্গিকদাস পিতার শেষ ইচ্ছার কথা বড় ভাইকে বলেন। বুলাকি তার বিরুদ্ধে যাওয়ার কথাও বলেন। বুলাকিদাস কখনোই জাঙ্গিকদাসকেভালো চোখে দেখতো না। তার ধারণা জাঙ্গিকদাস না থাকলে সে নিজে একাই পুরো সম্পত্তির মালিক হত। প্রায় সপ্তাহ খানেক সময় নিয়ে একজন সরকারি কর্মকর্তার মাধ্যমে বুলাকিদাস নিজের সম্পত্তি ভাগ করে নেয়। তার এই কাজে জাঙ্গিকদাস খুবই কষ্ট পান। বুলাকির বন্ধুরা বলতে লাগল সে ঠিক কাজই করেছে। বর্তমান দুনিয়ায় কারও উপর ভরসা নাই, হোক সে আপন ছোট ভাই। কিন্তু ন্যায়পরায়ন মানুষরা বুলাকিকে বলল- জাঙ্গিকদাস তাকে সব সময় বাপের জায়গাই দেখে, সে অকারণে ভায়ের সাথে শত্রুতা তৈরি করতেছে।

জাঙ্গিকদাস একটা সুতার কারখানা খুলে কিন্তু হঠাৎ অর্থের অভাবে কারখানা বন্ধ হতে বসে। জীবনে ছোট হওয়ার ভয়ে জাঙ্গিকদাস কখনো কারও কাছে হাত পাতেনি। তাই তার এই রকম দুর্দিনে সাহায্যের জন্য স্ত্রীর সাথে পরামর্শক্রমে আপন ভাইয়ের কাছে যাওয়ার মনস্থ করছিলেন। এমন সময় স্ত্রী বলেন- যখন তাকে ছোট ভাই মনে

[৯২] মুন্সি প্রেমচাঁন্দ, 'আখেরী আলফাজ', *মাজমুয়াহ মুন্সি প্রেমচাঁন্দ ঃ আফছানে*, ছংগে মিল পাবলিকেশন, লাহোর, ২০০২, পৃ. ২৯৮।

করেন না, তবে সেখানে গিয়ে অপমানিত হওয়ার কি আছে ? তারপরও জাঙ্গিকদাস ভায়ের কাছে সাহায্যের জন্য গেল কিন্তু বুলাকি তাকে সরাসরি না করে দিল। বরং তাকে বলল,

"دیکھا کیا جائے گا۔ میں تمہارے دروازے پر کبھی مانگنے نہ آؤں گا اور جو آؤں تو تم مجھے دھتکار دینا۔" [৯৩]

("দেখা যাবে। আমি তোমার দরজায় কখনো ভিক্ষা চাইতে আসবো না এবং যদি আসি তাহলে তুমি আমাকে ধিক্কার দিও")

শেষ পর্যন্ত জাঙ্গিকদাস একবন্ধু এবং স্ত্রীর গয়না বন্ধক রেখে কারখানার খরচ চালাতে লাগলো। কিছুদিন পর তার সুতার কারখানা ঘুড়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে সময়ের আবর্তনে সময় বুলাকির উপর প্রতিশোধ নিল। বুলাকিদাসের ব্যবসা ভাল চলছিল না। তার ধারণা হল, পুরো পৃথিবীই প্রতারণা পূর্ণ। তাহলে সে কেনো এর সুযোগ নিবে না? বুলাকিদাসের স্ত্রী তাকে ছোট ভায়ের কাছে থেকে সাহায্য নিতে বলল কিন্তু বুলাকি ভাবল যাকে সে ঘৃণা এবং ক্রোধের সাথে বের করে দিয়েছিল তার কাছে কিভাবে যাবে। অন্যদিকে ভাইয়ের এমন দুর্বস্থার কথা শুনে জাঙ্গিকদাস চিন্তা করতে লাগল কিভাবে ভাইকে সাহায্য করা যায়। গোপনে সে খবর নিল বুলাকি তার কাছ থেকে সাহায্য নিবে কিনা? জাঙ্গিকদাস হতাশ হয়ে রাতভর ভাইয়ের কথা চিন্তা করে কিছুই পেলনা। অতঃপর সে ভাবল তার বিপদে যে সাহায্য করেনি, তাকে কেন সে সাহায্য করবে। কিন্তু বাপের শেষ ইচ্ছার কথা মনে হতেই তার দু'চোখ থেকে জল ঝরতে লাগল।

জাঙ্গিকদাস ঠিক করল ভাইকে এমন ভাবে সাহায্য করতে হবে যাতে বুলাকি নিজেও জানতে না পারে। অন্যদিকে বুলাকি ভাবতে লাগল, তার জীবন, মান-সম্পদ, অর্থ সবই হারাতে বসেছে। তার আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কিছুই করার নাই। এমন সময় একজন চাকর বুলাকির কাছে একটি চিঠি নিয়ে আসেন। যাতে হাজার রুপি পরিমান অর্থ পাওয়া গেল। পরবর্তীতে বুলাকি খোঁজ নিয়ে জানতে পারে অচেনা একজন এই অর্থ দিয়ে গিয়েছে। সে ভাবল,

"یہ ایشور کی بھیجی ہوئی مدد ہے۔" [৯৪]

("এটা ঈশ্বরের প্রদত্ত সহায্য।")

এই ঘটনার কিছুদিন পর জাঙ্গিকদাস বুলাকির সাথে দেখা করতে আসেন কিন্তু বুলাকি এবার ও খারাপ ব্যবহার করেন। সে জাঙ্গিকদাসকে বলেন- "তুমি মনে হয় কিছু সাহায্য চাওয়ার ইচ্ছায় আমার কাছে এসেছো কিন্তু মনে রাখ বুলাকি নিজের কথা রেখো। আমার যেন কখনো এমন অবস্থা না হয়। তোমার কাছ থেকে সাহায্য নিতে হয়।" কিন্তু বুলাকির কথায় অন্য সময় খারাপ লাগলেও এইবার জাঙ্গিকদাসের মন অনেক শান্তি পেল।

---

[৯৩] মুন্সি প্রেমচাঁন্দ, 'আখেরী আলফাজ', *মাজমুয়াহ মুন্সি প্রেমচাঁন্দ ঃ আফছানে*, ছংগে মিল পাবলিকেশন, লাহোর, ২০০২, পৃ. ৩০৩।
[৯৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩।

প্রেমচাঁদ সাহিত্যে করুণার ফল্গুধারা বর্ষিত হয়েছে নিপীড়িত দরিদ্র কৃষক মজুরের উপর। তিনি তাঁর গল্পে কেবল শোষণের চিত্রই তুলে ধরেন নি, বরং রোমান্স কল্পনা ও সহাস্য রোমাঞ্চের ঘুর্ণিবৃত্য থেকে উর্দু গল্পকে মুক্ত করে তাকে নিয়ে এসেছেন কঠোর বাস্তববাদের আঙিনায়। দলিত, লাঞ্চিত সমাজের নীচু তলার মানুষগুলোর মর্মবেদনাকে সার্থক রূপ দিয়েছেন তাঁর ছোটগল্পের পাতায়। আর সেই সঙ্গে তার ভাষার যাদুমন্ত্রে তাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে তীব্র আঘাত হেনেছেন, যা তাদের মনে বিদ্রোহের ভাব জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করেছে। ধনিক শ্রেণীর প্রতি সঞ্চায়িত হয়েছে নি:স্ব শ্রেণীর ক্ষমাহীন ক্রোধ। অত্যাচারী জমিদার মহাজন ও শোষক শ্রেণীর প্রতি জাগ্রত হয়েছে ঘৃণা। অত্যাচার,অনাচার বা শোষণের প্রতি তীব্র ঘৃণায় অসহায় মানুষগুলোর হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সাধারন মানুষের ছোট ছোট দুঃখ কথার কথাকার প্রেমচাঁদ হয়ে উঠেন নিঃস্ব মানুষের ব্যথার রূপকার। তাঁর সাহিত্যের ম্লান মুখগুলি মুখর হয়, নিষ্করুণ ক্রোধে ফেঁটে পড়ে, প্রতিবাদ জানায় সমাজের নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে। এ যেন সমাজের বিরুদ্ধে স্বয়ং প্রেমচাঁদেরই সোচ্চার প্রতিবাদ।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রেমচাঁদের সমকালীন কয়েকজন উর্দু গদ্য সাহিত্যিক

প্রেমচাঁদ ছিলেন উর্দু ছোটগল্পে আলোকবর্তিকা স্বরূপ। তাঁর পথ ধরেই উর্দু ছোটগল্পে অবিভূত হয় একঝাঁক নবীণ উর্দু ছোটগল্পকার। প্রেমচাঁদ পরবর্তী প্রজন্মের হাতে যে বলিষ্ঠ হাল তুলে দিয়ে গেলেন, সেই হাল ধরেই পালে বাতাস লাগিয়ে নবীন লেখকদের এগিয়ে যেতে আর বাধা রইল না। বয়সের দিক থেকে দু-এক বছর ছোট-বড় বা তার থেকে বেশি হলেও এরা সবাই মোটামুটি সমকালীন বিখ্যাত উর্দু ছোটগল্পকার লেখক ছিলেন। সুলতান হায়দার জোশ, খাজা হাসান নিজামী, সাজ্জাদ হায়দার ইয়ালদারাম, নিয়াজ ফতেহপুরী, মুহাশাহ সদর সেন, আজীম কারুওবি, হায়দার উল্লাহ আফছার, আলী আব্বাস হুসাইনী, ইমতিয়াজ আলী তাজ, জলিল কেদওয়ায়ী, মুহাম্মদ মুজিব, মজনুন গোরখপুরী, রশিদ জাহান, কাউসার চাঁদপুরী, গোলাম আব্বাস, সাদাত হাসান মান্টো, আজিজ আহমেদ, সৈয়দ ফায়েজ মাহমুদ, হায়াতুল্লাহ আনছারী, আহমদ আলী, হেজাব ইমতিয়াজ আলী, আখতার হুসাইন রায়পুরী, কৃষণ চন্দর, ইহসমত চুগতাঈ, রাজেন্দ্র সিং বেদি, খাজা আহমদ আব্বাস, আশফাক আহমদ, জুগেন্দর পাল, কুররাতুলাইন হায়দার প্রমুখ এদের অন্যতম। তাদের রচনায় উপস্থাপিত হয়েছে সমসাময়িক বিষয় আর দৈনন্দিন জীবনের নতুন চিন্তা চেতনা। আজকের উর্দু ছোটগল্পের ভেতরে যে বৈচিত্রের বিবিধ স্বাদ আমরা সাগ্রহে গ্রহণ করি তা এদেরই দান। নিম্নে এদের জীবন কর্ম ও ছোটগল্প সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

খাজা হাসান নিজামী

জন্ম পরিচিতি:

পুরোনো দিল্লিতে উর্দুর যে সকল বিখ্যাত সাহিত্যিক জন্ম গ্রহণ করেছেন খাজা হাসান নিজামী তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি দিল্লির হযরত নিজামুদ্দিন আওলিয়ার বসতী দরগাতে ২ মুহার্‌রম ১২৯৬ হিজরি মোতাবেক ২৫ ডিসেম্বর ১৮৭৯/১৮৮০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তার আসল নাম সৈয়দ আল হাসান। পিতা মাতা যদিও তার নাম কাসেম আলী রেখেছিলেন তথাপি তাঁরা তাকে মামুন আলী হাসান বলে ডাকতেন। তার ডাক নাম সৈয়দ মুহাম্মদ আলী হাসান নিজামী এবং খাজা হাসান নিজামী। তার পিতা সৈয়দ আশেক হোসাইন বাইন্ডিং এর কাজ করতেন।[১] তিনি মাওলানা সৈয়দ বদরুদ্দিন ইসহাক এর বংশধর। মাওলানা বদরুদ্দীন ভারতীয় ইসলামী আদর্শবাদের একজন বড় সুফি সাধক ছিলেন।

শিক্ষাজীবন:

খাজা হাসান নিজামীর শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি হয় পিতা মাতার কাছেই। তিনি প্রথমে কুরআনুল কারীমের নাযেরা পড়েন। অত:পর ফার্সী ভাষার প্রাথমিক বইগুলো এবং আরবি ব্যাকরনের নাহু সরফ অধ্যায়ন করেন। তাঁর প্রথম শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল মুজাফ্ফর গড়ের কান্ডালাতে বসবাস করতেন। তার অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে মৌলভী ওসিয়্যাত আলী মৌলবী হাকীমুদ্দিন পাঞ্জাবী এবং মৌলবী রাযিয়াল হাসান অন্যতম। মাত্র ১১ বছর বয়সে তাঁর পিতা তাকে গাজী খানের তাওনসা শরীফে নিয়ে যান এবং হরবতুল্লাহ বখশ এর হাতে বাইয়াত করান। ১২ বছর বয়সে তাঁর পিতা মাতা মৃত্যুবরণ করেন। ১৬ বছর বয়সে তিনি তাঁর বড় ভাই সৈয়দ আলী হাসান শাহের সাথে ভাওয়ালপুর চাচরাঁ শরীফে যান এবং হযরত খাজা গোলাম ফরিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন।[২] মুল্লা ওহেদী এর বক্তব্য অনুযায়ী তিনি মৌলবী মুহাম্মদ আইয়ূব এর নিকট থেকে শরীয়ত এবং খাজা সাহেব এর নিকট থেকে তরীকত শিক্ষা গ্রহণ করেন।

কর্মজীবন:

১৯০৩ সালে বিভিন্ন বই এবং ঐতিহাসিক ভবন/স্থাপনার ছবি ফেরী করে বিক্রি শুরু করেন। ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে তিনি *'নিযামুল মাশায়েখ'* নামক রেসালা লেখা শুরু করেন। ১৯১৩ সালে তিনি এই পত্রিকায় কাজ করা বন্ধ করে দেন এবং মিরাঠে চলে যান। মিরাঠে তিনি 'তাওহীদ' নামক পত্রিকায় কাজ শুরু করেন।[৩] তিনি নিজাম উদ্দীন আওলিয়াদের মর্যাদাপূর্ণ সিলসিলার উচ্চপদস্থ একজন ঐশ্বরিক সুফী সাধক ছিলেন। মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক ভাবে

[১] মোহাম্মদ আনিসুল হক, *আদবি সাখসিয়াত*, কাফ কিতাব ঘর- ৩৯ পেট্টুওয়াটুন, ঢাকা, পৃ. ১৮১।
[২] মাহনামা, তাছবির, জানুয়ারী ১৯৩৫, পৃ. ০২।
[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ০২।

তিনি একজন সম্মানিত ব্যাক্তি ছিলেন। খাজা হাসান নিজামী চিকিৎসা ক্ষেত্রেও ভালো নাম কামান। তিনি মিসমেরিজম বিদ্যার মাধ্যমে মানুষের আত্মিক চিকিৎসা করতেন।

সাহিত্যকর্ম:

খাজা হাসান নিজামী ১৮৯৬ সালে লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর অনেক রচনা *'মুখজুর আখতার'* ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। তিনি তার জীবদ্দশায় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা নিয়ে ৬০টির ও বেশী বই লিখেছেন। মুল্লা ওয়াহীদী বলেন- খাজা হাসান নিজামী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ৫০০ বই লিখেছেন। যা কোটেড নকীভ ১৯৭৮ এ বিদ্যমান রয়েছে। ১৯১৭ সালে সেপ্টেম্বররে তিনি *'মুরশিদ'* নামক রিসালা বের করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদনা করেন। খাজা হাসান নিজামী নিজে ইংরেজী না জানলেও তিনি 'ইয়াংগ মুসলিম' এবং 'ডিকটেটর' নামক দুইটি ইংরেজী পত্রিকা বের করেছিলেন। তাঁর লেখনীর প্রধান বিষয়গুলো ছিল প্রতিরক্ষা, ইসলামী আদর্শ ও জ্ঞানের বিস্তার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ইত্যাদি। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে উত্তর ভারত জুড়ে মুসলমানদের উপর দাঙ্গা, নির্যাতন, নিপীড়নের দৃশ্য নিজামীর মনকে বেশ নাড়া দেয়। আগ্রাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের অত্যাচারের উপর তার বিখ্যাত কিছু রচনা রয়েছে। তার মধ্যে ১৯২৩ সালে প্রকাশিত *'দাই-ই-ইসলাম'* (ইসলামের মিশনারী) যাতে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি ও ব্রিটিশ উপ নির্দেশকের বিরোপ মনোভাব তুলে ধরা হয়েছে।

নিজামী মনে করতেন হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের সাথে শিখদের অনেক মিল রয়েছে। নিজামী *'তাদের ধর্ম'* প্রবন্ধে লিখেন- ইসলাম এক আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করে না। প্রার্থনা ও আচারের ক্ষেত্রে শিখরাও মুসলমানদের অনুরূপ অনুকরণ করে। তারাও পঠনের জন্য এক ধর্ম গ্রন্থের অনুসারী ও বিশ্বাসী। হিন্দুদের মতো শিখরা একাধিক দেবদেবী, মূর্তি ইত্যাদির পূজা করে না। মুসলমানদের জন্য হজ্ব যেমন নিদিষ্ট স্থান, তেমনি শিখদের জন্য তীর্থ যাত্রা নিদিষ্ট। মুসলমানরা যেমন ন্যায় পরায়নতার জন্য মৃত্যু বরণ করে শহীদ উপাধি লাভ করে শিখরাও তেমনি তা মানে। মুসলমান যেমন পাগড়ী ও দাড়ি রাখে শিখরাও তা করে থাকে।

'শিখ ও সাঈদ' নামক অধ্যায়ে তিনি বলেন- শাইখ ও সায়্যেদ সরাসরি রাসুলে করীম (সাঃ) এর বংশধর। তিনি সৈয়দ কে শিখদের সাথে তুলনা করেন। সৈয়দরা যেমন উদারতা, সাহস, ন্যায়বিচার ও সত্যের প্রতি দৃঢ়তার জন্য পরিচিত, তেমনি শিখরাও পরিচিত। হযরত ইমান হুসাইন (রা:) যিনি অত্যাচারী শাসকের সামনে মাথা নত করবেন না বলে তার জীবন উৎসর্গ করেছেন, তেমনি শিখরাও সত্যের সমর্থনের জন্য তাদের সন্তানদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। যেমন ভাবে সৈয়দরা মুসলিম নেতা হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত, তেমনি শিখদের সম্মানজনক ভাবে বলা হয় সরদার।

নিজামী বলেন- প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর নিজেই শিখদের সঙ্গে আছেন। তাদের একটি শক্তিশালী ও সাহসী সম্প্রদায় বানিয়েছেন এবং তাদের উত্তম গুনাবলীর সাথে সংযুক্ত করেছেন। ঈশ্বর তার এই বিশেষ বান্দাদের উপর তার সমস্ত আর্শীবাদ বর্ষণ করেন।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় তিনি হায়দারাবাদে চলে আসেন। পরে পরিস্থিতি শান্ত হলে আবার দিল্লীতে ফিরে যান। এ সময় মাওলানা আযাদ এবং মাওলানা জাফরের সাথে তার মনোমালিন্য হয়। তথাপিও তিনি শুদ্ধি আন্দোলন চালান। ফলে অনেক লোক তার থেকে দূরে সরে যায়। তিনি তার ভক্তদের নতুন নতুন বক্তব্যের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করতেন। খাজা হাসান নিজামীই ড. আল্লামা ইকবালকে 'প্রাচ্যের কবি' উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি আফগান শাহজাদা 'আল মারুফ' এবং 'তুর্কী খুন' নামক ছবিগুলোর সংলাপ রচনা করেছেন।[৪] খাজা হাসান নিজামী প্রায় ২৩১ গল্প, ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ রচনাও বের করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ ছোটগল্পগুলো হলো-

১. *আরব শহীদ কা ঘর* (عرب شہید کا گھر) এটি খাজা হাসান নিজামীর প্রথম ছোটগল্প। যা লাহোর থেকে ১৯১২ সালে মুদ্রিত হয়।
২. *জমিনদার* (زمیندار) যা লাহোর থেকে ১৯১২ সালে মুদ্রিত হয়।
৩. *গদর দিল্লি কে আফছানে* (غدر دلہی کے افسانی) : প্রথম খণ্ড মিরাঠের 'তওহীদ' পত্রিকায় ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়।
৪. *গদর দিল্লি কে আফছানে* (غدر دلہی کے افسانی) : দ্বিতীয় খণ্ড দিল্লি থেকে ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়।
৫. *গদর দিল্লী কে আফছানে* (প্রথম খণ্ড) *'বেগোমাত কে আছু'* (غدر دلہی کے افسانی (حصہ اول) بیگمات کے آنسو) : দিল্লি থেকে ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়।
৬. *গদর দিল্লী কে আফছানে (দ্বিতীয় খণ্ড) 'আংঙ্গরেজু কি বেপতা'* (غدر دلہی کے افسانی (حصہ دوم) انگریزوں کی بپتا) : দিল্লি থেকে ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়।[৫]

মৃত্যুকাল:

এই মহাসাধক সুফী ৩১ জুলাই ১৯৫৫ সালে দিল্লিতে মৃত্যু বরণ করেন।[৬] তাঁকে হযরত নিযাম উদ্দিন আওলিয়ার পাশে দাফন করা হয়।

---

[৪] মোহাম্মদ আনিসুল হক, *আদবি সাখসিয়াত*, কাফ কিতাব ঘর- ৩৯ পেট্রুওয়াটুন, ঢাকা, পৃ. ১৮১।
[৫] ড. মির্জা হামিদ বেগ, *উর্দু আফসানে কি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ২৩৬-২৩৭।
[৬] মোহাম্মদ আনিসুল হক, *আদবি সাখসিয়াত*, কাফ কিতাব ঘর- ৩৯ পেট্রুওয়াটুন, ঢাকা, পৃ. ১৮১।

সাজ্জাদ হায়দার ইয়ালদারাম

জন্ম ও বংশ পরিচিতি:

সাজ্জাদ হায়দার ইয়ালদারাম বিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত উর্দু ছোটগল্পকার ছিলেন। তিনি ১৮৮০ সালে ভারতের একটি ছোট্ট শহর বিজনৌর জেলার নাথের গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার প্রকৃত নাম সৈয়দ সাজ্জাদ হায়দার। তবে তিনি লেখনীতে বিভিন্ন ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। তার মধ্যে খানী খান এবং ইয়ালদারাম অন্যতম। ইয়ালদারাম তুর্কী শব্দ। যার অর্থ হলো 'বাজ'। তার পিতা সৈয়দ জালালউদ্দিন হায়দার। যিনি ঐ সময়কালীন বেনারসের একজন নামকরা কোতয়াল (পুলিশ) ছিলেন।[৭]

ইয়ালদারাম সুফী বংশের ছিলেন। ১২ শতাব্দীতে এই সুফীরা তিরমিজ থেকে স্থানান্তরিত হয়। ১৪ শতকে তারা 'নেহটাউরে' স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। মুঘল যুগে কৃষি জমি আবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তারা কেবল সুফী ছিলনা বরং তারা পন্ডিত ছিলেন। এ ক্ষেত্রে মহিলারাও পিছিয়ে ছিলেন না। সৈয়দ ইয়ালদারামের মাতা 'স্যায়েদা উম্মে মরিয়ম' কুরআনের ফার্সী ভাষার অনুবাদ করেন।

শিক্ষাজীবন:

ইয়ালদারাম বেনারসে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। অত:পর মাদরাসাতুল উলুম আলীগড় এ কিছুকাল শিক্ষা গ্রহন করেন। এরপর এম.এ ল কলেজ আলীগড় থেকে ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষা দেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষায় তিনি পুরো জেলায় মেধা তালিকায় প্রথম হন। একই কলেজ থেকে ১৯০১ সালে বি.এ পাশ করেন। এ পরীক্ষায়ও তিনি মেধা তালিকায় দ্বিতীয় হন।[৮]

চাকুরী জীবন:

বি.এ পাশ করার পর তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। এ সময় তিনি নাগপুরের রাজা আজম শাহের গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হন। ফলে নাগপুরে চলে যান। তুর্কি সাহিত্যের প্রতি তার অনেক আবেগ কাজ করতো। এ সময়ে বাগদাদের বৃটিশ কাউন্সিলে একজন অনুবাদকের পোস্ট খালি হলে আলীগড় কলেজের অধ্যক্ষের সুপারিশে সেখানে তুরস্কের মুখপাত্র হিসাবে তিনি যোগদান করেন। ফলে তিনি বাগদাদে চলে যান। এই সুযোগে তিনি অনেক তুর্কি সাহিত্য অধ্যায়ন করেন। এটি তাকে উর্দু গদ্যে একটি নতুন ধারা তৈরীতে সাহায্য করে। এ সময় তিনি উসমানিয়া সাম্রাজ্য ও পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ভারতে চলে আসেন। এখানে

---

[৭] মোহাম্মদ আনিসুল হক, *আদবি সাখসিয়াত*, কাফ কিতাব ঘর- ৩৯ পেট্টুওয়াটুন, ঢাকা, পৃ. ১৮৪।

[৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪।

সরকারের “Political Department” এ “Assistant Political Agent” হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ১৯১৪ সালে তিনি রাজা মাহমুদ আবাদ এর সেক্রেটারি হিসেবে কাজ শুরু করেন। সেখানে তার কর্মকান্ড ইউ. পি. সোল সার্ভিস এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ১৯১৮ সালে তাকে ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়। রাজা মাহমুদ আবাদ আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের “Vice Chancellor” নিযুক্ত হলে সাজ্জাদ হায়দার তাঁর চাকরিকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করেন। তিনি সেখানে ১৯২০-১৯২১ সালে পর্যন্ত প্রথম রেজিস্ট্রার হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯২১ সালে তিনি আবার ডেপুটি কালেক্টরে ফিরে আসেন। [১]

বিবাহঃ

সাজ্জাদ ১৯১২ সালে সৈয়দ নজরুল বাকেরের কন্যা নাজের জহরা বেগমকে বিয়ে করেন। তিনি সৈয়দ বংশের কন্যা ও একজন প্রসিদ্ধ লেখিকা ছিলেন। সেকালে নারী লেখিকারা তাদের প্রকৃত নাম উল্লেখ করা অনুচিত মনে করত, তাই লেখিকা হিসেবে তিনি বিন-ই-নজরুল বাকের নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

সাহিত্য চর্চাঃ

সাজ্জাদ কবিতা, ছোটগল্প এমনকি প্রবন্ধও লিখেছেন। তিনি প্রধানত রোমান্টিক লেখক হিসাবেই জনপ্রিয়। তিনি তুর্কি সাহিত্য উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। উনবিংশ শতকের লেখক হিসাবে তিনি নতুন প্রজন্মকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেন। তার উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্মের মধ্যে রয়েছে-

১. *মাতলুবে হাসীনা* (مطلوب حسیناں) : তুর্কী উপন্যাসের উর্দু অনুবাদ, যা ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়।

২. *যোহরা* (زہرا) : তুর্কী উপন্যাসের অনুবাদ, যা ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. *সালেছ বিল খায়ের* (ثالث بالخیر) : এটি ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়।

৪. *মিরজা ফুয়া আলী ঘড় কলেজ মে* (مرزا پھویا علی گڑھ کالج میں): দীর্ঘ কবিতা যা আলীগড় কলেজ ম্যাগাজিনে ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৫. *খিয়ালিস্তান* (خیالستان) : ৭ টি ছোটগল্প এবং ৬ টি প্রবন্ধ সহ ১৯১১ সাল লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

---

[১] প্রফেসার নুরুল হুসাইন নকবী, তারিখে আদবে উর্দু, এডুকেশন বুক হাউজ, আলীগড়, ২০০৪, পৃ. ২৫৩।

৬. *জালাল উদ্দিন খাওয়ারেজম শাহ* (جلال دین خوارزم شاہ) : তুর্কি নাটকের অনুবাদ যা ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়।

৭. *হেকায়াত ওয়া ইহতেসা সাত* (حکایات واحتساسات) : ১৩ টি ছোটগল্প এবং ১২ টি প্রবন্ধ সহ ১৯২৬ ও ১৯২৭ সালে সামান্য অংশ মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলীগড় প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় এবং সম্পূর্ন রুপে তা ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হয়।

৮. *আসীব উলফাত* (آسیب الفت) : তুর্কী উপন্যাসের অনুবাদ, যা দিল্লি থেকে ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়।

৯. *হুমা খানম* (ہما خانم) : তুর্কী উপন্যাসের অনুবাদ, যা এলাহাবাদ থেকে ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়।

১০. *হেকায়াতে লাইলি মজনু* (حکایات لیلیٰ مجنوں) : এ ছোটগল্পটি যা ১৯৪৪ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

১১. *এক কাহানী ছে আদীবোওঁ কি জবানী* (ایک کہانی چھ ادیبوں کی زبانی)

১২. *জাঙ্গ ওয়া জাদল* (جنگ وجدل) : তুর্কি নাটকের অনুবাদ।[১০]

১৩. *পুরানা খুয়াব* (پرانا خواب) : তুর্কিতে অনূদিত দীর্ঘ কবিতা।

১৪. *পুরানা খুয়াব* (پرانا خواب) : নাটক।

সাজ্জাদ সবচেয়ে বেশী সুনাম অর্জন করেন খিয়ালিস্তান (خیالستان) এর জন্য। এটা তাঁর প্রথম ছোটগল্প ও প্রবন্ধ সংকলন। এতে প্রায় ১৩ টির মতো ছোটগল্প এবং প্রবন্ধ রয়েছে। ছোটগল্পগুলির পটভূমি তুর্কি সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত ছিল।[১১] সাজ্জাদ হায়দার ইয়ালদারামের ছোটগল্পগুলোতে রোমান্টিকতার প্রবেশ অন্যদের থেকে বেশ আলাদা ছিল। তাঁর একক রচনা শৈলী অন্য কোন লেখকের মধ্যে পাওয়া যায় না। তার ছোট গল্পগুলির মধ্যে আবেগ, অনুভূীত এবং অতীত স্মৃতি ইত্যাদির প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে বেশী।[১২]

ইয়ালদারামের কিছু কিছু ছোটগল্পতে পুরুষদের চেয়ে নারীদের প্রাধান্যতা দেখা যায়। নারী ছাড়া পুরুষ অসম্পূর্ণ। তাঁর অনেক গল্প পড়লে মনে হবে নারী তার ছোটগল্পের প্রাণশক্তি। আলীগড়ের ছাত্র ও চাকুরীর সুবাদে তাঁর অনেক

[১০] ড. মির্জা হামিদ বেগ, *উর্দু আফসানে কি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ১৭৮-১৭৯।
[১১] মোহাম্মদ আনিসুল হক, *আদবি সাখসিয়াত*, কাফ কিতাব ঘর- ৩৯ পেট্রুওয়াটুন, ঢাকা, পৃ. ১৮৫।
[১২] ড. আবু সায়্যেদ নূর-উদ্দীন, *তারিখে আদবে উর্দু*, মাগরিবে পাকিস্তান উর্দু একাডেমী, লাহোর, ১৯৯৭, পৃ. ৩৫২।

ছোটগল্পের ভিতর স্যার সৈয়দ আহমদের বিশ্বাস, জীবন দর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তার লিখনীর মধ্যে গালিবের মতো নতুন নতুন শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সহজ সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষাই যা পাঠকে সাজ্জাদের গল্পের মূল প্রাণ।

মৃত্যুকাল:

এই মহান ব্যক্তি ১১ এপ্রিল ১৯৪৩ সালে তিনি লখনৌতে মৃত্যু বরণ করেন।[১৩] তাঁকে এশোর বাগান কবরস্থানে দাফন করা হয়।

[১৩] প্রফেসার নুরুল হুসাইন নকবী, *তারিখে আদবে উর্দু*, এডুকেশন বুক হাউজ, আলীগড়, ২০০৪, পৃ. ২৫৩।

নিয়াজ ফতেহপুরী

জন্ম পরিচিতি:

উর্দু সাহিত্যে যে সকল কবি সাহিত্যিক গদ্যের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শীতা দেখিয়েছেন, নিয়াজ ফতেহপুরী তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ভারতে উত্তর প্রদেশের ফতেহপুর জেলার হাসোয়া গ্রামে ১৮৮৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মাতা তার নাম রাখেন নিয়াজ মুহাম্মদ খান। তাঁর প্রকৃত নাম হল মাওলানা নিয়াজ মোহাম্মদ খান। তবে তাঁর পিতা তাকে লিয়াকত আলী খান বলে ডাকতেন। নিয়াজ মোহাম্মদ খান নিয়াজ ফতেহপুরী ছদ্ম নামে পরিচিত। তবে তিনি লিয়াকত আলী খান নামেও পরিচিত ছিলেন। এটাই তাঁর ঐতিহাসিক নাম। তার কলমী নাম নিয়াজ ফতেহপুরী। তার পিতার নাম আমির খান আমির। চাকরী থেকে অবসরের পর তিনি রামপুরে উকালতি করতেন।[১৪]

শিক্ষাজীবন:

বাল্যকাল থেকেই পড়ালেখার প্রতি নিয়াজের খুব আগ্রহ ছিল। তিনি আরবী, ফার্সির পাশাপাশি ইংরেজীতেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি ফতেহপুরের মৌলবি হাবিবুদ্দিনের নিকট এবং লখনৌর মো: হাসান গাজীপুরীর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। দশ বছর বয়সে ১৮৯৩/১৮৯৪ সালে মাদরাসায়ে ইসলামিয়া ফাতেহপুর এ ভর্তি হন। এখান থেকে ১৮৯৮ সালে ইংরেজী মিডেল পাশ করেন। একই সময়ে লখনৌতে দারুল উলুম নদওয়ায় এবং মাদরাসায়ে আলিয়া রামপুর এ প্রায় দেড় বছর মাও: আরব মুহাম্মদ তবীব এবং মাও: যুহুরুল হক্ব খাইর আবাদীর ছাত্রত্ব গ্রহন করেন। অবশেষে ১৮৯৯ সালে মাদরাসায়ে ইসলামিয়া ফতেহপুর থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন।

কর্মজীবন:

নিয়াজ ফতেহপুরীর পিতা একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন। পিতার বিভিন্ন জায়গায় বদলির কারনে তার শৈশব ফতেহপুর, লখনৌ এবং রামপুরে কাটে। তথাপি ১৮৮৪ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২১ বছর তারা ফতেহপুরেই থাকেন। ১৮৯৭ সালে তার পিতা চাকরি থেকে অবসর নেন এবং রামপুরে ওকালতি শুরু করলে নিয়াজ ফতেহপুরীও তার পিতার সাথে রামপুর বসবাস শুরু করেন। তিনি ১৯০০ সালে মুরাদ আবাদে সাব ইন্সপেক্টর হিসেবে পুলিশ ট্রেনিং নেন।[১৫] ১৯০১ সালে এলাহবাদের ইন্ডিয়া থানার সাব ইন্সপেক্টর হিসেবে নিযুক্ত হন, দুই বছর পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত থাকার পর ১৯০২ সালে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। ১৯০৩-১৯০৫ পর্যন্ত মাদরাসায়ে ইসলামিয়ার ইংরেজী শাখার হেড মাষ্টার ছিলেন। ১৯০৬-১৯০৭ সাল পর্যন্ত নবাব রিয়াযুল হাসান খানের কওনি

[১৪] ড. সৈয়্যেদ ইজাজ হুসাইন, *মুখতাছের তারিখে আদবে উর্দু*, উর্দু কিতাব ঘর, দিল্লি, পৃ. ৩০৫।
[১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫।

স্টেটে কোতওয়াল হিসেবে কাজ করেন। ১৯০৭-১৯০৮ সাল পর্যন্ত আজে গড় স্টেটে 'সুপারেন্ট পুলিশ' হিসেবে এবং ১৯০৮-১৯০৯ সাল পর্যন্ত হিসার জেলার সিকজ স্টেটে হানসীতে মিউনিসিপাল সেক্রেটারী হিসেবে চাকরি করেন। ১৯০৯-১৯১০ সালে আবার মাদরাসায়ে ইসলামিয়ার সাথে যুক্ত হন। ১৯১০ সালে 'জমিনদার' পত্রিকায় কাজ করেন। ১৯১১ সালে তিনি আবার হাসনীতে মিউনিসিপাল সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেন এবং একই সাথে সাপ্তাহিক 'তাওহীদ' এর সহযোগী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯১২ সালে তিনি তৃতীয় বারের মত মাদরাসায়ে ইসলামিয়ার সাথে যুক্ত হন এবং ১৯১৪ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। এর পরে দিল্লি স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। এর পরে দিল্লি চলে যান এবং হাকীম মুহাম্মদ আজমল খানের ইংরেজি স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। ১৯১৫-১৯১৯ সালে রায়িয়্যাত পত্রিকার সিনিয়র অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ১৯২১-১৯৬২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পদে চাকরিরত অবস্থায় লখনৌতেই ছিলেন। ১৯৬২ সালে তিনি পাকিস্তানে চলে আসেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের করাচিতে বসবাস করেন।[১৬]

বিবাহ:

তার জীবদ্দশায় তিন বার বিবাহ করেন। ১৯০১ সালে ১৭ বছর বয়সে ইলাহবাদে প্রথম বিবাহ করেন। কিন্তু ১৯২৩ সালে তার প্রথম স্ত্রী মারা যায়। ১৯২৪ সালে লাখনৌতে মুহাম্মদ ওলায়াত খানের মেয়ে মুখতার বেগম কে বিবাহ করেন। কিন্তু ১৯২৭ সালে তিনিও মারা গেলে একই সালে তিনি মুখতার বেগমের ছোট বোন গুলজার বেগমকে বিবাহ করেন।

সাহিত্যজীবন:

নিয়াজ ফতেহপুরী ছিলেন একজন বিখ্যাত গল্পকার যার উর্দু ছোটগল্পগুলোকে মুন্সী প্রেমচাঁদের ছোটগল্পের সমান মর্যাদা দেয়া যায়। নিয়াজের গল্পগুরো উর্দু সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ১৯১০ সালে তার প্রথম গল্প *'এ পারসি ডোশেজ কো দেখ কর'* প্রকাশের পর তার সাহিত্যিক শক্তি প্রকাশ পায়।

চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে ছোটগল্পের সত্যিকার বৈশিষ্টের জন্য নিয়াজ ফতেহপুরি পক্ষ পরিবর্তন করে দর্শন ও সমালোচনার দিকে অগ্রসর হন। যেগুলি বর্তমানে প্রেমচাঁদ দ্বারা শনাক্ত করা হয়েছে। তিনি তার কল্পনা প্রবণ মরুভূমিতে উদ্দেশ্যহীন ভ্রমনের নিরর্থকতা ছাড়া অন্য কিছু অনুভব করতে পারেননি। নিয়াজ ফতেহপুরী ছিলেন একজন সুপরিচিত নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে একজন নিরপেক্ষ সমালোচক। ভারতের লখনৌর আহমাদিয়া জামাতের সদস্যদের সাথে তার কিছু ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও আলোচনা রয়েছে।

[১৬] Intizar Husain , *The Rationalist and the Romantic: Niaz Fatehpuri*, 05 Sep 2011, NewAgeIslam.Com

তিনি একজন উর্দু কবি, সমালোচক এবং তার্কিক ও ছিলেন যিনি মৌলবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস করেছিলেন। নিয়াজ ফতেহপুরী উর্দু সাহিত্যে ধর্ম এবং তার সময়ে ভারতের সমাজ কার্যকলাপ বিদ্যমান বিভিন্ন দিক সম্পর্কে লিখেছেন, যা ভারতের সমাজ ব্যাস্থাকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি দুই ডজনেরও বেশী লেখা লিখেছেন। তিনি নিগার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন, যেটিকে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ উর্দু সাহিত্য পত্রিকায় পরিণত করেন। তিনি ১৯২২ সালে ফেব্রুয়ারিতে আগ্রা থেকে সাহিত্যিক মাসিক পরচা 'নিগার' বের করেন। এই পরচা ১৯২২ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত আগ্রা থেকে জানুয়ারী ১৯২৩ থেকে জুন ১৯২৭ পর্যন্ত ভুপাল থেকে এবং জুলাই ১৯২৭ থেকে জুলাই ১৯৬২ পর্যন্ত লখনৌ থেকে বের হয়। আগষ্ট ১৯৬২ থেকে মে ১৯৬২ পর্যন্ত নিগার পাকিস্তান নামে করাচি থেকে বের হয়। শতাব্দীর ষাট এর দশকের শেষের দিকে এই নিগার পত্রিকায় আহমাদিয়া জামাআতের পক্ষে লেখা শুরু করেন। তিনি তার লেখাতে পুরো ধর্মীয় জগত এবং বিভিন্ন চিন্তভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিভাবে একজন ব্যক্তি ঐ সময়ের তথাকথিত ধর্মীয় পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে সমালোচনা মূলক এবং আক্রমনাত্মক লেখার জন্য পরিচিত ছিলেন তা হযরত মির্জা গোলাম আহমদ এবং ইসলামের সবচেয়ে সুন্দর ও প্রয়োগিক রূপ হিসেবে জামাআতের কর্মকৌশলকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। নিয়াজ ফতেহপুরী আহমাদিয়া জামাআতের বিভিন্ন দিক নিয়ে লিখেছেন। তিনি বিশেষ করে হযরত মুসলেহ মউদ (রহঃ) এর কুরআনের ভাষ্য দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তার মতে এটি প্রথম এবং অদ্বিতীয় ভাষ্য যা একজন আধুনিক পুরুষের মনকে সন্তুষ্ট করতে পারে। নিয়াজ ফতেহপ্রী জামাআতের সদস্য ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিকে মূল্যায়ন করার জন্য বৃদ্ধ বয়সে জামাআতের হেডকোয়ার্টার কাডিয়ানএ গিয়েছিলেন এবং সত্য ইসলাম আহমাদিয়াতের জন্য জীবন উৎসর্গকারী দরবেশদের সাথে সাক্ষাত করে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। এটা দুঃখজনক যে তার সাহিত্য ও ধর্মীয় কাজ কর্মের রক্ষাকারীরা আহমাদিয়া জামাআত সম্পর্কে তার মতামতকে নিষ্প্রভ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি নিজে ষাট এর দশকের শেষের দিকে করাচীতে তার বাসভবনে ড. ফারমান ফতেহপুরীর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাকে বলেন যে, আহমাদিয়াত সম্পর্কে আল্লামা নিয়াজ ফতেহপুরীর মাতামতকে স্বীকার করার পাশাপাশি এর প্রতি সুবিচার করা উচিত। কিন্তু তাদের পরামর্শদাতা ও নিয়ন্ত্রন কারীর মধ্যে সাহসের অভাব ছিল।

নিগারের বের হওয়ার পূর্বে তার রচানাবলি লাহোরের *'ইন্তেখাবে লা জওয়াব'* দিল্লির *'ফুদায়ে আম'*, লাহোরের *'জমিনদার'* অমরিত সারের *'সুফী'*, মিরাঠের 'বয়িয়্যাত' দিল্লির *'মুতবা'* কলকাতার *'আল হেলাল'* দিল্লির *'তামাদ্দুন'* এবং আগ্রার *'নারুকাদ'* নামক পত্রিকা থেকে প্রকাশিত হত। ১৯৬২ সালে তিনি *'সাহিত্য ও শিক্ষা'*র জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন।[১৭]

[১৭] Padma Awards, *Ministry of Home Affairs, Government of India. 2015*. Retrieved July 21, 2015.

এগুলোর পাশাপাশি তার সাতটি উপন্যাস সংকলনও নিগার পত্রিকায় প্রকশিত হয়েছিল। এছাড়া প্রায় ৪৩ টিরও বেশী গল্প, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ রয়েছে। যদিও পরবতীতে তিনি ধর্মীয় ভন্ডামি ও গোড়ামির বিরুদ্ধে কিছু ছোটগল্প লিখেছিলেন এবং ছোটগল্পে মাধ্যমে যে ভাবে তিনি সমাজ সংস্কার করতে চেয়েছেন তার প্রতিফলন ঘটেছে তথাপি তার সাহিত্যের রোমান্টিকতা এতটাই স্পষ্টভাষী যে তা তাকে প্রকৃত সত্যের জগতে অবাধে পদার্পন করার অনুমতি দিয়েছে। [১৮]

তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছোটগল্প হল-

১. *এক শায়ের কা আনজাম* (ایک شاعر کا انجام) : এলাহাবাদ প্রেস থেকে ১৯১৩ সালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯২৯ সালে লখনৌ থেকে প্রকাশিত হয়।

২. *নিগারিস্তান* (نگارستان) : লখনৌ সাদেক বুক ডিপো থেকে ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. *হুছুন কি আয়ারিয়ান আওর দুসরে আফছানে* (حسن کی عیاریاں اور دوسرے افسانے) : হায়দারাবাদ জাওইয়াহ আদিব থেকে ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৪. *মুখতারাত নিয়াজ* (مختارات نیاز) : দিল্লি থেকে ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৫. *জামালিস্তান* (جمالستان) : লখনৌ নিগার বুক এজেন্সি থেকে ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৬. *শিহাব কি ছার গুজাস্ত* (شہاب کی سرگزشت) : লখনৌ সাদেব বুক হাউজ ডিপু থেকে প্রথমে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়। পরে সাদেব বুক হাউজ ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে।

৭. *কুরবান গাহ হুছন* (قربان گاہ حسن) : ১৯৩৯ সালে তা প্রকাশিত হয়।

৮. *কিউপড ইন্ড ছাইকি* (کیوپڈ اینڈ سائکی) : ১৯৩৯ সালে তা প্রকাশিত হয়।

৯. *নেকাব উঠ জানে কে বাদ* (نقاب اٹھ جانے کے بعد) : লখনৌ নিগার বুক এজেন্সি থেকে ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়।

---

[১৮] ড. আবু সায়্যেদ নূর-উদ্দীন, *তারিখে আদবে উর্দু*, মাগরিবে পাকিস্তান উর্দু একাডেমী, লাহোর, ১৯৯৭, পৃ. ৩৫৬ ।

১০. *সাবনামাস্তান কা কাতরাহ গাওহারিন* (*شبنمستان کا قطرہ گوہریں*) : করাচী থেকে প্রকাশিত হয়।[১৯]

এছাড়া তিনি গালিবের কাব্য *‘লাভ সনেটস অব গালিব’* (Love Sonnets of Ghalib) এবং *‘দ্যা ওয়াইন প্যাশন’* (The Wine of Passion) শিরোনামে দুটি গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। উভয়ই গ্রন্থই ফিরোজশন্স, লাহোর, পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত হয়।

মৃত্যুকাল:

এ বিখ্যাত ব্যক্তি ২৪ মে, ১৯৬৬ সালে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে পাকিস্তানের করাচীতে মৃত্যুবরণ করেন।

---

[১৯] ড. মির্জা হামিদ বেগ, উর্দু *আফসানে কি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একাডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ২৪৮-২৪৯।

সুলতান হায়দার জোশ

জন্ম পরিচিতি:

বিশিষ্ট উর্দু ছোট গল্পকার দিল্লির শেখপুর বাদউনে ৯ নভেম্বর, ১৮৮৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। যদিও ড. আনওয়ার আহমেদ 'উর্দু আফসানা'তে উল্লেখ করেছেন যে, সুলতান হায়দার জোশের জন্ম ১৮৮৮ সালে, তার এই কথা সত্য নয়। তার প্রকৃত নাম সুলতান হায়দার। কিন্তু তিনি লেখনিতে নিজের নাম সুলতান হায়দার জোশ অথবা জান বল (جان بل) ব্যবহার করতেন।

পরিবার পরিচিতি:

সুলতান হায়দার বংশ ছিল শেখ বংশ। জোশের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শেখ শরফুদ্দিন এবং নজিবুত তরফাইন। তাঁর বংশ শেখ বংশ। যদিও মায়ের দিক থেকে তার বংশ হাকীম আহসান উল্লাহ দেহলভীর সূত্র ধরে হযরত বাবা ফরিদগঞ্জ শেখরের সাথে মিলিত হয়েছে। এই দুই কারনে তাকে 'শেখ ফরিদী' বলা হয়। তার বাবা শেখ নাজির হায়দার ছিলেন মহান সুফি সাধক 'সুফি বাবা ফরিদউদ্দিন গুলজেসাকার' এর সরাসরি বংশধর।[২০] জোশ তাই মানব দরদী ছিলেন। তিনি পৈত্রিক সুত্রে বিশাল সম্পত্তির মালিক ছিলেন। যার বেশি ভাগই তিনি আল্লাহর রহে দান করে দেন। সুলতান হায়দার জোশের স্ত্রী ছিলেন সৈয়দা বেগাম, তাদের ঘরে এক ছেলে এবং দুই মেয়ে ছিল। ছেলে 'মুহাম্মদ এহসান হায়দার' ভারত বিভাজনের পূর্বে 'আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি স্কুল' এর প্রধান ছিলেন। পরে তিনি যুক্তরাজ্যে চলে যান। যুক্তরাজ্যে যাওয়ার আগে তিনি 'পাকিস্তানের ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল' এ প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সুলতান হায়দার জোশের প্রথম মেয়ে মাহমুদা বেগম 'আনোয়ার গার্লস কলেজ' আলীগড়ের প্রভাষক ছিলেন এবং দ্বিতীয় মেয়ে আবিদা আহমেদ ছিলেন ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট 'জনাব ফখরুদ্দিন আলী আহমদে'র সহধর্মিনী। তিনি ভারতের প্রথম 'ফাস্ট লেডি' নামে খ্যাতি অর্জন করেন।

শিক্ষাজীবন:

সুলতান হায়দার জুশ মায়ের তত্ত্বাবধানে দিল্লির 'এংলো এরাবিক স্কুল'-এ প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি মিশন স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। কিন্তু এক বৎসর পর তাকে আবার দিল্লীর 'এংলো এরাবিক স্কুল' ভর্তি করা হয় এবং সেখান থেকে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯০৫ সালে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য 'মাদরাসাতুল উলুম আলীগড়'এ ভর্তি হয়ে অধ্যায়ন করতে থাকেন।[২১] ১৯০৬ সালে নওয়াব মুহসিনুল মুলক এর বিরুদ্ধে যে ছাত্র

---

[২০] আবুল ফজল সিদ্দিক, *পেহলি কুরছি কে হুজুর*, মাতবুয়াহ ছিপ, করাচী, ১৯৮৮, পৃ. ৫৭।

[২১] ড. সৈয়্যেদ ইজাজ হুসাইন, *মুখতাছের তারিখে আদবে উর্দু*, উর্দু কিতাব ঘর, দিল্লি, পৃ. ২৫৫।

আন্দোলন হয়েছিল, তিনি তাতে সক্রিয় ভাবে জড়িত ছিলেন এবং আন্দোলন পরিচালনা কারীদের অন্যতম ছিলেন। ফলে তাকে এম.এল কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরপর তিনি আর পড়ালেখা করেন নি।

কর্মজীবন:

আলীগড় কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর তিনি ১৯১২ সাল পর্যন্ত বেকার ছিলেন। ১৯১২ সালে তার চাচা খান বাহাদুর মুমতাজ উদ্দিন এর সুপারিশে লর্ড মিল্টন তাকে 'নায়েবে তাহসীলদার' পদে চাকরি দেন। এ পদে যোগদানের মাধ্যমে তিনি কর্মজীবনের প্রারম্ভিকা করেন। পরবর্তীতে তার পদোন্নতি হলে তিনি 'ডেপুটি কালেক্টর' পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ সালে ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।[২২] তিনি আলীগড় ইউনিভার্সিটি কোর্টের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

সাহিত্য জীবন:

সুলতান হায়দার জোশ ছাত্র অবস্থায়ই উপন্যাস লিখার মাধ্যমে লেখক হিসেবে আত্ম প্রকাশ করেন। বলা হয় যে, উর্দু প্রাথমিক যুগের উপন্যাস লেখক ছিলেন সুলতান হায়দার জোশ। তিনি একজন সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। তিনি ইংরেজ সভ্যতার খারাপ দিকগুলোকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু করেন এবং ভারতকে পশ্চিমের ভয়াবহতা থেকে দূরে রাখতে প্রচেষ্ট চালান। তার প্রথম প্রবন্ধ মাওলানা শওকত আলী পত্রিকাতে সম্পাদিত হয়। এছাড়াও কমরেড, নাকিব প্রভৃতি পত্রিকাগুলোতে তাঁর প্রথম দিকের লেখাগুলো প্রকাশিত হয়।[২৩] এছাড়াও তার গুরু গম্ভীর এবং হাস্যরসাত্মক লেখা মাখজান, ওল্ড বয় এবং দৈনিক হামদার্দ এ প্রাকশিত হত। সুলতান হায়দার জোশ কবিতা লেখার চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু তিনি লেখালেখির ক্ষেত্রে কবিতাকে তেমন গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেননি। তিনি শিখপুর মুনতাছিম খান নবাব এর উপর একটি বই লিখেন। এটি একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক বই, যাতে তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীর, শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেবের সময়ের সমাজ চিত্র তুলে ধরেন।[২৪]

জোশ ইংরেজী সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উর্দু ভাষায় ছোটগল্প লিখতে শুরু করেন। তাঁর লেখা ছোটগল্পগুলো সে সময়ের জনপ্রিয় সাহিত্য পত্রিকাগুলোতে নিয়মিত প্রকাশিত হত। তার প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প *'নাবিনা বিবি'* (نابینا بیوی) মাখযান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও তার অন্যান্য রচনাবলীগুলো হল-

[২২] ড. সৈয়্যেদ ইজাজ হুসাইন, *মুখতাছের তারিখে আদবে উর্দু*, উর্দু কিতাব ঘর, দিল্লি, পৃ. ২৫৫।
[২৩] ড. মাছয়ুদ রেজা খাকি, *উর্দু আফছানে কা এরতেকা*, বারায়ী উর্দু, পাঞ্জাব, ১৯৭০, পৃ. ৯৭।
[২৪] ড. আবু সায়্যেদ নূর-উদ্দীন, *তারিখে আদবে উর্দু*, মাগরিবে পাকিস্তান উর্দু একাডেমী, লাহোর, ১৯৯৭, পৃ. ৩৫০-৩৫১।

১. *ফাসানা জোশ* (فسانہ جوش) : ৬টি ছোটগল্প ও ৯ টি প্রবন্ধ সম্বলিত বইটি লখনৌ আলনাজির প্রেস থেকে ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়।

২. *জোশ ফিকির* (جوش فکر) : ৫টি ছোটগল্প ও ৬ টি প্রবন্ধ সম্বলিত বইটি আলীগড় ডিস্ট্রিক গেজেট প্রেস থেকে ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. *ছবর কি দেবী* (صبر کی دیوی) : এই গল্প গ্রন্থটি আগ্রা আজিজি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

৪. *মুসাওয়াত* (مساوات)

৫. *ইত্তেফাকাত যামানা* (اتفاقات زمانہ)

মৃত্যুকাল:

অবসর গ্রহণের পর জোশ আলীগড়েই বাকি জীবন কাটান। শেষ বয়সে তার শ্রবণ শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সুলতান হায়দার জোশ ১১ মে, ১৯৫৩ সালে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে আলীগড়েই ইন্তেকাল করেন।[২৫] তাকে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

---

[২৫] প্রফেসার নুরুল হুসাইন নকবী, *তারিখে আদবে উর্দু*, এডুকেশন বুক হাউজ, আলীগড়, ২০০৪, পৃ. ৩৫১।

আলী আব্বাস হুসাইনী

জন্ম পরিচিতি:

আলী আব্বাস হুসাইনী উর্দু সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, ছোট গল্পকার এবং সমালোচক ছিলেন। তিনি ১৮৯৭ সালে ভারতের গাজীপুর পেয়ারা নামক স্থানে জন্ম গ্রহন করেন। তার পিতা ছিলেন সাদাত মৌলবী।[২৬]

শিক্ষাজীবন:

প্রাথমিক শিক্ষা পিতা-মাতার কাছেই শিখেন। অত:পর মাদরাসায় আরবী এবং ইসলামিয়্যাত শিক্ষা গ্রহণ করেন। মাদরাসায় ধর্মীয় শিক্ষার্জনের পাশাপাশি তিনি নামাজ, রোযায় নিয়মিত অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। এমতাবস্তায় পরিবার তাকে ইংরেজী শিক্ষারও অনুমতি দেন। ১৯১৫ সালে এলাহাবাদ খৃষ্টান কলেজ থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯১৭ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন।[২৭] ১৯১৯ সালে তিনি লখনৌর কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। ১৯২১ সালে এলাহাবাদ টিচার ট্রেনিং কলেজ থেকে এল. টি পাশ করেন। সর্বশেষ তিনি ১৯২৪ সালে এম. এ পাশ করেন।

কর্মজীবন :

১৯২১ সালে এল টি ডিগ্রি অর্জনের পরে তিনি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। সারা জীবন তিনি শিক্ষার সাথেই জড়িত থাকেন। অত:পর ১৯৫৪ সালে প্রিন্সিপালের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

সাহিত্য জীবন:

আলী আব্বাস হুসাইনী কল্প কাহিনীর প্রতি প্রবল আগ্রহ রাখতেন। মাত্র দশ এগারো বছর বয়সে উর্দুতে 'আলীফ লায়লা' মুখস্ত করে ফেলেন। মহাকবি ফেরদৌসের অমরগ্রন্থ 'শাহনামা' তিনি সাতবার অধ্যায়ন করেন। ঐ সময় আব্দুল হালীম শারার এবং মুহাম্মদ আলী তীবের সাহিত্য যথেষ্ট প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। আলী আব্বাস হুসাইনী চোখের অন্তরালে এ দুইজন সাহিত্যিকদের প্রায় সব গ্রন্থই পড়ে ফেলেন। তিনি ১৯১৭ সালে তার প্রথম ছোটগল্প *'গুনচাহ না শাগুফতাহ'* লেখেন। ১৯২০ সালে প্রথম রোমান্টিক উপন্যাস *'স্যার সৈয়দ আহমদ পাশা'* সম্পূর্ণ করেন।

---

[২৬] প্রফেসার নুরুল হুসাইন নকবী, *তারিখে আদবে উর্দু*, এডুকেশন বুক হাউজ, আলীগড়, ২০০৪, পৃ. ৩৫৩।
[২৭] ড. সৈয়েদ ইজাজ হুসাইন, *মুখতাছের তারিখে আদবে উর্দু*, উর্দু কিতাব ঘর, দিল্লি, পৃ. ২৫৭।

আলী আব্বাস হুসাইনী প্রায় ১৯ টি ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস, সমালোচনা সাহিত্য রচনা করেন। নিম্নে তার ছোটগল্পগুলো তুলে ধরা হলো-

১. *আই-সি-এস আওর দুছরে আফছানে* (آئی۔سی۔ایس اور دوسرے افسانے): ১৪টি ছোটগল্প সহ ইন্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ থেকে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়।

২. *বাসি ফুল* (باسی پھول) : ১৪ টি ছোটগল্প সহ মাকতুবা মাকতুবায়ে উর্দু, লাহোর থেকে ১৯৩৯ সালে প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় সংস্করন চৌধুরী একাডেমি, লাহোর থেকে এবং তৃতীয় সংস্করণ ছলিম ব্রাদার্স রবিন্দ্র স্বরণী, কলকাতা থেকে ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. *রফিক তানহাই* (رفیق تنہائی) : মাকতুবায়ে উর্দু, লাহোর থেকে ১৯৪২ সালে প্রথম সংস্করণ এবং দ্বিতীয় সংস্করন নয়া আদারাহ, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

৪. *হামারা গাও আউর দুছরে আফছানে* (ہمارا گاؤں اور دوسرے افسانے): ১০টি ছোটগল্প সহ ইস্ট পাবলিকেশন হাউজ নম্বর ০৩ আবাদ পার্ক, লাখনৌ থেকে ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়।

৫. *নদীয়া কিনারে* (ندیا کنارے) : দিল্লী থেকে ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়।

৬. *কানটুন মে ফুল* (کانٹوں میں پھول) : উর্দু একাডেমি, সিন্ধি, করাচী থেক প্রকাশিত হয়।

৭. *মেলা ঘুমনে* (میلہ گھومنے) : মাকতুবায়ে উর্দু, লাহোর থেকে প্রথম সংস্করণ এবং দ্বিতীয় সংস্কারণ নয়া আদারাহ, সরকার রোড, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

৮. *ইয়েহ কুচ হাঁছি নেহি হ্যায়* (یہ کچھ ہنسی نہیں ہے)

৯. *উলজেহি ধাঁগে* (الجھے دھاگے)।[২৮]

মৃত্যুকাল:

১৯৬৯ সালে আলী আব্বাস হুসাইনী মৃত্যু বরণ করেন।[২৯]

---

[২৮] ড. মির্জা হামিদ বেগ, *উর্দু আফসানুকি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০* ,একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৩২১-৩২২।

[২৯] প্রফেসার নুরুল হুসাইন নকবী, *তারিখে আদবে উর্দু*, এডুকেশন বুক হাউজ, আলীগড়, ২০০৪, পৃ. ৩৫৩।

ইমতিয়াজ আলী তাজ

জন্ম ও পরিচিতি:

১৩ অক্টোবর, ১৯০০ সালে লাহোরে ইমতিয়াজ আলী তাজ জন্ম গ্রহণ করেন। উর্দু নাটকে অসামান্য অবদানের জন্য 'শামস-উল-উলামা' (জ্ঞানের সূর্য) উপাধি পান। তার পূর্বপুরুষরা ১৯৫৭ সালে বিদ্রোহের পর লাহোরে চলে আসেন। তার পিতার নাম মৌলভী মুমতাজ আলী ও মাতা মোহাম্মদি বেগম। [৩০] ইমতিয়াজের মাতা ছিলেন 'মুছির-ই-মাদীর' এর সম্পাদক। ইমতিয়াজের স্ত্রী হিজাব ইমতিয়াজ আলী ভারতীয় উপমহাদেশে তার সময়ের প্রথম ও প্রধান গল্পকার ছিলেন।

শিক্ষাজীবন:

তিনি গর্ভমেন্ট কলেজ, লাহের থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এম.এ ইংরেজী বিষয়ে ভর্তি হন কিন্তু চূড়ান্ত পরীক্ষায় তিনি অংশ গ্রহণ করেননি।

কর্মজীবন :

লাহোরে পড়াশুনা শেষে ইমতিয়াজ প্রথমে তার বাবার প্রকাশনা সংস্থা 'দারুল ইসহাত' এ কাজ শুরু করেন। এছাড়াও তিনি লাহোর আর্ট স্কুল তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ১৯৫৮ সালে 'মজলিস' নামক একটি অনুবাদ বোর্ডের পরিচালক ছিলেন। সেখানে তিনি উর্দু সাহিত্যের কাজগুলো পুন:প্রকাশ করেন। তিনি অভিনেতা এবং পরিচালক হিসেবে থিয়েটারে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর সৈয়দ ইমতিয়াজ আলী তাজ রেডিও পাকিস্তানের 'পাকিস্তান হামারা হায়' অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। এটি কয়েক বছর ধরে জনপ্রিয় রেডিও প্রোগ্রাম হিসাবে অব্যাহত ছিল। তিনি তাজ প্রোডাকশন্স লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করেন। তাতে চলচ্চিত্রের জন্য গল্প, স্ক্রিন প্লে এবং ডায়ালগ লেখার মাধ্যমে চলচ্চিত্রে জোরালো অবদান রাখেন।

সাহিত্য জীবন:

কলেজ জীবন থেকে ইমতিয়াজ সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কর্মকান্ডে খুব সক্রিয় ছিলেন। তিনি থিয়েটার এবং মুশায়ারাতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তিনি একজন নাট্যকার, অনুবাদক, ছোটগল্পকার, সাংবাদিক, চিত্রনাট্য লেখক, চলচ্চিত্র প্রযোজক ছিলেন। এতে বুঝা যায়, তিনি উর্দু ভাষায় অনেক কাজ করে গেছেন। আনুমানিক তাঁর ১০০টিরও বেশী বই প্রকাশিত হয়েছে।

---

[৩০] মোহাম্মদ আনিসুল হক, *আদবি সাখসিয়াত*, কাফ কিতাব ঘর- ৩৯ পেট্রুওয়াটুন, ঢাকা, পৃ. ২২৯।

মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি প্রথম ছোটগল্প *'শামা আওর পায়ওয়ানা'* লিখেন। তিনি কলেজ জীবনেই বিভিন্ন ইংরেজী নাটক অনুবাদ এবং নির্দেশনার কাজে সাহিত্যিক গুনাবলী দেখিয়েছেন। যখন মেয়েরা অভিনয়ের ব্যাপারে উৎসাহিত হত না তখন তিনি নিজে বিভিন্ন নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন। *'ফুল'* এর প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি তার সময়কালীন বিখ্যাত ছোটগল্পকার লেখক গোলাম আব্বাস এবং তরুণ লেখক আহমেদ নাদিম কাসিমীর সাহায্য নিয়ে ছিলেন। ১৯১৮ সালে তিনি তার বন্ধু আব্দুল মাজিদ মালিকের সহযোগীতায় 'কাহকাশান' পত্রিকা বের করেন। যার মাধ্যমে মাত্র ১৮ বছর বয়সে তার সাংবাদিকতা জীবন শুরু হয়। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি তা নিজস্ব পরিচয়ে প্রকাশ করেন।

১৯২২ সাল ইমতিয়াজ আলি রচনা করেন ঐতিহাসিক মহাকাব্য *'আনারকলি'*।[৩] এই গল্পে দেখা যায়, আনারকলি একজন রাজ প্রাসাদের নর্তকি, দাসীর কন্যা। তিনি শাহজাদা সেলিমের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং শেষ মুহূর্তে এই প্রেমের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। তার এই রচনাকে বলা হয় 'উর্দু নাটক কাহিনীর ইতিহাসে একটি মাইল ফলক'। তিনি ১৯৩০ সালে এই নাটকটির কিছুটা পরিবর্তন আনেন, যা ১৯৩১ সালে পুন:মুদ্রনে সংযোজিত হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে ১৯৫৩ সালে আনারকলি এবং ১৯৬০ সাল মুগল-ই-আজম চলচ্চিত্র তৈরী হয়েছে। এর মাধ্যমে একজন উচ্চতর উর্দু সাহিত্যিক লেখক হিসাবে তিনি তুমুল জনপ্রিয়তার অর্জন করেন।

তিনি শেক্সপিয়ারের বেশ কিছু নাটক উর্দুতে অনুবাদ করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে- *'আমিদ সুদার ড্রিম'* তার উর্দু অনুবাদ *'শাওন রেইন কা সপ্না'*। ১৯২৬ সালে তিনি *'চাচা চাক্কান'* নামে একটি নাটক রচনা করেন। যা ইংরেজী নাট্যকার জেরোম এর *'আংকেল পদজার'* এর অনুরূপ। যাকে আজ পর্যন্ত উর্দু সাহিত্যের সবচেয়ে হাস্যকর চরিত্র হিসাবে গণ্য করা হয়।

এছাড়াও তিনি ক্লাসিকেল নাটক লিখেছেন ও সংগৃহিত নাটক সম্পাদনাও করেছেন। বিশেষ করে আরাম, জায়েফ এবং রাউনাক এর মতো ক্লাসিক নাটকের জন্য অনেক বাহবা পেয়েছিলেন। লাহোরের 'মজলিসে তারিখি আদাবে' কাজ করার সময় বেশ কয়েকটি নাটকের সংকলন খণ্ড তিনি প্রকাশ করেন। যা প্রাতিষ্ঠানিক থিয়েটারের পুনরুজ্জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ রাখে।

তাজ উপন্যাসের ব্যাপারে সমভাবে আগ্রহী ছিলেন। তিনি প্রবন্ধ এবং জীবনী গ্রন্থও লিখেছেন। জীবনী গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- মহাত্মা গান্ধীর জীবনী, পন্ডিত মতি লাল নেহেরুর উপর প্রবন্ধ যা ঐ সময়কালে অনেক প্রশংসিত হয়েছিল। এছাড়াও তিনি মুহাম্মদ হুসেন আজাদ, হাফিজ জালান্ধারী, শওকত থানভীর উপর প্রবন্ধ লিখেছেন। উর্দু ভাষায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি হচ্ছে-

---

[৩] মোহাম্মদ আনিসুল হক, *আদবি সাখসিয়াত*, কাফ কিতাব ঘর- ৩৯ পেট্রুওয়াটুন, ঢাকা, পৃ. ২৩০।

১. *আনারকলি* (*انار کلی*) : মাকতাবে জাদীদ, দিল্লী, ১৯৩১ সালে, স্যার সৈয়দ বুক ডিপু, আলীগড়, ১৯৬৯ সালে, পরিচালক কউমি কাউন্সিল বারায়ে ফারেঙ্গে উর্দু জবান, নিউ দিল্লী, ২০১১ সালে এছাড়া কয়েকটি প্রকাশনী ও বইটি প্রকাশ করেন।

২. *চাচা চাক্কান* (*چچا چھکّن*) : দারুল ইসাত পাঞ্জাব, লাহোর থেকে ১৯৪১ সালে এবং পরে কিতাবকার পাবিলিকেশন, রামপুর থেকে ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. *সৈয়দ ইমতিয়াজ আলী তাজ কে ইয়াক বাবী ড্রামে* (*سید امتیاز علی تاج کے یک بابی ڈرامے*): পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি লাহোর থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত হয়।

৪. *রেডিও, টেলিভিশন : কেমেরাও পোগ্রাম কি তায়ারি আউর পেশকাশি* (*ریڈیو۔ٹیلی ویثن: کمراں پروگراموں کی تیاری اور پیشکش*): আতিঅব পাবলিকেশন হাউজ, হায়দ্রাবাদ, ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয়।

৫. *কুরতুবান কা কাজী* (*قرطبہ کا قاضی*) : ছংঙ্গে মিল, লাহোর থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়।

৬. *বাচ্চু কে ড্রামে* (*بچوں کے ڈرامے*) : ওক্সফোর্ট থেকে ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয়।

৭. *ঘরেলো আজ মুদাহ নুছকন কা ইনসাইক্লোপিডিয়া* (Gharailo Azmuda Nuskhon Ka Encyclopedia): অক্সফোর্ট থেকে ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয়।

৮. *রেইল কাহানিয়া* (*ریل کہانیا*)

৯. *তাহজিবে নুছওয়া* (*تہذیب نسوان*) : দারুল আশায়অত পাঞ্জাব, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

১০. *বাচ্চু কে লিয়ে নয়ী পুরানি কাহানিয়া* (*بچوں کے لیے نئی پرانی کہانیاں*)

১১. *তায়রিফ আউর খেদমত* (*تعریف اور خدمت*) : মজলিস তারাক্কি আদব লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

১২. *উর্দু কা ক্লাসিকি আদব* : খুরশেদ (*اردو کا کلاسیکی ادب: خورشید*): (১ম খণ্ড) মজলিস তারাক্কি আদব লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

১৩. *উর্দু কা ক্লাসিকি আদব : আরাম কে ড্রামে* (*اردو کا کلاسیکی ادب: آرام کے ڈرامے*): (৬ষ্ঠ খণ্ড) মজলিস তারাক্কি আদব লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

১৪. *উর্দু কা ক্লাসিকি আদব : মুতাফারাক মুজিফিন কে ড্রামে* (اردو کا کلاسیکی ادب: متفرق مضفین کے ڈرامے) : (৮ম খণ্ড) মজলিস তারাক্কি আদব লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

ইমতিয়াজ আলী তাজকে নিয়ে প্রকাশিত বই:

১. *সৈয়দ ইমতিয়াজ আলী তাজ*, সাহাবিদ ও ফ্যান, গৌহর নওশাহির।
২. *ইমতিয়াজ আলী তাজ কি তামসিল সিনাসী*, মোহাম্মদ সালিম মালিক।
৩. *ইমতিয়াজ ঃ তাহকিক ও তানকীদ*, মোহাম্মদ মালিম মালিক।
৪. *তাজ কি ড্রামা আনারকলি পার এক নজর*, রুহাফজা রহমান।[৩২]

পুরস্কার:

১৯৫৫ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি কতৃক তিনি পারফরমেন্স পুরষ্কার পান।

মৃত্যুকাল:

১৯ এপ্রিল, ১৯৭০ সালে অজ্ঞাত হামলাকারী তাকে বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে। তার স্ত্রী হিজাব ইমতিয়াজ আলীও গুরুতর ভাবে আহত হন।

[৩২] Imtiyaz Ali Taj: 1900–1970, *World Cat Identities Organization*. Retrieved 31 October 2013.

জলিল কেদওয়ায়ী

জন্ম পরিচিতি:

জলিল আহমদ, সংক্ষিপ্ত নাম হল জলিল। সাহিত্যিক নামও জলিল কেদওয়ায়ী। আসল নাম ছিল জিল্লুর রহমান কেদওয়ায়ী। তিনি ১৬ মার্চ, ১৯০৪ সালে ভারতের আনাও (আউয়াদ) নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ উর্দু কবি হাসরাত মুহানীর বাড়ীর কাছাকাছি তার বাড়ী ছিল। এই কারনে হাসরাত মুহানির সাথে তার খুব সখ্যতা ছিল।[৩৩]

শিক্ষাজীবন:

জলিল কেদওয়ায়ী ম্যাট্রিক পর্যন্ত আনাও তথা আওয়াদে অবস্থান করেছেন। ১৯২৩ সালে বি.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯২৬ সালে উর্দু এম.এ ডিগ্রি অর্জন করার পর ১৯৩১ সালে উর্দু এম.এ ডিগ্রি অর্জন করার জন্য এলাহাবাদ ইউনিতে ভর্তি হন এবং ১৯৩৩ সালে প্রথম বিভাগে উর্দু এম.এ পাশ করেন। [৩৪]

কর্মজীবন:

জলিল কিদওয়ায়ী ১৯২২ সালে শিক্ষা অর্জনের জন্য আলীগড়ে যান। সেখানে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ছিলেন স্যায়েদ সাজ্জাদ হায়দার ইয়ালদারাম। ইয়ালদারামকে সকলেই মুরব্বি এবং উপকারী বলে জানতো। জলিল কেদওয়ায়ীর সহপাঠীদের মধ্যে খাজা মঞ্জুর হুসাইন এবং খাজা গোলাম স্যায়েদায়ীন এর নাম উল্লেখ করা যায় এবং তার ঐ সময় সেখানে অবস্থান করেছিলেন। খাজা মঞ্জুর হুসাইন এবং খাজা গোলাম স্যায়েদায়ীন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত আরবী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাদের পরে সম্পাদনার দায়িত্ব জলিল কেদওয়ায়ী গ্রহণ করেন। সে সময়ে খাজার দাস্তান এবং আম নাজীর নামক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ হত। ১৯২৩ সালে বি.এ ডিগ্রি অর্জন করার পরে জলিল কেদওয়ী কে জাফেরুল মিল্লাত আলবী নিজের পত্রিকায় আন-নাজীর সম্পাদনার জন্য লখনৌতে তাকে ডেকে আনেন। লখনৌ পৌছে জলিল কেদওয়ায়ী আন-নজীর পত্রিকায় উল্লেখ যোগ্য কয়েকটি সংখ্যা সম্পাদনা করেন। কয়েক মাসের মাথায় ইয়ালদারাম জলিল কেদওয়ায়ীকে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চাকুরির জন্য প্রস্তাব দেন। সে কারণে সকল কাজ কর্ম ছেরে জলিল কেদওয়ায়ী আলীগড়ে চলে যান। সেখানে তাকে ৬০-১০০ টাকা বেতন দেওয়া হত। প্রবন্ধ রচনা এবং কাব্য রচনার মাধ্যমে একজন পেশাদার লেখকের মত লাহোরের মাখজান, আলীগড়ের মারিফ, পিন্ডী বাহাউদ্দীনের সুফী এবং লাখনৌর

---

[৩৩] আবদুল কাদের ছুরুর, *জাদিদে উর্দু শায়েরী*, মাতবুয়অহ আলমগীর ইলেকট্রিক হাউজ, লাহোর, ১৯৪৫, পৃ. ৩৩৮।

[৩৪] ড. সৈয়্যেদ ইজাজ হুসাইন, *মুখতাছের তারিখে আদবে উর্দু*, উর্দু কিতাব ঘর, দিল্লি, পৃ. ২৬১।

নয়ে রঙ্গে খেয়ালের সাথে সংযুক্ত করা হয়। ১৯৩১ সালে যখন উর্দুতে এম.এ করার জন্য এলাহবাদ গেলেন, তখন আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর সারদাস মাসউদ শুধু দুই বছরের জন্য তার ছুটি মঞ্জুর করেননি বরং দুই বছরের জন্য নিজে জলিল কেদওয়ায়ীর জন্য বেতন মঞ্জুর করে দেন। ১৯৩৩ সালে জলিল কেদওয়ীকে আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি সিলেকসন কমিটির সদস্য ড. আল্লামা ইকবাল এবং সৈয়দ সুলায়মান নদবী বিরোধীতা সত্ব্যেও উর্দু বিভাগে প্রভাষক নিয়োগ করা হয় এবং তার মাসিক বেতন ১৫০ টাকা করা হয়। ১৯৩৬ সালে খান বাহাদুর সৈয়্যোদ নাজমুদ্দীন আহমদ, জাফরী, মাসীক ২০০-৩০০ রুপি বেতনে ভারত সরকারের তথ্য বিভাগের সরকারী পত্রিকা সম্পাদনের জন্য ডেকে নেন। [৩৫] এখানে জলিল কেদওয়ায়ী এর বেতন আগের থেকে বেশী নির্ধারণ করা হয়। ১৯৪০ সালে সহকারী তথ্য অফিসার হিসাবে জলিল কেদওয়ী বেতন ৪০০-৬০০ রুপি গিয়ে পৌছে। কিন্তু সাহিত্য চর্চার বিষয়ে এই আর্থিক উন্নতিটা নগণ্য বলা যায়। কেননা জলিল কেদওয়ায়ী যতটা সাহিত্য চর্চা করতে পারতেন, সেটা এখান করতে পারেননি। পাকিস্তান প্রতষ্ঠির পর তিনি করাচী চলে যান। সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর আঞ্জুমাসে তারাক্কী উর্দু (পাকিস্তান) করাচীর সাথে সম্পর্ক রাখার পাশাপাশি নিজের প্রতিষ্ঠিত রাজ মাসউদ এডুকেশন এণ্ড কালচার সোসাইটি করাচীর জন্য কাজ করতে থাকেন।

সাহিত্য চর্চা:

শৈশবকাল থেকেই সাহিত্যের প্রতি জলিল কেদওয়ায়ীর অনুরাগ জন্মে। ১৯৩০ সালে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ *‘নকশে ওয়া নিগার’* (نقش و نگار) আলীগড়ে প্রকাশিত হয়। [৩৬] আনাও এলাকায় বাসরত সুহানী, আজীজ ছফিপুরী এবং জগৎ মহৎ লালদের মত ব্যক্তিত্বরা বাস করতেন। আবার ঐ আনাওতে জিগার মুরাদাবাদী, আজগর গণ্ডবী, জাফর আলী খান আছর এবং আজীত লখনৌবী প্রায়ই সেখানে আসা যাওয়া করতেন। এভাবেই আনাওর পরিবেশ কাব্য চর্চার অনুকূল ছিল। জলিল কেদওয়ায়ী শিক্ষা জীবন থেকেই কাব্য রচনা করেন, যা বাদাইওনের নকিব পত্রিকায় এবং পন্ডিত বাহাউদ্দীনের সুফী পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল। জলিল কিদওয়ায়ীর উল্লেখযোগ্য বইগুলো নিম্নরুপ-

১. *ছায়েরে গুল* (سیر گل) : অনুবাদ মুলক ছোটগল্প, জামানা বুক এজেন্সি, কানপুর থেকে ১৯৩০ সালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়।

২. *এন্তেখাবে হাছরাত* (انتخاب حسرت) : গজল, আখতার পারেংটেঙ্গ ওয়ার্ক্স, আলীগড় থেকে ১৯৩১-৩২ সালে প্রকাশিত হয়।

---

[৩৫] জলিল কেদওয়ায়ী, *নুয়ায়ী ছিনাহ তাব*, নাজির পিন্টিং প্রেস, করাচী, ১৯৫১, পৃ. ১৪।
[৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

৩. *আছনামে খেয়ালী* (اصنام خیالی) : অনুবাদ মূলক ছোটগল্প, আখতার পারেংটেঙ্গ ওয়ার্ক্স, আলীগড় থেকে ১৯৩১-৩২ সালে প্রকাশিত হয়।

৪. *মুনা ওয়ানা* (مونا وانا) : নাটক, আখতার পারেংটেঙ্গ ওয়ার্ক্স, আলীগড় থেকে ১৯৩১-৩২ সালে প্রকাশিত হয়।

৫. *দেওয়ান বিদার* (دیوان بیدار) : (তাহকিকি), হিন্দুস্তান একাডেমী, এলাহবাদ থেকে ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়।

৬. *নকশে ওয়া নিগার* (نقش ونگار) : কবিতা ও গজল, ছাওয়াল প্রথমে ১৯৩০ সালে এবং পরে এজেন্ট ছাদেক বুক ডিপু, আলীগড় থেকে ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়।

৭. *হুছুন এন্তেখাব* (حسن انتخاب) : (তারতিব ওয়া তাহজীব) ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়।

৮. *কারনামাহ আদব* (کارنامہ ادب) : (তারতিব ওয়া তাহজীব) ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়।

৯. *নয়ায়ে ছিনাহ তাব* (نوائے سینہ تاب) : নাজির প্রিন্টিং প্রেস, করাচী, ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয়।

১০. *তানকিদি আওর খাকে* (تنقیدیں اور خاکے) : উর্দু একাডেমি সিন্ধি, করাচি থেকে ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়।

১১. *কালামে গালিব* (کلام غالب) : এটি করাচি থেকে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়।

১২. *কমছন মুজাহিদ আউর দুছরে কাহানিয়া* (کمسن مجاہد اور دوسرے کہانیاں) : করাচি থেকে ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়।

১৩. *চান্দ আকাবির চান্দ মুয়াছের* (چند اکابر چند معاصر) : ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয়।

১৪. *শুয়ারায়ে শোরিয়াত* (شعراء شعریات) : ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয়।

১৫. *তাজকিরে আওর তাবসিরে* (تذکرے اور تبصرے) : উর্দু একাডেমি সিন্ধি, করাচি থেকে ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়।

১৬. *মাকতুবাতে আব্দুল হক* (مکتوبات عبدالحق) : (তারতিব আওর তাহজিব), আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু, কারচি থেকে প্রকাশিত হয়।

১৭. *তাজকিরাহ শায়েরায়ী বদনাম* (تذکرہ شعرائے بدنام) : (তারতিব আওর তাহজিব), উর্দু একাডেমী, সিন্ধি, থেকে ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়।

১৮. *খেয়াবান মাছউদ* (خیابان مسعود)

১৯. *শোলায়ে মুছতাজিল* (شعلۂ مستعجل)

২০. *মামু জান* : নাটক (ماموں جان)

২১. *কাতরাতে শাবনম* (قطرات شبنم)

২২. *চশমায়ে আফতাব* (چشمۂ آفتاب)

২৩. *খাকাস্তান পুরআনাহ* (خاکستر پروانہ) : ওসামা সাকিব, ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়।

২৪. *স্ট্যান্ডার্ড ইংরেজী উর্দু ডিকসেনারী* (اسٹنڈرڈ انگریزی اردو ڈکشنری) : আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু, করাচি থেকে প্রকাশিত হয়। [৩৭]

মৃত্যুকাল:

১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ সালে রাওয়াল পিণ্ডিতে তিনি মারা যান। পরে তাকে করাচী থেকে স্থানান্তরিত করে অন্য জায়গায় দাফন করা হয়।

---

[৩৭] ড. মির্জা হামিদ বেগ, *উর্দু আফসানে কি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৩০২-৩০৩।

মজনুন গোরখপুরী

জন্ম পরিচিতি:

মজনুনের আসল নাম আহমদ সিদ্দিক, তবে তিনি মজনুন বা মজনুন গোরখপুরী নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। তিনি ১০ মে, ১৯০৪ সালে উত্তর প্রদেশের পালন্দাহ, বস্তি জেলার গোরখপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ফারুক দেবনা গোরখপুরী।[৩৮] তিনি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষক ছিলেন এবং মাওলানা মোহাম্মদ আলী জহর এর হামদর্দ পত্রিকার করামিষ্ট ছিলেন।

শিক্ষাজীবন:

তিনি গুরুখপুরের সেন্ট এন্ডুজ স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এখান থেকে তিনি ১৯২১ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে ইন্টার মিডিয়েট পাশ করেন। ১৯২৯ সালে তিনি গোরখপুর সেন্ট এন্ডুজ কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় যান এবং সেখান থেকে তিনি দারুস নিজামিয়াহ পাশ করেন। তিনি আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৪ সালে ইংরেজীতে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উর্দুতে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবন:

মজনুন গোরখপুরী জীবনের বেশী সময়ই কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেই অতিবাহিত করেছেন। ১৯৩২-১৯৩৫ সাল পর্যন্ত সেন্ট এন্ডুজ কলেজে ইংরেজী বিভাগে কর্মরত ছিলেন। ১৯৩৫ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ইংরেজীর প্রভাষক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৩৬-১৯৩৭ সাল পর্যন্ত মিয়া সাহেব জর্জ ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজ গুরুখপুরে ইংরেজীর ও মানতিকের প্রভাষক ছিলেন। এছাড়া তিনি সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ থেকে অক্টোবর ১৯৫৮ পর্যন্ত গোরখপুর বিশ্ববিদ্যলয়ের সভাপতি ও নভেম্বর ১৯৫৮ থেকে মে ১৯৬৮ পর্যন্ত আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগ কতৃক পরিচালিত 'আলীগড় ঐতিহাসিক সাহিত্য লেখক' এর সহকারী পরিচালক ছিলেন। ১৯৬৭ সালে তিনি পাকিস্তান গমন করেন এবং করাচীতে বসবাস করতে থাকেন। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি আঞ্জুমানে তারাক্কিয়ে পছন্দিদাহ এর সদস্য ছিলেন।

---

[৩৮] ড. মির্জা হামিদ বেগ, উর্দু *আফসানুকি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৩০৯।

সাহিত্যে অবদানঃ

মজনুন গোরখপুরী প্রগ্রেসিভ রাইটার্স আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে এর সাথে যুক্ত হন। মজনুন গোরখপুরী সাহিত্যিক জীবনের শুরুতে মজনুন ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি ছোটগল্প এবং সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ লিখেন।[৩৯] তার প্রথম ছোটগল্প *জায়েদি কা হাশর* (زیدی کا حشر) ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৩১ সালে তিনি আইউয়ান নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা বের করেন।[৪০] তিনি জীবনের বেশির ভাগ সময় গুরুখপুর এবং আলীগড়েই কাটান। ১৯৬৭ সালের দিকে তিনি পাকিস্তানে চলে যান এবং করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৮ সালে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। মজনুন গোরখপুরী একজন বহুমুখী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি উর্দু সাহিত্যের ছোটগল্প, উপন্যাস, সমালোচনা মূলক গ্রন্থের পাশাপাশি বিশ্লেষণ ধর্মী গ্রন্থ সহ প্রায় ৩৫টি বই সংকলন করে গেছেন। তার উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পগুলো হলো-

১. *জায়েদি কা হাশর* (زیدی کا حشر) : উর্দু একাডেমী, নাগপুর থেকে ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়।

২. *হাতিয়া আওর দুছরে আফসানে* (ہتیا اور دوسرے افسانے) : হালি পাবলিশার্স হাউজ, লাখনৌ থেকে ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. *মাজনুন কে আফসানে* (مجنوں کے افسانے) : হালি পাবলিশার্স হাউজ, লাখনৌ থেকে ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়।

৪. *ছগুয়ার সবাব* (سوگوار شباب) : অনূদিত ছোটগল্পটি আইওয়ান আসায়াত, গুরখপুর থেকে ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয়।

৫. *জওয়াব ওয়া খেয়াল* (خواب وخیال) : সিদ্দিক বুক হাউজ, আলীগড় এবং আঞ্জুমান, লাখনৌ থেকে ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়।

৬. *ছের নওসাত* (سرنوشت) : রজাকি মেশিন প্রেস, হায়দারাবাদ থেকে ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়।

৭. *ছয়্যেদে যাবুঁ* (صیدزبوں) : অনূদিত ছোটগল্প টি আইওয়ান আসায়াত, গুরখপুর থেকে ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়।

---

[৩৯] আবদুল কাদের ছুরুর, *জাদিদে উর্দু শায়েরী*, মাতবুয়অহ আলমগীর ইলেকট্রিক হাউজ, লাহোর, ১৯৪৫, পৃ. ৩৪৪।
[৪০] ড. আবু সায়েদ নূর-উদ্দীন, *তারিখে আদবে উর্দু*, মাগরিবে পাকিস্তান উর্দু একাডেমী, লাহোর, ১৯৯৭, পৃ. ৩৫৯।

৮. *সরাব* (سراب) : আদারাহ আসায়াত উর্দু, হায়দারাবাদ থেকে ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হয়।

৯. *সমন পোশ আওর দুসরে আফসানা* (سمن پوش اور دوسرے افسانے) : ০৬ টি ছোটগল্প সহ প্রথম সংস্করণটি কিতাব খানা এলমে আদব, দিল্লী থেকে ১৯৩৪ সালে এবং দ্বিতীয় সংস্করণটি ১৫২ পৃষ্ঠা সহ ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়।

১০. *নকশে নাহিদ* (نقش ناہید) ।[৪১]

অনুবাদ মূলক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো-

১. উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের *কিং লেয়ার* গল্পটি উর্দুতে অনুবাদ করেন।
২. জন মিল্টন কর্তৃক *স্যামসন এ্যাগোনস্টেস* গল্পটি তিনি *শামসুল মুভারিজ* নামে অনুবাদ করেন।

সামালোচনা মূলক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো:

১. *আফসানাহ* (افسانہ) : আইওয়ান আসওয়াত, গোরখপুর থেকে ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়।

২. *আদাব আওর জিন্দেগী* (ادب اور زندگی): মজনুন গোরখপুরী কি চান্দ তাকীদাহ কা মাজমু'আহ, তারসীপ-ওয়া-ইজাপ কে পাথ, আইওয়ান আসওয়াত, গোরখপুর থেকে ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. *তানকীদী হাশিয়ে* (تنقیدی حاشے) : তানকিদি মাজমিন কা মাজমুআহ্, আদারাহ আসায়াত উর্দু, হায়দারাবাদ দকিন থেকে ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হয়।

৪. *ইকবাল* (اقبال): জিমালী তাবসীরাহ, ছনগম পাবলিশার্স হাউজ, এলাহাবাদ থেকে ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৫. *নুকুশ-ও-আফকার* (نقوش وافکار) : ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়।

৬. *তারিখে জামালিয়াত* (تاریخ جمالیات) : আঞ্জুমান তারাক্কি উর্দু (হিন্দি), দিল্লী থেকে ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়।

৭. *শের আওর গজল* (شعر و غزل) : ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়।

---

[৪১] ড. মির্জা হামিদ বেগ, *উর্দু আফসানুকি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৩১০।

৮. *গজল সারা* (غزل سرا) : ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়।

৯. *গালিব* : শখ্‌ছ আওর শায়ের (غالب: شخص اور شاعر) : মাকতাব্‌াহ-ই-আরবি কালাম, করাচি থেকে ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। [৪২]

পুরস্কার এবং স্বীকৃতি:

মজনুন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক তামাম-ই-ইমতিয়াজ (বিশেষ পদক) পদক লাভ করেন।

মৃত্যুকাল:

৪ জুন ১৯৮৮ সালে তিনি পাকিস্তানের করাচীতে (সিন্ধী) মারা যান। পরে তাকে সাকি হাসান কবরস্থানে দাফন করা হয়।

[৪২] ড. মির্জা হামিদ বেগ, *উর্দু আফসানুকি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৩১১।

রশিদ জাহান

জন্ম পরিচিতি:

রশিদ জাহান বিংশ শতাব্দীর উর্দুর একজন ভারতীয় নারী লেখিকা, যিনি নারীদের জন্য উর্দু সাহিত্যে একটি নতুন যুগের সূচনা করেন। তিনি ছোটগল্পকার ও নাটক লেখিকা ছিলেন। রশিদ জাহান ২৫ আগস্ট ১৯০৫ সালে আলীগড়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তবে তাঁর কলমী নাম রশিদ জাহাঁ অথবা ডাক্তার রশিদ জাহাঁ। তাঁর পিতার নাম শেখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম বেগম ওয়াহিদ জাহাঁ।[৪৩] তিনি তাঁর পিতা-মাতার পাঁচ সন্তানের মধ্যে জেষ্ঠ্য সন্তান ছিলেন। রশিদ জাহানের পিতা শাইখ আব্দুল্লাহ এবং মাতা ওয়াহেদ জাহাঁ বেগম সে সময়ের নামকরা সামাজিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। শাইখ আব্দুল্লাহ 'মুসলিম গার্লজ স্কুল আলীগড়' এবং 'উইমেন্স কলেজ আলীগড়' এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তারা দুইজনই নারী শিক্ষার অন্যতম ধারক ও বাহক ছিলেন।

শিক্ষাজীবন:

রশিদ জাঁহার পিতা আব্দুল্লাহ আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 'উমেন্স মুসলিম গার্লস কলেজে' নামে একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে রশিদ জাহাঁ তার প্রাথমিক শিক্ষা জন্য সেখানেই পড়ালেখা শুরু করেন।[৪৪] ১৯২২ সালে ঐ কলেজ থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। পরে আলীগড় ত্যাগ করেন এবং লখনৌতে চলে আসেন। সেখানে তিনি আজাবেলা থুবরান কলেজ থেকে ১৯২৪ সালে তিনি এফ.এস.সি পাস করেন এবং ১৯৩১ ও ১৯৩২ সেশনে তিনি দিল্লির মহিলা হার্ডিঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং সেখানে থেকে এম.বি.বি.এস পাস করেন। তিনি একজন স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রশিক্ষণ নেন। ১৯৩৪ সালে ১৪ অক্টোবর মাহমুদ আল জাফরকে বিবাহ করেন।

কর্মজীবন:

কর্ম জীবনে রশিদ জাহান ছিলেন একজন চিকিৎসক। তিনি দিল্লির 'লেডি ডাপরন হাসপাতালে' প্রাদেশিক চিকিৎসা পরিষদে যোগদান করেন। তিনি উত্তর ভারতের ছোট ছোট শহরগুলোতে যেমন কানপুর, মিরাট, বুলন্দ শহর, বারানসি, লাখনৌর কুইন মেরি হাসপাতালে ইত্যাদি স্থানে কাজ করেন। এছাড়াও তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে একজন সক্রিয় সদস্য এবং প্রগতি লেখক সমিতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অনেকগুলো রাজনৈতিক

---

[৪৩] মুহাম্মদ কাছিম সিদ্দিকী, *খাওয়াতিন কে নুমায়েন্দহ আফছানে*, এডুকেশনাল বুক হাউজ, আলীগড়, ২০১৪, পৃ. ৪৬।

[৪৪] *The Hindu, Rashid Jahan: Rebel With a Cause,* Retrieved 19 July 2018.

দলের সাথে একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। ভারতীয় পিপলস থিয়েটারেরও একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন রশিদ জাঁহা। তিনি উর্দু সাহিত্যে প্রথম নারী লেখক, যিনি ভারতীয় সমাজে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীদের সমস্যা গুলোকে সুস্পষ্ট ভাবে ও দৃঢ় ভাবে তুলে ধরেছেন। তার রাজনৈতিক দর্শন ছিল কমিউনিজম, নারীবাদ, জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা। তিনি তার দল কমিউনিস্ট পার্টির সহকর্মী বিপ্লবী মাহমুদ জাফরকে বিয়ে করেন।

রশিদ জাহান ১৪ আক্টোবর ১৯৩৪ সালে মাহমুদুজ জাফরকে বিবাহ করার পর হাসপাতালের চাকরি থেকে অবসর নেন। অত:পর অমৃতসরে এসে ব্যক্তিগত ভাবে ডাক্তারি প্রাকটিস শুরু করেন। ১৯৩৭ সালে স্বামী সন্তান সব কিছু ছেড়ে তিনি ইউরোপে চলে যান। যখন দেশে ফিরে আসেন তখন মাহমুদ জাফর চাকরি ছেড়ে দিয়ে রশিদ জাহাঁ এর সাথে দাহরাদুনে বসবাস করতে থাকেন। ঐখানে অবস্থান কালে রাশিদ জাহাঁ কিছুদিন ডাক্তারি প্রাকটিস করেন। যদিও তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজেই বেশী ব্যস্ত থাকতেন। রশিদ জাহাঁ এবং তার স্বামী মাহমুদ জাফর কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৪২ সালে তাঁরা উভয়ই লখনৌ চলে যান। রশিদ জাহাঁ এখানেও ব্যক্তিগত অনুশীলন চালু রাখেন এবং অল ইন্ডয়া রেডিও এর জন্য নাটক ও ফিচার লিখতেন।

সাহিত্যকর্ম:

বহুমুখী প্রতিভাধর রশিদ জাহাঁ ছিলেন উর্দু সাহিত্যের প্রথম নারী লেখক। ১৯৩১ সালে তার লেখা প্রথম গ্রন্থ *‘আঙ্গারে’* (انگارے) প্রকাশিত হয়। [৪৫] এটি ছিল প্রথা বিরোধী গল্পের সংকলন, সময় ব্যাপক সাড়া ফেলে। বইটিকে সর্ব ভারতীয় শিয়া কনফারেন্স লখনৌতে কুরুচি পূর্ণ এবং মুসলমান ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত বলে ঘোষণা করা হয়। বইটির বিরুদ্ধে ধর্মীয় নেতারা বিভিন্ন ফতোয়া দেয় এবং প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। রশিদ জাহান *‘আঙ্গারে’* বইটি প্রকাশের জন্য বৃটিশ সরকারের কাছে লিখিত ক্ষমা চান এবং বইটির অবিক্রিত কপিগুলো জমা দেন। বর্তমানে বইটির মাত্র পাঁচটি কপি সংরক্ষিত আছে। *‘আঙ্গারে’* (انگارے) বইটিতে লেখা দুটি ছোটগল্পের মধ্যে প্রথমটি *‘দিল্লী কি ছের’*। মাত্র তিন পৃষ্ঠার এই গল্পটিতে তিনি দেখিয়েছেন পর্দার আড়ালে নারীর জীবন ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান। আর দ্বিতীয় গল্পটি *‘পর্দে কে পিছে’* (*پردے کے پیچھے*) যেখানে তিনি ধনী এবং সম্ভ্রান্ত দুটি মুসলিম পরিবারের দু’জন মহিলার মধ্যে কথোপকথন তুলে ধরেছেন। তাঁর লেখার বেশ কিছু সংকলন *‘আওরাত আওর দিগার আফসানে’* এবং *‘ওহ আওর দোসরে আফসানে’* নামে ১৯৩৭ সালে লাহোরে একটি মাসিক পত্রিকায় এবং ১৯৭৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এছাড়া রশিদ জাহাঁর অন্যান্য লেখাগুলোর মধ্যে *‘নয়ি বহু কি*

---

[৪৫] মুহাম্মদ কাছিম সিদ্দিকী, *খাওয়াতিন কে নুমায়েন্দহ আফছানে*, এডুকেশনাল বুক হাউজ, আলীগড়, ২০১৪, পৃ. ০৭।

নয়ি আইব, *‘ঘড়িবন কে ভগবান’ ‘পুলি’ ‘নয়ি মসিবত’* উল্লেখযোগ্য। এগুলো পাঠক সমাজে বেশ সমাদৃত হয়। তার ছোটগল্পগুলো নিম্নরুপ-

১. *আঙ্গারে* (انگارے) : এই বইটিতে রশিদ জাহাঁর দুইটি ছোট গল্প ছিল। প্রথমটি হল *‘দিল্লী কি ছের’* (دلّی کی سیر) আর দ্বিতীয়টি হল *‘পর্দে কে পিছে’* (پردے کے پیچھے) । যা ডিসেম্বর ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়।

২. *আউরাত আউর দিগার আফসানে* (عورت اور دیگر افسانے) : ৬ টি ছোটগল্প সহ ১১৪ পৃষ্টার এই বইটি হাসমি বেক ডিপু, দিল্লী থেকে নভেম্বর ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. *সুলায়ে জুয়ালাহ* (شعلۂ جوالہ) : ১১ টি ছোটগল্প সহ নামি প্রেস, লাখনৌ থেকে ১৯৬৮ সালে প্রকাশিতহয়।

৪. *ওহ্ আউর দুছরে আফসানে* (وہ اور دوسرے افسانے) : ১১ টি ছোটগল্প, নাটক এবং একটি প্রবন্ধ সহ ৩০৪ পৃষ্টার এই বইটি রশিদ জাহাঁ ইয়াদগার কমিটি, নয়া দিল্লি থেকে ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়।[৪৬]

মৃত্যুকাল:

১৯৪২ সালে রশিদ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবে ১৯৫০ সালে তাঁর ক্যান্সর ধরা পড়ে। উচ্চ চিকিৎসার জন্য তিনি ৫ জুলাই ১৯৫২ সালে রাশিয়ার মস্কোতে যান। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় ২৯ জুলাই, ১৯৫২ সালে মাত্র ৪৭ সাল বয়সে মারা যান।[৪৭] তাকে মস্কোর ওয়েডেন্সকী কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

---

[৪৬] ড. মির্জা হামিদ বেগ, উর্দু *আফসানুকি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৩৬৮।

[৪৭] মুহাম্মদ কাছিম সিদ্দিকী, *খাওয়াতিন কে নুমায়েন্দহ আফছানে*, এডুকেশনাল বুক হাউজ, আলীগড়, ২০১৪, পৃ. ৪৬।

কাউসার চাঁদপুরী

নাম ও বংশ পরিচিতি:

কাউসার চাঁদপুরীর আসল নাম সৈয়দ আলী। তাকে সৈয়দ আলী কাউসার অথবা কাউসার চাঁদপুরী নামে ডাকা হতো। কাউসার চাঁদপুরী ছিলেন একজন ভারতীয় ইউনানী চিকিৎসক এবং উর্দু লেখক যিনি উপন্যাস, ছোটগল্পকার ও সাহিত্য সামালোচক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। কাউসার চাঁদপুরী ১৪ আগস্ট, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের বজনৌর জেলার চাঁদপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।[৮] তাঁর পিতা আলী মুজাফ্‌ফর ইউনানী ঔষুধের ব্যবসায়ী ছিলেন।

শিক্ষা ও কর্মজীবন:

কাউসার চাঁদপুরী ভোপালের 'প্রিন্সেস আসিফা তিব্বিয়া কলেজে' ইউনানী ঔষুধের উপর পড়াশোনা করেন। তারপর তিনি ভোপালের ইউনানী শিফাখানা কলেজে শিক্ষকতা করেন। তিনি পার্লামেন্টের একজন সদস্য ছিলেন। তিনি 'আফসার-উল-আতিব্বা' হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি দিল্লিতে চলে যান। সেখানে হামদর্দ নাসিং হোমে যোগদান করেন।

সাহিত্য জীবন:

কাউসার চাঁদপুরী ছিলেন একজন প্রতিভাবান লেখক। তিনি ১৭টি উপন্যাস, ১৪টি ছোটগল্প, ৪টি সাহিত্য সমালোচনা মূলক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি উর্দু গদ্য সাহিত্যের একজন বাকপটু লেখক ছিলেন। তিনি এই ধারণা পোষণ করতেন যে, নৈতিকতার মানদণ্ডকে উন্নত করার জন্য ছোট গল্পকে অনুধাবন করা উচিত। মালিক রামের *যিকির-ই-গালিব* গ্রন্থের অনুকরণে লেখা *জাহান-ই-গালিব* বইয়ে তিনি গালিবের জীবন ও চরিত্রের অন্ধকারময় দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। তিনি ইউনানী চিকিৎসার অনুশীলন এবং ইতিহাসের উপরও অনেক প্রবন্ধ ও বই লিখেছেন। তিনি নবম শতকের একটি পাণ্ডুলিপি *'ড্যানিশ-নামা-ই-জাহান'* প্রকাশ করেন, যেটিকে পরবর্তীতে *'স্ট্যাজি ইন দি হিস্ট্রি অব মেডিসিন'* [১৯৮০] বইয়ের ৫৩-৫৬ নং পৃষ্ঠায় পুনঃস্থাপন কারা হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্মগুলো হল- *জাহান-ই-গালিব*, *আতিব্বা-ই-আহমদ-ই-মুঘলিয়া*, *রাআখ-অর-কালিয়ান*, *পাথার-কা-গুলাব*, *মুর্জহায় কালিয়ান*, *কারভান হামারা*, *হাকিম আজমল খান*, *ফিকর ও শুদর* এবং *দিদাহ-ই-বিন্না* ইত্যাদি। তার ছোটগল্পগুলো হলো-

---

[৮] ড. ওয়াহিদ কুরাইশি, *বেহতারিন ইনশায়ে আদব*, মাকতুবাহ উর্দু আদব, ১৯৬৪, পৃ. ১১৮।

১. *হানিমুন আউর দুছরে আফছানে* (ہنی موں اور دوسرے افسانے)

২. *দিলচিছপ আফসানে* (دلچسپ افسانی)

৩. *শুলায়ে সিঙ্গ* (شعلۂ سنگ) : হামদার্দ ফাউন্ডেসন, করাচি থেকে ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৪. *রঙ্গিন সপ্নে* (رنگین سپنے)

৫. *আউরাতু কে আফসানে* (عورتوں کے افسانے) : মাকতুবাহ উর্দু, লাহোর থেকে ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়।

৬. *দুনিয়া কি হুর* (دنیا کی حور) : মাকতুবাহ উর্দু, লাহোর থেকে ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়।

৭. *এশক্ ওয়া সুরুর* (اشک و شرر)

৮. *মুছকার আহটিন* (مسکراہٹیں)

৯. *দিলগাদাজ আফসানে* (دلگداز افسانے) : সিদ্দিক বুক ডিপু, লাখনৌ থেকে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়।

১০. *নুক ঝুংক* (نوک جھونک) : মুতবাহ উহুদ আফরিন, হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়।

১১. *জাম জম* (جام جم) : মুতবাহ উহুদ আফরিন, হায়দারাবাদ থেকে ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয়।

১২. *আওয়াজু কে ছালিব* (آوازوں کی صلیب)

১৩. রাত কা ছুরজ (رات کا سورج) : ২৯ টি ছোটগল্প সহ ওয়াছিম আখতার, দিল্লী থেকে ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয়।[৪৯]

মৃত্যুকাল:

কাউসার চাঁদপুরী ১৩ জুন, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের দিল্লিতে মারা যান। তাকে জামিয়াহ মালিয়াহ কবরস্থানে দাফন করা হয়।

---

[৪৯] ড. মির্জা হামিদ বেগ, *উর্দু আফসানে কি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৬৪২-৬৪৩।

গোলাম আব্বাস

জন্ম পরিচিতি:

গোলাম আব্বাস একজন খ্যতনামা ছোটগল্পকার ছিলেন। তার পূর্ব পুরুষরা উনিশ শতকের দিকে আফগানিস্তানে থেকে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের অমৃতসরে ১৭ নভেম্বর, ১৯০৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তার আসল নাম গোলাম আব্বাস আর এই নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ফার্সি, পাঞ্জাবি, উর্দু এবং ইংরেজী সহ বিভিন্ন ভাষা জানতেন। তিনি বংশীয় উপনাম ব্যবহার না করে নিজেকে গোলাম আব্বাস বলে পরিচয় দিতেন। তার পিতার নাম মিয়া আব্দুল আযীয।

শিক্ষাদীক্ষা:

গোলাম আব্বাস 'দয়াল সিংঙ্গ হাই স্কুল' লাহোর থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯৪৪ সালে এফ.এ পাশ করেন। তিনি বি. এ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে ছিলেন কিন্তু উত্তীর্ণ হতে পারেননি।

বিবাহিত জীবন:

গোলাম আব্বাস দাম্পত্য জীবনে দু'টি বিয়ে করেন। ১৯৩৯ সালে প্রথম স্ত্রী আলীগড়ের মেয়ে জাকির'কে বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রীর ঘরে ৫ সন্তান ছিল। তারপর ১৯৫২ সালে দ্বিতীয় স্ত্রী জেইনব'কে বিবাহ করেন। জেইনব খ্রিস্টান ছিলেন, পরে সে মাওলানা ইহতেশামুল হক থানবীর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। এই পক্ষেও আব্বাসী ৪-৫ সন্তানের জনক ছিলেন।

কর্মজীবন:

মাত্র ১৯ বছর বয়সে একজন সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক হিসেবে গোলাম আব্বাসের কর্মজীবনের সূচনা ঘটে। প্রথম দিকে গোলাম আব্বাস ফ্রিল্যান্সার সাংবাদিক হিসেবে হুমাউন, কারওয়ান, হাজার দাস্তান, আদবি লালিফ, নারাঙ্গে খেয়াল এবং শাহজাদা পত্রিকায় কাজ করেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি লেখালেখিও চালু রাখেন। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তিনি বাচ্চাদের প্রিয় রিসালা *'ফুল'* এবং নারীদের প্রিয় পরচা *'তাহযীবে নিসওয়া'* এর নায়েবে মুদির বা উপাধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেন। উল্লেখ্য যে, এ সময়ের মধ্যে লাহোরের *'দারুল ইশায়াত'* পত্রিকার মালিক এবং সাহিত্য জগতের এক সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব জনাব ইমতিয়াজ আলী তাজের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৩৮ সালে তিনি দিল্লীর 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' এর সাথে জড়িত হন এবং রেডিও এর পক্ষ

থেকে প্রকাশিত 'আওয়াজ' রিসালার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি একই সালে রেডিও থেকে হিন্দি ভাষায় 'সারেং' নামক আরো একটি রিসালা বের করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় তিনি পাকিস্তানে চলে আসেন এবং পাকিস্তান রেডিওতে যোগদান করেন। ১৯৪৮ সালে 'রেডিও পাকিস্তানের' ম্যাগাজিন 'আহাঙ্গ' এর সম্পাদনা করেন। ১৯৪৯ সালে কিছু দিন তথ্য ও প্রকাশ বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ে পাবলিক রিলেশন এর সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। একই বছরে বিবিসি লন্ডনে 'প্রোগ্রাম প্রডিওসর' হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫২ সালে দেশে ফিরে এসে তিনি আবারো 'আহাঙ্গ' পত্রিকায় কাজ করা শুরু করেন এবং ১৯৬৭ সালে এই পত্রিকা থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। গোলাম আব্বাস বিবিসিতে চাকরিরত অবস্থায় কিছুদিন ফ্রান্স এবং চীনে সময় কাটান।

সাহিত্যকর্ম:

গোলাম আব্বাসের ছোটগল্পের প্রিয় চরিত্র ছিল 'মানুষ'। তিনি তার গল্পে সমাজের সব ধরণের মানুষকে তুলে এনেছেন। ক্লার্ক, বিক্রেতা, স্যুইপার, সঙ্গীত শিল্পী, বেকার যুবক তাদের কষ্ট এবং সংগ্রাম যথেষ্ট বাস্তবতার সাথে তুলে ধরেছেন। মূলত তিনি পঞ্চাশের দশকের মানুষের মানসিক, সমাজিক, আবেগীয় অবস্থা বর্ণনা করেছেন। গোলাম আব্বাস উর্দু সাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ ছোট গল্পকার ছিলেন। মানুষ হিসেবে তিনি খুবই সাধারণ জীবন যাপন করতেন। যার কারণে তিনি জীবনকে অনেক কাছ থেকে দেখেছেন। তার গল্পের চরিত্রগুলোকে তিনি গ্রহণ করেছেন সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে। একই কারণে তার গল্পের চরিত্র চিত্রায়নে বহুমুখীরূপ দেখা যায়। উর্দু সাহিত্যে তার ছোটগল্পগুলির একটি স্বতন্ত্র শৈলী আছে। তার ছোটগল্প গুলোতে মানুষের দুর্বলতা, ভন্ডামি এবং দোষ ত্রুটি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর কখনো ব্যঙ্গাত্মক বা বিষাক্ত ভাবে তার লেখায় উচ্চারিত হয়নি। মানব প্রকৃতি তাদের চাপও আবেগ এবং মানব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা যা মানুষের জীবনকে সমাজের সামনে তুলে ধরে, তাই তাকে আকৃষ্ট করেছিল। তার বেশির ভাগ ছোটগল্পে একটি রোমাঞ্চকর গল্প বলার পরিবর্তে চরিত্রের অভ্যন্তরীণ রূপ ও বিবর্তনের চূড়ান্ত রূপ দিয়েছেন।

গোলাম আব্বাসের গল্পের চরিত্রগুলোর ভিতর গভীর সামাজিক সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। তার দর্শন-চিন্তা ছিল ইতিবাচক এবং গঠনমূলক। লেখকের প্রিয় বিষয়বস্তু ছিল সমাজের নিচু এবং মধ্যম শ্রেণীর মানুষের অর্ন্তমুখী বিভিন্ন সামাজিক বিষয়বস্তু ও সমস্যা ঘটনাবলী। জীবন সচেতনতার প্রতিপাদ্যই তার লেখনীতে ফুটে উঠেছে। তিনি পরিশ্রম এবং সততার সাথে কাজ করে গেছেন। তার ছোটগল্পের মাঝে প্রাণবন্তর, বাস্তববোধ এবং সহানুভূতিশীল মন ও জীবন প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠে। সমালোচনার দিক দিয়ে গোলাম আব্বাস হচ্ছেন সাধারণ মানুষের লেখক। তিনি সাধারন মানুষের গল্প লিখেছেন এমনকি শ্রমিক দিন মজুরদের জীবনী তার লেখনীতে তুলে এনেছেন। যাদের অস্তিত্ব সমাজের ধনী শ্রেণী স্বীকার করেনা তাদের দিকে কেই লক্ষ্য করে না, সত্যিকার অর্থে তারা সম্মান ও ভালবাসার দাবীর অধিকার তাদের মানায় না।

গোলাম আব্বাস তার ছোটগল্প লেখার ব্যাপারে ছিলেন স্পষ্টবাদী। তিনি সব শ্রেণীর পাঠকের সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। গোলাম আব্বাস একজন নৈতিক মানদণ্ড সম্পন্ন ছোটগল্পকার ছিলেন। তিনি নিজে কখনো লেখায় ভুল চিত্র তুলে ধরেননি এবং কখনো অন্যায্যও অন্যায়ের সামনে মাথা নত করেননি। গোলাম আব্বাসের লেখনি বৈশিষ্ট্য ছিল সরল, প্রাঞ্জল এবং হালকা ছন্দময়। তার গল্পগুলো ধীরগতিতে এগিয়ে গেছে এবং স্বাভাবিক রুপে জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। বর্তমান শিক্ষা, চরমপন্থা তীব্রতার পরিবর্তে মৃদুতা ও স্নিগ্ধতা ফুটে উঠেছে। এভাবেই তিনি নিজেকে পরিচিত করেছেন। ১৯২২ সালে তিনি প্রথম ছোটগল্প লিখেন। তার প্রথম ছোটগল্পটির নাম ছিল *'বকরী'*।

তিনি তার লেখায় মানুষের প্রতি তেমন সহানুভূতি দেখাননি। কিন্তু তিনি মানুষের দুর্বলতা নিয়েও মজা করেননি। মূলত তিনি লেখার মাধ্যমে কোন প্রকার সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে চাননি। তিনি রাশিয়ান ছোটগল্পের প্রতি খুব অনুরাগী ছিলেন। বিশেষ করে চেখভ এবং গোর্কির কাজ পছন্দ করতেন। ১৫ বছর বয়সে তিনি প্রথমবার লিও তলস্তয়ের বিখ্যাত গল্প *'জিলা ওয়াত্বান'* অনুবাদ করেন। যা 'হাজার দাস্তান' ম্যাগাজিনে ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাস সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

গল্পের প্লট নির্মাণে গোলাম আব্বাস অসাধরন নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। গল্পের মধ্যমণি হিসেবে তুলে এনেছেন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা। যেমন *'কাটবা'* গল্পের 'শরীফ হুসাইন' এর চিত্র। *'ওভারকোট'* গল্পে মানুষের অধিকার আদায়ের প্রতিফলন। *'আনন্দী'* গল্পে নিজের শৈশব স্মৃতি তুলে ধরেছেন। গোলাম আব্বাস ছোটগল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস সহ প্রায় ১৫ টির বেশী সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পগুলো হলো-

১. *দুনিয়া কে শাহকার আফসানে* (دنیا کے شاہکار افسانے): অনুবাদিত ০৩ টি খণ্ডে আবরাহিমিয়া, এলাহবাদ থেকে ১৯২২-১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়।

২. *আল-হামরা কে আফসানে* (الحمرا کے افسانے): দারুল আসয়াত পাঞ্জাব, লাহোর থেকে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. *আনন্দী* (آنندی) : ১০টি ছোটগল্প সহ লাহোর থেকে ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়।

৪. *জারে কি চান্দনী* (جاڑے کی چاندنی) : ৪টি ছোটগল্প সহ সাজ্জাদ ইন্ড কামরান পাবলিশার্স, করাচী থেকে জুলাই ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়।

৫. *কান রাস* (کن رس) : ৯টি ছোটগল্প সহ আলমাশাল, লাহোর থেকে ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়।

৬. *ধংক* (دھنک) : সাজ্জাদ এন্ড কামরান পাবলিশার্স, করাচী থেকে জুন ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়।

৭. *জিন্দেগী-নাকাব-চেহরা* (*زندگی'نقاب'چہرہ*) : ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়।[৫০]

তিনি বাচ্চাদের জন্যও বই লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য বই গুলো হলো- *চান্দ কি বেটি* (چاند کی بیٹی) , চান্দ তারা (چاند تارا) , *ছুরিয়া কি ঘরিয়া* (ثریا کی گڑیا) , *বরফ কি বেটি* (برف کی بیٹی) । গোলাম আব্বাস নারীদের নিয়েও লিখেছেন। সমাজের নারী অবস্থা, তাদের প্রতি অবিচার এবং নির্যাতনের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। বিশেষ করে তার ছোটগল্প 'আনন্দী'র কথা এ প্রসঙ্গে বলা যায়, গল্পে তিনি নারী চরিত্রকে দৃঢ় ভাবে উপস্থাপন করেছেন। আর এই বিষয়ে তিনি ঝুকি গ্রহণ করতেও পিছপা হননি।

কবিতা তিনি বিশেষ ভাবে পছন্দ করতেন। কিন্তু তিনি কবিতায় তেমন সফল হতে পারেননি। তিনি একজন মুসলিম পরিবারের সন্তান ছিলেন। যদিও তার পূর্বপুরুষদের পছন্দ করতেন কিন্তু ধর্ম বিশ্বাসের বেলায় তিনি স্বাধীন চিন্তাচেতনার অধিকারী ছিলেন।

১৯৬৭ সালে তিনি *'হোটেল মহিঞ্জ-দারো'* নামে একটি গল্প লিখেন। যাতে তিনি পাকিস্তান সরকারের ঐতিহাসিক পরিণতি এবং সামাজিক অশান্তি এবং ধর্ম বিদ্বেষী হিসাবে তুলে ধরে ছিলেন। গোলাম আব্বাস রোমান্টিক লেখক ছিলেন না। এই বিষয়ে তার কোন আগ্রহও ছিলনা। তিনি বাস্তাববাদী লেখক ছিলেন। তিনি বাস্তব জীবন সংগ্রামের মাঝেই সৌন্দর্য খুজে পেয়েছেন।

পুরষ্কার লাভঃ

গোলাম আব্বাসের প্রথম ছোটগল্প *'আনন্দী'* ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। Panjab Advisory Board তাকে এই গল্পের জন্য পুরষ্কৃত করেন। তার দ্বিতীয় গল্প *'জারায়ে কি চান্দনি'* জন্য ১৯৬০ সালে পুরষ্কার পান। ১৯৬৭ সালে তিনি পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে সাহিত্যে অবদানের জন্য *'সেতারা-ই-ইমতিয়াজ'* পুরস্কার লাভ করেন।

বিদেশ ভ্রমনঃ

চাকরি কালীন এবং চাকরি পরবর্তী সময়ে গোলাম আব্বাস ফ্রান্স, স্পেন, কানাডা, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে ভ্রমণ করেন।

মৃত্যুকালঃ

চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর গোলাম আব্বাস করাচিতে বাকি জীবন কাটিয়েছেন। ১ নভেম্বর, ১৯৮২ সালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারনে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। এই মহান ব্যক্তিকে করাচির পি.এ.সি.এইচ কবরস্থানে কবরস্থ করা হয়।

---

[৫০] ড. মির্জা হামিদ বেগ, *উর্দু আফসানে কি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৪৯২-৪৯৩।

সাদাত হাসান মান্টো

জন্ম পরিচিতি:

মান্টোর জন্ম ১৯১২ সালের ১১ মে পাঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার সোমরালা গ্রামে। মান্টোর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন কাশ্মীরি পণ্ডিত। পণ্ডিত নেহেরু ও আল্লামা ইকবালের পূর্ব পুরুষেরাও ছিলেন কাশ্মীরি পণ্ডিত।[১] এ জন্য মান্টো গর্ববাধ করতেন। মান্টোর বাবা মিয়া গোলাম হাসান ছিলেন পাঁচ সন্তনের মধ্যে কনিষ্ঠ। মিয়া গোলাম হাসান পাঞ্জাব সরকারের ইনসাফ মহকুমার সাব জজ ছিলেন। মান্টোর মা সরদার বেগম মিয়া সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন। অমৃতসরে মান্টোর বাবা উকিলপাড়ায় থাকতেন। তাঁর বাবা মুন্সেফ হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন:

প্রাথমিক শিক্ষা অমৃতসর, লাহোর, আলীগড় এবং দিল্লির বিভিন্ন স্কুল থেকে গ্রহণ করেন। মান্টো অমৃতসর মুসলিম হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করতে ৪ বছর সময় লাগান। তিন তিন বার তিনি অকৃতকার্য হন। অবশেষে ১৯৩১ সালে অতি কষ্টে তৃতীয় বিভাগে পাশ করেন। প্রতিবারেই তিনি উর্দুতে ফেল করতেন। চতুর্থ বার যদিও তিনি পাশ করেন, তাও আবার উর্দুতে ফেল করেন।[২] মন খারাপ হওয়ায় শহরের ফজলুর দোকানে জুয়ার আড্ডায় নিয়মিত হাজিরা দিতেন। স্কুলে দুষ্টুমির জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল। পাড়ার ছেলেরা তাঁকে টমি বলে ডাকত।[৩] ইন্টারিমিডিয়েটের ছাত্র হিসেবে তিনি প্রথমবার অমৃতসর হিন্দু মহাসভা কলেজ ভর্তি হন ও পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেন। পরবর্তীতে এম.এ.ও কলেজে চলে আসলে সেখানেও তিনি ফেল করেন। শিক্ষক ও বাড়ির লোকজন তাঁর ওপর বিরক্ত ছিল খুবই। ১৯৩১ সালে কলেজে পাঠকালীন অবিভক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের অশান্ত পরিবেশে মান্টোর লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটে। ১৯৩২ সালে পিতার মৃত্যুর পর মান্টো আরো অসহায় হয়ে পড়েন। পরিবারের অর্থ কষ্ট লাঘবের জন্যে তখন থেকেই তিনি আয় উপার্জনের পথ খুঁজতে থাকেন। সে সময় তার্কিক লেখক আবদুল বারি আলিগের সঙ্গে মান্টোর সাক্ষাৎ ঘটে। এ সাক্ষাৎ সাদত হাসান মান্টোর জীবনে একটি মাইলফলক।[৪] দারুণ মানসিক চাপে পড়ে তাঁর বন্ধু উর্দু লেখক আবু সাঈদের সাথে শলা পরামর্শ করে আলীগড়ে পড়ার মনস্থ করেন। আবু সাঈদ কোরাইশিও এফএ পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন। তখন আলীগড়ে প্রগতিশীল কবি আলী সরদার জাফরির সাথে দেখা হলে নিজেকে কমরেড মান্টো হিসেবে পরিচয় দেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ম-কানুন ছিল কড়া। কিন্তু মান্টো কোনো নিয়ম-কানুনই মানতেন না। স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছিল না। এক্সরে রিপোর্টে যক্ষা ধরা পড়ে। তখনকার দিনে যক্ষা মরণব্যাধি।

---

[১] প্রফেসার নুরুল হুসাইন নকবী, *তারিখে আদবে উর্দু*, এডুকেশন বুক হাউজ, আলীগড়, ২০০৪, পৃ. ৩৫৬।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬।

[৩] নাছরুল্লাহ খান, *কেয়া কাফেলাহ জাতা হে*, মাকতুবাহ তাহজিব অ ফান, করাচী, ১৯৮৪, পৃ. ১৪৫।

[৪] *A new biography of Saadat Hasan Manto, Arunima Mazumdar, Times of India, 11 March, 2014.*

ডাক্তার তাঁকে স্বাস্থ্য নিবাসে গিয়ে বিশ্রামের পরামর্শ দেন। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় প্রবেশ নিষেধ করে দেন। অবশেষে মান্টোর বড় বোনের আর্থিক সাহায্যে কাশ্মীরের স্বাস্থ্যনিবাস বতুতে চলে যান। তিন মাস অবস্থানের পর সুস্থ হয়ে মান্টো অমৃতসরে ফিরে আসেন।

কর্মজীবন:

১৯৩৬ সালে অমৃতসর থেকে মান্টো মুম্বাই চলে আসেন। সেখানে নাজির লুভিয়ানভির সাপ্তাহিক 'মুসাব্বির'-এ মাত্র মাসিক ৪০ টাকা বেতনে সাংবাদিকতা শুরু করেন। তখন থেকে তাঁর কর্মজীবন শুরু। মুসাব্বির-এ তিনি চলচ্চিত্রের সমালোচনা লিখতেন। ৪ বছর পর মান্টো দিল্লি অলইন্ডিয়া রেডিওতে দেড়শ টাকা বেতনে চাকরি নেন। রেডিওর জন্য নিয়মিত কথিকা ও নাটক লিখতেন; যার ফলে তাঁর খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। অলইন্ডিয়া রেডিওতে কর্মরত থাকাকালে প্রখ্যাত উর্দু লেখক কৃষণ চন্দর, উপেন্দ্রনাথ আশক এবং দেবেন্দ্র সত্যার্থী প্রমুখের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। দেড় বছর পর অলইন্ডিয়া রেডিওর চাকরি ত্যাগ করে মুম্বাই চলে আসেন। সেখানে ফিলিমিস্তানে তিনশ টাকা বেতনে কাহিনিকার ও সংলাপ রচয়িতার চাকরি নেন। মুম্বাইয়ে মান্টো বেশ সম্মান অর্জন করেছিলেন কিন্তু টাকা পয়সার অভাবের কারনে তিনি জানুয়ারী ১৯৪৮ সালে লাহোরে আসেন। মান্টো বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রের কাহিনী রচনা করেন, তার মধ্যে 'গালিব' উল্লেখযোগ্য। মান্টো পাকিস্তান চলে যাওয়ার পর 'গালিব' ছবি নির্মিত হয় এবং রিলিজ হয়। 'গালিব' ছবিটি বক্স অফিস হিট করেছিল এবং ভারতীয় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে।

বিবাহ ও পরিবার পরিজন:

১৯৩৮ সালে তাঁর মা অমৃতসর থেকে মুম্বাই এলেন, মান্টোর থাকা, খাওয়া-দাওয়া বেহাল অবস্থা দেখে বিয়ের জন্য মেয়ে ঠিক করেন। কাশ্মীরি মেয়ে নাম সুফিয়া বেগম। মান্টোর তিনজন সৎভাই ছিলেন ব্যারিস্টার ও উচ্চশিক্ষিত। তবে বড় ভাইয়েরা কখনও মান্টোর খোঁজ-খবর নিতেন না। দৈনিক অভাবগ্রস্থ ছেলে, চাকরি অস্থায়ী, মদ্য পানে অভ্যস্থ জেনেও সুফিয়া বেগমের চাচা মান্টোর পারিবারিক অবস্থা জেনে ভাতিজিকে মান্টোর সাথে বিয়ে দিতে রাজি হন। বিয়ের সংবাদ জেনে মান্টোর মাথা ঘুরে যাওয়ার অবস্থা। মান্টোর সিনেমা কোম্পানির মালিক শেঠজিকে তাঁর অবস্থা জানালেন। শেঠজি দয়াপরবশ হয়ে মান্টোর স্ত্রীর জন্য শাড়ি, কাপড়, গয়না কিনে দিলেন। তাতে ব্যয় হয় পাঁচশ টাকা। ১৫-২০ জন আত্মীয় নিয়ে মে, ১৯৩৮ সালে নিকাহ অনুষ্ঠান সারেন তবে বউ ঘরে তুলতে তাঁর দেড় বছর সময় লেগেছিল। কনেকে ২৬ এপ্রিল, ১৯৩৯ সালে কোন এক ছুটির দিনে দুই কামরার ফ্ল্যাট ৩৫ টাকায়

ভাড়া করা ঘরে তুলে আনেন।[৫৫] মান্টোর তিন কন্যা নিঘাত, নুজহাত ও নুসরত। একটি ছেলে ছিল দেড় বছর বয়সে মারা যায়।

সাহিত্যকর্ম:

অমৃতসর মুসলিম হাই স্কুলে লেখাপাড়া করার সময় তিনি রাত দিন ইংরেজী উপন্যাস পড়তেন। সেখান থেকে প্লট নকল করে বন্ধুদেরকে শুনিয়ে বাহ বাহ নিতেন এবং একেবারে বিদেশী স্টাইলে ইংরেজী বলতে পারতেন। সে সময় অনেক উপন্যাস পড়ার জন্য তিনি কি না করতেন ? ঘর থেকে টাকা চুরি করতেন। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে ঋন নিয়ে উপন্যাসের বই কিনতেন। এমনকি তিনি অমৃতসর রেল স্টেশনের 'ডব্লিউ.এইচ. উয়েল' এর বুক স্টল থেকে বই চুরি করে ধরা পড়েন। পুলিশ যখন থানায় নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তিনি ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলে স্লোগান দেন। মানুষ মনে করতো- তিনি রাজনৈতিক বন্দী, তাকে ঘিরে ধরতো এবং পুলিশ তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হত। ১৯৩৬ সালে প্রেমচাঁদের বাস্তবধর্মী লেখা গল্প *'কফন'* দিয়ে উর্দু ছোটগল্পের আধুনিক ধারার যাত্রা শুরু, মান্টোতে এসে তা পূর্ণতা পায়। সালমান রুশদি মান্টোকে আধুনিক ভারতীয় ছোটগল্পের অবিতর্কিত শ্রেষ্ঠ রূপকার বলে আখ্যায়িত করেছেন। রুশদির এই বক্তব্যের সাথে দ্বিমত পোষণের কোনো উপায় নেই। মূলত অনুবাদের মাধ্যমে মান্টোর সাহিত্যজগতে প্রবেশ। ভিক্টর হুগোর *কয়েদির ডায়েরি* উর্দুতে অনুবাদ করেন। তারপর অস্কার ওয়াইল্ডের *বেয়ারা* উর্দুতে অনুবাদ করেন। মান্টো রুশ গল্পও অনুবাদ করেছেন। তিনি ফরাসি, ইংরেজী ও রুশ সাহিত্য বিশেষত মোপাসাঁ, সামারসেট মম এবং ম্যাক্সিম গোর্কির রচনা পড়ে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হন। মান্টোর *'ঠান্ডা গোস্ত'*, *'কালো সেলোয়ার'*, *'ধোঁয়া'* এবং *'ওপর নিচে আউর দরমিয়ান'* গল্পে অশ্লীলতার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়।[৫৬] *'খুলে দাও'* (খোল দো) গল্প প্রকাশের দায়ে উর্দু মাসিক সাহিত্য পত্রিকা *'নাকুশ'*-এর প্রকাশনা ছয় মাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আহমদ নাদিম কাসমি। আর *'ঠান্ডা গোস্ত'* প্রকাশের জন্য জরিমানা করা হয় 'জাবেদ সাময়িকী'কে। *'ওপর নিচে আউর দরমিয়ান'*-এর ছাপা নিষিদ্ধ করা হলে কোনো পত্রিকাই পরবর্তী কিস্তিগুলো ছাপতে রাজি হয়নি

চলচ্চিত্রের কাহিনি লেখার সাথে জড়িত থাকাকালে মান্টো রিপোর্টাজ ও স্কেচধর্মী একটি অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম *'গাঞ্জে ফেরেস্তে'*। এই গ্রন্থ মান্টোর রচিত ভারত উপমহাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসের দলিল বিশেষ। বাংলাদেশে গ্রন্থটি অনুবাদ করেন প্রয়াত মোস্তফা হারুন, প্রকাশক মুক্তধারা। সত্তরের দশকে (১৯৭৭) গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে পাঠকমহলে সাড়া জাগায়। এই গ্রন্থে অশোক কুমার, নাসিম বানু, শ্যাম, নার্গিস, উর্দু লেখিকা

---

[৫৫] নাছরুল্লাহ খান, *কেয়া কাফেলাহ জাতা হে*, মাকতুবাহ তাহজিব অ ফান, করাচী, ১৯৮৪, পৃ. ১৫২।
[৫৬] শহিদুর আলম, *শেষ্ঠ উর্দুগল্প (প্রথম খণ্ড)*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ৮ জানুয়ারী ১৯৯৫। পৃ. ০৭।

ইসমত চুগতাই এবং সুরসম্রাজ্ঞী নূরজাহান সহ বাইশ জনের স্কেচধর্মী জীবনী লিপিবদ্ধ আছে। তিনি তাঁদের জীবন নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেছেন।

রাজনীতি, ধর্ম আর ভৌগলিক সীমারেখা মানুষের তৈরি। তাই মান্টো ভারত বিভাগ মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি লিখেছেন, *'টোবাটেক সিং'*-এর মতো অসাধারণ গল্প। ভারত বিভাগের ওপর এমন গল্প আর দুই-একটি লেখা হয়েছে কি না সন্দেহ।

এমনিতেও মান্টো সমাজের নিঃস্ব, রিক্ত, পতিতাদের নিয়েআ কাজ করতেন, অন্ধগলির পতিতাদের চরিত্র প্রকাশ্য আলোয় তুলে ধরতেন- যা কর্তাদের কর্তব্যনিষ্ঠ চোখে প্রায়ই দৃষ্টিকটু ঠেকত। পতিতাদের জীবন নিয়ে লিখেছেন *'কালো সেলোয়ার'*, *'জানকী'*, *'মানহানি'*, *'সয়দা'*, *'শোভা'* ও *'খুশিয়া'*র মতো অপূর্ব গল্প। তাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্য হলো তিনি পতিতাদের জীবনের বিভিন্ন দিক অত্যন্ত মানবিক সহানুভূতির সাথে উপস্থাপন করেছেন। মান্টো অন্ধকার গলির পতিতালয়ের সুগন্ধি, সুলতানা ও খুশিয়া প্রভৃতি চরিত্র সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন, যা পাঠকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।[৫৭] তার উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প গুলো হলো নিম্নরুপ-

১. *রুছি আফছানে* (*رسی افسانے*) : অনুবাদ, দারুল আশয়াত পাঞ্জাব, লাহোর থেকে ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়।

২. *আতেশ পারি* (*آتش پارے*) : ৮ টি ছোটগল্প সহ উর্দু বুক স্টেট লাহোর: মুজতবাই প্রিন্টিং প্রেস থেকে ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. *মন্টু কে আফছানে* (*منٹو کے افسانے*) : ২৪ টি ছোটগল্প সহ সাকি বুক ডিপু, দিল্লি থেকে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়।

৪. *ধোঁয়া* (*دھواں*) : ২০ টি ছোটগল্প ও ২ টি নাটক সহ সাকি বুক ডিপু, দিল্লি থেকে ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয়।

৫. *আফছানে আউর ড্রামে* (*افسانے اور ڈرامے*) : ৭ টি ছোটগল্প, ১ টি সম্পূর্ণ নাটক, ১ টি ফিচার, ৪ টি স্ট্রেজ নাটক সহ আদারাত আসয়াত উর্দু, হায়দারাবাদ দক্ষিণ থেকে ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়।

---

[৫৭] প্রফেসার গুপি চান্দ নারাঙ্গ, *উর্দু আফসানা রুবায়াত আওর মাসায়েল*, এডুকেশন পাবলিকেশন হাউজ, দিল্লী, ১৯৮১, পৃ. ২০৬-২০৭।

৬. *লাজ্জাত সংঙ্গ* (لذت سنگ) : ৩ টি ছোটগল্প সহ নয়া আদারাহ, লাহোর থেকে ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়। আরেকটি সংস্করণ মাকতাবাহ জাদিদ দিল্লিও প্রকাশ করে।

৭. *চাগ্দ* (چغد) : ৯ টি ছোটগল্প সহ কিতাব পাবলিশার্স, বোম্বে থেকে ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়।

৮. *ঠান্ডা গোস্ত* (ٹھنڈا گوشت) : ৮ টি ছোটগল্প সহ মাকতুবাহ জাদিদ লাহোর থেকে ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়। আবার মাকতাবাহ নু, দিল্লি ১৯২ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট এই বইটি ১৯৫০ সালেই প্রকাশ করে।

৯. *খালি বুতলিন, খালি ডুবি* (خالی بوتلیں، خالی ڈبے) : ১৩ টি ছোটগল্প সহ মাকতুবাহ জাদিদ, লাহোর থেকে ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়।

১০. *নমরুদ কি খোদায়ি* (نمرود کی خدائی) : ১২ টি ছোটগল্প সহ নয়া আদারাহ, লাহোর থেকে ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়।

১১. *বাদশাহাত কা খাতেমাহ* (بادشاہت کا خاتمہ) : ১১ টি ছোটগল্প সহ মাকতাবাহ উর্দু লাহোর থেকে ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয়। এর আরেকটি সংস্করণ গুশাহ আদব, লাহোর থেকেও প্রকাশ হয়।

১২. *ইয়াজিদ* (یزید) : ৯ টি ছোটগল্প সহ মাকতুবাহ জাদিদ, লাহোর থেকে ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয়।

১৩. *বিশ গায়েরে মাতবুয়াহ কাহানিয়া* (بیس غیر مطبوعہ کہانیاں) : ২০ টি ছোটগল্প সহ ১০০ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট বইটি মাকতুবাহ নুকুশ ৯৩০, চান্দনি চক, দিল্লি থেকে ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়।

১৪. *ছরক কে কিনারে* (سڑک کے کنارے) : ১১ টি ছোটগল্প সহ নয়া আদারাহ, লাহোর থেকে ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয়। এর আরেকটি সংস্করণ নিউ তাজ অফিস দিল্লি থেকেও প্রকাশিত হয়।

১৫. *ফান্দে* (پھندے) : ৫ টি ছোটগল্প সহ ১৪৪ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট বইটি মাকতাবাহ জাদিদ, দিল্লি থেকে ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয়।

১৬. *উপর নিচে আউর দরমিয়ান* (اوپر نیچے اور درمیان) : ৮ টি ছোটগল্প এবং প্রবন্ধ সহ ১৭৮ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট বইটি আছমানিয়া বুক ডিপু, কলকাতা থেকে ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয়। এর আরেকটি সংস্করণ গুশা আদব লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

১৭. *ছারকান্ডুঁ কে পিছে* (سرکنڈوں کے پیچھے) : ১৩ টি ছোটগল্প সহ ইদারায়ে ফুরুগে উর্দু, লাহোর থেকে ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়। এর আরেকটি সংস্করণ হালি পাবলিশার্স হাউজ, দিল্লি থেকে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়।

১৮. *পেহেন্দনে* (پھندنے) : ১১ টি ছোটগল্প ও ১ টি নাটক সহ মাকতাবাহ জাদিদ লাহোর থেকে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়।

১৯. *বেগায়ের এজাজত* : ১১ টি ছোটগল্প সহ জাফর ব্রাদার্স লাহোর থেকে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইটি ইংরেজী ও রুশিয়ান ভাষা থেকে অনুবাদিত।

২০. *বারকায়ে* (برقعے) : ১১ টি ছোটগল্প সহ জাফর ব্রাদার্স লাহোর থেকে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়।

২১. *শিকারি আউরাতে* (شکاری عورتیں) : ১২ টি ছোটগল্প সহ জাফর ব্রাদার্স লাহোর থেকে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়।

২২. *রুতি মাশাহ আউর তুলাহ* (رتی ماشہ اور تولہ) : ১০ টি ছোটগল্প ও ১ টি নাটক সহ জাফর ব্রাদার্স লাহোর থেকে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়।

২৩. *লাউড স্পিকার* (لاوڈ اسپیکر) : ছোটগল্প এবং প্রবন্ধ সহ ২৮৮ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট বইটি আজাদ বুক ডিপু, আমর তাছের থেকে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইটির আরেকটি সংস্করণ গুশা আদব, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

২৪. *মান্টু কে নুমায়েন্দাহ আফছানে* (منٹو کے نمائندہ افسانے) : ২০৮ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট বইটি মাকতুবাহ ইলম ওয়া ফান, লাহোর থেকে ১৯৮৪ সাল প্রকাশিত হয়।

২৫. *আনার কলি* (انارکلی) : ১০ টি ছোটগল্প সহ মাকতুবাহ সায়ের ওয়া আদব লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

২৬. *এক মরদ* (ایک مرد) : ৮ টি ছোটগল্প, ৪ টি নাটক, ১ টি ফিচার সহ জাফর ব্রাদার্স লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

২৭. *পরদে কে পিছে* (پردے کے پیچھے) : ১০ টি নাটক ও ছোটগল্প সহ ১৭৫ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট বইটি মাকতুবাহ রাঙ্গিন, দিল্লি থেকে ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয়।

২৮.*শাদি* (شادی) : ৭ টি ছোটগল্প সহ ১৪২ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট বইটি কিতাব খানাহ আরিয়াহ অরত লাল কুনওয়ান, দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়।

২৯.*কালি ছালওয়ার* (کالی شلوار) : ২৩২ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট বইটি জাফর ব্রাদার্স, দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়।

৩০.*তাল্খ তারস শিরিণ* (تلخ ترش شیریں) : প্রবন্ধ এবং ছোটগল্প।

৩১.*ছিয়াহ হাসি* (سیاہ حاشے) : আলবায়ান লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

৩২.*তাহেরাহ ছে তাহেরাহ* (طاہرہ سے طاہرہ) : জাফর ব্রাদার্স, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

৩৩. *গোলাব কা ফুল* (گلاب کا پھول)

৩৪.*নাখুন কা করজ্* (ناخن کا قرض)

৩৫. *চশম রোজান* (چشم روزن)

৩৬. *গুরি কি আফছানে* (گورکی کے افسانے) : মেকছম গুরি কির অনুবাদ, মাকতুবাহ শায়ের অ আদব, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।[৫৮]

পাকিস্তানে গমন:

ভারত বিভাগের পর তাঁর স্ত্রী সুফিয়া তিন কন্যাসহ লাহোর চলে যান। পরে ১৯৪৮ সালে মান্টো মুম্বাই থেকে কাউকে না বলে লাহোর চলে আসেন। একমাত্র চিত্রনায়ক শ্যাম মুম্বাই স্টিমার ঘাটে এসে বিদায় জানান। দীর্ঘ ২১ বছর তিনি সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। এর মধ্যে দশ বছর তাকে অশ্লীলতার অভিযোগে মামলার জন্য আদালতে ঘুরাঘুরি করতে হয় এবং অনেক আর্থিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। তবে নীতির প্রশ্নে তিনি কখনো আপোস করেননি। পাকিস্তান সরকার তাঁকে কম্যুনিস্ট মনে করত। তাই পাকিস্তান রেডিওতে তাঁর প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। মুম্বাইয়ের মতো লাহোরে চলচ্চিত্রের জন্য সংলাপ ও কাহিনি লেখার সুযোগ ছিল না। পাকিস্তান সরকারের সাথে মার্কিন সামরিক চুক্তির কড়া সমালোচক ছিলেন মান্টো। ফলে তাঁর বক্তৃতাদান ও লেখনীর ব্যাপারেও সরকারি নিষেধাজ্ঞা ছিল।

---

[৫৮] ড. মির্জা হামিদ বেগ, *উর্দু আফসানে কি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৫০৮-৫১২।

মৃত্যু সময়কাল:

মান্টো মদ্য পানে খুব অভ্যস্ত ছিলেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে নাটকীয়ভাবে মান্টো তার ভাগ্নের কাছে মদ পানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঐ অবস্থায় তাঁর রক্তবমি হচ্ছিল, সাথে পেটে প্রচন্ড ব্যথা। হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্সের জন্য সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, "কোটের পকেটে সাড়ে তিন টাকা আছে, দুই প্যাক হুইস্কি আনাও।" তাঁর শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য হুইস্কি আনা হলো। এক চামচ হুইস্কি তাঁর মুখে দেওয়া হলো। কয়েক ফোঁটা গলায় ঢুকল আর অবশিষ্টটুকু মুখ থেকে বাইরে গড়িয়ে পড়ল। এর মাঝে সারা দেহে খিচুনি শুরু হল। তখন তিনি অজ্ঞান, অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে নেওয়ার পথেই ১৯৫৫ সালের ১৮ জানুয়ারি মাত্র ৪৩ বছর বয়সে মান্টো লাহোরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৫৯]

[৫৯] প্রফেসার নুরুল হুসাইন নকবী, *তারিখে আদবে উর্দু*, এডুকেশন বুক হাউজ, আলীগড়, ২০০৪, পৃ. ৩৫৬।

আজিজ আহমেদ

জন্ম পরিচিতি:

নাম আজিজ আহমেদ। সাহিত্যিক নাম আজিজ আহমেদ ওসমান আবদী অথবা আজিজ আহমেদ। তিনি একজন উর্দু ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক, কবি, অনুবাদক, ইতিহাসবিদ, গবেষক, প্রবন্ধকার, ইকবাল গবেষক ও পণ্ডিত ব্যক্তি এবং একজন পাকিস্তানি সাহিত্য সমালোচক ছিলেন। আজিজ আহমেদ ১১ নভেম্বর, ১৯১৩ সালে ভারতের হায়দ্রাবাদের বারাহ বানকে জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম নবিউল্লাহ ও মাতার নাম জাকিয়া বেগম। নবিউল্লাহর আসল নাম বশীর আহমেদ। তিনি কাপরী জেলার ঘমা নগর এলাকায় বাস করতেন। দাক্ষিন্যাত্যের হায়দ্রাবাদের বিখ্যাত উকিলদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। আজিজ আহমেদ বাল্যকালে পিতা-মাতা হারানোর কারনে নিজের আপন মামা মুহাম্মদ আহমেদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। মামাও পেশায় উকিল ছিলেন। আজীজ আহমেদ হায়দ্রাবাদেই কিছু কাল থাকার পর লণ্ডনে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও চাকরি করেন। তারপর তিনি কানাডার টরোন্টোতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন।

শিক্ষা গ্রহণ:

আজিজ আহমেদ উসমানাবাদে ওসমানিয়া হাই স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করার পর ১৯২৮ সালে হায়দ্রাবাদের জামিয়া ওসমানিয়ায় ভর্তি হন। সেখান থেকে এফ.এ করার পর ১৯৩৪ সালে সেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইংরেজী, ফার্সিতে প্রথম বিভাগে কৃর্তিত্বের সাথে বি.এ ডিগ্রী পাশ করেন। জামিয়া ওসমানিয়াতে আজীজ আহমেদ ড. মৌলভী আবদুল হক, ড. মহিউদ্দীন কাদেরী জোর, প্রফেসার আব্দুল কাদের ছরওয়ারী, মৌলভী ওহী উদ্দীন ছালিন এবং মাওলানা মানাজের আহসান গিলানীদের ন্যায় শিক্ষকদের সান্বিদ্ধ্যে আসেন। শিক্ষা জীবনে অন্য শিক্ষকদের তুলনায় ড. মৌলভী আবদুল হক এবং প্রফেসার আব্দুল কাদের ছরওয়ারীর সান্বিদ্ধ লাভ করেন। আব্দুল কাদের ছারওয়াররি মাসিক পত্রিকা মাকতাবা এর জন্য সহযোগী সম্পাদক হিসিবে কাজ করেন। অনার্স ডিগ্রি অর্জনের পর মৌলভী আবদুল হকের চেষ্টায় আজিজ আহমেদ চাকরিতে ঢুকতে পারেন এবং ভাতা লাভ করেন। উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য তিনি ১৯৩৫ সালে ইংল্যান্ডে চলে যান। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থা কালীন তার সাথে ড. আব্দুল হকের মাধ্যমে ই.এম ফরেস্টারের সাথে যোগাযোগ হয়। ১৯৩৮ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রী নেন। অতপর কিছুদিন ইউরোপ ভ্রমণে বের হন। এসময়ে তিনি ফ্রান্সে ছরবন ইউনির সাথে কিছু কাল যুক্ত থাকেন। সেখান থেকে ফ্রেন্স ভাষা শিখেন। ১৯৩৮ সালে দেশে ফিরে এসে তিনি জামিয়া উসমানিয়ার সাথে সংযুক্ত হয়ে যান। ১৯৪০ সালে তিনি বিবাহ করেন। ১৯৭২ সালে তিনি ইতিহাস গবেষণার জন্য লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট লাভ করেন।

কর্মজীবন:

আজিজ আহমেদ ১৯৩৮ সালে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগে অধ্যাপনা শুরুর মাধ্যমে তার কর্মজীবনের সূচনা করেন। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৪১ সালে প্রিন্সেস ডিইর-ই-শাহওয়ার এর ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে চাকরি করেন। পরবর্তীতে তিনি আবার হায়দ্রাবাদে ওসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার হিসেবে ১৯৪৬-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত নিযুক্ত হন। ১৯৪৭-১৯৪৯ পর্যন্ত প্রফেসর হিসাবে কাজ করেন। ১৯৪৯ সালে চাকুরি থেকে ইস্তফা দিয়ে পাকিস্তানে চলে আসেন। ১৯৪৯-১৯৫০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের করাচি তথ্য বিভাগে সহকারী পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৫০-১৯৫৩ সাল পর্যন্ত কাশ্মীর বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গণ-যোগাযোগ বিভাগের উপ পরিচালক ছিলেন। ১৯৫৯-১৯৫৭ সাল পর্যন্ত কাশ্মীর বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ঐ গণ-যোগাযোগ বিভাগের পরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেন। ৯ বছর পাকিস্তানে অবস্থান করে সরকারের বিজ্ঞাপন, চলচিত্র ও প্রকাশনা বিভাগে কাজ করার পর সেখান থেকে তিনি লন্ডনে চলে যান। সেখানে তিনি ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত 'লন্ডন স্কুল অব অরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান ষ্টাডিজ' এ একজন উর্দুর শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৬২ সালে কানাডার টরেন্টে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে বদলি হন। ১৯৬৮ সালে বিভাগের পূর্ণ অধ্যাপক হন। ১৯৬৯ সাল মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি আমেরিকার লন্স এঞ্জেলসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। ১৯৭৫ সালের শুরুতে শেষ বারের মত কায়েদে আজম মেমোরিয়ালে লেকচার দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের ইসলামাবাদে এসেছিলেন। ১৯৭৮ সালে ১৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় ফয়েজ আহমদ ফয়েজের সম্মানে কানাডার টরেন্টোতে আয়োজিত মুশারায় তিনি শেষ পাবলিক মিটিং অংশ গ্রহণ করেন।

সাহিত্য চর্চা:

আজিজ আহমেদ উর্দু ছাড়াও ইংরেজী, আরবী, ফার্সি, জার্মান, ইতালিয়ান, তুর্কী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন ও স্পষ্ট ভাবে কথা বলতে পারতেন। শেষ জীবনে নরওয়ে জিয়ান ভাষা শিখেছিলেন। তিনি সাতটি ভাষার উপর অনুবাদক, গল্পকার, নবেল লেখক, ইকবাল গবেষক, গজল কথক, গবেষক এবং সমালোচনা মূলক লেখক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি অনুবাদের মাধ্যমে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। এরপর তিনি ছোটগল্প লিখতে শুরু করেন। তিনি ১০টি উপন্যাস, ৪টি ছোটগল্পের সংস্করণ ও ২টি সাহিত্য সমালোচকের বই প্রকাশ করেন এবং তিনি ইসলামের ইতিহাসের উপরও একটি বই লিখেন। তার উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পের মধ্যে রয়েছে-

১. *রাসক-ই-নাতামাম* (رقص ناتمام) : ১১ টি ছোটগল্প সহ প্রথম সংস্করণ মাকতুবাহ জাদিদ, লাহোর থেকে ১৯৪৫ সালে এবং দ্বিতীয় সংস্করণটি ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়।

২. *বেকার দিন বেকার রাতি* (بیکار دن بیکار راتیں) : ০৭ টি ছোটগল্প সহ মাকতুবাহ জাদিদ, লাহোর থেকে ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. *খুদাংঙ্গ জাছতাহ, জব আখি আয়িন পুশ হুয়ি* (خدنگ جستہ، جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں) : মেরি লাইব্রেরী থেকে ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয়।

৪. *আব হায়াত* (آب حیات) : ঐতিহাসিক ছোটগল্প, মাকতুবাহ মেরি লাইব্রেরী থেকে একই সালে প্রকাশিত হয়। [৬০]

এছাড়াও বিবিধ সংখ্যায় তার ছোটগল্প গুলো হলো-

১. *নফরত কিউ থি* (نفرت کیوں تھی) : নুকুশ, লাহোর থেকে ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত ।

২. জেল মন্ডল (جل منڈل) : নুকুশ, লাহোর থেকে ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত ।

৩. *কাঠ পাতিলিয়ান* (کٹھ پتلیاں) : উর্দু আদব, লাহোর থেকে ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত।

৪. *কুকব* (کوکب) : ছুবিরা, লাহোর থেকে ১৫ ও ১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৫. *বাজিইয়াবি* (بازیابی) : নুকুশ, লাহোর থেকে ১৫ ও ১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত ।

৬. *কাতিল কবির* (قاتل کبیر) : নুকুম, লাহোর থেকে ২৫ ও ২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত ।

৭. *কাশা কাশ জজবাত* (کشاکش جذبات) : মুজাল্লাহ মকতব, হায়দারাবাদ থেকে নভেম্বর ১৯২৯ সালে প্রাকশিত হয়। [৬১]

এছাড়াও তার অনুবাদিত ছোটগল্পগুলো হলো-

১. *বাচুপান* (بچپن) : (রুডিয়া রুড কাপলংঙ্গ ছোটগল্পের অনুবাদ) যা নয়ারঙ্গে খেয়াল, লাহোর থেকে সেপ্টেম্বর ১৯২৮ সালে প্রকাশিতহয়।

---

[৬০] ড. মির্জা হামিদ বেগ, উর্দু *আফসানুকি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৩৭৪-৩৭৫।

[৬১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২।

২. *শরীল লারকা* (*شریر لڑکا*) : (টেগুর ছোটগল্পের অনুবাদ) যা নয়ারঙ্গে খেয়াল, লাহোর থেকে ডিসেম্বর ১৯২৮ সালে প্রকাশিতহয়।

৩. *খারাব আবাদ* (*خراب آباد*) : (Wasteland: By T.S. Eliot) রেসালাহ উর্দু থেকে ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়।

৪. *পাজারণ* (*پجارن*) : (টেগুর ছোটগল্পের অনুবাদ) যা মহেনামা এন্তেখাবে নু, করাচি থেকে নভেম্বর ১৯৮২ সালের ০৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৫. *আজিজ আহমদ কে তাকরিবান, সাজ মাগরিব* (*عزیز احمد کی تقریباً، ساز مغرب*): ১৫ টি ইংরেজী ছোটগল্প।[৬২]

এছাড়া ইতিহাস সংস্কৃতি ও সাহিত্য সমালোচনার উপর বেশ কিছু বই লিখেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বইগুলো হলো-

১. *'তারাক্কি পছন্দ আদব'* [১৯৪৬]
২. *'দিল্লীর প্রথম তুর্কী সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাস ও প্রতিষ্ঠান ঃ ১২০৬-১২৯০'* [১৯৪৯]
৩. *'ইকবাল নয়ে তাসকিন'*
৪. *'Islamic law in theory and Practice' [তত্ব ও অনুশীলনে ইসলামের আইন]* [১৯৫৬]
৫. *'সৈয়দ আহমেদ খান'*
৬. *জামাল-আল-দিন-আল-আফগানী'* এবং *'ভারতীয় মুসলমান'* [১৯৬০]
৭. *'ভারতীয় পরিবেশে ইসলামের সংস্কৃতি অধ্যায়ন'* [১৯৬৯]
৮. *'ভারত ও পাকিস্তানে ইসলামের আধুনীকায়ন ঃ ১৯৫৭-১৯৬৮'* [১৯৬৭]
৯. *'ভারতের ইসলামী আধ্যাত্মিক ইতিহাস'* [১৯৬৯]
১০. *'ভারত ও পাকিস্তানী মুসলিমদের আত্মকথা ঃ ১৯৫৭-১৯৬৮'* [১৯৭০]
১১. *'পাকিস্তানের ধর্ম ও সমাজ'* [১৯৭১]
১২. *'ইসলামী সিমিলির ইতিহাস'* [১৯৭৫] ইত্যদি তার উল্লেখযোগ্য বই।

এছাড়া তিনি মাত্র ১২ পৃষ্ঠার এটি কবিতা সংকলন করেন, যার নাম হল *'ইন্তেখাব-ই-জাবেদ'*। যা ১৯৪২ সালে প্রাকশিত হয়।

মৃত্যুকাল:

শেষ জীবনে তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। কয়েকবার তার অপারেশন হয়। অবশেষে কানাডার টরেন্টোর সেন্টজন বিল্ডিংয়ে বসবাসরত অবস্থায় ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

---

[৬২] ড. মির্জা হামিদ বেগ, *উর্দু আফসানুকি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৩৮২।

কৃষণ চন্দর

হিন্দি এবং উর্দু উভয় ভাষাতেই কৃষণ চন্দর সাহিত্য সাধনা করলেও তার প্রধান পরিচিত উর্দু সাহিত্যিক হিসেবে। তিনি যখন উর্দু ভাষার সাহিত্য চর্চা শুরু করেন তখন উর্দু সাহিত্যের গদ্য শাখাটি সবে হাটি হাটি পা পা করে সাবালকত্বের দিকে যাত্রা করেছে।

জন্ম পরিচিতি:

কৃষণ চন্দর তৎকালীন অবিভক্ত ভারতবর্ষের পশ্চিম পাঞ্জাবের গুজরান এলাকার ওজিরাবাদ জেলায় ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ভোর চারটার দিকে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পুরো নাম কৃষণ চন্দর চোপরাহ।[৬৩] জন্ম সূত্রে তিনি ছিলেন কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ। তার পিতা ছিলেন কাশ্মীরের ভারতপুর নামক ছোট রাজ্যের স্বনামধন্য চিকিৎসক। বাবার নাম গৌরিশংকর চোপড়া। তার পিতা ছিলেন আর্য আর মা ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। তার ডাক্তার পিতা ধর্মীয় গোড়ামী থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। কৃষণ চন্দ্রের ধর্ম সম্পর্কে উদার মনোভাব গড়ে উঠার পেছনে তার পিতার একটা বড় ভূমিকা ছিল।ব্যক্তিগত জীবনে তিনি তিন সন্তানের জনক। দুই মেয়ে ও এক ছেলে। তবে বিয়েটা তার বেশীদিন টেকেনি। পরে তিনি নৈনিতালের বিশিষ্ট উর্দু সাহিত্যিক রশিদ আহম্মদ সিদ্দিকীর মেয়ে ছোটগল্পকার সালমা সিদ্দিকীকে বিয়ে করেন।[৬৪]

শিক্ষাজীবন:

তৎকালীন সময়ে সাধারণত মেয়েরা হিন্দি ভাষার চর্চা করতো, কিন্তু পুরুষেরা শিক্ষা গ্রহণ করত উর্দু ভাষাতেই। তাই কৃষণ চন্দরকেও উর্দু ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তিনি পড়াশোনা করেন পুঞ্চ হাই স্কুলে। স্কুল জীবন থেকে অতি গোপনে সাহিত্যচর্চা করতেন। ১৯৩৪ এর দশকে তিনি ফরম্যান ক্রিশ্চিয়ান কলেজে ইংরেজিতে স্নাতক করেন। ১৯৩৭ সালে লাহোর পাঞ্জাব কলেজ থেকে এল.এল.বি করেন।[৬৫]

কর্মজীবন:

১৯৪০ সালে কর্মসূত্রে প্রথম জীবনে তিনি লাহোর বেতার কেন্দ্রে এবং পরে দিল্লী বেতার কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন।[৬৬] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কাশ্মীরী বাজারের একটি ছোট বাংলো হতে দিল্লি রেডিওর অনুষ্ঠান সম্প্রচার হত। কৃষণ চন্দর, সাদাত হাসান মান্টো, উপন্দ্রেনাথ আশ্‌ক তিনজন কাজ করতেন। তাদের ঘিরেই দিল্লি রডিও স্টেশন হয়ে উঠেছিল এক সাহিত্য-মজলিশ। আশরার উল হক মজাজ ছিলেন রেডিওর উর্দু ম্যাগাজিন ‘*আওয়াজ*’ এর সম্পাদক।

---

[৬৩] ড. মির্জা হামিদ বেগ, *উর্দু আফসানে কি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৬০৫।
[৬৪] ননী শূর, *কৃষণ চন্দরের নির্বাচিত গল্প*, আদবি সাখসিয়াত, হাওলাদার প্রকাশনী, অক্টোবর ২০১৩, পৃ. ৪।
[৬৫] মোহাম্মদ আনিসুল হক, *আদবি সাখসিয়াত*, কাফ কিতাব ঘর- ৩৯ পেট্টুওয়াটুন, ঢাকা, পৃ. ২৩৩।
[৬৬] ড. সৈয়েদ ইজাজ হুসাইন, *মুখতাছের তারিখে আদবে উর্দু*, উর্দু কিতাব ঘর, দিল্লি, পৃ. ২৬৫।

তাদের সাথে যোগ দিতেন ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ও চিরাগ হাসান হাসরত। এ মজলিশের মধ্যমণি ছিলেন কৃষণ। যুদ্ধের পর তিনি সরকারি চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।

সাহিত্য জীবন :

সাহিত্যের প্রতি তার আকর্ষণ গড়ে ওঠে শৈশবেই। কিন্তু সাহিত্য-সাধনার পথে বাধা ছিল মায়ের চোখরাঙানি আর বাবার কঠোর নির্দেশ। এসব অমান্য করেই স্কুল-জীবন থেকে অতি গোপনে তার সাহিত্যচর্চা শুরু। ১৯৩৬ সালে "প্রগতি লেখক সংঘ" প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বছরই অর্থাৎ ২৩ বছর বয়স থেকে লেখক হিসাবে কৃষণ চন্দরের আবির্ভাব। কৃষণ চন্দর খুব মেধাবী ছিলেন। মাতৃভক্তও ছিলেন। তবু তিনি বলেছিলেন- 'এম.এ পাশ করব, ওকালতি পাশ করব, কিন্তু জজ হব না, গল্প লেখাও ছাড়ব না।' [৬৭]

কলেজ জীবনেই তার প্রথম গল্প *'য়কান'* [কামলা] *'রিয়াসত'* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৩৬ সালে তার রম্য রচনা *'হাওয়াই কিলা'* তৎকালীন প্রগতিশীল পত্রিকা 'হুমায়ু'তে প্রকাশিত হয় এবং তা সম্পাদক কর্তৃক প্রশংসিত হয়। কিছুদিন পর ওই পত্রিকাতেই তার গল্প *'ঝিলম মে নাও পর'* প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লেখক হিসাবে পরিচিত পেয়ে যান। [৬৮]

কৃষণ চন্দরের সাহিত্যিক জীবনকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১৯৩৯ সালে তিনি রোমান্টিক ভাব ধারার দৃঢ়চিত্তে ছিলেন। ১৯৪০ সাল থেকে James Joyee, Ezra Pound and D.H. Law-rence এর প্রভাবে বাস্তব জীবনধর্মী লেখা শুরু করেন এবং ১৯৪৫ সাল থেকে ভারতে এবং বিশ্ব জুড়ে উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধ দ্বারা প্রভাবিত হন এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন।

কৃষণ চন্দরের প্রথম প্রকাশিত গল্প সংকলন *'তিলিসম-এ-খেয়াল'*। [৬৯] প্রথম উপন্যাস *'শিকস্ত'*। প্রথম গল্প থেকেই কৃষণ চন্দরের মানবতাবাদী সেক্যুলার দৃষ্টি ভঙ্গি প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি একে একে অজস্র গল্প ও উপন্যাস লিখে উর্দু এবং হিন্দি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। সারা ভারতেই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পরে।

কৃষণ চন্দর সমাজতান্ত্রিক সমাজের ঊর্ধ্বে উঠতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সমগ্র জীবনকালে তিনি প্রান্তিক, কৃষক ও শ্রমিকদের সেই সাথে লেখক ও শিল্পীদের সাহায্য করার প্রচেষ্টায় উৎসাহিত করেছিলেন। কৃষক চন্দর নিজের সম্পর্কে বলেন-

"আমি এমন একটি প্রাণী, যে শুধু লিখতে জানে, যদি আমি লিখতে না পারি তবে আমি বেঁচে থাকবো না।" [৭০]

---

[৬৭] ননী শূর, *কৃষণ চন্দরের নির্বাচিত গল্প*, হাওলাদার প্রকাশনী, অক্টোবর ২০১৩, পৃ. ৫।

[৬৮] প্রফেসার গুপি চান্দ নারাঙ্গ, *উর্দু আফসানা রুবায়াত আওর মাসায়েল*, এডুকেশন পাবলিকেশন হাউজ, দিল্লী, ১৯৮১, পৃ. ৬৩।

[৬৯] ড. আহমেদ হাসান, *কৃষণ চন্দর আউর মুখতাছের আফছানে নিগার*, মর্ডান পাবলিসার্স হাউজ, নয়া দিল্লি, ১৯৮৯, পৃ. ৪৭।

[৭০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।

বাংলা ও ভারতীয় বিভিন্ন ভাষা ছাড়াও রুশ, জার্মান, ইংরেজী, চেক, হাঙ্গেরী, চীন ও জাপানি ভাষায় তার সাহিত্য অনূদিত হয়েছে। উপমহাদেশের ভিতরে কৃষণ চন্দরই সবচাইতে বেশী ছোটগল্প লিখেছেন। তার গল্প সংখ্যা ৫০০ বা তারও বেশী। উর্দু ও হিন্দি ভাষায় তার ৩০ টি ছোটগল্প সংকলন এবং ২০ টি উপন্যাস ও অন্যান্য সহ প্রায় শতাধিক বই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি নাটক, প্যারডি প্রতিবেদন, চলচ্চিত্র, স্ক্রিপ্ট এবং শিশুদের জন্য বই লিখেন। তার ছোটগল্প গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বইগুলো হলো নিম্নরূপ-

১. *তিলিসম-এ-খেয়াল* (طلسم خیال) : মাকতুবাহ উর্দু, লাহোর থেকে ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়।

২. *নাজারে* (نظارے) : কিতাব খানা আদবি দুনিয়া থেকে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. *জিন্দেগী কে মোর পর* (زندگی کے موڑ پر) : মাকতুবাহ উর্দু, লাহোর থেকে ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৪. *নয়ে আফসানে* (نئے افسانے) : দিল্লী প্রিন্টিং প্রেস থেকে ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৫. *পুরানে খুদা* (پرانے خدا) : আব্দুল হক একডেমী, হায়দারাবাদ থেকে ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়।

৬. *আজন্তা ছে আগে* (اجنتا سے آگے) : কিতাব পাবলিশার্স লিমিটেড, বোম্বে থেকে ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়।

৭. *তিন গুন্ডে* (تین غنڈے) : ইন্ডিয়ান বুক কম্পানী, দিল্লি থেকে ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়।

৮. *সমন্দর দূর হ্যে* (سمندر دور ہے) : ১১ টি ছোটগল্প সহ নও হিন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, নয়ী দিল্লি থেকে ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়।

৯. *হাম ওয়াহসি হ্যায়* (ہم وحشی ہیں) : ০৭ টি ছোটগল্প সহ কিতাব পাবলিশার্স লিমিটেড, বোম্বে নম্বর ১ থেকে ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়।

১০. *এক ঘিরজা এক খন্দক* (ایک گرجا ایک خندق) : ১০ টি ছোটগল্প সহ ন্যাশনাল ইনফরমেশন এন্ড পাবলিকেশন, বোম্বে থেকে ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়।

১১. *হাল কে ছায়ে মে* (ہل کے سائے میں) : মাকতুব সুলতানী, বোম্বে থেকে ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয়।

১২. *নয়ে গোলাম* (نئے غلام) : ১০ টি ছোটগল্প সহ কাদেরী কিতাব খানা, বোম্বে থেকে ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয়।

১৩. *মিনা বাজার* (مینا بازار) : মাকতুবাহ শাহারা, দিল্লি থেকে ১৯৫৩ সালে প্রথমে এবং পরে কিতাব নুমা, লাহোর থেকে একই সালে প্রকাশিত হয়।

১৪. *মাজা হিয়াহ আফসানে* (مزاحیہ افسانہ) : ১২ টি ছোটগল্প ও ছবি সহ আজাদ কিতাব ঘর, কল্লান মহল, দিল্লি থেকে ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়।

১৫. *এক রুপিয়া এক ফুল* (ایک روپیہ ایک پھول) : ০৮ টি ছোটগল্প সহ এশিয়া পাবলিশার্স, দিল্লি থেকে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়।

১৬. *ইউকাপ্টিস কি ডালি* (یوکپٹس کی ڈالی) : ০৫ টি ছোটগল্প, ০১ টি নাটক সহ এশিয়া পাবলিশার্স তেইছ হাজারী, দিল্লী থেকে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়।

১৭. *কিতাব কা কফন* (کتاب کا کفن) : ১১ টি ছোটগল্প নিয়ে নয়ী দিল্লি থেকে ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়।

১৮. *নাগমে কি মওত* (نغمے کی موت) : ১১ টি ছোটগল্প সহ এশিয়া পাবলিশার্স তেইছ হাজারী, দিল্লি থেকে ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়।

১৯. *মে ইনতেজার করুঙ্গা* (میں انتظار کروں گا) : ০৮ টি ছোটগল্প সহ মকতব সায়েরাহ, দিল্লি থেকে ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়।

২০. *আন্নদাতা* (ان داتا) : ০৪ টি ছোটগল্প সহ এশিয়া পাবলিশার্স, দিল্লি থেকে ১৯৫৯ সালে সালে প্রকাশিত হয়।

২১. *শিকাস্ত কি বাদ* (شکست کے بعد) : ১০টি ছোটগল্প সহ দিপক পাবলিশার্স থেকে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়।

২২. *স্বপ্ন কা কয়েদী* (سپنوں کا قیدی) : ১১ টি ছোটগল্প সহ মাকতুবাহ জামাহ লিমিটেড, নয়া দিল্লি থেকে ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়।

২৩. *হাইড্রোজেন বোম কে বায়াদ* (ہائیڈروجن بم کے بعد) : ০৪ টি ছোটগল্প, ০১ টি নাটক ও এক ছবি সহ এশিয়া পাবলিশার্স তেইছ হাজার, দিল্লি থেকে ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়।

২৪. *দোসওয়া ফল* (دسواں پل) : ০৮ টি ছোটগল্প সহ এশিয়া পাবলিশার্স, দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়।

২৫.*দিল কেসি কা দোস্ত নেহি* (دل کسی کا دوست نہیں) : ০৯ টি ছোটগল্প সহ এশিয়া পাবলিসার্স, দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়।

২৬.*কাশ্মীর কি কাহানীয়াঁ* (کشمیر کی کہانیاں) : ১২ টি ছোটগল্প সহ এলাহবাদ পাবলিশিং হাউজ, এলাহবাদ থেকে প্রকাশিত হয়।

২৭.*এক খুশবো আরি আরি ছে* (ایک خوشبوں اڑی اڑی سے) : মাকতুব আনকার, করাচি থেকে প্রকাশিত হয়।

২৮.*পানি কা দরখত* (پانی کا درخت) : নয়া ইদারাহ, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

২৯.*তাস কা খেল* (تاش کا کھیل) : রায়াত পাবলিশার্স, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

৩০.*দরদ কি নহর* (درد کی نہر) : করাচি বুক ডিপু, করাচি থেকে প্রকাশিত হয়।

৩১.*দস্ত খেয়াল* (دشت خیال) : মমতাজ একাডেমী, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

৩২.*দুসরে বরফ বারি কে বাদ* (دوسری برف باری کے بعد) : খেয়াম পাবলিশার্স, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

৩৩. *ছপনোঁ কি রাহ গুজার মে* (سپنوں کی راہ گذر میں) : খেয়াম পাবলিশার্স, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

৩৪.*সানু* (شانو) : রাজা পাবলিশার্স, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

৩৫. *কাকটেল ঢিল* (کاک ٹیل) : ছনগম পাবলিশার্স, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

৩৬. *কালা ছুরজ* (کالا سورج) : মাকতুব আকার, করাচি থেকে প্রকাশিত হয়।

৩৭.*কবুতর কে খত* (کبوتر کے خط) : পাশা পাবলিশার্স, লাহোর থেকে প্রথমে এবং পরে মাকতুবাহ মাহুল, করাচি থেকে ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৩৮. *হাম তো মুহাব্বত করে গা* (ہم تو محبت کرے گا) : এশিয়ান বুক সেন্টার, করাচি থেকে প্রকাশিত হয়।

৩৯. *কৃষণ চান্দ কে বেহতারিন আফসানে* (کرشن چندر کے بہترین افسانے) : চৌধুরী একাডেমী, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

৪০. *ফুল কি তানহায়ি* (پھول کی تنہائی)

৪১. *কাঁচ কি টুকরে* (کانچ کے ٹکڑے)

৪২. *তুফান কি কায়ান* (طوفان کلیاں)

৪৩. *উল্টা দরখত* (الٹا درخت)

৪৪. *খিরকিয়া কায়া* (کھڑکیاں)

৪৫. *মুছকারানে ওয়ালিয়া* (مسکرانے والیاں)

৪৬. *দাদর ফল কে বাচ্চে* (دادر پل کے بچے)

৪৭. *ফুটপাত কে ফারিশতে* (فٹ پاتھ کے فرشتے)

৪৮. *কালে কোছ* (کالے کوس)

৪৯. *দোসরে বরফ বারি ছে পেহলে* (دوسری برف باری سے پہلے)

৫০. *আধে ঘন্টে কা খোদা* (آدھے گھنٹے کا خدا)

৫১. *টুটে হুয়ে তারে* (ٹوٹے ہوئے تارے) : মাকতুবাহ উর্দু, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।[৭১]

পুরস্কার প্রাপ্তঃ

মানবতাবাদ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ১৯৬৬ সালে সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু কমিটি কৃষন চন্দকে প্রথম সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত করেন। এরপর ১৯৬৯ সালে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মভূষণ উপাধি লাভ করেন।

মৃত্যুকালঃ

কৃষণ চন্দর ১৯৭৭ সালে ৮ মার্চ মুম্বাইতে নিজ ঘরে লেখার টেবিলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত লিখে ছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয় তার শেষ উপন্যাস '*ফুটপাত কে ফারিশতে*'।[৭২]

---

[৭১] ড. আহমেদ হাসান, *কৃষণ চন্দর আউর মুখতাছের আফছানে নিগার*, মর্ডান পাবলিসার্স হাউজ, নয়া দিল্লি, ১৯৮৯, পৃ. ১৫৫-১৫৯।

ইসমত চুগতাঈ

জন্ম পরিচিতি:

নাম ইসমত খানম, সাহিত্যিক নাম হলো ইসমত সাহেদ লতিফ বা ইসমত চুগতাঈ। ইসমত চুগতাঈয়ের জন্ম ২১ আগস্ট, ১৯১৫ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের বাদায়ুন জেলায়।[৭২] তিনি বড় হয়েছেন প্রধানত রাজস্থানের যোধপুরে। সেখানে তার বাবা ছিলেন একজন পদস্থ সরকারী আমলা। ইসমত ছিলেন বাবা মায়ের দশ সন্তানের মধ্যে নবম। শিশু বয়সেই তাঁর বড় বোনদের বিয়ে হয়ে যায়। মূলত তিনি বেড়ে উঠেছেন তাঁর ভাইদের সঙ্গ-সহচর্যেই, যেটা তার স্বভাবে এবং লেখায় ভাব সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে বলে তিনি বার বার স্বীকার করেন।

শিক্ষাজীবন:

বাবার সরকারী চাকরির সুবাদে পরিবার সহ তিনি আগ্রায় যান। সেখান থেকে আলীগড় চলে আসেন। চুগতাঈ তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা কলেজ থেকে। আজীব বেগ চুগতাঈর কাছ থেকে তিনি ইতিহাস ও প্রানী বিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন। যখনই তিনি সুযোগ পেতেন চুগতাঈকে পড়াতে শুরু করে দিতেন। হাদিছ ও কুরআন ও তিনি শিক্ষা দেন।[৭৩] পরিবারের দৃঢ় পতিরোধ থাকায় তিনি বাড়ি ছেড়ে লখনৌতে চলে আসেন। সেখানের 'ইসাবেলা থোর্বান কলেজ' লখনৌ থেকে তিনি বি.এ পাস করেন।[৭৪]

কর্মজীবন:

১৯৪১ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে মুম্বাই একটি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে নিযুক্ত হন।[৭৫] ১৯৪২ সালে স্কুল ইন্সপেক্টর হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি উপমহাদেশের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলিম মহিলা বি.এ, বি.এড করা ছিলেন।

পারিবারিক জীবন:

১৯৪২ সাল তার চলচিত্র পরিচালক ও স্ক্রিপ্ট রাইডার শহীদ লতিফের সাথে দেখা হয়। তাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব তৈরী হয় এবং পরবর্তীতে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[৭৬] সীমা সাভনি এবং সাবরিনা লতিফ নামে তাদের ২টি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়।

---

[৭২] ড. আবু সায়্যেদ নূর-উদ্দীন, *তারিখে আদবে উর্দু*, মাগরিবে পাকিস্তান উর্দু একাডেমী, লাহোর, ১৯৯৭, পৃ. ৩৬৭।

[৭৩] ড. মির্জা হামিদ বেগ, *উর্দু আফসানে কি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*,একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৭০৫।

[৭৪] মুহাম্মদ কাছিম সিদ্দিকী, *খাওয়াতিন কে নুমায়েন্দহ আফছানে*, এডুকেশনাল বুক হাউজ, আলীগড়, ২০১৪, পৃ. ৫৭।

[৭৫] মোহাম্মদ আনিসুল হক, *আদবি সাখসিয়াত*, কাফ কিতাব ঘর- ৩৯ পেট্রুওয়াটুন, ঢাকা, পৃ. ২৩৭।

[৭৬] প্রফেসার নুরুল হুসাইন নকবী, *তারিখে আদবে উর্দু*, এডুকেশন বুক হাউজ, আলীগড়, ২০০৪, পৃ. ৩৫৯।

সাহিত্য জীবন:

ইসমত চুগতাঈ যখন নিতান্ত কিশোরী, তখনই তার বড়ভাই মির্জা আজিম বেগ চুগতাঈ একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক ছিলেন। তখন তিনি তার বোনের লেখিকা হয়ে ওঠার পেছনে প্রথম শিক্ষক এবং প্রেরণা দাত হিসেবে কাজ করেনছেন। ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌতে স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রী থাকা কালেই ইসমত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গ সংগঠন 'প্রোগ্রেসিভ রাইটারস এসোসিয়েসান' (পি.ডব্লিউ.এ) এর প্রথম সভায় যোগদান করেন। তিনি প্রথমবারের মতো রশিদ জাহানের সাথে পরিচিত হন। যিনি চুগতাঈকে বাস্তববাদী ও চ্যালেঞ্জিং নারী চরিত্র লিখতে অনুপ্রাণিত করেন। প্রথমদিকে চুগতাঈ ব্যক্তিগত ভাবে লেখালেখি করতেন, প্রকাশের জন্য প্রকাশনা খোঁজ করেননি। মূলত ১৯৩৮ সাল থেকেই তিনি ছোটগল্প লেখা শুরু করেন। তার প্রথম ছোটগল্পটি হল *'কাফের'* যা ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়। [৭৮]

১৯৩৯ সালে উর্দু পত্রিকা 'সাকি'তে 'ফ্যাসাদী' নামে একটি নাটক রচনা করেন। যাকে তার প্রথম প্রকাশিত কাজ হিসাবে ধরা হয়। প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠকরা মনে করেছিল যে তাঁর ভাই আজিম বেগের ছদ্মনামে এটা রচিত হয়েছে। এরপর তিনি অন্যান্য প্রকাশনা এবং সংবাদপত্রের জন্য লেখা শুরু করেন। তার প্রথম দিকের কাজ গুলোর মধ্যে রয়েছে- বাঁচপান, এন অটো বায়োগ্রাফি পিচ, কাফির, হার ফাস্ট সর্ট স্টরি, ডেট, হার ওনলি সলিলকৌই এবং আর কিছু সাহিত্য কর্ম ছিল। তার প্রথম উপন্যাস *'জদ্দি'* ইংরেজি ভাষায় অনুদিত হয় 'Widat Heart' নামে। *'কল্যাণ'* এবং *'কটেন'* নামে তার দুটি ছোটগল্প সংকলন যথাক্রমে ১৯৪১ এবং ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়।

১৯৪২ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত একটি সাহিত্য পত্রিকা *'আদাব-ই-লতিফ'*এ তার ছোটগল্প *'লিহাফ'* প্রকাশিত হয়। তার কেন্দ্রীয় থিম ছিল মহিলা সমকামীতা। উপমহাদেশ জুড়ে *'লিহাফ'* খুব আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং চুগতাঈ তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন। *'লিহাফ'* দুইজন নারী, যাদের একজন স্বামী প্রেম থেকে বঞ্চিত হয় এবং অন্যজন চরিত্রে দাসী। *'লিহাফ'* প্রকাশের পরপরই এ গল্পে অশ্লীলতা ও ধর্মদ্রহিতার অপরাধ এনে লাহোর আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। ক্ষমা প্রার্থনার বদলে তিনি মামলায় লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হন।[৭৯]

পরবর্তীতে তিনি ক্রমবর্ধমান ভাবে লেখালেখিতে জড়িত হয়ে পড়েন। *গেন্ধা*, *খিদমতগার* এর মত সফল ছোটগল্প এবং *'ইনতিখাব'* এর মত নাটক লিখেন তিনি। চুগাতার ছোটগল্পগুলোতে মূলত যে অঞ্চলে তিনি বড় হয়েছেন, তার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে তার লিখিত *'সিকরেট ডিউটি'*তে ভারতের জাতীয় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগত সামাজিক রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। চুগতাঈ এর লেখায় তার ভাইয়ের প্রভাব থাকলেও তিনি

---

[৭৭] মোহাম্মদ আনিসুল হক, *আদবি সাখসিয়াত*, কাফ কিতাব ঘর- ৩৯ পেট্টুওয়াটুন, ঢাকা, পৃ. ২৩৭।

[৭৮] শেহজাদ মানজার, *ইসমত চুগতাই কে ১০ বেহতারিন আফছানে*, তাখলিকাত লাহোর, ১৯৯৭, পৃ. ০৬।

[৭৯] প্রফেসার গুপি চান্দ নারাঙ্গ, *উর্দু আফসানা রুবায়াত আওর মাসায়েল*, এডুকেশন পাবলিকেশন হাউজ, দিল্লী, ১৯৮১, পৃ. ৪৩০।

রশিদ জাহান ও সাদাত হাসান মান্টো দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কিছু পশ্চিমা লেখক যেমন সিগমন্ড প্রয়েড, উইলিয়াম সিডনি পোর্টার, জর্জ বার্নাডশ ও এন্টন চেখভের মতো লেখক দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। [৮০]

স্বামী বিখ্যাত পরিচালক ও চিত্র নাট্য লেখক শহিদ লতিফ চুগতাইকে চলচ্চিত্র দুনিয়ার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ১৯৬৭ সালে শহিদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই দম্পতি বহু চলচ্চিত্রে একসাথে কাজ করে গেছেন।

উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে তিনি তেমন সফল ছিলেন না। তার উপন্যাস *'তেরহি লেকার'* কে উর্দু সাহিত্যে সেরা উপন্যাসগুলোর মধ্যে গণ্য করা হয়। কিন্তু তার অন্যান্য উপন্যাস *জিদ্দি*, *মাছুমা*, *সাউদাই* এবং *দিল কি দুনিয়া* দ্বারা তিনি সমালোচকদের মন জয় করতে পারেননি।

ইসমত চুগতাঈ এর লেখার ধরণ:

উর্দু ভাষায় ইসমত চুগতাই সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম ছিলেন। তিনি ছিলেন বিশ শতকের উর্দু সাহিত্যের আলোকিত, সাহসী, আদর্শবাদী, প্রগতিশীল এবং নারীবাদী লেখক। তিনি সেই যুগে উর্দু সাহিত্যে মার্কসবাদ ও বাস্তবাদের প্রবনতা দেখিয়েছেন। ১৯৪০ এর দশকে নারীবাদ আদর্শ এবং ধারণা তেমনভাবে ভারতবর্ষে পুরোপুরি পৌছায়নি, সেই সময় কালে চুগতাঈ তার লেখায় নারীদের সামাজিক, মনস্তাত্বিক ও যৌন সমস্যা তুলে ধরে সামাজিক বিপ্লব গড়ে তুলেন।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো এবং উপমহাদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে মুসলমানদের জন্যে আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তান কায়েম হলো। তার আত্মীয়-স্বজন, মুসলিম বন্ধু-বান্ধব সহ অনেক লেখক লেখিকা পাকিস্তানে চলে গেলেও চুগতাঈ ভারতেই থেকে যান এবং রশিদ জাহান, ওয়াজেদা তাবাসসুম ও কুররাতুল আইন হায়দারের সঙ্গে মিলে উর্দু সাহিত্যে জন্ম দিলেন এক বিপ্লবী নারীবাদী রাজনীতি ও নন্দন তাত্বিক মূল্যবোধ।

তার লেখায় যৌনতার দিকে তাকিয়েছেন নারীদের দৃষ্টিকোন থেকে। নিপুন ভাবে তুলে এনেছেন নবযুগের ভারতে উদ্ভূত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের জীবন যাত্রাকে এবং সমকালীন আরো বহু বিতর্কিত বিষয়কে। তার উচ্চ কণ্ঠ, আবেগদীপ্ত লিখন শৈলী তাকে তার সমকালের তো বটেই, উত্তর কালের লেখক লেখিকা, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও তাকে পরিণত করেছে এক অনুকরনীয় আদর্শে।

তার গল্পের ভিতর যে সজীবতা, সুগন্ধ তা তার ভেতরকার মেয়ে সত্ত্বা ও ছেলেদের মত মুক্ত জীবন যাপন, এই দুই থেকেই তা সৃষ্ট। মান্টোর ভাষায়- "ইসমতের নারী সত্ত্বা এবং পুরুষ প্রকৃতির মাঝে আজব ধরনের জেদ ও অসঙ্গতি

[৮০] মাহাম্মদ আনিসুল হক, *আদবি সাখসিয়াত*, কোফ কিতাব ঘর- ৩৯ পেট্টুওয়াটুন, ঢাকা, পৃ. ২৩৯।

বিদ্যমান। হয়তো প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন কিন্তু প্রকাশ্যে অনীহা প্রকাশ করে চলেছেন। চুমোর জন্যে হয়তো মন আকুতি জানাচ্ছে কিন্তু চুমোর বদলে সে গালে সুঁই চালিয়ে মজা দেখবেন।” [৮১]

ইসমত নিজেকে সব সময় বাস্তববাদী লেখক বলে দাবী করতেন। তার গল্পের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ তিনি উড়িয়ে দিতেন। তিনি মনে করতেন তিনি দায়বদ্ধ বাস্তবের প্রতি এবং শিল্পের প্রতি।

তার গল্পের চরিত্রের মধ্যে আছে তার পরিবারে সদস্যরা। যেমন তার ভাইকে নিয়ে লিখেছেন দোযখী গল্পটি। পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে তেমন কিছু বলার রেওয়াজ আসলে উপমহাদেশীয় সংস্কৃতিতে নেই। পরিবারের সদস্যদের প্রসঙ্গ আসলেই সবাই সেন্টিমেন্টাল হয়ে ওঠে। তাদের সব সময় আদর্শায়িত করার চেষ্ট করা হয়, এক্ষেত্রে ইসমত প্রথা ভেঙ্গেছেন বললেই চলে।

ইসমত নিজের সম্পর্কে বলা তার কথাগুলো লেখক হিসেবে তার সত্ত্বাকে যথার্থ ভাবে উপস্থাপন করে। তার লেখা- “কলমের হাতে আমি অসহায়। আমার মন ও কলমের মাঝে কেউ দাঁড়াতে পারে না।” ব্যক্তিগত ভাবে ইসমত চুগতাঈ সকল সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ছিলেন। তার কন্যা এবং ভাই ঝি বিয়ে করেছেন হিন্দুকে। ইসমতের নিজের ভাষায়- “তিনি এসেছেন এমন এক পরিবার থেকে, যেখানে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান সবই শান্তিতে বসবাস করে।” তিনি বলেছেন- “তিনি শুধু কোরানই পড়েননি। একই রকম খোলা মনোভাব নিয়ে গীতা আর বইবেলও পড়েছেন।”

তার নির্বাচিত ছোটগল্প সমগ্রগুলো হলো-

১. *কুল্লিয়ান* (کلیاں) : প্রথম সংস্করণ ছাকি বুক ডিপু, দিল্লী থেকে ১৯৪০ সালে এবং দ্বিতীয় সংস্কারণ আয়েনায়ে আদব, লাহোর ও তৃতীয় সংস্করন উর্দু একাডেমী সিন্ধ, করাচী থেকে প্রকাশিত হয়।

২. *চুটিঁ* (چوٹیں) : ছোটগল্প, নাটক ও খাকি এর মিশ্রনে গ্রন্থটি দিল্লী থেকে ১৯৪৪ সালে এবং দ্বিতীয় সংস্কারণ উর্দু একাডেমী সিন্ধ, করাচী ও তৃতীয় সংস্করন আয়েনায়ে আদব, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

৩. *এক বাত* (ایک بات) : মাকতুবাহ উর্দু সরকার রোড, লাহোর থেকে ১৯৫২ সালে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ নয়া আদারাহ সরকার রোড, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

৪. *ছুয়ি মুয়ি* (چھوئی موئی) : উর্দু একাডেমী সিন্ধ, করাচী থেকে ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়।

---

[৮১] খলিলুর রহমান আজমি, *উর্দু মে তারাক্কি পছন্দ আদবি তাহরিক*, এডুকেশন বুক হাউজ, আলী গড়, ২০১৫, পৃ. ১৯৪।

৫. *দু হাত* (دوہاتھ) : শিস মহল কিতাব ঘর, লাহোর থেকে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়।

৬. *কুয়ারি* (کواری) : হিন্দী ছোটগল্প।

৭. *জেহের* (زہر)

৮. *পেহলি লারকি* (پہلی لڑکی)

৯. *খরিদালু* (خریدلو)

১০. *লেহাফ* (لحاف)

১১. *বদন কি খুশবু* (بدن کی خوشبو)

১২. *আধি আওরাত, আধা খাব* (آدھی عورت،آدھا خواب)

১৩. *দোযখ* (دوزخ) : ৫টি ছোটগল্প, ২টি প্রবন্ধ ও ১টি নাটক সংমিশ্রনে প্রকাশিত হয়।[৮২]

পুরষ্কার প্রাপ্তি :

১. ১৯৭৪ সালে গালিব পুরষ্কার, উর্দু নাটক '*তারীহী লেকার*' এর জন্য।
২. ১৯৭৫ সালে ফিল্ম ফেয়ার শেষ্ঠ গল্প পুরষ্কার, চলচ্চিত্র '*গরম হাওয়া*' কাইফি আজমির সাথে।
৩. ১৯৭৫ সালে ভারত সরকার কর্তৃক রাজ্য পুরষ্কার।
৪. ১৯৭৬ সালে ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মশ্রী পুরষ্কার।
৫. ১৯৭৬ সালে উত্তর প্রদেশ সরকার থেকে পুরষ্কার।
৬. ১৯৭৭ সালে গালিব ইনস্টিটিউট থেকে উর্দু নাটক '*তাহির কে জেহের*' এর জন্য গালিব পুরষ্কার।
৭. ১৯৭৯ সালে অন্ধ্র প্রদেশ উর্দু একাডেমী থেকে মাখদুম সাহিত্য পুরষ্কার।
৮. ১৯৮২ সালে সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহেরু পুরষ্কার।
৯. ১৯৯০ সালে রাজস্থান উর্দু একাডেমী হতে ইকবাল অ্যাওয়ার্ড।

মৃত্যুকাল:

২৪ আক্টোবর, ২০০১ সালের মুম্বাইয়ে ইসমত মারা যান।[৮৩] তার মৃত্যুর পর তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে সেখানকার চন্দবাড়ি মহা শ্মশানে দাহ করা হয়।

---

[৮২] ড. মির্জা হামিদ বেগ, *উর্দু আফসানে কি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৭০৬-৭০৭।
[৮৩] প্রফেসার নুরুল হুসাইন নকবী, *তারিখে আদবে উর্দু*, এডুকেশন বুক হাউজ, আলীগড়, ২০০৪, পৃ. ৩৫৯।

রাজেন্দ্র সিং বেদি

জন্ম পরিচিতি:

রাজেন্দ্র সিং বেদি একজন উপন্যাসিক, নাট্যকার, চলচ্চিত্র পরিচালক, চিত্রনাট্যকার এবং বিশেষ করে একজন ছোটগল্পকার হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি নিজেই তার জন্ম সম্পর্কে বলেন, তিনি ১ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ সালে দুপুর ৩:৪৭ মিনিটে লাহোরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম বাবা হীরা সিং বেদি সিং সম্প্রদায় এবং মাতার নাম সেবা দেবী হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ছিলেন। [৮৪] ১৯৩৪ সালে তিনি মাত্র ১৯ বছর বয়সে কাবুলের এক সুন্দরী নারীকে বিয়ে করেন। তিনি ২ কন্যা ও ২ পুত্রের জনক ছিলেন। [৮৫]

শিক্ষাজীবন:

বেদি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন লাহোর থেকে। বাবা বেশির ভাগ সময় অসুস্থ থাকার কারনে তার পড়ালেখা ঠিক মত হয়ে ওঠেনি। মার কাছ থেকে বসে বসে গিতা পাঠ ও গল্প শুনতে শুনতে তার গল্পের প্রতি আগ্রহ জন্মে। তার চাচা একটি স্টিম প্রেস কিনেন, কিনার পর দেখেন সেখানে প্রায় পাঁচ হাজারের মতো বই। বেদি প্রাইমারি থেকে মিডেল ক্লাস যেতে যেতে ঐ সব বই পড়ে ফেলেন। তার পর তিনি ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হন। [৮৬] ১৯৩৩-১৯৩৫ সালে তিনি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। কিন্তু তিনি উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেননি।

কর্মজীবন:

মা মারা যাবার পর তার অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যায়। যার কারনে তিনি ডাক বিভাগে ক্লার্ক হিসেবে কাজ শুরু করেন। নয় বছর পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন। পরে অল ইণ্ডিয়া রেডিও লাহোর দপ্তরে যোগদান করেন। পরে তিনি জম্মু ও কাশ্মীর ব্রডকাস্টিং সার্ভিসে পরিচালক হন। [৮৭] ভারত বিভাজনের সময় তিনি স্থায়ী ভাবে ভারতে চলে আসেন। সেখানে তিনি সফল কয়েকটি চলচ্চিত্রের স্ক্রিপ্ট লিখেন।

সাহিত্য জীবন:

রাজেন্দ্র সিং বেদি উর্দু ছোটগল্পের ঐ সব সুভাগ্যবান লেখকদের মধ্যে অন্যতম যারা প্রাথমিক ছোটগল্পগুলোর মাধ্যমেই ছোটগল্পকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি অন্যান্য আধুনিক ছোট গল্পকারদের নর-নারী প্রেম ঘটিত

---

[৮৪] প্রফেসার ওয়ারিস আলভি, *কুল্লিয়াতে রাজেন্দ্র সিং বেদি*, ভলিউম- ০১, কউমি কান্সিল বারায়ে ফুরুগ উর্দু জবান, নয়ি দিল্লি, ২০০৮, পৃ. ০৯।
[৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।
[৮৬] ড. সৈয়েদ ইজাজ হুসাইন, *মুখতাছের তারিখে আদবে উর্দু*, উর্দু কিতাব ঘর, দিল্লি, পৃ. ২৭০।
[৮৭] প্রফেসার নুরুল হুসাইন নকবী, *তারিখে আদবে উর্দু*, এডুকেশন বুক হাউজ, আলীগড়, ২০০৪, পৃ. ৩৫৮।

বিষয়ের বাইরে গিয়ে মানবজীবনের ছোট ছোট বিষয়বস্তু গুলোকে তুলে ধরেছেন তার প্রতিটা ছোটগল্পতে। তিনি তার ছোটগল্প সমূহে বাস্তবতাকে তাৎক্ষণিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে পটভূমি তৈরি করেননি বরং বাস্তবতাকে নিজ চোখে দেখে ছোটগল্পে বিষয়বস্তু করেছেন। [৮৮] তার সহজ সরল লেখার ধরন পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট করতো। তার ছোটগল্পের প্রভাব পাঠকের মনে এমন ভাবে প্রভাব ফেলত যে সে নিজেই তার ছোটগল্পগুলো পড়ার জন্য নিজেই অগ্রসর হত।

বেদির প্রথম ছোটগল্পটি হলো *দানাহ ও দাম (دانہ ودام)* যা ১৯৩৯-১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়। [৮৯] বেদি তার ছোটগল্প সমূহে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বিষয়বস্তু হিসাবে নিয়েছেন এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। বেদি একজন প্রগতিশীল লেখক হিসাবে মার্কসবাদের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন রাশিয়ান লেখকদেরও অনুসরণ করতেন। বেদি তার ছোটগল্প সমূহে চরিত্রগুলো মনস্তাত্ত্বিক দিকের উপর আলোকপাত করেছেন এবং জীবনের বাস্তবতার সাথে মিল রেখে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার দিকে নজর দিয়েছেন। প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছোটগল্পকারদের মধ্যে রাজেন্দ্র সিং বেদি অন্যতম। সাদাত হাসান মান্টো, কৃষণ চন্দর এবং রাজেন্দ্র সিং বেদি মিলে সাহিত্যিক ত্রিভুজ গঠন করেছিলেন। তাতে বেদী নিজেকে একজন স্বনামধন্য লেখকের প্রতিচ্ছবি রূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৯০]

আহমদ আনসারী বলেন-

مواد اور فن دونوں کے اعتبار سے اگر اردو کے دو بڑے کہانی لکھنے والوں کا نام لیا جائے تو وہ بلاشبہ پریم چند اور راجند سنگھ بیدی ہو سکتے ہیں۔ [৯১]

(বিষয় ও শিল্প উভয় বিচারে যদি দুই জন বড় ছোটগল্পকারের নাম নেওয়া হয়, তাহলে এতে বলতে কোন বাধা নেই যে, প্রেমচাঁদ ও রাজেন্দ্র সিং বেদি শ্রেষ্ঠ।)

সাদাত হাসান মান্টোকে যদিও সর্বোচ্চ সম্মানিত উর্দু সাহিত্যিক ধরা হয়, তবে রাজেন্দ্র সিং বেদি সেখানে অবশ্যই দ্বিতীয় স্থানে থাকবেন। মান্টোর মতো তিনিও ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগ নিয়ে লিখিত গল্পগুলোর জন্য বিখ্যাত। যাতে দুই মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু ঘটে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর দ্বারা অপহরণকৃত নারীদের করুণ কাহিনী তিনি তুলে ধরেছেন। হাজার হাজার নারী তাদের সম্মান বাচানোর জন্য আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলো। নারী চরিত্রগুলির

---

[৮৮] প্রফেসার গুপি চান্দ নারাঙ্গ, *উর্দু আফসানা রুবায়াত আওর মাসায়েল*, এডুকেশন পাবলিকেশন হাউজ, দিল্লী, ১৯৮১, পৃ. ৪০৬।

[৮৯] প্রফেসার ওয়ারিস আলভি, *কুল্লিয়াতে রাজেন্দ্র সিং বেদি*, ভলিয়ম- ০১, কউমি কান্সিল বারায়ে ফুরুগ উর্দু জবান, নয়ি দিল্লি, ২০০৮, পৃ. ০৭।

[৯০] ড. আবু সায়্যেদ নূর-উদ্দীন, *তারিখে আদবে উর্দু*, মাগরিবে পাকিস্তান উর্দু একাডেমী, লাহোর, ১৯৯৭, পৃ. ৩৬৭।

[৯১] খলিলুর রহমান আজমি, *উর্দু মে তারাক্কি পছন্দ আদবি তাহরিক*, এডুকেশন বুক হাউজ, আলী গড়, ২০১৫, পৃ. ১৯৩।

বর্ণনা বেদী বুদ্ধির সাথে সমবেদনা সহকারে বর্ণনা করেছেন। তার কাহিনী গুলোতে তিনি মানুষের আনন্দ, জীবনের আলোক সজ্জা এবং জীবনের অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বোঝাপড়া তুলে ধরেছেন। তার কাহিনীগুলোতে একটি দৃঢ় পরামর্শমূলক উপাদান রয়েছে, যা ভারতীয় ঐতিহ্যের মূলধারার সাথে যুক্ত এবং তার গল্পগুলিতে ভারতীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। রাজেন্দ্র সিং বেদি প্রায় ৭২ টির মতো ছোটগল্প লিখেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুলো নিম্নরুপ-

১. *দানাহ ও দাম* (دانہ و دام) : ১৪ টি ছোটগল্প সহ প্রথম সংস্করন মাকতাবাহ উর্দু লাহোর থেকে ১৯৩৯ সালে এবং দ্বিতীয়বার মাকতাবাহ জামাহ লিমিটেড, দিল্লি থেকে ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়।

২. *গ্রহণ* (گرہن) : ১৪ টি ছোটগল্প সহ প্রথম সংস্করন মাকতাবাহ উর্দু লাহোর থেকে ১৯৪২ সালে এবং দ্বিতীয়বার নয়া দারাহ, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

৩. *ছাত খেল* (سات کھیل) : ৭টি ছোটগল্প ও নাটক, যার প্রথম সংস্করনটি আদবি ছনগম লাহোর থেকে ১৯৪৩ সালে ও দ্বিতীয় বার মাকতাবাহ জামাহ লিমিটেড, দিল্লি থেকে জুন, ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়।

৪. *কুক জলি* (کوکھ جلی) : ১১ টি ছোটগল্প সহ কিতবা পাবলিশার লিমিটেড, মেট্রো প্রেস, বোম্বে থেকে ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয়।

৫. *হাত হামারে কলম হুয়ে* (ہاتھ ہمارے قلم ہوئے) : ১০ টি ছোটগল্প সহ মাকতুবাহ জামাহ, নয়া দিল্লি থেকে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ গুলো পাকিস্তান থেকেও প্রকাশিত হয়।

৬. *এক চাদর মিলি ছি* (ایک چادر میلی سی) : মাকতুবাহ জামাহ, নয়া দিল্লি থেকে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়বার ও মাকতুবাহ জামাহ থেকে ১৯৭৫ সালে প্রকাশ হয়।

৭. *আপনে দুখ মুঝে দে দো* (اپنے دکھ مجھے دے دو) : ৯টি ছোটগল্প সহ প্রথমবার মাকতুবাহ জামাহ, নয়া দিল্লি থেকে ১৯৬৫ সালে ও ঐ প্রকাশনা থেকেই ১৯৭৫ সালে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়।

৮. *মুক্তি বুধ* (مکتی بودھ) : মাকতাব জামাহ লিমিটেড, নয়া দিল্লি থেকে ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৯. *মেহমান* (مہمان) : ৬ টি ছোটগল্প সহ প্রথমবার হিন্দ পাক্ট বক্স, দিল্লি থেকে এবং দ্বিতীয়বার উর্দু পাক্ট বক্স (পাকিস্তান), করাচী থেকে প্রকাশিত হয়।

১০. *জুগিয়া* (جوگیا) : রুমানি ছোটগল্প, যা উর্দু পাক্ট বক্স (পাকিস্তান), করাচী থেকে প্রকাশিত হয়।

১১. *কন্দন* (کندن) : মাকতাব উর্দু আদব লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

১২. *বেদি কে আফসানে* (بیدی کے افسانے) : মাকতাব উর্দু আদব লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

১৩. *লম্বি লারকি* (لمبی لڑکی) : নয়ি এদারাহ লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

১৪. *বিল্লী কা বাচ্চাহ* (بلی کا بچہ)

১৫. *লাজুন্তি* (لاجونتی) : নায় এরাদাহ লাহোরে থেকে প্রকাশিত হয়।

১৬. *লমছ্* (لمس) । [৯২]

তার অনূদিত গল্পটি হল *(এক চাদর মিলি ছে)* ایک چادر میلی سی ইংরেজীতে যা I Take this Woman, যার জন্য তিনি ১৯৬৫ সালে Sanitya Akademi Award পান। এই বইটি পরে বাংলা, হিন্দি এবং কাশ্মীরী ভাষায় অনুবাদ হয়।

চলচ্চিত্র:

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তিনি বোম্বে চলে যান এবং ডি. ডি. কাশএয়াপ এর সাথে কাজ করা শুরু করেন। ১৯৪২ সালে তিনি প্রথম 'বাড়ি বানেন' এর ডায়লগ লিখেন। যদিও তিনি ১৯৫২ সালে তার দ্বিতীয় চলচ্চিত্র 'দাগ' এর জন্য বেশি প্রশংসিত হয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালে তিনি আমার কুমার, বালরাজশাহী, গীতা বেলী এবং আর অনেককে নিয়ে *'চিনি কোপারেটিভ'* নামে একটি কোম্পানী খুলেন।

১৯৫৫ সালে বেদীর *'গরম কোট'* ছোটগল্পের উপর নির্মিত সিনেমা *'রানগোলি'* তে তিনি পরিচালনায় অংশ নেন। এরপর তিনি বিরতহীন ভাবে মির্জা গালিব, দেবদাস, মধুমতি, অনুরাধা, অনুপমা, সত্যাকম, অভিমান বিখ্যাত হিন্দি ক্ল্যাসিক মুভির চিত্রনাট্য লিখে যান। তার উপন্যাস *'এক চাদর মিলিছে'* থেকে পাকিস্তানে ছবি বানানো হয়েছে।

[৯২] ড. মির্জা হামিদ বেগ, উর্দু *আফসানে কি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৪৪০-৪৪২।

তিনি প্রধানত উর্দুতেই সিনেমার স্ক্রিপ্ট লিখেছেন। সেই সময়ে তিনি সবচেয়ে দামি স্ক্রিপ্ট লেখকদের একজন ছিলেন। তার পুত্র নরেন্দ্র বেদি চলচ্চিত্র পরিচালক ছিলেন। রাজেন্দ্র সিং বেদির স্মৃতি রক্ষায় পাঞ্জাব সরকার উর্দু সাহিত্যে 'রাজেন্দ্র সিং বেদি এওয়ার্ড' চালু করেছে।

তার উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র সমূহ-

1. Ek Chandar Maili Si- [Story]
2. Aankhir Dekhi- [Director]
3. Mutthi Bhar Chawal- [story]
4. Nawab Sanib- [Director]
5. Pnagun- [Director, Producer]
6. Abhimaan- [dialogue]
7. Granan- [story]
8. Dastak- [Direction, Screen Writer]
9. Satyakan- [Dialogue]
10. Mere Hamdam Mere Dost- [Screen Writer]
11. Ba naron Ke Sapne- [Dialogue]
12. Anupama- [Dialogue]
13. Mere Sanam- [Screen Writer, Dialogue]
14. Rangoli- [Dialogue, Screen Writer]
15. Aas Ka panchni- [Screen Writer]

পুরস্কার:

১. ১৯৫৯ সালে ফিল্ম ফেয়ারে "মধুমতি"র জন্য সেরা ডায়লগ এওয়ার্ড পান।

২. ১৯৬৫ সালে "*এক চাদর মিলি ছে*" এর জন্য সাহিত্য একাডেমী এওয়ার্ড পান।

৩. ১৯৭১ সালে ফিল্ম ফেয়ারে "সাতইয়াকাম" জন্য সেরা ডায়লগ এওয়ার্ড পান।

৪. ১৯৭৮ সালে উর্দু নাটকের জন্য গালিব এওয়ার্ড পান।

মৃত্যুকাল:

১১ নভেম্বর, ১৯৮৪ সালে বেদি বোম্বে মারা যান।[৯৩]

---

[৯৩] পদ্মা পেহদেইউ, (অনুবাদক: মারগুব আলী), *বদি ছে এক গুফতাগু*, মাতবুয়াহ দস্তাবেজ, রাউলপিন্ডি, ১৯৮৭, পৃ. ৪৪২।

খাজা আহমদ আব্বাস

জন্ম পরিচিতি:

খাজা আহমদ আব্বাস সাধারণত কে. এ আব্বাস নামে বেশি জনপ্রিয়। খাজা আহমদ আব্বাস ৭ জুন, ১৯১৬ সালে ভারতের হরিয়আনা জেলার পানিপথে জন্ম গ্রহণ করেন। খাজা আহমদ আব্বাস উর্দু কবি খাজা আলতাফ হোসেন হালির পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার দাদা খাজা গোলাম আব্বাস ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহ আন্দোলনের প্রধান বিদ্রোহীদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং পানি পথের প্রথম শহীদ তিনি। তার বাবা গোলাম-উস-সিবলেইন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক করেছিলেন। আব্বাসের মা মাসরুর খাতুন শিক্ষাবিদ সাজ্জাদ হোসেনের মেয়ে। ১৯৪০ সালে আব্বাস মুজতবাই খাতুনকে বিয়ে করেন। মাত্র ১৮ বছর তাদের বিয়ে স্থায়ী ছিল। কেননা মুজতবাই খাতুন ১৯৫৮ সালে মার যান।[৯৪]

শিক্ষাজীবন:

আব্বাস তার প্রাথমিক শিক্ষা 'হালি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়' থেকে শুরু করেন, যা তার মহান পিতামহ হালি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তিনি পানির পথে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। শৈশবে বাবার কথা মত কুরআন পাঠ শিখেন। আব্বাস পনের বছর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন সম্পন্ন করেন। ১৯৩৩ সালে ইংরেজী সাহিত্যে বি.এ. ১৯৩৫ সালে আলীগড় মুসিলম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি পাশ করেন।

কর্মজীবন:

আব্বাস কর্মজীবন শুরু করেন সাংবাদিক হিসেবে। বি.এ সমাপ্ত করার পর নতুন দিল্লির 'ন্যাশনাল কল' পত্রিকায় যোগদান করেন। ১৯৩৪ সালে আইন অধ্যায়নরত অবস্থায় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'Aligarh Opinion' এ কাজ করেন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে তার শিক্ষা সমাপ্ত করার পর আব্বাস ১৯৩৫ সাল বম্বে ক্রনিকলে যোগদান করেন। তিনি মাঝে মাঝে সামালোচক হিসেবে লিখতেন কিন্তু পত্রিকার চলচ্চিত্র সমালোচকের মৃত্যুর পর তাকে চলচ্চিত্র বিভাগের সম্পাদক করা হয়। ১৯৩৬ সালে তিনি বম্বে টকিজের জন্য পটি পাবলিকেস্ট হিসেবে চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেন। হিমাংশু রায় এবং দেবিকা রাণীর মালিকানাধীন একটি প্রযোজনা হাউস, যেখানে তিনি তার প্রথম চিত্রনাট্য 'নয়া ছনছার' বিক্রি করেন।

---

[৯৪] ড. মির্জা হামিদ বেগ, *উর্দু আফসানে কি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৬৮১।

১৯৩৫ সালে বম্বে ক্রনিকলে লেখা শুরু করেন। বম্বে ক্রনিকলে কাজ করার সময় তিনি 'লাস্ট পেজ' নামে একটি কলাম লিখতে শুরু করেন।

আব্বাস সিনেমার জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে শুরু করেন। চাদ আনন্দের জন্য 'নিছা নগর' এবং 'আনন্দ এন্ড ড. কটনিছ কি আমার খানি' লিখেন ভি. শান্তা রামের জন্য। তিনি উর্দু এবং হিন্দিতে চলচ্চিত্র তৈরি করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি 'ধারতী কী লাল' চলচিত্রের মাধ্যমে পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।[৯৫] যা ১৯৪২ সালে 'বেঙ্গল দুর্ভিক্ষ' এর ওপর ভিত্তি করে তৈরী করেন। এখানে তিনি বাংলার ভয়াবহ মন্বন্তর নিয়ে কৃষণ চন্দরের গল্প 'অন্নদাতা' অবলম্বনে তৈরী করেন। ১৯৫১ সালে তিনি 'নয়া ছনছা' নামে 'প্রোডাকশন কম্পানী' তৈরী করেন। যেখানে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার উপর ভিত্তি করে 'আনহোনি, মুন্নি, রাহি শেহর আওর সপ্না, শাত হিন্দুস্তানী'র মত চলচ্চিত্র তৈরী করেন।

১৯৬৮ সালে তিনি 'চার্হ আহার এক খানি' নামে একটি ডকুমেন্টারি তৈরী করেন। কিন্তু প্রদর্শনী জন্য সেন্সর বোর্ড গ্রহণ না করলে তিনি শেষ পর্যন্ত মামলা করে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট থেকে সাংবিধানিক বৈধতার ভিত্তিতে অনুমতি আনেন।

সাহিত্যকর্ম:

উর্দু সাহিত্যের অন্যতম লেখক খাজা আহমদ আব্বাস কৃষন চন্দর, সা'দাত হাসান মান্টো, রাজেন্দ্র সিং বেদী প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকদের সমসাময়িক ছিলেন। তার লিখিত ছোটগল্পের সংখ্যা শতাধিক। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভিত্তিক তার বিখ্যাত একটি উপন্যাস হল *'ইনকিলাব'*, আর *'রিটার্ণ টিকিট'* তার গল্প সংকলন। অসাধারণ লেখনী খাজা আহমদ আব্বাসের। খাজা আহমদ আব্বাস ইংরেজি, উর্দু এবং হিন্দিতে প্রায় ৭০ টির মতো বই প্রকাশ করেন এর মধ্যে অন্যতম ছোটগল্পগুলো হলো-

১. *মোহাম্মদ আলী* (*محمد علی*) : হালী পাবলিশার্স হাউজ, দিল্লি, ১৯৩৬ সাল প্রকাশিত হয়।

২. *এক লারকি* (*ایک لڑکی*) : মাকতুবাহ উর্দু সরকার রোড, লাহোর থেকে ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণটি ডিসেম্বর ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. *জাফরান কে ফুল* (*زعفران کے پھول*) : কিতাব পাবলিশার্স, বোম্বে থেকে ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়।

৪. *ম্যাঁয় কুন হুঁ* (*میں کون ہوں*) : নওহিন্দ পাবলিশার্স, বোম্বে থেকে ১৯৪৯ সাল প্রকাশিত হয়।

---

[৯৫] ড. মির্জা হামিদ বেগ, *উর্দু আফসানে কি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৬৮১।

৫. *কেহতে হ্যায় জেছ কো ইসক্* (کہتے ہیں جس کو عشق) : পারভিন বুক ডিপু, এলাহবাদ থেকে ১ম সংস্করণটি ১৯৫৪ সালে এবং ০৩ টি ছোটগল্প সহ ২য় সংস্করণটিও ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়।

৬. *দিয়া জলে ছারি রাত* (دیا جلے ساری رات) : ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়।

৭. *গিহু আওর গোলাব* (گیہوں اور گلاب) : ০৭ টি ছোটগল্প সহ এশিয়া পাবলিশার্স, দিল্লি থেকে ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়।

৮. *লাওয়ান মাছবুরি* (لوان مسوری) : ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয়।

৯. *নয়ী ধরতী নয়ে ইনছান* (نئی دھرتی نئے انسان) : ১৫ টি ছোটগল্প সহ মাকতুবাহ জামিয়াহ লিমিটেড, নয়া দিল্লি থেকে ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়।

১০. *নিলি ছারি* (نیلی ساری) : মাকতুবাহ জামিয়াহ লিমিটেড, নয়া দিল্লি থেকে ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়।

১১. আন্ধেরা ওজালা (اندھیرا اجالا)

১২. *পাও মে ফুল* (پاوں میں پھول)

১৩. *তিন পাহিয়ে* (تین پہیے) ।[৯৬]

এছাড়াও তার ইংরেজী বইগুলো হলো-

১. *Inqilab*: ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হয়।
২. *Rice and other stories*: ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়।
৩. *A Novel of The India of Today*: ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়।
৪. *I Write and Feel*: ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়।
৫. *Blood and stores and other stories*: ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয়।
৬. *Face to Face with Khruchev*: ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়।
৭. *Till We Reach The Stars*: ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়।

---

[৯৬] ড. মির্জা হামিদ বেগ, *উর্দু আফসানে কি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৬৮২-৬৮৩।

৮. *India Gandhi, Return of the Rose*: ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয়।

৯. *Mera nam Joker*: ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়।

১০. *Boy meets Girl*: ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয়।

১১. *That Women-Her Seven Years In Power*: ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয়।

১২. *Face To Face With Indira Gandhi*: ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়।

১৩. *Distant Dream*: ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয়।

১৪. *Mad Mad Mad World of Indian Films*: ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়।

১৫. *Barrister At Law*: ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়।

১৬. *Tomorrow is ours.*

১৭. *One Did Not Come Back*

১৮. *Mussolini and Fascism*

১৯. *An Indian looks at America.*

২০. *The Walls lf Glass.*[৯৭]

২১. *Outside India, the Adventures of a Roving Reporter.*

২২. *Let India fight for Freedom.*

২৩. *Defeat for Death: A story without names.*

২৪. *Not all lies*

২৫. *Kashmir Fights for Freedom*

২৬. *In the image of Mao fse- Tung.*

২৭. *First Geat Noel of the Indian Revolution.*

২৮. *The Black Sun and other stories.*

২৯. *Divided Heart.*

৩০. *When Night Fall.*

৩১. *The most beautiful I woman in the World.*

৩২. *Bobby*

---

[৯৭] ড. মির্জা হামিদ বেগ, *উর্দু আফসানে কি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৬৮৩।

খাজা আব্বাসের জীবনী এবং কর্মজীবনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সময় বই এবং আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে। তাকে উর্দু ছোটগল্পের প্রথম সারির প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে ধরা হয়। পৃথিবী ব্যাপি খাজা আহমদ আব্বাস একজন সাংবাদিক এবং চলচ্চিত্রকার হিসাবেই পরিচিত ছিলেন বেশী। অধিকাংশ মানুষই জানে না তিনি প্রায় ৭৩ টি বই লিখেছেন উর্দু, ইংরেজী ও হিন্দি ভাষায়। তার মধ্যে রয়েছে ১৫ টি উপন্যাস এবং ৭ টি ছোটগল্প সংকলন। তার ছোটগল্প সংকলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হলো নিম্নরুপ-

১. *Blood and stones and other stories*- ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়।
২. *Cages of Freedom and other Stories*- ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়।
৩. *Rice and other stories*- ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়।
৪. *One thousand Nights on a bed of stores and other stories*- ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়।
৫. *The Black Sun and other stories*- ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়।
৬. *Men and Women*- ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়।
৭. *The Gun and other Stories*- ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয়।

পাঁচ দশকের কর্মজীবনে তিনি অনেক ধরনের কাজই করেন। তার বিভিন্ন কাজ রাশিয়ান, জার্মানী, ইতালীয়, ফেঞ্চ, আরবি এবং বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। আব্বাস সাহিত্যিক ক্ষেত্রগুলিতে কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। যার মধ্যে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী Khrushchov আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, চার্লি চ্যাপলিন, মাও-সে-তুং এবং ইউরি গ্যাগারিন ছিলেন। তার আত্মজীবনী I am not as Island ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয় এবং পরে ২০১০ সালে তা ফ্লিম আকারে মুক্তি পায়।

খাজা আহমদ আব্বাস একজন অসাধরণ লেখক ছিলেন। তিনি তার লেখায় প্রধানত সাধারণ মানুষের জীবনই তুলে ধরেছেন, যারা তাদের জীবন সংগ্রামে বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ে অংশ নেয়। তিনি তার লেখনীতে যথেষ্ট পরিমানে মহাত্মা গান্ধী এবং মার্কসবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি তার লেখায় দারিদ্র, ক্ষুধা, শোষণ ও প্রতিবাদ, বিচ্ছিন্নতা, পিতৃতান্ত্রিকতা এবং নারী কণ্ঠের উত্থান সহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছেন। খাজা আবাবসের সবচেয়ে বিখ্যাত ছোটগল্প *‘স্পারোস’* উর্দুতে প্রকাশিত হয় *‘আবাবিল’* নামে, যখন তার বয়স মাত্র ২৬ বছর। তার সর্বশেষ ছোটগল্পের সংকলন *‘এন ইভিনিং ইন লুকনাও’* তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় *‘সোরেশ কোহলি’* সম্পদনায়।

পুরষ্কার:

চলচিত্রের জন্য তিনি ভারতের চারটি ন্যাশনাল ফ্লিম এওয়ার্ড জিতে নেন এবং কান চলচিত্র উৎসব থেকে প্যালস ডি অর লাভ করেন। কেরলভি ভেরী ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভালে ক্রিস্টাল গ্লোব জিতেন। পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকার হিসাবে তাকে ভারতীয় সমান্তরাল বা নব্য বাস্তব সম্মত চলচ্চিত্রের অগ্রদূত হিসেবে ধরা হয়। একজন চিত্রনাট্যকার হিসেবে তিনি রাজ কাপুরের সেবা চলচ্চিত্রের লেখার জন্যও বিখ্যাত হন।

তিনি সাত হিন্দুস্থানি সিনেমার জন্য নার্গিস দত্ত পুরষ্কার জিতেছিলেন এবং একে বলিউডের অমিতাভ বচ্চনের প্রথম ছবি হিসেবে ধরা হয়। ১৯৬৯ সালে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মশ্রী পদকে ভূষিত হন। এছাড়া তিনি গালিব পুরষ্কার, সোভিয়েত পুরষ্কার সহ চলচ্চিত্র ও সাহিত্যে অবদানের জন্য বিভিন্ন পুরষ্কারে সম্মানিত হন।

মৃত্যুকাল:

তিনি ৭২ বছর বয়সে ১ জুন, ১৯৮৭ সালে মুম্বাইতে ইন্তেকাল করেন।

আশফাক আহমদ

জন্ম পরিচিতি:

প্রকৃত নাম আশফাক আহমদ খান। ছদ্ম নাম আশফাক আহমদ। তিনি ভারতের হুশিয়ারপুর জেলার খানপুর নামক একটি ছোট্ট গ্রামে ডা: মোহাম্মদ খানের ঘরে বৃষ্টি বিঘ্নিত রাতে রোজ সোমবার ২২ আগস্ট, ১৯২৫ সালের জন্ম গ্রহণ করেন। আশফাক আহমদ এক পাঠান ঘরের সন্তান ছিলেন। তার পিতা একজন পারিশ্রমিক কৃষক এবং জাবের পাঠান ছিলেন।

শিক্ষাজীবন:

আশফাক আহমদের জন্মের পর তার পিতা ড. মুহম্মদ খান খানপুর (ভারত) থেকে বদলী হয়ে পিরোজপুরে যান। আশফাক আহমদ তার প্রাথমিক শিক্ষা ফিরোজপুর গ্রামের কেছবা মিকেছতার স্কুল থেকে ১৯৪৩ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তিনি ফিরোজপুর "রাম শিখ দাস" নামক কলেজ থেকে এফ.এ পাশ করেন। তাছাড়াও তিনি ফিরোজপুরের আর.এস.ডি কলেজ থেকে সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়ে বি.এ পাশ করেন। পাকিস্তান ভাগের পর আশফাক আহমদ তার পরিবারের সাথে ফিরোজপুর থেকে পাকিস্তানে চলে আসেন। পাকিস্তানে আসার পর তিনি গভর্মেন্ট কলেজ লাহোরে উর্দু বিভাগে এম.এ. তে ভর্তি হন। সেখানে তিনি প্রথম বর্ষের ফলাফলে প্রথম স্থান অর্জন করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। তিনি ফাইনাল পরীক্ষায় সে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রথম স্থান অর্জন করেন। তিনি ইতালী রোম ইউনিভার্সিটি থেকে ইতালী ভাষায় ডিপ্লোমা করেন। ফ্রান্সের গ্যানুবেন ইউনিভার্সিটি থেকে ফেঞ্চ ভাষায় ডিপ্লোমা করেন। তাছাড়াও তিনি নিউইয়োর্ক ইউনিভার্সিটি আমরিকা থেকে ব্রড কাস্টিং এর উপর ট্রেনিং নেন।

কর্মজীবন:

১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান ভাগ হওয়ার পর তিনি পরিবারের সাথে লাহোরে চলে আসেন এবং একটি ভূস্মীভূত বাড়ীতে অবস্থান করতে থাকেন। আর্থিক দূর্বলতা হেতু চাকুরীর জন্য বিভিন্ন অফিসে দারস্থ হন। অবশেষে ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট দ্বারা রেলওয়ের চাকুরীতে যোগদান করেন। সে সময়ই বানু কুদসিয়ার সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কুদসিয়া তার লাহোর কলেজের উর্দু সাহিত্য চক্রের একজন সহপাঠী ছিলেন। পরে তিনি লাহোরের দয়াল সিং কলেজে দুই বছরের জন্য উর্দু প্রভাষক হিসেবে কাজ করেন। পরে তিনি ইতালীতে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি আদবী মজলিস দাস্তান নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেন, যা প্রাথমিক ম্যাগাজিন হিসাবে গণনা করা হয়। উর্দুতে অপসেট পেপারে তা মুদ্রিত হয়। তিনি দুই বছর পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে লাইল এবং নাহার শিরোনামে তাতে লিখতেন। তিনি ১৯৬৬ সালে কেন্দ্রীয় উর্দু বোর্ডের

পরিচালক নিযুক্ত হন, পরে তিনি উর্দু বিজ্ঞান বোর্ডে বদলী হন। এই পদে তিনি ২৯ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত এই সংস্থার সাথে যুক্ত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউল হকের শাসনামলে তিনি ফেডারেল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সাহিত্য জীবনঃ

শৈশবেই তিনি গল্প লিখা শুরু করেন। যা তখনকার সময়ের পত্রিকায় প্রকাশ হত। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত *ডাডরিয়া* নামক ছোটগল্পটি শৈল্পিক শব্দ চয়নে লিখার কারনে সে সময়কালে কিংবদন্তী খেতাব লাভ করেন। উর্দু সাহিত্যে গল্প লিখায় তিনি সে সকল শব্দ বা গল্পের অনুষদভুক্ত শিল্পরূপ ব্যবহার করেছেন তা অন্য কোন লেখকের মধ্যে কমই দেখা গেছে। *এক মুহাব্বত ছো আফসানে* (ایک محبت سوافسانے) এবং *উজলে ফুল* (اجلے پھول) তার প্রথম ছোটগল্প। তার পরে *ছফর দর ছফর* (ছফরনামা), *খেল কাহানি* (নবেল), *এক মুহাব্বত ছো ড্রামে* (নাটক সিরিজ) তার প্রসিদ্ধ লিখনী ছিল। স্বামী স্ত্রী মিলে লাহোর থেকে দাস্তান গোর নামক একটি সাহিত্য পত্রিকা বের করেন। তখন থেকেই তার রেডিওর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। রেডিও আর্টিস মো: হুসাইন যিনি আলী বাবা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আশফাক আহমদ'কে তিনি নাটক লেখার দিকে নির্দেশ দেন। ১৯৬৫ সালে তিনি 'রেডিও পাকিস্তান লাহোর'এ 'তালকিন শাহ' নামে সাপ্তাহিক ফিচার প্রোগ্রাম করা শুরু করেন। জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং তা ত্রিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে চলে। ১৯৮৭ পর্যন্ত তালকিনে শাহ ব্যতীত তিনি ৪৮ টি রেডিও নাটক লিখেন। পাকিস্তান টেলিভিশনের জন্য কমপক্ষে তিনি ৩৫০ টি ফিচার এবং নাটক লিখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পগুলি হলো-

১. *এক মুহাব্বত ছো আফসানে* (ایک محبت سوافسانے) : ১৩ টি ছোটগল্প সহ সঙ্গেমিল পাবলিকেশন, লাহোর থেকে ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয়।
২. *উজলে ফুল* (اجلے پھول) : ০৮ টি ছোটগল্প এবং ০১ টি সংবাদ সহ বুক লেন্ড, লাহোর থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়।
৩. *ছফর মিনা* (سفر مینا) : ১১ টি ছোটগল্প সহ সঙ্গমিল পাবলিশার্স, লাহোর থেকে ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়।
৪. *ছুবহানে আফছানে* (صبحانے افسانے) : ২২ টি ছোটগল্প সহ প্রকাশিত হয়।
৫. *ফেল কারী* (پھلکاری) : ৪ টি ছোটগল্প সহ প্রকশিত হয়।
৬. *গায়রে মাতবুয়াহ আফছানে* (غیر مطبوعہ افسانے) : ৩ টি ছোটগল্প সহ প্রকশিত হয়।

আসফাক আহমদ ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ৩৫ টি ছোটগল্প লিখেন। ৩২ টি ছোটগল্প উপরোক্ত বইগুলোতে প্রকাশিত হয়। বাকী ০৩ টি ছোটগল্প অন্যান্য প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়। সে গুলো হলো-

১. *মাষ্টার রোশনি* (ماسٹر روشی) : ছোটগল্পটি ১৯৭১ *কে মুনতাখাব আফসানে* (1971کے منتخب افسانے) বইয়ের ২৫-৪৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।

২. *ছুনে* (سونی) : ছোটগল্পটি *(আদব লতিফ)* (ادب لطیف) এর ৩-৪ সংখ্যায় ২৪-৫৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ১৯৮৩ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

৩. *বন্দর লোগ* (بندر لوگ) : ছোটগল্পটি *নয়া দোর* (نیا دور) করাচী থেকে প্রকাশিত হয়। [৯৮]

পুরস্কার প্রাপ্তি:

১৯৭৯ সালে তিনি 'প্রাইড অফ পারফরমেন্স অ্যাওয়ার্ড' এবং 'সিতার-ই-ইমতিয়াজ' পুরস্কার লাভ করেন।

মৃত্যুকাল:

লিভার ক্যান্সারে হঠাৎ ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। পরে তাকে পাকিস্তানের লাহোর মডেল টাউনে সমাহিত করা হয়।

---

[৯৮] ড. মির্জা হামিদ বেগ, *উর্দু আফসানে কি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৮৪১-৮৪২।

জুগেন্দর পাল

জন্ম পরিচিতি:

প্রকৃত নাম জুগেন্দর পাল। সাহিত্যিক নামও জুগেন্দর পাল। ৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৫ সালে পশ্চিম পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম লাল চান্দ ছেঠী (১৮৯০-১৯৪৮)। মাতা মায়া দেবী (১৮৯৩-১৯৬৬)। লাল চান্দ ছেঠী একজন দোকানদার ছিলেন। জুগেন্দর ১৯৪৮ সালে তিনি আফ্রিকার এক মেয়ে কৃষ্ণা পাল (১ ডিসেম্বর, ১৮২৯) কে বিয়ে করেন। তাদের পরিবারে দুই ছেলে সুধির, সুনিত ও এক মেয়ে ছুকরিতা জন্ম গ্রহণ করে।[৯৯]

শিক্ষাজীবন:

জুগেন্দরের মাতৃভাষা ছিল পাঞ্জাবি। কিন্তু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা উর্দুর মাধ্যমে করেন। তিনি গন্ডাসিং হাই স্কুল, শিয়ালকোট থেকে ১৯৪১ সালে মেট্রিক পাশ করেন। পিতা একজন সাধারণ দোকানদার হওয়ার কারনে জুগেন্দর পাল অনেক কষ্টে শিষ্ঠে এফ.এস.সি পাশ করেন। মারি কলেজ, শিয়ালকোট থেকে ১৯৪৮ সালে বি.এ পাশ করেন। পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, লাহোর থেকে ইংরেজীর উপর ১৯৫৫ সালে এম.এ পাশ করেন।[১০০]

কর্মজীবন:

বি.এ তে যখন ভর্তি হন, তখন তার পড়াশুনার খরচ চালাতে তার পিতার কষ্ট হয়। তাই তিনি প্রাইভেট পড়ানোর পাশাপাশি দৈনিক হাজিরায় মিলিটারীর একটা প্যারাসুট কম্পানিতে 'ডিসপাচ ক্লার্ক' হিসেবে চাকরী নেন। কিছুদিন তিনি একজন 'স্পর্টস সাপ্লাই' এর টুরিস্ট এজেন্ট হিসাবেও কাজ করেন। বি.এ পাশ করার পর ১৯৪২ সালে 'মিলিটারী একাউন্স' দপ্তরে ক্লার্ক হিসেবে চাকুরী শুরু করেন। ১৯৪৭ সাল তিনি অমৃতসারে চলে যান এবং সেখানে তার এক ধনাট্য মামার এজেন্সীর সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করেন। কিন্তু তিন মাস পর তিনি শিয়ালকোটে ফিরে আসেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারনে ১৯৪৮ সালে তিনি আবার আম্বারে চলে যান। আম্বারে এসে তিনি আবার তার বাবার দোকানে দুধের ব্যবসার সাথে জড়িয়ে পড়েন। একই বছরে তার পিতা মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৪৮ সালে কৃষ্ণা পালের সাথে বিয়ে হয়। ঐ সময় কৃষ্ণা পাল জামেয়া মিল্লা ইসলামিয়া দিল্লি কলেজে ইংরেজীর প্রভাষক ছিলেন। বিয়ের পর স্ত্রী কৃষ্ণা পালের সাথে পূর্ব আফ্রিকার নাইরোবীতে চলে যান। সেখানে ১৯৪৯ -১৯৬৪ পর্যন্ত কেনিয়া এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে ডিউক গ্লাসিসটার স্কুলে নাইরোবিতে স্কুল শিক্ষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৪ সালে

---

[৯৯] মাহনামা চাহারছো, রাউলপিন্ডি, ভলিয়ম: ১১, মার্চ ও এপ্রিল ২০০২, পৃ. ৫।

[১০০] ড. মির্জা হামিদ বেগ, *উর্দু আফসানে কি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৯৪৩।

কেনিয়ার স্বাধীনতার পর এডুকেশন অফিসার পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে ভারতে ফিরে আসেন এবং মহা রাষ্ট্রের আওরঙ্গবাদে বসবাস শুরু করেন। ১৯৬৪-১৯৬৫ পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের এইচ.বি কলেজ আওরঙ্গবাদে ইংরেজী ভাষার প্রফেসর এবং ১৯৬৫-১৯৭৮ পর্যন্ত ঐ কলেজের প্রেন্সিপাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৪ বছর পর সেখান থেকে ছুটি নিয়ে করে দিল্লি চলে আসেন এবং এখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন।[১০১] জীবনের শেষ কাল পর্যন্ত তিনি কেনিয়া থেকে বৃটিশ পেনশন পান আর ফ্রিলেন্স সাহিত্যিক হিসেবে জীবন যাপন করেন।

সাহিত্য জীবনঃ

যখন প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে উর্দু ছোটগল্পের বীজ জন্ম নিচ্ছিল যখন তখনই জুগেন্দর পাল এই সাহিত্য চক্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। জুগেন্দর পাল এমন বিরল গল্পকারদের একজন যারা শুরু গল্পের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে জানতেন এমন নয় বরং এইগুলি অসাধারণ ভাবে একত্রিত করতে জানতেন। জুগেন্দর পালের গল্পগুলো শুধুমাত্র ভারতে নয় বরং পাকিস্তানেও ব্যাপক পরিসরে জনপ্রিয়। তার গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে সামাজিক অসুস্থতা এবং মানুষের জীবন সংগ্রাম ফুটে উঠেছে।

১৯৬১ সালে তার প্রথম ছোটগল্পের সংকলন *'ধরটি কা কাল'* প্রকাশিত হয়। আফ্রিকায় অনেক বছর থাকার ফলে সেখানে পরিবেশ সম্পর্কে জানতেন এবং আফ্রিকান পরিবেশের বিভিন্ন অনুভূতি তার এই ছোটগল্পের ভিতর তুলে ধরেন। জুগেন্দর পালের ২টি উপন্যাস, ৩টি সংক্ষিপ্ত উপন্যাস, ১৩ টি ছোটগল্প সংকলন, ২টি সমালোচনা মূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার প্রথম ছোটগল্পটি *'তিইয়াগ ছে পেহলে'* যা ১৯৪৫ সাল মাহনামা (ছাকি) দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়।[১০২] তার বিখ্যাত ছোটগল্পের মধ্যে রয়েছে-

১. *ধরতি কা কাল* (دھرتی کاکال) : ১১টি ছোটগল্প সহ হালি পাবলিশার্স, দিল্লী থেকে ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়।
২. *ম্যয় কিয়ুঁ ছুচুও* (میں کوں سوچوں) : ৬ টি ছোটগল্প সহ আদবাস্তান উর্দু, অমৃতসার থেকে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়।
৩. *রেছায়ি* (رسائی) : ০৮ টি ছোটগল্প সহ নাছরত পাবলিশার্স, লাখনৌ থেকে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়।
৪. *মিট্টি কা ইদরাক* (مٹی کاادراک) : ১৩ টি ছোটগল্প সহ লাজপুত রায় এডিসন্স, দিল্লী থেকে ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয়।
৫. *লেকিন* (لیکن) : ২০ টি ছোটগল্প সহ উর্দু পাবলিশার্স, লাখনৌ থেকে ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়।

---

[১০১] জুগেন্দর পাল, *জুগেন্দর পাল কি কাহানিয়া*, তাখলিককার পাবলিশার্স, দিল্লি, ২০০৫, পৃ. ২৭০।
[১০২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০।

৬. *বে মুহাবেরা* (بے محاورہ) : ২৪ টি ছোটগল্প সহ কৈলাশ পাবলিশার্স, আওরঙ্গবাদ থেকে ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয়।

৭. *বে এরাদাহ* (بے ارادہ) : ২৩ টি ছোটগল্প সহ জম জম বুক টেস্ট, দিল্লী থেকে ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়।

৮. *ছেলুটিন* (سلوٹیں): গল্পটি লাজপুত রায় এডিসন্স, দিল্লী থেকে ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয়।

৯. *জুগেন্দ্রর পাল কি মুনতাখাব আফসানে* (جوگندر پال کے منتخب افسانے)

১০. *কিতাঙ্গড়* (کتھا نگر)

১১. *খেলা* (کھلا) ।[১০৩]

তার প্রথম উপন্যাস হচ্ছে '*এক বোন্দ লাহু কি*' (ایک بوند لہو کی) । তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে- আমাদ ওয়া রাফস (آمد و رفت) , *বায়ানাত* (بیانات) , *নাদিদ* (نادید) ইত্যাদি। তার অনেক গল্প এবং উপন্যাস বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। হিন্দি ও ইংরেজী সহ বিভিন্ন ভাষায় তার স্ত্রী, কন্যা, ভাইঝি এবং অন্যান্য লেখকগন অনুবাদ করেছেন। তিনি সময়ের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসরমান লেখক ছিলেন।

পুরষ্কারঃ

তিনি ১৯৮৩ সালে তৎকালীন ভারতের ভাইস পেসিডেন্ট ড. শংকর দয়াল শরমার কাছ থেকে গালিব পুরস্কার এছাড়া সর্ব ভারতীয় বাহাদুর শাহ জাফর পুরস্কার, উর্দু আদব পুরষ্কার সহ অনেক পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হন।[১০৪]

মৃত্যুকালঃ

২২ এপ্রিল, ২০১৬ সালে রোজ শুক্রবার ৯০ বছর বয়সে দীর্ঘস্থায়ী অসুস্তার মধ্য দিয়ে উর্দু সাহিত্যে একটি যুগের অবসান হয়।[১০৫]

---

[১০৩] ড. মির্জা হামিদ বেগ, *উর্দু আফসানে কি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৯৪৩-৯৪৪।

[১০৪] সাহিত্য একাডেমী, ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, ইনভাইট ইউ টু মিট দ্যা অথর : জুগেন্দর পাল, ১৭ এপ্রিল, ২০০২।

[১০৫] দ্যা হিন্দু, নয়া দিল্লি, এপ্রিল ২৪, ২০১৬।

কুররাতুল আইন হায়দার

জন্ম পরিচিতি:

লেখিকা কুররাতুল আইন হায়দার ২০ জানুয়ারী, ১৯২৬ সালে উত্তর প্রদেশের আলিগড়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি লেখক এবং উর্দু ছোটগল্পকার সাজ্জাদ হায়দার ইয়ালদারামের কন্যা।[১০৬] সাজ্জাদ হায়দার ইয়ালদারাম আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এছাড়াও তিনি 'জামিয়া মিল্লা ইয়া ইসলামিয়া' নিউ দিল্লিতে, এমেরিটাস প্রফেসর ছিলেন। তার মা নজর জহুরা ও একজন লেখীকা ছিলেন।[১০৭] কুররাতুল আইন হায়দার 'আইন আপা' ছদ্মনামে লেখালেখি করতেন।

শিক্ষাজীবন:

প্রাথমিক শিক্ষা তিনি দেরাদুন এবং লখনৌর কানুন্ট স্কুল থেকে করেন। ম্যাট্রিক করেন ঘছারি মান্ডি স্কুল, লাখনৌ থেকে। আজাবিলা থুবরান কলেজ, লখনৌ থেকে বি.এ সম্পন্ন করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি লাখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। সর্বশেষে তিনি বারান গভর্মেন্ট স্কুল অফ আর্টিস লাখনৌ এবং হার্ডিজ স্কুল অফ লন্ডন থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন।[১০৮]

কর্মজীবন:

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর কুররাতুল আইন হায়দার পাকিস্তানে চলে আসেন। সেখানে তিনি কিছুদিন ডকুমেন্টারি ফিল্ম নিয়ে কাজ করেন। ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের করাচীতে প্রচার ও প্রকাশনা মন্ত্রণালয়ে চাকুরী নেন। লন্ডন পাকিস্তান হাইকমিশনে প্রেস সহদূত হিসাবে কাজ করেন। ১৯৯৫৫-১৯৫৬ পর্যন্ত পাকিস্তান ইন্টার ন্যাশনাল এয়ার লাইন্স-এ তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৫৬-১৯৬০ পর্যন্ত প্রচার ও প্রকাশনা মন্ত্রনালয়ে কর্মরত ছিলেন। তিনি ফিল্ম প্রযোজক, লেখক ছাড়াও 'পাকিস্তান কোয়াটারলি' এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬১ সালে ভারতে ফিরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি ইংল্যান্ডে ছিলেন। সেখানে তিনি 'বিবিসি'র জন্য কাজ করেন। জীবিকা অর্জনের জন্য ইংরেজী সাময়িকী 'ইমপ্রিন্ট' এ ম্যানিজিং এডিটর হিসেবে কাজ করতেন এবং তিনি সেখানকার 'বেন্ট কুলম্যান গ্রুপ' এর সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি নিয়মিত ভাবে ছোটগল্প, সাহিত্য অনুবাদ ও উপন্যাস প্রকাশ করতেন। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার শিকাগো, উইসকনসিন এবং অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি লেকচারার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ভারতে আসার পর সেখানে তিনি ইমপ্রিন্ট সম্পাদক হিসেবে কাজ

---

[১০৬] প্রফেসার নুরুল হুসাইন নকবী, তারিখে আদবে উর্দু, এডুকেশন বুক হাউজ, আলীগড়, ২০০৪, পৃ. ৩৬২।
[১০৭] মুহাম্মদ কাছিম সিদ্দিকী, *খাওয়াতিন কে নুমায়েন্দহ আফছানে*, এডুকেশনাল বুক হাউজ, আলীগড়, ২০১৪, পৃ. ৬৯।
[১০৮] দ্যা ইডিটর অফ ইনছাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা, বায়োগ্রাফি, কুররাতুলাইন হায়দার, ০৯ অক্টোবর, ২০১৭।

করেন। এছাড়াও 'অল স্টেটেড উইকলি ইন্ডিয়া'র সাথে ছিলেন। 'সেন্টার্ল বোর্ড অব ফিল্ম্ সেন্সর' এর একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৬৮-১৯৭৭ পর্যন্ত সাহিত্য একাডেমির জেনারেল কাউন্সিলের উর্দু উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।

সাহিত্য জীবন:

তিনি মাত্র ১১ বছর বয়স থেকে লেখালেখি শুরু করেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা মোট ৩০ টি। তার মধ্যে ১২ টি উপন্যাস এবং ৪ টি ছোটগল্পের সংকলন রয়েছে। তিনি উল্লেখযোগ্য পরিমান ক্লাসিক অনুবাদও করেছেন। তার সাহিত্যকর্ম ইংরেজী এবং অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

তার প্রথম ছোটগল্প *'বি-ছুহিয়া'* এবং প্রথম উপন্যাস *'মায়রায় বিহ ছানাম খায়রায়'*। কুররাতুল আইন হায়দারের সবচেয়ে সারা জাগানো সাহিত্য কর্ম হচ্ছে *'আগ কা দরিয়া'*। এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। যা সময় এবং ইতিহাসের বিশাল ঝড় অনুসন্ধান করেছে।[১০৯] এতে এমন একটি গল্প বলা হয়েছে যা চতুর্থ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারত এবং পাকিস্তানের স্বাধীনতা পরবর্তী সময় পর্যন্ত ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছে। তার অন্যান্য ছোটগল্পের মধ্যে রয়েছে-

১. *ছাত্তারো ছে আগে* (ستاروں سے آگے) : মাকতুবাহ জাদিদ, লাহোর থেকে ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়।

২. *শিশে কে ঘর* (شیشے کے گھر) : মাকতুবাহ জাদিদ, লাহোর থেকে ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. *পাত জহরী কি আওয়াজ* (پت جھڑ کی آواز) : মাকতুবাহ জাদিদ, নয়া দিল্লী থেকে ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়।

৪. *ফছল গুল আয়ি ইয়া আজল আয়ি* (فصل گل آئی یا اجل آئی) : খেয়াম পাবলিশার্স, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

৫. *জাহা ফুল খেলতে হ্যায়* (جہاں پھول کھلتے ہیں)

৬. *আপেছ কে গিত* (آپس کے گیت)

৭. *জগনু কি দুনিয়া* (جگنوؤں کی دنیا)

---

[১০৯] ড. ছুনবল নিগার, *উর্দু নছর কা তানকিদে মুতায়াল্লাহ*, এডুকেশন বুক হাউজ, আলীগড়, ২০১১, পৃ. ৪৫২।

৮. *তালাশ* (تلاش)

৯. *রোশনি কি রফতার* (روشنی کی رفتار) : ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়।

১০. *ইয়াদ কি এক দেহঙ্ক জলে* (یاد کی اک دھنک جلے) : রফতার পাবলিশার্স, লাহোর থেকে প্রকশিত হয়।

১১. *উধ কি শাম* (اوودھ کی شام)

১২. *মেরে বেহতারিন আফছানে* (میرے بہترین افسانے)

১৩. *কুররাতুল আইন হায়দার কে মখতালিফ আফছানে* (قرت العین حیدر کے منتخب افسانے)।[১১০]

তার প্রকাশিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১. *ছাফিনাহ গাম দিল* (سفینہ غم دل) : মাকতুবাহ জাদিদ, লাহোর থেকে ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়।

২. *মেরে ভাই ছনাম খানে* (میرے بھی صنم خانے) : মাকতুবাহ জাদিদ, লাহোর থেকে ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয়।

৩. *আগ কা দরিয়া* (آگ کا دریا) : মাকতুবাহ জাদিদ, লাহোর থেকে ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয়।

৪. *হামে চেরাগ হামে পুরানে* (ہمیں چراغ ہمیں پروانے) : মাকতুবাহ জাদিদ, লাহোর থেকে ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয়।

৫. *আখের ছব কে হাম ছফর* (آخر شب کے ہمسفر)

৬. *কার জাহা দারাজ হে* (کار جہاں دراز ہے)

৭. *ছিতা হরণ* (سیتا ہرن) : কিতাব নামা, লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

৮. *হাও ছংঙ্গ সোসাইটি* (ہاؤسنگ سوسائٹی)

---

[১১০] ড. মির্জা হামিদ বেগ, *উর্দু আফসানে কি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০* ,একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৮৬৭-৮৬৯।

৯. *চায়ে কে বাগ* (چائے کے باغ)

১০. *দিলরুবা* (دلربا)

১১. *আগলে জনম মোজে বেটা নাহ কাহু* (اگلے جنم مجھے بیٹا نہ کہو)

১২. *চার নবেল্ট* (چار ناولٹ) : রিয়াজ আহমদ, এলাহবাদ থেকে ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়।

১৩. *জাহান দিগার* (جہان دیگر)

১৪. *তিন নবেল্ট* (تین ناولٹ)

১৫. *ঢান বেহতা রাহা* (ڈان بہتا رہا) : সুলু খুফের অনুবাদ।

১৬. *আদমি কা মুকাদ্দেম* (آدمی کا مقدر) : "The Fate of Man" নবেল্ট এর ৫৩ পৃষ্ঠার উর্দু অনুবাদ, মাকতাবাহ জামাহ লিমিটেড, দিল্লী থেকে ১৯৬৫ সারে প্রকাশিত হয়।

১৭. *কুচে গেহরুন্দে* (کچے گھروندے)

১৮. *উড়তে খাকে* (اڑتے خاکے)

১৯. *মাকী খেতি* (ماں کی کھیتی): এয়তেমাতুফ চেংগিসের নবেলের অনুবাদ, মাকতুবাহ জামাহ লিমিটেড, দিল্লী থেকে ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয়।

২০. *কাইছা মে কতল* (کیسا میں قتل)

২১. *ডাংগু* (ڈنگو) : আর ফারিরমিনের নবেল্টের উর্দু অনুবাদ, মাকতুবাহ জামাহ লিমিটেড, দিল্লী থেকে ১৯৬৬ সারে প্রকাশিত হয়।

২২. *ইয়ু দুকিয়াহ* (یودوکیہ) : ইরা পানুয়ার নবেলের উর্দু অনুবাদ, মাকতুবাহ জামাহ লিমিটেড, দিল্লী থেকে ১৯৬৫ সারে প্রকাশিত হয়।

২৩. *গারদেশ রংগ চমন* (گردش رنگ چمن) : মাকতুবাহ দানিয়াল, করাচী থেকে প্রকাশিত হয়।

২৪.*খেয়ালি পুলাও* (خیالی پلاؤ) : নবেলের উর্দু অনুবাদ, মাকতুবাহ জামাহ লিমিটেড, দিল্লী থেকে ১৯৬৭ সারে প্রকাশিত হয়।[১১১]

বাচ্চাদের জন্য তিনি কয়েকটি বই লিখেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বইগুলো হল-

১. *শের খান* (شیر خان)

২. *ভেহরি কে বাচ্চে* (بھیڑیئے کے بچے)

৩. *লুমরে কে বাচ্চে* (لومڑی کے بچے)

৪. *মা ডেহেনচু কে বাচ্চে* (میاں ڈھینچو کے بچے)

৫. *বাহাদুর* (بہادر)

৬. *হারুন কে বাচ্চে* (ہرن کے بچے)

৭. *জান হুছুন আব্দুর রহমান* (جن حسن عبدالرحمن) : দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[১১২]

কুররাতুল আইন হায়দারকে তার সমসাময়িক বিখ্যাত লেখক মিলনা কুন্ডেরা, গ্যাব্রিয়েলা গার্সিয়া মার্কেজ এর সাথে তুলনা করা হয়। আশিতাভ ঘোষ তার সম্পর্কে লিখেছেন- "বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় কণ্ঠ স্বরগুলির মধ্যে তিনি একজন।"

অনূদিত উল্লেখযোগ্য কর্ম সমূহ :

১. Sound of the Falling Leaves
২. A Season of Betrayals
৩. River of Fire
৪. Fireflies in the Mist
৫. The Exiles

---

[১১১] ড. মির্জা হামিদ বেগ, *উর্দু আফসানে কি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০* ,একডেমি আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১, পৃ. ৮৬৮-৮৬৯।

[১১২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬৯।

লেখার বৈশিষ্ট্য:

কুররাতুলইন হায়দার উর্দু সাহিত্যে এক প্রভাবশালী উপস্যাসিক, ছোটগল্পকার, শিক্ষাবীদ এবং সাংবাদিক ছিলেন। লেখক যেমন নিজের দায়িত্ববোধ থেকে পিছিয়ে পরা সমাজ এবং সমাজের অসংলগ্ন দৃশ্য তুলে ধরেন, তিনিও ঠিক তাই করেছেন। তার উপন্যাসগুলোতে লিঙ্গ বৈষম্য, পারিবারিক, সমাজের নারীর অবস্থান তৎকালীন সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা এবং আন্দোলনের চিত্র তুলে ধরেছেন। মূলত তিনি ঐতিহাসিক লেখালেখিতে বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। যা আমরা তার *'আগ কা দরিয়া'*তে দেখতে পাই। টাইমস্ সাহিত্য সাপ্লিমেন্টে আমি হুসেন *'আগ কা দরিয়া'* সম্পর্কে লিখেছেন যে, এটি স্প্যানিক সাহিত্যের জন্য শতবর্ষের একাকিত্বের প্রকাশ।

পুরস্কার ও সম্মাননা:

১. ১৯৬৭ সালে সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহেরু পুরষ্কার।
২. ১৯৬৭ সালে *'পাঞ্জেরি কী আওয়াজ'* এর জন্য সাহিত্য একাডেমী পুরষ্কার।
৩. ১৯৬৯ সালে গালিব পুরষ্কার।
৪. ১৯৮৪ সালে ভারত সরকার থেকে পদ্মশ্রী পুরষ্কার পান।
৫. ১৯৮৫ সালে সাহিত্য একাডেমি পুরষ্কার লাভ করেন।
৬. ১৯৮৯ সালে *'আখেব-ই-শাককে হাম সফর'* এর জন্য জ্ঞান পীঠ পুরষ্কার পান।
৭. ২০০০ সালে বাহাদুর শাহ জাফর পুরষ্কার।
৮. ২০০৫ সালে পদ্মভূষণ। [১১৩]

মৃত্যুকাল:

দীর্ঘ দিন ধরে ফুসফুস আক্রান্ত রোগে ভোগে ২১ আগস্ট, ২০০৭ সালে নিউ দিল্লির কাছে নূদিয়া হাসপাতালে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুতে ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী উত্তর প্রদেশের মূখ্যমন্ত্রী শোক প্রকাশ করেন।

---

[১১৩] দালান ভালা, *প্যাট ঝর কি আওয়াজ*, মকব্বহী-ই-জামমিয়া, নয়া দিল্লি, ১৯৭০, পৃ. ৭-১৯।

উপসংহার

মুন্সি প্রেমচাঁদের জীবন কালের সীমা ছিল প্রায় ৫৬ বছর । তবে তাঁর গল্প সাহিত্যের অংঙ্কুরের ভিত্তি হয় বিশ শতকের প্রথম দিকে। তৎসময়ে উর্দু ছোটগল্পে আবির্ভাব ঘটে বিশিষ্ট কয়েকজন উর্দু লেখকবৃন্দের। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাশেদুল খাইরী, খাজা হাসান নিজামী, সাজ্জাদ হায়দার ইয়ালদারাম, নিয়াজ ফতেহপুরী, মুহাশাহ সদর সেন, আলী আব্বাস হুসাইনী, ইমতিয়াজ আলী তাজ, সাদাত হাছান মান্টো, কৃষণ চন্দর, ইসমত চুগতাঈ, রাজেন্দ্র সিং বেদি, কুররাতুল আইন হায়দার প্রমুখ লেখকবৃন্দ। তার পাঠক মনকে সেভাবে পরিতৃপ্ত করতে পারেননি, যতটা পেরেছেন মুন্সি প্রেমচাঁদ। প্রেমচাঁদের এই বিরাট সফলতার প্রধান কারণ ছিল তাঁর ছোটগল্পের বিষয় বৈচিত্রতা ও সাবলীল উপস্থাপন। তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বিষয় ছিল কৃষিনির্ভর গ্রামীন সমাজ। তাঁর পাঠক সমাজও ছিল মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী, তাদের অন্তরের কথা কলমের তুলিতে জীবন্ত করে ব্যক্ত করেছেন। কারণ তখন সমাজের অধিকাংশ পাঠকদের গ্রামীন জীবনের সাথে সম্পর্ক ছিল নিবিড়। প্রেমচাঁদের ছোটগল্পের আরেকটি দিক : নিপীড়িত নারী জাতির প্রতি গভীর দরদ এবং সমাজের তথাকথিত নীচু শ্রেণীর প্রতি আন্তরিক সমানুভূতি। তার ছোটগল্পে পল্লীসমাজের মুন্নি, আনন্দী, কুসুম, গংঙ্গী, মুলিয়া, চম্পা, আমিনা, শারদা, অহল্যা, সুখদা, নিরুপমা, সুভাগী, পদ্ম, বুলাকী, গায়েত্রী, লীলা, চন্দ্রকুমারী, রূপকুমারী, দিলফরেব, গোপা, পান্না, করুণা, ফুলমতী, জহুরা, গৌরী, বুধিয়া, ঝুরিয়া, গোদাবরী, দেবকী প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে নির্যাতিত নারী এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

নানামাত্রিক শোষণের স্বরূপ উম্মোচনে প্রেমচাঁদের ছোটগল্প পূর্বাপর উজ্জ্বল। সমাজের অধিকাংশ মানুষের জীবনের দৈন্য হাহাকার ও পঙ্গুঁত্বের মূলে রয়েছে স্বল্প সংখ্যক লোকের শোষণপীড়ন, অনাচার ও অবিচার। শোষণ-জুলুম, জমিদার-জোতদার ও কুসীদজীবী শ্রেণীর শোষণ অত্যাচার কিংবা উচ্চবিত্ত, মজুতদারের সুক্ষ্ম শোষণ প্রক্রিয়া প্রভৃতি সবকিছুরই গভীরতর রূপ প্রেমচাঁদের ছোটগল্পে সহজলভ্য।

প্রেমচাঁদের উর্দু ছোটগল্পে সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন শোষণ ও নির্যাতন ফুটে উঠেছে গভীরভাবে। বিভিন্ন শ্রেণীর বহুমাত্রিক শোষণকে উপজীব্য করে লিখা হয়েছে অসংখ্য কালজয়ী গল্প। খাজনা, নজরানা, বেগার, বিভিন্ন খাত দেখিয়ে কর আদায় নিত্যকার বিষয়গুলো হলো কৃষকের উপর জমিদার শ্রেণীর শোষণের একেকটি মাধ্যম। এগুলো প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে কৃষকের উপর নেমে আসে নানা প্রকারের নির্যাতন। রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদার ও প্রশাসন কর্তৃক প্রজাপীড়নের অসংখ্য চিত্র রয়েছে প্রেঁমচাদের রচনায়।

প্রেমচাঁদ তাঁর ছোটগল্পে মহাজনি শোষণের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কেন কৃষক বাধ্য হয় মহাজনের নিকট ঋণ গ্রহণ করতে আর মহাজন দরিদ্র কৃষকের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে কিভাবে তাকে সর্বস্বান্ত

করে। তিনি এটিও দেখিয়েছেন, যে কৃষক একবার ঋণ গ্রহণ করে তার আর কোনোক্রমেই নিস্তার নেই, শীঘ্রই সে পরিণত হয় ভূমিহীন মজুরে। শোষণের ক্ষেত্রে সমাজ, ধর্ম কিভাবে মহাজনের সহায়ক হয়েছে তা প্রেমচাঁদের দৃষ্টি এড়ায়নি। আইনের ফাঁকে কেমন করে মহাজনেরা সরকারি নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে কৃষক শোষণ অব্যাহত রেখেছে তার চিত্রও অঙ্কন করেছেন প্রেমচাঁদ। মহাজনের শোষনের ক্ষেত্রে জমিদার, জমিদারের কর্মচারী, সরকারি কর্মচারীর সহায়তার প্রক্রিয়া চিহ্নিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পে।

মধ্যযুগে কবীর, নানক, দাদু ইত্যাদি সমাজ সংস্কারকদেরকে নিয়ে যেমন অনেক কবিতা লিখা হয়েছে তেমনি প্রেমচাঁদ ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নিয়ে অসংখ্য গল্প রচনা করেছেন। ধর্মের নামে গ্রামের সহজ-সরল মানুষগুলোর উপর যুগ যুগ ধরে চলে আসা ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন শোষণকে এসমস্ত গল্পে দেখানো হয়েছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামের মানুষগুলোকে পুরোহিত ও পান্ডার দল যেভাবে নানা বিধি-নিষেধের জালে জড়িয়ে ফেলেছিল তা থেকে তাদের মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালান তিনি। এখানে তাঁর ভূমিকা একজন সমাজ-সংস্কারকের। তিনি ধর্মের ধ্বজাধারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অনিয়ম, অবিচার ও অন্যায়ের অগমন কাহিনী দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরেছেন। প্রেমচাঁদের সময়ে মন্দির গুলিতে ঠাকুর পুজোর নাম করে পান্ডা ও পুরোহিতের দলের শোষণযন্ত্র মুক্ত বিহঙ্গের মত যথেচ্ছাচারের পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত ছিল। মন্দিরে মন্দিরে মোহান্ত ও তিলকধারী পূজারীর দল নানা লীলাখেলায় মত্ত ছিল। মন্দিরে আগত সহজ সরল গৃহবধূ ও ধর্মভীরু বৃদ্ধাদের কপটজালে আবদ্ধ করে বাসনাপূর্তি করতেও এরা পাশ্চাৎপদ ছিল না। ধর্মস্থানগুলি ছিল অধার্মিক কাজকর্মের আখড়া। এসকল ধর্মীয় ব্যক্তিদের অধার্মিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রেমচাঁদ ছিলেন সর্বদা সোচ্চার ।

যে দেশে যে সমাজে ব্যক্তির মূল্য বলতে কিছু ছিলনা, কেবল গুটিকয়েক সমাজপতি ধর্মের নামে শাসন চালিয়ে মানুষকে মূঢ় ও মূক করে রেখেছিল, প্রেমচাঁদ সেখানে ব্যক্তিমানুষের সুখ-দু:খকে মর্যাদা দিয়ে ব্যক্তির মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় বিরাট ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে এই পুরুষশাসিত সমাজে যে নারী ছিল সবচেয়ে লাঞ্চিত ও উপেক্ষিত, প্রেমচাঁদ গভীর দরদ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তার বেদনাকে ভাষা দিয়েছেন; তার মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সারাজীবন মসীযুদ্ধ করেছেন।

শহুরে, গ্রামীন, উচ্চ-মধ্য, নিম্নস্তরের, সতী-অসতী, বিধবা, পতিতা, স্বৈরিণী ও শিক্ষাদাত্রী প্রভৃতি নানান রকমের নারী-চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তিনি। সমসাময়িক বাঙলা কথাসাহিত্যিক, যাকে বলা হয় সাহিত্যে বিচিত্র নারী চরিত্রের স্রষ্টা সেই শরৎচন্দ্রের চেয়ে প্রেমচাঁদের নারী চরিত্র সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য অনেক বেশি। কারণ এই নারীদের তিনি সৃষ্টি করেছেন অনেকটা তাদের শ্রেণি-স্থিতির দিক লক্ষ্য রেখে। পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে নারীরা কোন না কোন শ্রেণীর দ্বারা নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত। প্রেমচাঁদের গল্পে বিভিন্ন নারী চরিত্রের মাধ্যমে তাই ফুটে উঠেছে সুস্পষ্টভাবে।

অচ্ছুৎবর্গ যেমন সামাজিকভাবে নিস্পিষ্ট ও অবহেলিত তেমনি তারা সমাজে সবচেয়ে বেশি শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। যুগ-যুগান্তর ব্যাপী শোষণ, বঞ্চনা অচ্ছুৎবর্গকেও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, হীন, দুর্বল ও প্রতিবাদহীন করে তুলেছে। দারিদ্র এবং বঞ্চনাকেই তারা স্বাভাবিক মনে করে। সে সঙ্গে মিশে থাকে ধর্মের ভয়, যা প্রচার করেছে ব্রাহ্মণবর্গ তাদের নিজেদেরই স্বার্থে। অচ্ছুৎবর্গ প্রতিবাদকে, এমনকি মানসিক প্রতিবাদকেও ধর্মহানি বা পাপ বলে মনে করে। তাদের ধারণা, এই জীবন, এই দৈন্য, এই লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা পূর্বজন্মের পাপের ফল, এই জীবন ব্রাহ্মণের সেবার জন্যই সৃষ্ট।

প্রেমচাঁদের গল্পে বিভিন্ন পেশাজীবি শ্রেণীর কথাও উঠে এসেছে। পদ ও পদবির দাপটে এ সমস্ত লোকেরা নিরীহ সাধারণ মানুষের উপর চালাতো বহুমূখী শোষণ। এভাবে তারা সম্পদের পাহাড় গড়ে সমাজে শ্রেণী বৈষম্যকে আরো উসকে দিতো। তাদের কারনে কালক্রমে চলে আসছে সুদ ও ঘুষের কারবার। যার ফলোশ্রুতিতে পদদলিত হয়ে পিষ্ঠ হচ্ছে সমাজের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষগুলো। বিভক্ত হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীতে। সুদও ঘুষ আদান-প্রদানের মাধ্যমে মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ভাঙ্গছে আর সৃষ্টি হচ্ছে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও বৈষম্য। প্রেমচাঁদের ছোটগল্পে বিভিন্ন পেশাজীবি শ্রেণীর শোষণকে নিখুতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রেমচাঁদের ছোটগল্পগুলো পাঠ করলে বোঝা যায় যে তাঁর বিষয়বস্তু অতি বৈচিত্রময়। ভারতীয় সমাজের এমন কোনো সমস্যা নেই যা তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পেরেছে। নারী সমস্যার মধ্যে বাল্য বিবাহ, যৌতুক প্রথা, বিধবা সমস্যা, অসম বিবাহ, পতিতা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। তা ছাড়া জমিদার, মহাজন, ভণ্ডসাধু-সন্নাসী, দরিদ্র কৃষক, মজদুর, লেখক, সম্পাদক, উকিল ব্যারিষ্টার কেউ বাদ পড়েনি। সমাজের সকল সমস্যাই তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করে তা থেকে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে যথাযথ চিত্র তুলে ধরেছেন। অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা, চিকিৎসা, আইন আদালত, পুলিশ, কোট-কাচারি ইত্যাদির সমস্যগুলো তাঁর কথা সাহিত্যে বিবৃত হয়েছে। তাই ভাব সৌন্দর্যের জন্যে তাঁকে কোথাও হাস্য রসের সাহায্য নিতে হয়েছে, আবার কোথাও করুণ রসের উদ্রেক করতে হয়েছে। আসলে প্রেমচাঁদের কাজের মহত্ত্ব হল, আলোচনার দিক-নির্দেশ। তাই যখন তিনি মধ্যবিত্ত ও কৃষকের চিত্র এঁকেছেন, তা অদ্ভুতভাবে সুন্দর ও বাস্তব হয়ে উঠেছে। শিল্পসম্মত চিত্রণে তিনি সংযম ও কঠোরতাকে সমান ভাবে মর্যাদা দিয়েছেন। সমাজ সম্পর্কে বিপুলতা বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা যেমন প্রেমচাঁদকে মানুষের প্রতি মানুষের নির্দয় শোষণ সম্পর্কে সচেতন করে তেমনি মানুষ ও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ প্রত্যাশা তাকে উদ্বুদ্ধ করে এসবের চিত্র রূপায়নে। সকল প্রকার প্রলোভনমুক্ত জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সমাজের কল্যাণ প্রত্যাশী প্রেমচাঁদ সাহিত্য সাধনায় ছিলেন গভীরভাবে আন্তরিক সৎ ও অক্লান্ত। তিনি ছিলেন সর্বাংশে আধুনিকতামণ্ডিত, নির্মোহ বাস্তবতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার।

পরিশিষ্ট

১. মুন্সি প্রেমচাঁদের জীবনপঞ্জি।

২. মুন্সি প্রেমচাঁদের উর্দু ও অন্যান্য ভাষার রচনাবলীর তালিকা।

৩. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার নাম।

৪. চিত্রাবলী ও প্রতিচিত্র।

মুন্সি প্রেমচাঁদের জীবনপঞ্জি

১৮৮০ ১৮৮০ সালে ৩১ জুলাই রোজ শনিবার বেনারস শহর (কাশী নগর) থেকে চার মাইল দূরে লমহী (উত্তর প্রদেশ, বৃটিশ ভারত) নামে এক অজ পাড়াগাঁয়ে প্রেমচাঁদ জন্ম গ্রহণ করেন।

পিতা শ্রী অজায়ব রায়।

মাতা শ্রীমতী আনন্দী দেবী।

প্রেমচাঁদের জন্মস্থান বারণসী থেকে পাঁচ-ছ মাইল দূরে অবস্থিত 'লমহী' নামক গ্রামে।

ধনপত রায় শ্রীবাস্তব ছিল তার মূলনাম।

১৮৮৮ মাতা শ্রীমতী আনন্দী দেবীর মারা যান।

১৮৮৮ লালপুর গ্রামের এক মৌলভী সাহেবের কাছে উর্দু, ফার্সী, শিক্ষা শুরু করেন।

১৮৯৩ মাত্র ১৩ বংর বয়সে মামাকে কেন্দ্র করে তার লেখা প্রথম গল্পটি ছিল 'অপ্রাপ্য'।

১৮৯৯ প্রেমচাঁদ ১৮ টাকা মাইনে শিক্ষক হিসেবে প্রথম চাকুরীতে পদার্পন করেন।

১৯০৫ ১৫ বছর বয়সে একটি কুরূপ, কর্কশ স্বভাবের মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহ হয়।

১৮৯৬ পিতা শ্রী অজায়ব রায় মারা যান।

বিমাতা সহ পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব কাধে চাপে। ৬ কিলোমিটার দূরে পড়তে যেতেন নগ্ন পায়ে। ৫ টাকার টিউশনি আরশ্ব করেন। ৩ টাকা বাড়িতে পাঠাতেন এবং ২ টাকায় নিজে জন্য খরচ করতেন।

১৮৯৬ তিনি এক মুসলিম নারীর প্রেমে পড়েন।

১৮৯৭ এন্ট্রন্স পাস করেন। গভর্ণমেন্ট সেন্ট্রল ট্রেনিং কলেজে (এলাহাবাদ) ভর্তি হন।

১৮৯৭ প্রথম বিয়ে করেন।

১৯০৪ প্রথম বিভাগে জুনিয়র ইংলিশ টিচার্স সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাশ করেন।

১৯০৪ উর্দু ও হিন্দিতে ভার্ণাকুলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯০৪ প্রথম পত্নী মারা যান।

১৯০৫ - ১৯০৮ কানপুরে সহায়ক শিক্ষক রূপে কাজ করেন। পরে সাব ডিপুটি ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস্ হিসেবে ৬ বছর কাজ করেন।

১৯০৬ শিবরাত্রির দিন প্রেমচাঁদ 'শিবরানি দেবী' নামে এক বিধবাকে দ্বিতীয় বিবাহ করেন।

১৯০৭ প্রেমচাঁদের ছোট উপন্যাস যা উর্দু'তে '*হম্ সুর্মা য়ো হম্ সওয়ার*' প্রকাশিত হয়।

১৯১০ সরকার কর্তৃক তার *'সোজে ওয়াতন'* বাজেয়াপ্ত হয়।

১৯১০ অক্টোরব নভেম্বর মাস থেকে প্রেমচাঁদ ছদ্মনামটি ব্যবহার করতে শুরু করেন।

১৯১৪ 'বস্তী' তে বদলী হন। সেখান থাকতেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

১৯১৬ আগস্টে গোরক্ষপুরের নর্মাল স্কুলের এ্যাসিষ্টেন্ট মাষ্টার নিযুক্ত হন।

১৯১৬ তিনি গোরক্ষপুরে থাকতেই প্রথম পুত্র সন্তানের পিতা হন।

১৯১৬ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এফ.এ.ও পাশ করেন।

১৯১৮ পুত্র শ্রীপতাপ রায় জন্ম গ্রহন করেন।

১৯১৮ আগস্ট মাসে প্রেমচাঁদের গৌরকপুরে বদলি হন।

১৯১৯ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করেন।

১৯২১ মার্চ মাসে গান্ধিজির আমন্ত্রনে অসহযোগ আন্দেলনের সময় তিনি সরকারী চাকরির পদত্যাগ পত্র জমা দেন।

১৯২২ পদত্যাগ করে গ্রামে চলে যান। সেখানে তিনি পাকা বাড়ী নির্মান করেন এবং নিজেকে পুরো দমে সাহিত্য কর্মে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯২২ সেখানে থাকতেই তিনি ১৫০ টাকায় মর্যাদা পত্রিকার সম্পাদনা আরম্ভ করেন।

১৯২২ ১২৫ টাকা বেতনে তিনি কাশী বিদ্যাপীটে শিক্ষক নিযুক্ত হন।

১৯২২ মারওয়ারি স্কুল থেকে ইস্তফা দিয়ে প্রেমচাঁদ একেবারেই বেনারস চলে যান।

১৯২৩ অপর তিনজনের সাথে মিলিত হয়ে তিনি 'স্বরস্বতী' প্রেস খোলেন। সেখানে তার অবদান ছিল ৪৫০০ টাকা। অক্লান্ত পরিশ্রম করার পরও তার প্রেসে লোকসান হতে থাকে।

১৯২৫ ১০০ টাকা মাসিক বেতনে 'লাইব্রেরী এ্যাসিস্টেন্ট' হয়ে 'গঙ্গা পুস্তক মালা' প্রকাশনা সংস্থায় যোগদান করেন।

১৯২৬ তিনি আবার বেনারসে আগমন করেন।

১৯২৮ জুন মাস পর্যন্ত থাকার পর লখনো যান।

১৯২৮ নভেম্বর ১৯৩১ সাল পর্যন্ত তিনি ২০০ টাকা মাসিক বেতনে 'মাধুরী' মাসিক পত্রিকায় সম্পাদন করেন।

১৯৩০ জানুয়ারী মাসে তিনি 'হংস' নামক নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে দেশদ্রোহাত্মক লেখা প্রকাশের জন্য ১০০০ টাকা জামিন দাবী করায় পত্রিকা বন্ধ করে দেন।

১৯৩১ পত্রিকা 'জাগরণ'কে সাপ্তাহিক রুপান্তরিত করে নিজের প্রেস থেকে সম্পাদনা ও প্রকাশ শুরু করেন।

১৯৩৩ ছেলেদের পড়াশুনার জন্য তিনি লখনো থেকে বেনারসে ফিরে আসেন।

১৯৩৪ পর্যন্ত প্রেসের কাজেই ব্যস্ত থাকেন।

১৯৩৫ অক্টোবরে হিন্দী সাহিত্য পরিষদ 'হংস' প্রকাশনার ভার নিজের কাধে নেন কিন্তু আবার নিষিদ্ধ লেখার দায়ে টাকা চাওয়া হয়। পরিষদ পুনরায় প্রকাশন বন্ধ করে দেয়। কিন্তু প্রেমচাঁদ আবার এর দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নেন। ক্ষতিপূরণের জন্যে অনিচ্ছা সত্বেও জুন ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে বোম্বই যান এবং ৭৫০ টাকা বেতনে সিনেমার গল্প লেখার কাজ নেন।

১৯৩৫ মার্চ সাসে বনিবনাত না হওয়ায় তিনি বেনারসে ফিরে আসেন।

১৯৩৬ ১৪ই ফেব্রুয়ারিতে "প্রগতিশীল লেখক সংঘ" গঠিত হয়।

১৯৩৬ ০৮ অক্টোবর, রোজ বৃহস্পতিবার রাত ০৩ টার দিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মুন্সি প্রেমচাঁদের উর্দু ও অন্যান্য ভাষার রচনাবলীর তালিকা

ছোটগল্প-

১৯০৮	*সোজ-এ-ওয়াতন* (سوز وطن)	কানপুর 'নওয়াব রায়: জামানা প্রেস'
১৯১৫-১৯১৮	*প্রেম পচিসি* (پریم پچیسی)	পাঞ্জাবের 'দারুল আসায়াত প্রেস'
১৯২০	*প্রেম বাত্তিসি* (پریم بتیسی)	কানপুর 'জামানা প্রেস'
১৯২৮	*খাকে পারওয়ানা* (خاک پروانہ)	দিল্লী 'লাজপুত রায় ইন্ডাস্টিজ লাহোর প্রেস'
১৯২৮	*খাব ও খেয়াল* (خواب وخیال)	লাহোর 'দারুল আসাআত পাঞ্জাব প্রেস'
১৯২৯	*ফেরদোস-এ-খেয়াল* (فردوس خیال)	এলাহাবাদ 'ইন্ডিয়ান প্রেস'
১৯৩০	*প্রেম চালিসি* (پریم چالیسی)	লাহোর 'গিলানী ইলেক্ট্রিক প্রেস'
১৯৩৪	*আখেরী তোহফা* (آخری تحفہ)	লাহোর 'নারায়ন দত্ত ছেহগুল ইন্ডাস্টিজ প্রেস'
১৯৩৬	*যাদেরাহ* (زادراہ)	দল্লী 'হালী পাবলিশার্স হাউজ কিতাব ঘর প্রেস'
১৯৩৭	*দুধ কি কিমত* (دودھ کی قیمت)	দিল্লী 'ইসমত বেক ডিপু প্রেস'
১৯৩৭	*ওয়ারিদাত*	দিল্লী 'মাকতুবাহ জামায়াত প্রেস'

উপন্যাস-

১৯০৫	*আসরারে মাআবিদ* (اسرار معابد)	পত্রিকা 'আওয়াজে খালক'এ
১৯০৭	*হাম খারমাও হাম ছাওয়াব* (ہم خرما و ہم ثواب)	লখনৌ 'ছাওয়াল এজেন্ট সিদ্দিক বেক ডিপু প্রেস'
১৯০৭	*কিশনা* (کشنا)	লাহোর 'লাজপুত রায় ইন্ডাস্ট্রিজ লাহোর প্রেস'
১৯০৭	*রুঠি রানী* (روٹھی رانی)	কানপুর 'জামানা প্রেস'
১৯১২	*জালওয়াএ ইসার* (جلوہ ایثار)	এলাহবাদ 'ইন্ডিয়ান প্রেস'
১৯১৬	*বাজার-ই-হুস্ন* (بازار حسن)	লাহোর 'দারুল আসাআত পাঞ্জাব প্রেস'
১৯২১	*বাজার-ই-হুস্ন* (بازار حسن)	লাহোর 'দারুল আসাআত পাঞ্জাব প্রেস'
১৯২২	*গোশা-এ-আফিয়াত* (گوشۂ عافیت)	লাহোর 'দারুল ইসমত পাঞ্জাব প্রেস'
১৯২৭	*চোগান-এ-হাছতি* (چوگان ہستی)	লাহোর 'দারুল ইশাআত পাঞ্জাব প্রেস'
১৯৩১	*পারদাএ মজায* (پردہ مجاز)	লাহোর 'লাজপুত রায় ইন্ডাস্ট্রিজ লাহোর প্রেস'
১৯২৯	*নিরমলা* (نرملا)	লাহোর 'গিলানী ইলেক্ট্রিক প্রেস বুক ডিপু'
১৯৩২	*বেওয়াহ* (بیوہ)	বেনারস 'স্বরস্বতী প্রেস'
১৯৩২	*গবন* (غبن)	লাহোর 'লাজপুত রায় ইন্ডাস্ট্রিজ লাহোর প্রেস'
১৯৩৪	*আমল* (میدان عمل)	*ময়দান-এ-*বেনারস 'স্বরস্বতী প্রেস'
১৯৩৭	*গোদান* (گئودان)	বেনারস 'স্বরস্বতী প্রেস'
১৯৩৬	*মঙ্গল সুত্র* (منگل سوتر)	বেনারস 'হিন্দুস্তানী পাবলিশার্স হাউজ প্রেস'

ইংরেজী লেখকদের গল্প উর্দু ও হিন্দিতে অনুবাদ-

১৯১৯	'মাটার লাংক' এর "*Sightless*" গল্পটি '*শাবতার*' (شاب تار) নামে উর্দুতে প্রকাশিত হয়।	'জামানাহ' পত্রিকায়
১৯৩০	'গুলজার দি'র "*Silver Box*" গল্পটি হিন্দিতে '*চান্দি কি ডিবিয়া*' (چاندی کی ڈبیا) নামে প্রকাশিত হয়।	'হিন্দুস্তানী একাডেমি, এলাহবাদ'
১৯৩০	'গুলজার দি'র "*Justice*" গল্পটি হিন্দিতে '*ন্যায়*' (نیائے)	'হিন্দুস্তানী একাডেমি, এলাহবাদ'
১৯৩০	'গুলজার দি'র "*Strife Strike*" গল্পটি হিন্দিতে '*হরতাল*'(ہرتال)	'হিন্দুস্তানী একাডেমি, এলাহবাদ

নাটক-

১৯২৩	*কারবালা* (کربلا)	'মাধুরি' পত্রিকায়
১৯৩৩	*রুহানী শাড়ি* (روحانی شادی)	'ইসমত বেগ ডিপু' দিল্লী
১৯২৩	*সংগ্রাম* (سنگرام)	কলকাতার 'হিন্দু প্রেস এজেন্সি'
১৯৩০	*চান্দি কি ডিবিয়া* (چاندی کی ڈبیا)	'হিন্দুস্তানী একাডেমী'

শিশুতোষ-

মন মোদক (من مودک)

কুত্তেকি কাহানী (کتّے کی کہانی)

জংগল কি কাহানী (جنگل کی کہانیاں) -

অনুবাদ -

শরৎচন্দ্রের *'ষোড়শী'* এবং *'শ্রীকান্ত'* ১ম খণ্ড এর ইংরেজী রূপান্তর থেকে উর্দু অনুবাদ করেন যথাক্রমে *আউরাত* ও *সপেরান* নামে।

গান্ধীজির লিখা ইংরেজি রূপান্তর থেকে *'ভগবদ্গীতা'*,

বঙ্কিমচন্দ্রের *'কপালকুণ্ডলা'* উপন্যাসের অনুবাদ করেন একই নামে।

গৌরীশঙ্কর ওঝার মূল হিন্দি রচনা থেকে প্রেমচাঁদ উর্দুতে নতুন গ্রন্থ রচনা করলেন *'কুরান-এ-কুস্তা মে হিন্দুস্থানী তাহদিব'* শিরোনামে।

প্রেমচাঁদ রবীন্দ্রনাথের দুটি উপন্যাসও উর্দুতে অনুবাদ করেছিলেন *'বউ ঠাকুরানীর হাটে' 'দুলহান্'* নামে এবং *'নৌকাডুবি' 'তুফান'* নামে অনুবাদ করেন।

প্রেমচাঁদের হিন্দী রচনাপঞ্জী

উপন্যাস-

১৯০২	*বরদান*, উর্দুতে লিখিত "জলবা ই-ইসার" নামক বৃহৎ উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ যা হিন্দীতে বহু পরে প্রকাশিত হয়। *বাজরে হুছনের* হিন্দী অনুবাদ।
১৯০৪-১৯০৬	*প্রতিজ্ঞা*, *বেওয়াহ*'র হিন্দু অনুবাদ।
১৯১৪-১৯১৫	*সেবাসদন*, *বাজরে হুছনের* হিন্দী অনুবাদ।
১৯১৮	*প্রেমাশ্রম*, *বাজরে হুছনের* হিন্দী অনুবাদ।
১৯২৩	*নির্মলা*
১৯২৪-১৯২৫	*রঙ্গভূমি*
১৯৩২	*কায়াকল্প*, *ময়দানে আমলে*'র হিন্দী অনুবাদ।
১৯৩৬	*গোদান*, বেনারসের স্বরস্বতী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।
মঙ্গলসূত্র	অসম্পূর্ণ উপন্যাস।

গল্প সঙ্কলন-

১৯১৭	*সপ্তসরোজ*, গোরক্ষপুরে প্রকাশিত হয়।
১৯১৭	*নবনিধি* বোম্বাইতে প্রকাশিত হয়।
১৯১৮	*প্রেম পূর্ণিমা* কলকাতাতে প্রকাশিত হয়।
১৯২১	*বড়ে ঘর কি বেটী* কলকাতাতে প্রকাশিত হয়।
১৯২১	*লাল ফিতা* কলকাতাতে প্রকাশিত হয়।
১৯২১	*নমক কা দারোগা* কলকাতাতে প্রকাশিত হয়।
১৯২৩	*প্রেম পচীসী* কলকাতা স্বরস্বতী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।
১৯২৪	*ব্যাংক কা দীবালা* কলকাতাতে প্রকাশিত হয়।
১৯২৪	*প্রেম প্রসুন* লখনৌতে প্রকাশিত হয়।
১৯২৬	*প্রেম দ্বাদশী* লখনৌতে প্রকাশিত হয়।

১৯২৬	*প্রেম প্রতিমা* বেনারসে প্রকাশিত হয়।
১৯২৬	*প্রেম প্রমোদ* এলাহাবাদ স্বরস্বতী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।
১৯২৭	*শান্তি* কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।
১৯২৯	*প্রেম তীর্থ* বেনারস থেকে প্রকাশিত হয়।
১৯২৯	*পাঁচ ফুল* বেনারস স্বরস্বতী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।
১৯২৯	*অগ্নি সমাধি* লখনৌ স্বরস্বতী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।
১৯২৯	*প্রেম চতুর্থী* কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।
১৯২৯	*প্রেম প্রতিজ্ঞা* বেনারস থেকে প্রকাশিত হয়।
১৯৩০	*সপ্ত সুরজ* বেনারস স্বরস্বতী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।
১৯৩০	*প্রেম পঞ্চমী* লখনৌ স্বরস্বতী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।
১৯৩২	*প্রেরণা* বেনারস থেকে প্রকাশিত হয়।
১৯৩৪	*পঞ্চ প্রসুন* কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।
১৯৩৫	*নব জীবন* কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।
১৯৩৬	*সমন যাত্রা* বেনারস স্বরস্বতী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

হিন্দী নাটক-

১৯২৩	*সংগ্রাম* কলকাতার স্বরস্বতী প্রেস থেকে জামানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
১৯২৪	*কারবালা* লখনৌ থেকে প্রকাশিত হয়।
১৯৩৩	*প্রেম কী বেদী* বেনারস থেকে প্রকাশিত হয়।

জীবনী-

১৯১৮	*মহাত্মা শেখ সাদী* গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত হয়।
১৯৩৮	*দূর্গাদাস* বেনারস থেকে প্রকাশিত হয়।
১৯৩৩	*জীবনসার* (আত্ম কাহিনী) হংসের আত্মকথা নামক বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

অনুবাদ-

১৯২০ *সুখদাস* (সাইলাস মেরিনর) বোম্বাইয়ের স্বরস্বতী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯২৩ *টল্ সটয় কি কাহানিয়া* কলকাতা স্বরস্বতী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯২৩ *অহংকার* (আনরাতুল ফ্রান্সের নাটক) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯২৭ *আজাদ কথা* (ফসান-এ-আজাদ: পন্ডিত রতন নাথ শের শাহ) বেনারসের স্বরস্বতী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯৩০ *হরতাল* (গলসওয়র্দীর নাটক) এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯৩১ *চাঁন্দি কি ডিবিয়া* (গুলজরদীর ইংরেজী নাটক) এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯৩১ *ন্যায়* (নাটক) এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯৩৯ *সৃষ্টি কা আরম্ভ* (বর্ণার্ড শর নাটক)।

শিশু সাহিত্য-

১৯২৬ *মনমোদক* এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯৩৬ *কুত্তে কি কাহানী* বেনারসের স্বরস্বতী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯৩৮ *জঙ্গল কি কাহানিয়া* বেনারসের স্বরস্বতী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯৪১ *রামচর্চা* বেনারসের স্বরসতী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

দুর্গাদাস বাস্তবে শিশুদের জন্যেই লেখা। যা জীবনীতে উল্লেখ রয়েছে।

এছাড়াও *‘কুছ বিচার’* ও *‘প্রেমচাঁন্দ কে বিচার’* এর কয়েকটি ভাগে তার অসংখ্য প্রবন্ধ হংস, জাগরণ, চাঁদ, মাধুরী ইত্যাদি পত্রিকায় রয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার নাম

আবদুল কাদের ছুরুর : *জাদিদে উর্দু শায়েরী*, মাতবুয়অহ আলমগীর ইলেকট্রিক হাউজ, লাহোর, ১৯৪৫।

আব্দুল কাভী দাছনভী : *প্রেমচাঁন্দ*, কওমী কাউন্সিল বরাই ফুরুগ উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ২০১১।

আবুল ফজল সিদ্দিক : *পেহলি কুরছি কে হুজুর*, মাতবুয়াহ ছিপ, করাচী, ১৯৮৮।

আমরিত রায় : *প্রেমচান্দ : কলম কা ছিপাহী*, ছাহিতীহ একাডেমী, দিল্লী, সন- ১৯৯২।

আবু সায়্যেদ নূর-উদ্দীন, ড. : *তারিখে আদবে উর্দু*, মাগরিবে পাকিস্তান উর্দু একাডেমী, লাহোর, ১৯৯৭।

আহমেদ হাসান, ড. : *কৃষণ চন্দর আউর মুখতাছের আফছানে নিগার*, মর্ডান পাবলিসার্স হাউজ, নয়া দিল্লি, ১৯৮৯।

ইনশা : *আদিবু কি হায়াত মুয়াশিকাহ*, উর্দু বাজার, কলকাতা, ১৯৯০।

ওমর রাইছ, ড. : *প্রেমচাঁদ কে নমায়েন্দাহ আফছানে*, এডুকেশনাল বুক হাউজ, আলীগড়, ২০১০।

ওয়ারিস আলভি, প্রফেসার : *কুল্লিয়াতে রাজেন্দ্র সিং বেদি*, ভলিওম- ০১, কউমি কান্সিল বারায়ে ফুরুগ উর্দু জবান, নয়ি দিল্লি, ২০০৮।

ওয়াহিদ কুরাইশি, ড. : *বেহতারিন ইনশায়ে আদব*, মাকতুবাহ উর্দু আদব, ১৯৬৪।

খলিলুর রহমান আজমি : *উর্দু মে তারাক্কি পছন্দ আদবি তাহরিক*, এডুকেশন বুক হাউজ, আলী গড়, ২০১৫।

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, ড. : *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য*, প্র-স, কলি ১৩৮০।

গুপি চান্দ নারাঙ্গ, প্রফেসার : *উর্দু আফসানা রুবায়াত আওর মাসায়েল*, এডুকেশন পাবলিকেশন হাউজ, দিল্লী, ১৯৮১।

ছুনবল নিগার, ড. : *উর্দু নছর কা তানকিদে মুতায়াল্লাহ*, এডুকেশন বুক হাউজ, আলীগড়, ২০১১।

জলিল কেদওয়ায়ী : *নুয়ায়ী ছিনাহ তাব*, নাজির পিন্টিং প্রেস, করাচী, ১৯৫১।

জি. কে. মানিক টালা : *প্রেমচান্দ : হায়াত-ই-নূর*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ১৯৯৩।

জি. কে. মানিক টালা : *জামানাহ : প্রেমচাঁন্দ নম্বর*, কউমি কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগ উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, জুলাই ২০০২।

জি. কে. মানিক টাল ঃ *প্রেমচাঁন্দ : কুচ নয়ি মোবাহেছ*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, আক্টোবর- ১৯৮৮।

জুগেন্দর পাল ঃ *জুগেন্দর পাল কি কাহানিয়া*, তাখলিককার পাবলিশার্স, দিল্লি, ২০০৫।

দালান ভালা ঃ *প্যাট ঝর কি আওয়াজ*, মকব্বহী-ই-জামমিয়া, নয়া দিল্লি, ১৯৭০।

ননী শূর ঃ *কৃষণ চন্দরের নির্বাচিত গল্প*, আদবি সাখসিয়াত, হাওলাদার প্রকাশনী, অক্টোবর ২০১৩।

নাঈম আনিস, ড. ঃ *প্রেমচাঁন্দ : হায়াত আউর খেদমত*, মুসলিম ইনস্টিউট পাবলিকেশন, কলকাতা, ডিসেম্বর- ২০১০।

নাছরুল্লাহ খান ঃ *কেয়া কাফেলাহ জাতা হে*, মাকতুবাহ তাহজিব অ ফান, করাচী, ১৯৮৪।

নিতাই বসু ঃ *মুনশি প্রেমচন্দ*, গ্রন্থতীর্থ ৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা, ১ম প্রকাশনা, ২০০৬।

নুরুল হুসাইন নকবী, প্রফেসার ঃ তারিখে আদবে উর্দু, এডুকেশন বুক হাউজ, আলীগড়, ২০০৪।

প্রেমচাঁদ ঃ *প্রেমচাঁদ কী যিন্দিগী আউর তাছনীফাত পর এক নযর*, যামানা পত্রিকা, সংখ্যা ৩।

প্রেমচাঁদ ঃ *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১০, ডিসেম্বর, ২০০১,

প্রেমচাঁদ ঃ *প্রেমচাঁদ স্মৃতি*, দিল্লী, ১৯৯১।

প্রেমচাঁদ ঃ *কুল্লিয়াতে প্রেমচাঁদ*, (মদন গোপাল সম্পাদিত), কওমী কাউন্সিল বরায়ে ফুরুগে উর্দু জবান, নয়া দিল্লী, ভলিয়ম- ১১, ডিসেম্বর, ২০০১,

প্রেমচন্দ ঃ *প্রেমচন্দ: গল্প সংগ্রহ*, পশ্চিম বাংলা একাডেমি, জানুয়ারি ২০০৬।

প্রেমচন্দ ঃ *প্রেমচন্দ ঃ নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, কলিকাতা, ২০ মে ১৯৮৮।

প্রেম গোপাল মিত্তাল ঃ *প্রেমচন্দ কে ছ আফছানে : তারিখি তারতিমছে*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮।

প্রেম গোপাল মিত্রা ঃ *প্রেমচাঁদ শাহনাছ : মদন গোপাল*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ২০০৮।

প্রেমচাঁদ বিশ্বকোষ ঃ ভলিয়ম- ১, পশ্চিম বাংলা একাডেমি, জানুয়ারি ২০০৬।

পদ্মা পেহদেইউ, (অনু: মারগুব আলী) ঃ *বদি ছে এক গুফতাগু*, মাতবুয়াহ দস্তাবেজ, রাউলপিন্ডি, ১৯৮৭।

পৃথ্বীরাজ সেন, সৌরেন দত্ত ঃ *মুন্সী প্রেমচন্দ : গল্পসমগ্র*, প্রথম খণ্ড, কামিনী প্রকাশালয়, ৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলকাতা, নভেম্বর-২০০৯।

মদন গোপাল ঃ *প্রেমচন্দ : গল্পসংগ্রহ*, কলকাতা, জানুয়ারী ২০১৮।

মাহনামা ঃ তাছবির, জানুয়ারী ১৯৩৫।

মাছয়ুদ রেজা খাকি, ড. ঃ *উর্দু আফছানে কা এরতেকা*, বারায়ে উর্দু, পাঞ্জাব, ১৯৭০।

মোহাম্মদ আনিসুল হক ঃ *আদবি সাখসিয়াত*, কোফ কিতাব ঘর- ৩৯ পেট্রুওয়াটুন, ঢাকা।

মুহাম্মদ কাছিম সিদ্দিকী ঃ *খাওয়াতিন কে নুমায়েন্দহ আফছানে*, এডুকেশনাল বুক হাউজ, আলীগড়, ২০1৪।

মুন্সি প্রেমচান্দ ঃ *প্রেমচল্লিছি (প্রথম খন্ড)*, দারুল আশয়াত পাঞ্জাব, লাহোর, ১৯৪২।

মুন্সী প্রেমচন্দ ঃ *গল্প-গুচ্ছ*, যুব প্রকাশনী, কলিকাতা।

মুনশী প্রেমচঁন্দ ঃ *বিবিধ প্রসঙ্গ-১*, হংস প্রকাশন, এলাহাবাদ, ১৯৮।

মুনশী প্রেমচন্দ ঃ *বলিদান*, মান সরোবর-৮।

মুন্সি প্রেমচাঁন্দ ঃ *মাজমুয়াহ মুন্সি প্রেমচাঁন্দ : আফছানে*, ছংগে মিল পাবলিকেশন, লাহোর, ২০০২।

মির্জা হামিদ বেগ, ড. ঃ *উর্দু আফসানুকি রুবায়াত ঃ ১৯০৩-১৯৯০*, একাডেমিক আদবিয়াতে পাকিস্তান, ইসলামাবাদ, ডিসেম্বর ১৯৯১।

শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় ঃ *সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি*, স্বদেশ ও সাহিত্য, রচণাবলী, ৫ম খণ্ড।

শাকিলুর রহমান, প্রফেসার ঃ *প্রেমচাঁদ কা ফান*, মর্ডান পাবলিশিং হাউজ, নয়া দিল্লী, ১৯৯৩।

শহিদুর আলম ঃ *শ্রেষ্ঠ উর্দুগল্প (প্রথম খণ্ড)*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ৮ জানুয়ারী ১৯৯।

শেহজাদ মানজার ঃ *ইসমত চুগতাই কে ১০ বেহতারিন আফছানে*, তাখলিকাত লাহোর, ১৯৯৭।

শিবরানী দেবী ঃ *প্রেমচাঁদ : ঘর মে*, আঞ্জুমান তারাক্কি উর্দু (হিন্দী), নয়া দিল্লী, ২০০৭।

সৌরেন দত্ত ঃ *মুন্সী প্রেমচন্দ : গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড*, কামিনী প্রকাশালয়, ৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলকাতা, ২০১২।

সৈয়েদ ইজাজ হুসাইন, ড. ঃ *মুখতাছের তারিখে আদবে উর্দু*, উর্দু কিতাব ঘর, দিল্লি।

Biography ঃ The Editor of Encyclopedia Britannica, Korratuline Hayder, 09 October, 2017.

David Rubin ঃ *Widows, wives, and other heroines*: twelve short stories, New York: Oxford University Press, Delhi, 1998.

David Rubin ঃ *The World of Premchand: Selected Short Stories*, The David Rubin Collection, New Delhi, 21 October 2017.

Irfan Habib ঃ *An Atlas of the Mughal Empire: Political and Economic Maps with etailed Notes*, *Bibligraphy and Index*, Oxford University press, Oxford New york – 1982.

Joseph E. Schwactzberg ঃ *A Historical Atlas of South Asia*, The University of Chicago Press ltd. London, 1978.

Madan Gopal ঃ *Munshi Premchand: A Literary Biography*, Asia Publishing House, Bombay, 1964.

Nandini Nopany and P. Lal ঃ *Twenty Four Stories by Premchand*, Vikas Publishing House, New Delhi, 1980.

Sankar Sengupta ঃ *A study of women of bengal*, 1st ed. Cal. 1970.

The Indian Empery ঃ The Imperial Gajatier of India, Varot, 1909, Vo. 02.

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

সাহিত্য একাডেমী	ঃ	ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, ইনভাইট ইউ টু মিট দ্যা অথর : জুগেন্দর পাল, ১৭ এপ্রিল, ২০০২।
দ্যা হিন্দু	ঃ	নয়া দিল্লি, এপ্রিল ২৪, ২০১৬।
হংস	ঃ	জীবন সার, (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৩২), দিল্লী।
The Hindu	ঃ	*Rashid Jahan: Rebel With a Cause*, Retrieved 19 July 2018.
Times of India	ঃ	*A new biography of Saadat Hasan Manto, Arunima Mazumdar, 11 March, 2014*
World Cat Identities Organization	ঃ	Imtiyaz Ali Taj: 1900–1970, Retrieved 31 October 2013.

রিপোর্ট ও ওয়েব সাইড

মাহনামা চাহারছো, রাউলপিন্ডি, ভলিয়মঃ ১১, মার্চ ও এপ্রিল ২০০২, পৃ. ৫।

মাগরিবে বাঙ্গাল : প্রেমচান্দ নম্বর, ইনফরমেশন এন্ড কালচারাল এফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট অফ গভমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ভলিয়মঃ ৫১, ইস্যু নম্বরঃ ১৫-১৭, কলকাতা, ১ আগস্ট - ১ সেপ্টেম্বর ২০০৪, পৃ. ১০০।

http://hindi.firstpost.com/culture/special-story-on-munshi-premchand-village-lamahi-on-his-birthday-pr-44233.html

Indian Village Directory, ওয়েব সাইডঃ banwaripur Lamhi

Intizar Husain , *The Rationalist and the Romantic: Niaz Fatehpuri*, 05 Sep 2011, NewAgeIslam.Com

Padma Awards, *Ministry of Home Affairs, Government of India. 2015*. Retrieved July 21, 2015.

Report of the Commissioner for linguistic minorities: 50th report. July 2012 to June 2013.

varanasi.nic.in

State division of Uttar Pradesh, ২২ জুলাই, ২০১২।

চিত্রাবলী ও প্রতিচিত্র

মুন্সি প্রেমচাঁদ (ধনপত রায়) (১৮৮০-১৯৩৬)।

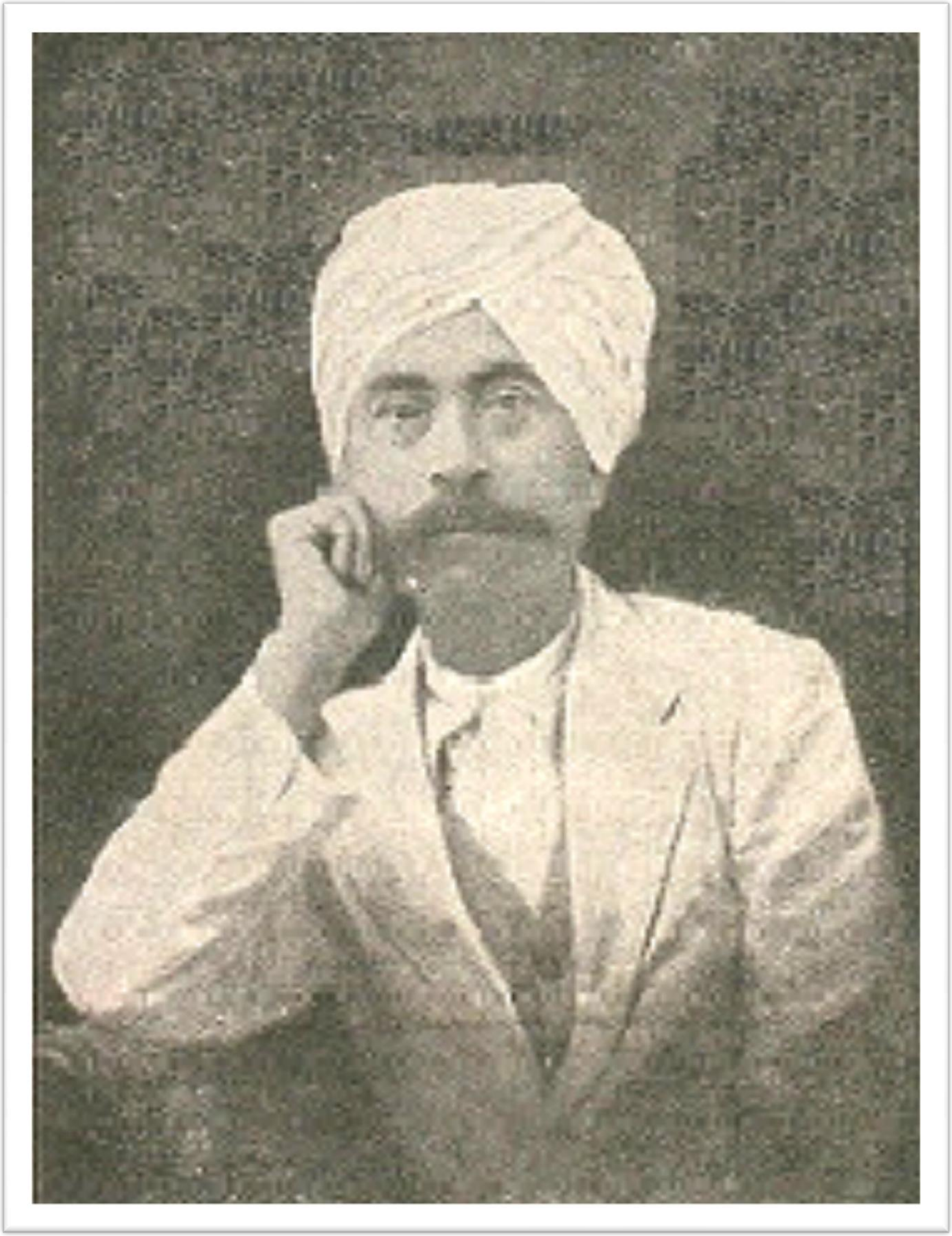

সরকারী চাকরী কালীন সময়ে মুন্সি প্রেমচাঁদ।

মুন্সি প্রেমচাঁদ **১৯২১** সালে সরকারী চাকুরী ছাড়ার পরে।

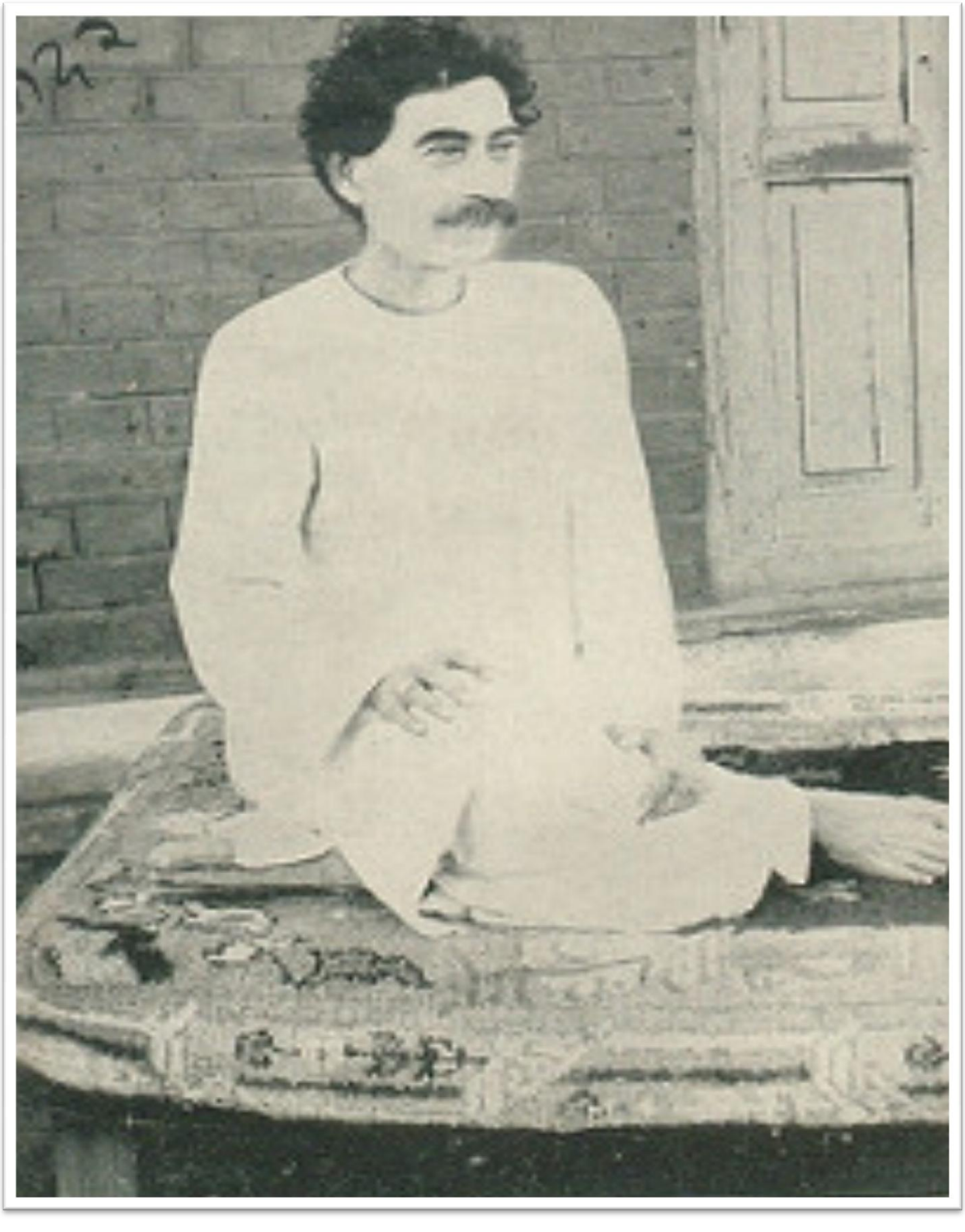

মুন্সি প্রেমচাঁদ ১৯৩২ সালে।

নিজ দফতরে কর্মরত অবস্থায় মুন্সি প্রেমচাঁদ।

দ্বিতীয় স্ত্রী শিবরাণী দেবীর সাথে মুন্সি প্রেমচাঁদ।

মুমূর্ষ থাকা অবস্থায় মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে মুন্সি প্রেমচাঁদ। পিছনে তার স্ত্রী শিবরাণী দেবী।

মুন্সি প্রেমচাঁদের বাসস্থান।

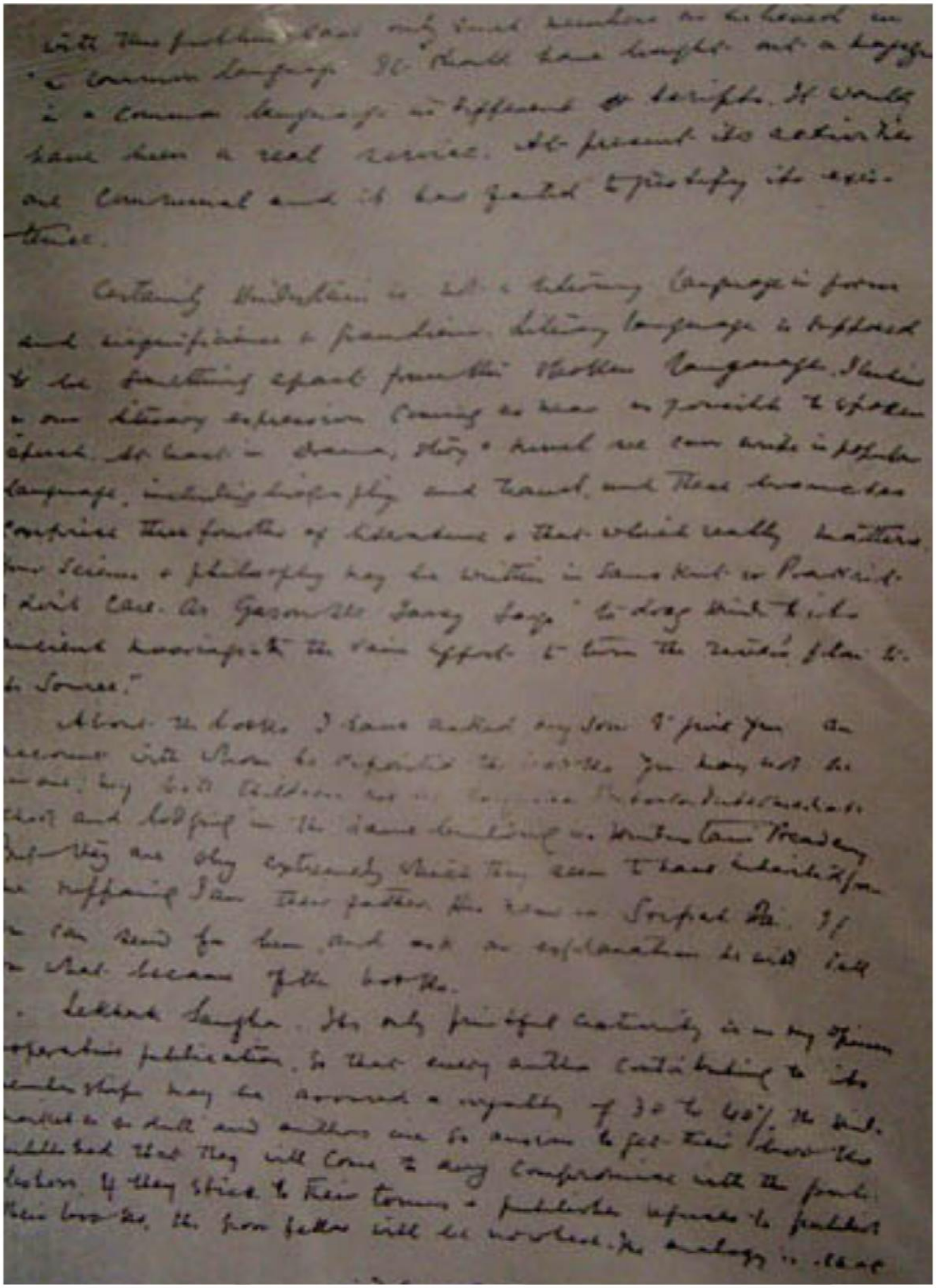

প্রেমচাঁদের ইংরেজী হাতের লেখা।

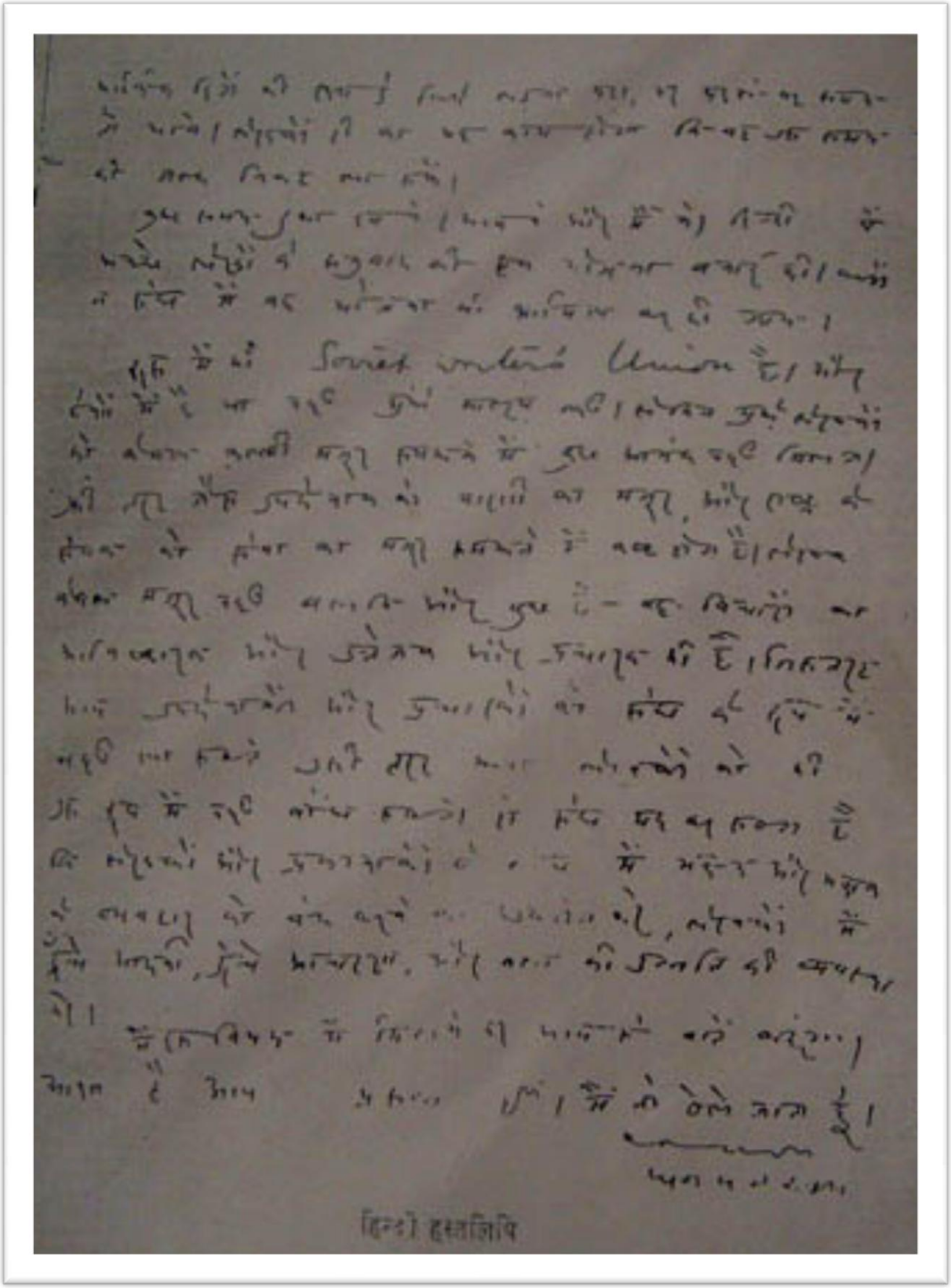

हिन्दी हस्तलिपि

প্রেমচাঁদের হিন্দী হাতের লেখা

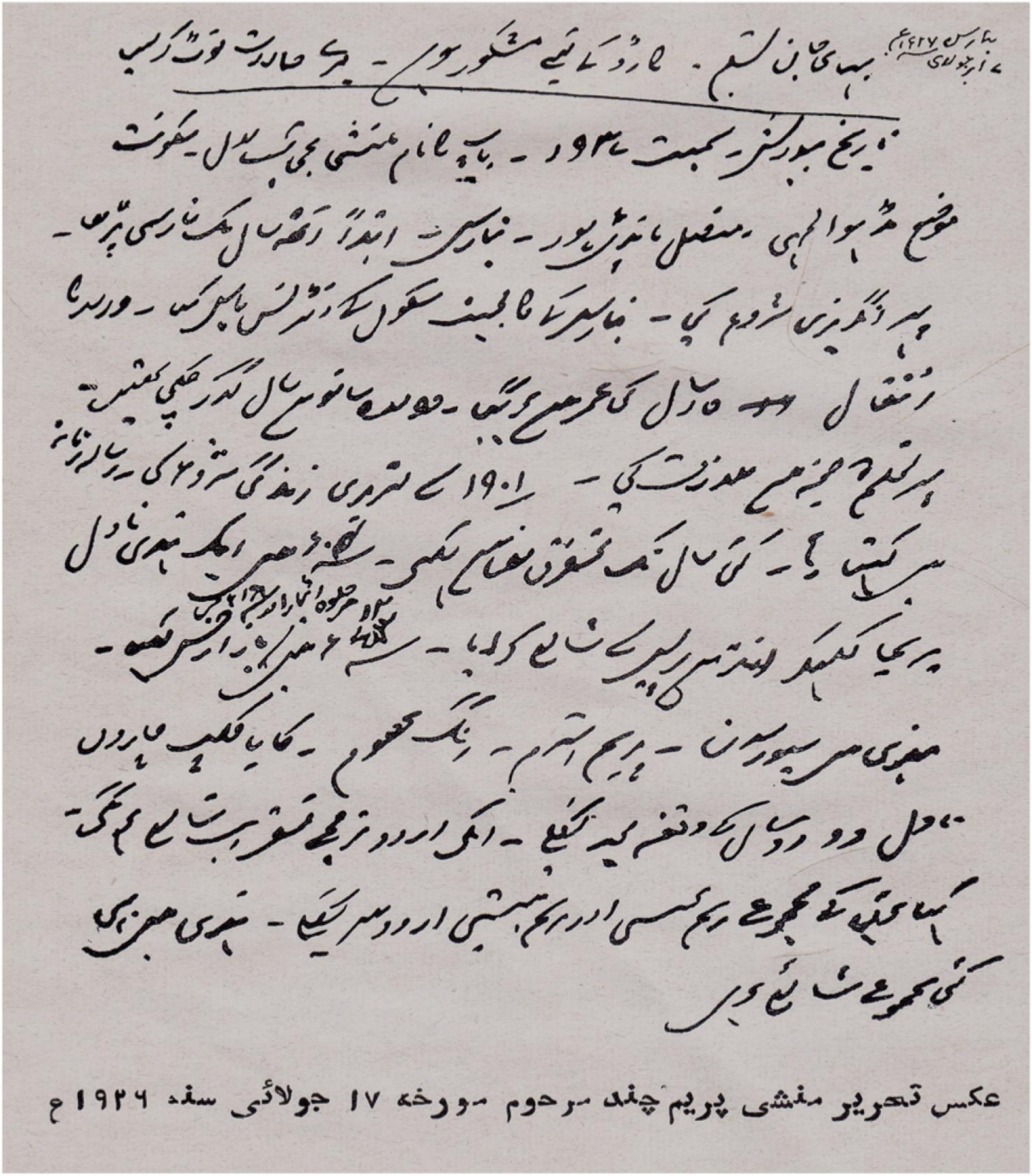
بنارس ۱۷ جولائی ۱۹۲۶ء

[illegible]

تاریخ پیدائش - سمبت ۱۹۳۷ - باپ کا نام منشی عجائب لال - سکونت
موضع مڈھوا [illegible] متصل پانڈے پور - بنارس - ابتداً آٹھ سال تک فارسی پڑھی -
پھر انگریزی شروع کی - بنارس کے کالجیٹ سکول سے انٹرنس پاس کیا - والد کا
انتقال ۱۵ سال کی عمر میں ہو گیا - والدہ ساتویں سال گذر چکی تھیں -
پھر تعلیم محکمہ میں ملازمت کی - ۱۹۰۱ سے لٹریری زندگی شروع کی - زمانہ
میں لکھتا تھا - کئی سال تک مختلف مضامین لکھے - ۱۹۰۹ میں ایک ہندی ناول
پریما لکھکر انڈین پریس سے شائع کرایا - [illegible]
ہندی میں سیوا سدن - پریم آشرم - رنگ بھومی - کایا کلپ چار ناول
[illegible] وہ دو دو سال کے وقفہ سے نکلے - ان کے اردو ترجمے بھی شائع ہو گئے -
کہانیوں کے مجموعے پریم پچیسی اور پریم بتیسی اردو میں نکلے - ہندی میں بھی
کئی مجموعے شائع ہوئے

عکس تحریر منشی پریم چند مرحوم مورخہ ۱۷ جولائی سنہ ۱۹۲۶ء

প্রেমচাঁদের উর্দু হাতের লেখা।

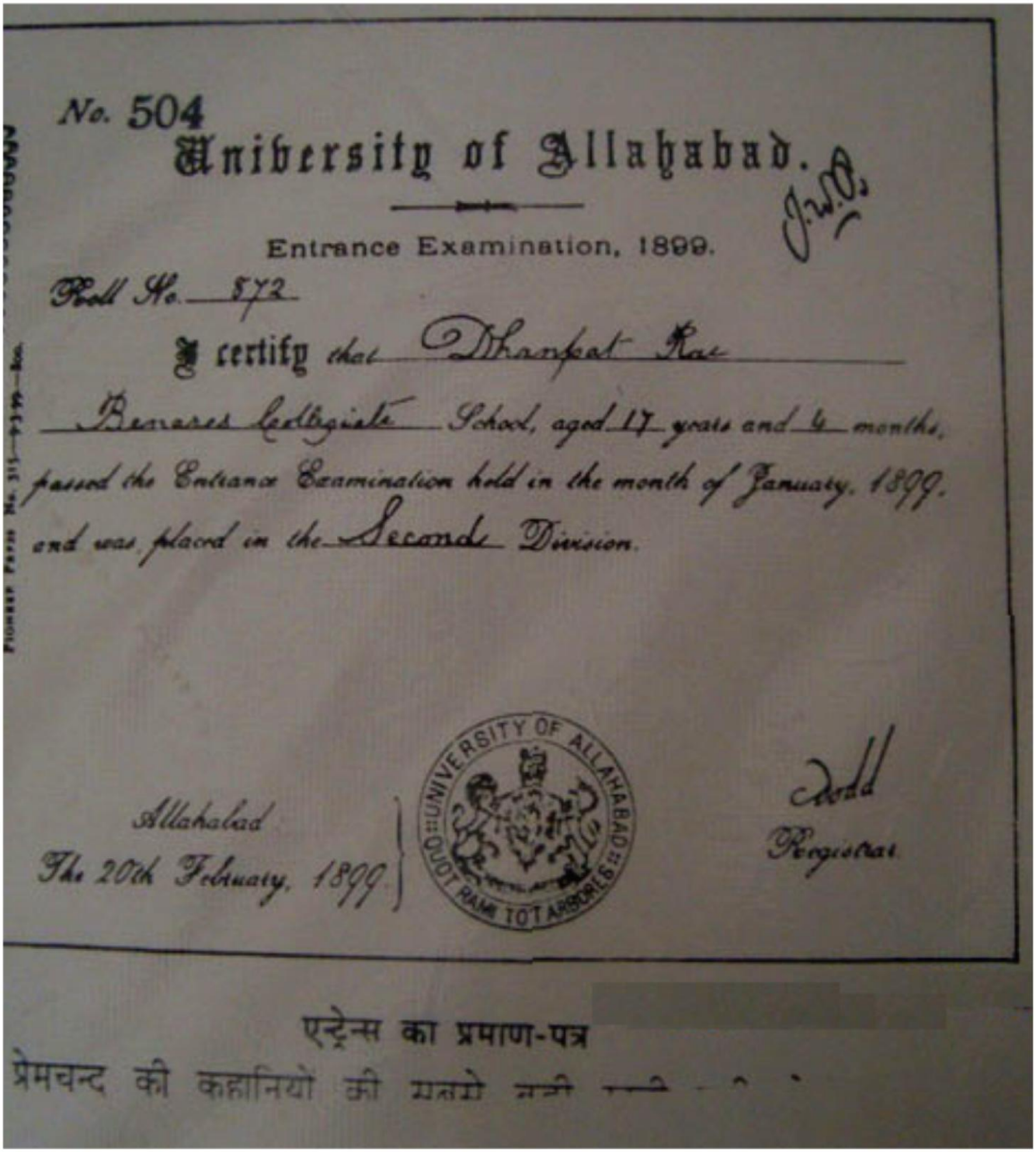

No. 504

University of Allahabad.

Entrance Examination, 1899.

Roll No. 572

I certify that Dhanpat Rai

Benares Collegiate School, aged 17 years and 6 months, passed the Entrance Examination held in the month of January, 1899, and was placed in the Second Division.

Allahabad
The 20th February, 1899.

Registrar

১৮৯৯ সালে এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুন্সি প্রেমচাঁদের ইন্টারেন্স পরীক্ষায় পাশের সার্টিফিকেট।

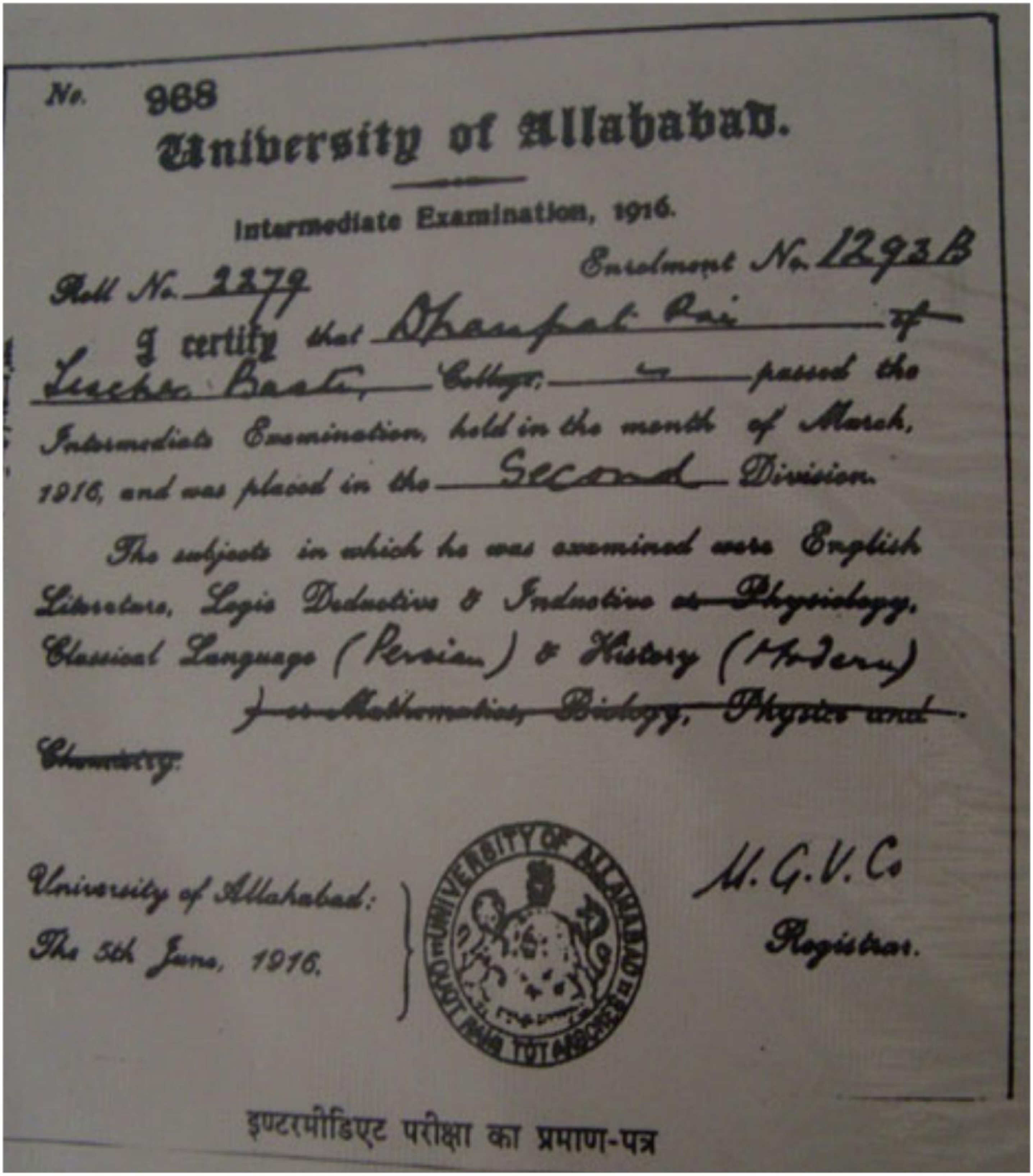

No. 968

University of Allahabad.

Intermediate Examination, 1916.

Enrolment No. 1293B

Roll No. 2379

I certify that Dhanpat Rai of [illegible] College, — passed the Intermediate Examination, held in the month of March, 1916, and was placed in the Second Division.

The subjects in which he was examined were English Literature, Logic Deductive & Inductive ~~or Physiology~~, Classical Language (Persian) & History (Modern) ~~or Mathematics, Biology, Physics and Chemistry~~.

University of Allahabad:
The 5th June, 1916.

M. G. V. Co
Registrar.

इण्टरमीडिएट परीक्षा का प्रमाण-पत्र

১৮৯৯ সালে এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুন্সি প্রেমচাঁদের প্রবেশপত্রের সার্টিফিকেট।

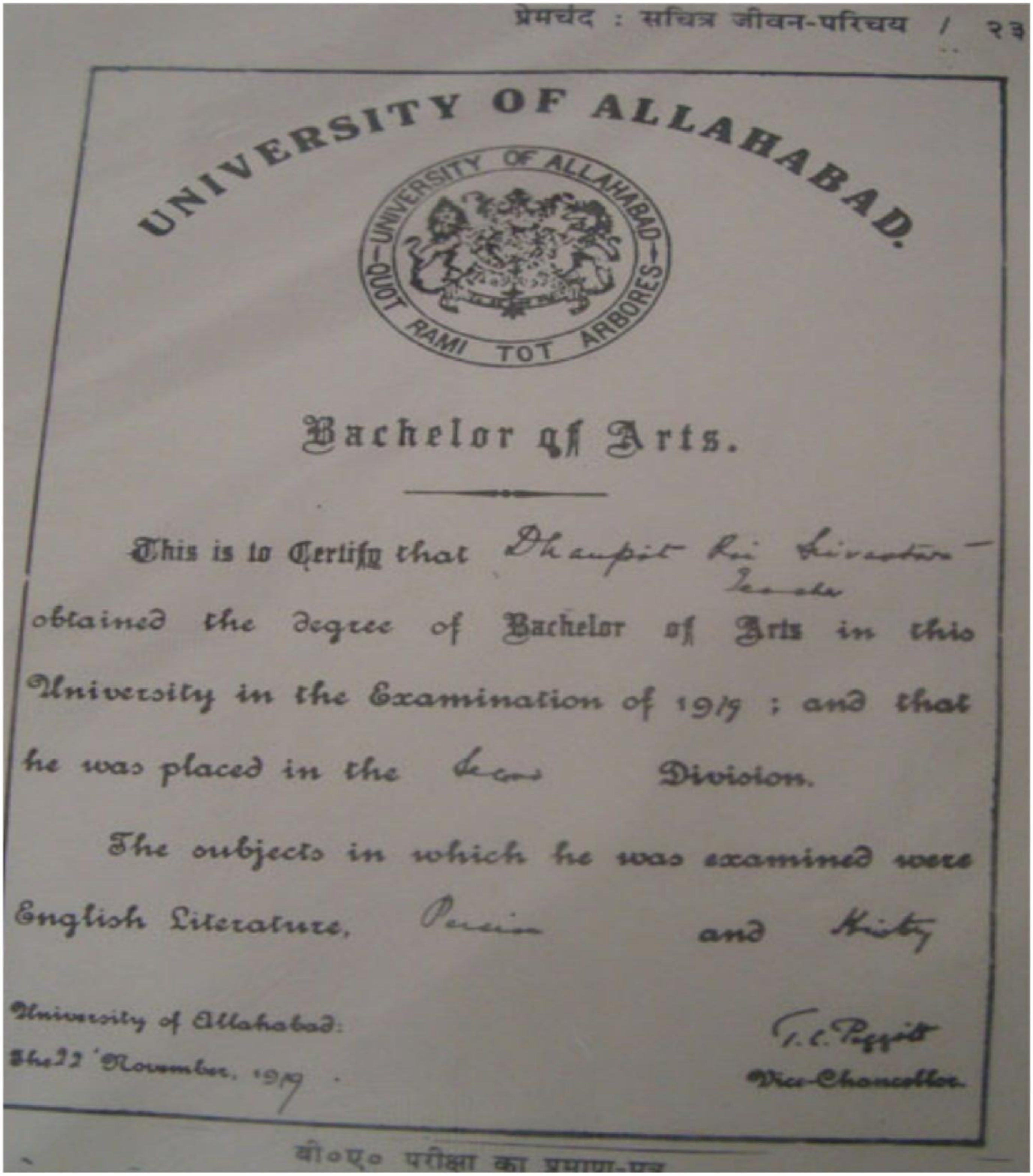

प्रेमचंद : सचित्र जीवन-परिचय / २३

UNIVERSITY OF ALLAHABAD.

UNIVERSITY OF ALLAHABAD — QUOT RAMI TOT ARBORES

Bachelor of Arts.

This is to Certify that Dhanpat Rai Srivastava
obtained the degree of Bachelor of Arts in this University in the Examination of 1919; and that he was placed in the Second Division.

The subjects in which he was examined were English Literature, Persian and History

University of Allahabad:
The 22 November, 1919.

Vice-Chancellor.

बी०ए० परीक्षा का प्रमाण-पत्र

১৯১৯ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাসকৃত ব্যাচেলর অফ আর্টস ডিগ্রীর সার্টিফিকেট।

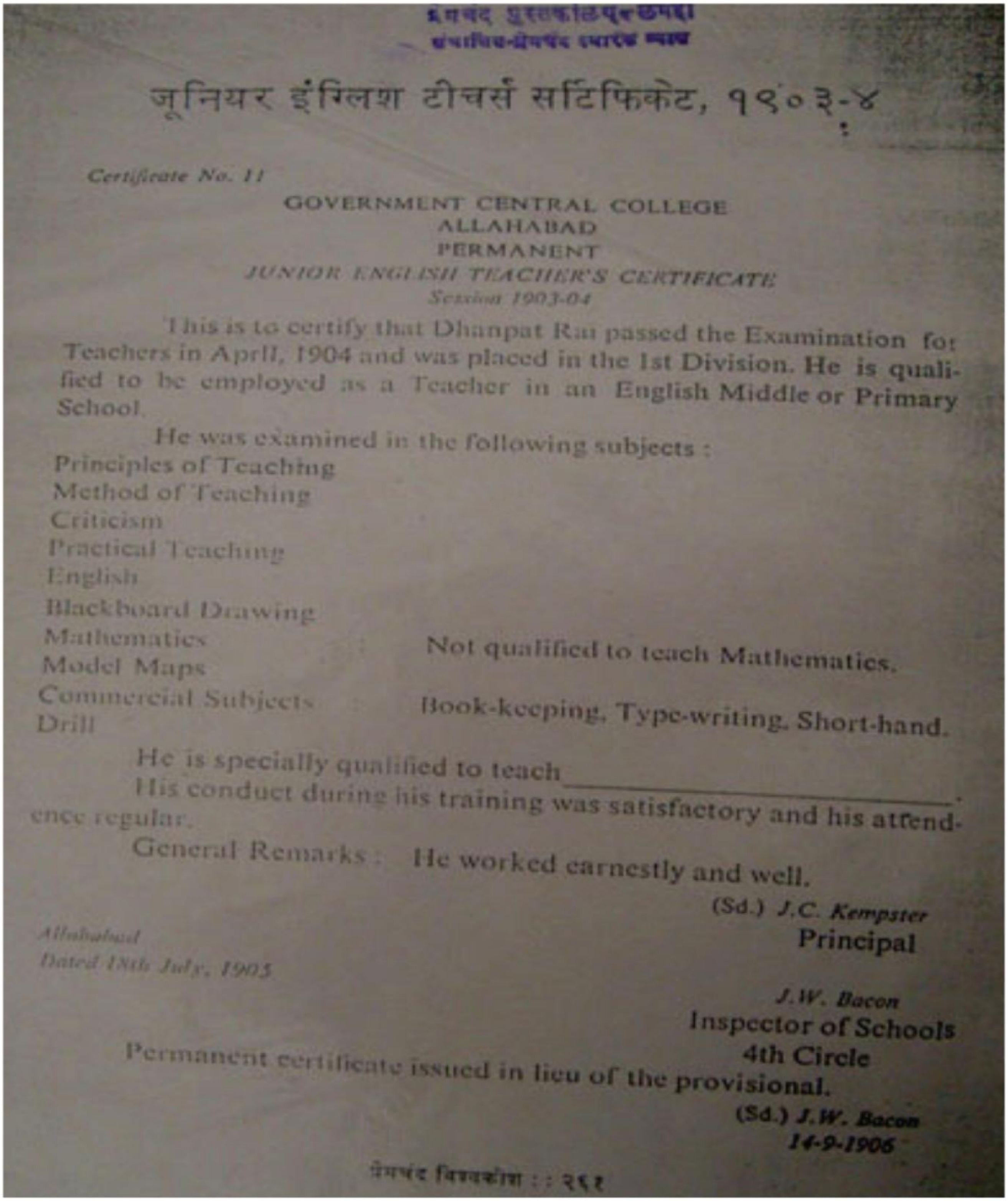

जूनियर इंग्लिश टीचर्स सर्टिफिकेट, १९०३-४

Certificate No. 11

GOVERNMENT CENTRAL COLLEGE
ALLAHABAD
PERMANENT
JUNIOR ENGLISH TEACHER'S CERTIFICATE
Session 1903-04

This is to certify that Dhanpat Rai passed the Examination for Teachers in April, 1904 and was placed in the 1st Division. He is qualified to be employed as a Teacher in an English Middle or Primary School.

He was examined in the following subjects :

Principles of Teaching
Method of Teaching
Criticism
Practical Teaching
English
Blackboard Drawing
Mathematics : Not qualified to teach Mathematics.
Model Maps
Commercial Subjects : Book-keeping, Type-writing, Short-hand.
Drill

He is specially qualified to teach ______________.

His conduct during his training was satisfactory and his attendence regular.

General Remarks : He worked earnestly and well.

(Sd.) *J.C. Kempster*
Principal

Allahabad
Dated 18th July, 1905

J.W. Bacon
Inspector of Schools
4th Circle

Permanent certificate issued in lieu of the provisional.

(Sd.) *J.W. Bacon*
14-9-1906

प्रेमचंद विश्वकोश :: २६१

সরকারী কেন্দ্রীয় কলেজ এলাহাবাদে জুনিয়র ইংলিশ শিক্ষকের সার্টিফিকেট।

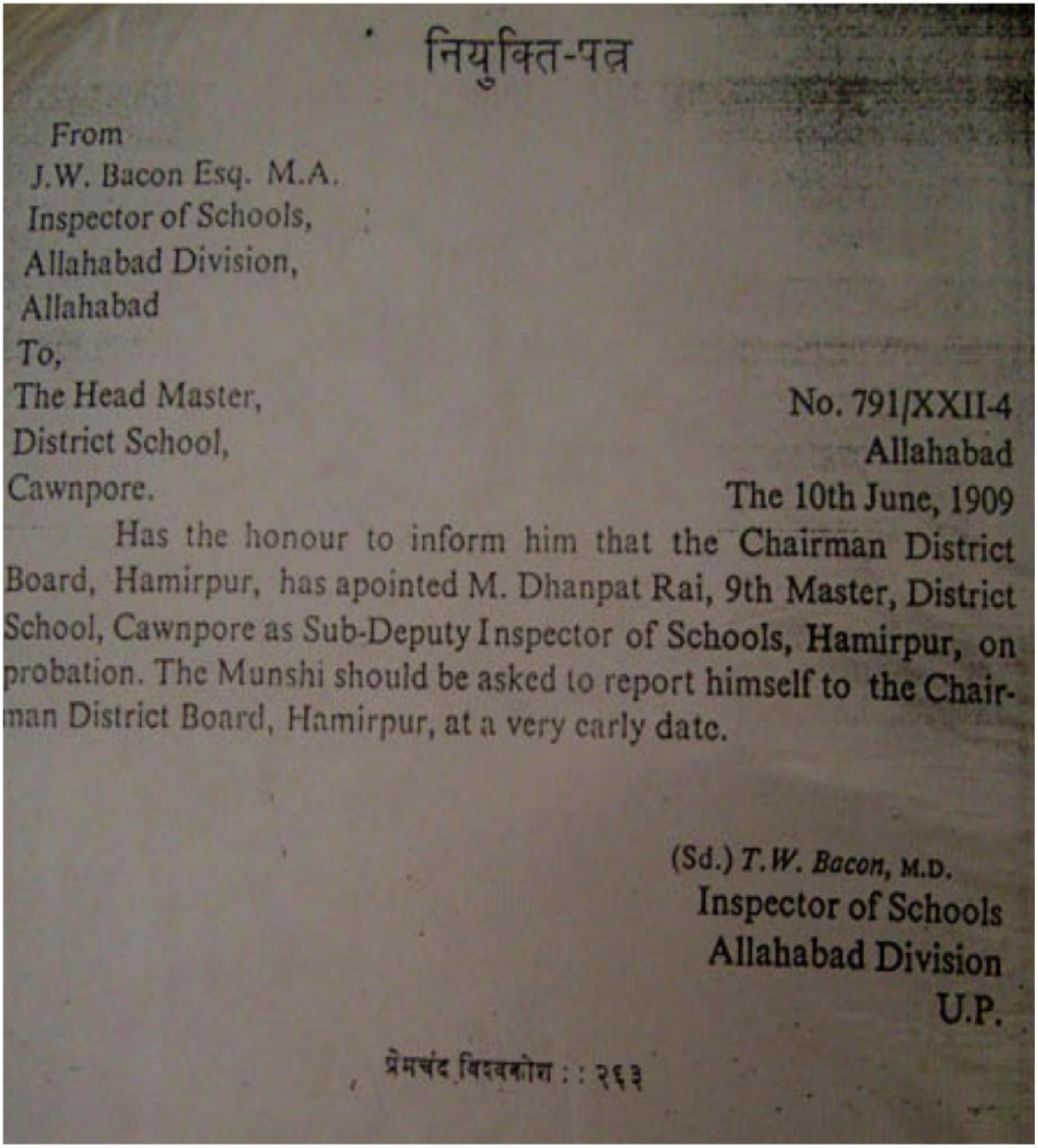

नियुक्ति-पत्र

From
J.W. Bacon Esq. M.A.
Inspector of Schools,
Allahabad Division,
Allahabad

To,
The Head Master,
District School,
Cawnpore.

No. 791/XXII-4
Allahabad
The 10th June, 1909

Has the honour to inform him that the Chairman District Board, Hamirpur, has apointed M. Dhanpat Rai, 9th Master, District School, Cawnpore as Sub-Deputy Inspector of Schools, Hamirpur, on probation. The Munshi should be asked to report himself to the Chairman District Board, Hamirpur, at a very early date.

(Sd.) *T.W. Bacon*, M.D.
Inspector of Schools
Allahabad Division
U.P.

प्रेमचंद विश्वकोश : : २६३

হামিরপুর স্কুলে সাব-ডিপুটি ইন্সপেক্টর হিসেবে চাকুরির নিয়োগ পত্র।

লমহী যাদুঘরে রাখা মুন্সি প্রেমচাঁদের গ্রন্থসমূহ এবং তাঁর মূর্তি।

মুন্সি প্রেমচঁন্দ লাইব্রেরী, যা তার জন্মস্থান লমহী গ্রামে অবস্থিত। গ্রন্থাগারে শ্রীপত রায়, অমৃতরায় এবং প্রেমচাঁদের বিভিন্ন ছবি, বিভিন্ন পদক ও বই সংগৃহিত আছে।

প্রেমচাঁদের স্মৃতিসৌধের প্রধান ফটক।

১৯১৬ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত গোরখপুরে বসবাসরত মুন্সি প্রেমচাঁদের স্মৃতিচারণের একটি প্লেট।